ধর্মাধর্ম

প্রদীপ দাশগুপ্ত

গণমন প্রকাশন
৩৩এ/১এ হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন
কলকাতা - ৫০

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪

প্রকাশক

শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
গণমন প্রকাশন
৩৩এ/১এ হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন
কলকাতা - ৭০০ ০৫০

মুদ্রণ

শিপা এন্টারপ্রাইজেস্
৬/৪, গোপাল চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০২

আমার সমস্ত কর্মের প্রেরণা
আমার সদ্য প্রয়াত
মাকে —

সূচী ঃ

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

তোমাদের ঐতিহ্যবাদের ধাক্কায় চিৎপাৎ হয়ে পড়ে আছি। না, কোনও আলঙ্কারিক অর্থে নয়, একেবারে সত্যি সত্যি। গত সপ্তাহে এক বৃদ্ধ গেরুয়াধারী সাধু ট্রেন থেকে আমাকে সবলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে গটমট করে হেঁটে চলে গেলেন, পেছন ফিরে একবার তাকালেনও না। জগৎটাকেই যিনি 'মায়া' বলে জেনে ফেলেছেন এবং নিজের 'মোক্ষ'ই যাঁর একমাত্র কাম্য (অবশ্য উদরপূর্তিটাও নিশ্চয়ই বাদ যায় না, কারণ সাধুটি যথেষ্ট নাদুশ নুদুশ), তাঁর পক্ষে আমার মত পাপীতাপীর পতনে বিচলিত না হওয়াই স্বাভাবিক। আমাকে অনেক যত্নে বাঁচিয়েছে দুটি অজ্ঞাতকুলশীল যুবক, যাদের বেশভূষায় চালচলনে কোনও ঐতিহ্য-বিলাস ছিল না। বুকে হাতে প্লাস্টার নিয়ে তোমাকে এ চিঠি লিখছি। সারতে মাস দুয়েক লাগবে। মাঝে মধ্যে তোমাকে পত্রাঘাত করার এই এক অখণ্ড অবসর।

ঐতিহ্যের কথা তুলছি কেন, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছে, তারই প্রসঙ্গে গতদিন তুমি ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলে। এমন কি আমাদের যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নিয়ে আমরা এতদিন গর্ব করেছি, যা আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একেবারে ভিত্তি, যা নিয়ে এতদিন কেউ কখনও তর্ক তোলেনি, এমন কি তাকেও যে এখন 'মেকি' বলা হচ্ছে এবং আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতাকে যে 'হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারী' হতে হবে বলে দাবি করা হচ্ছে, তর্কের তোড়ে তুমি তারও সাফাই গাইছিলে। আমি কোনও বিতর্কে না গিয়ে তোমাকে বোঝাতে [illegible]ইছিলাম যে ঐতিহ্য এমনই একটি জিনিস, যার সবটা কখনও বর্জন করা যায় না, অ[illegible]টাই রক্ষাও করা যায় না, রক্ষা করা উচিতও হয় না।

'রামায়ণ' 'মহাভারতে'র কথাই ধর। এ দুটি যে অসামান্য মহাকাব্য, এ যে আমাদের ঐতিহ্যের মহান উত্তরাধিকার এ কথা কে না মানবে। কিন্তু তুমি যদি রামায়ণ মহাভারতের যুগটাকে এ যুগে ঐতিহ্যের নামে চালু করতে চাও তো মহা বিড়ম্বনা। কৃষ্ণ আর পাণ্ডবেরা যদি 'হিন্দু' ঐতিহ্যের নিদর্শন হয়, তবে কৌরবরাও কি 'হিন্দু' নয়? তারা সকলেই তো জেঠতুতো খুড়তুতো পিসতুতো ভাই। তা হলে বলতে হয় 'হিন্দু' ঐতিহ্য মাত্রই মহৎ নয়। শুধু কি তাই? পাণ্ডবেরাই বা কোন ধোয়া তুলসীপাতা? ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত নিজের ভাই ও স্ত্রীকে বাজি রাখতে একালের লম্পট জুয়াড়িরও বিবেকে বাধবে। একলব্যের হত্যাকাণ্ড মেনে নিতে তুমি নিশ্চয়ই পারবে না। আর ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে তোমার গিন্নি যদি দ্রৌপদী হতে চান, তবে তুমি অবশ্যই বিদ্রোহী হবে! কারণ, তোমরাও তো পাঁচ ভাই! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর আগে কৃষ্ণ যে বক্তৃতাটা অর্জুনের কাছে দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' তিনি যুগে যুগে

জন্মগ্রহণ কবেন। কিন্তু যুদ্ধে তো উভয পক্ষই ঝাড়ে বংশে প্রায নির্মূল হযে গেল, সেই মহাশ্মশানে কোন ধর্ম স্থাপিত হল, বোঝা গেল না। কাবণ তাবপবেও হিংসা, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, দ্বেষ জেগে বইল। স্বযং কৃষ্ণেব যদুকুল ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বে নির্মূল হল, আব তাদেব স্ত্রীদেবকে গাণ্ডীবধাবী অর্জুন দস্যুদেব হাত থেকে বক্ষা কবতে পাবলেন না। ববং সেই লাস্যমযী পুবস্ত্রীবা অনেকেই স্বেচ্ছায দস্যুদেব কণ্ঠলগ্না হযেছিল, একথা স্বযং ত্রিকালদর্শী মহাকবিই লিখে গেছেন। তাহলে? কোন ঐতিহ্যটা মানব? মহাভাবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই খেদ কবছেন কুরুবংশ ও যদুবংশ নির্মূল হওযাব জন্য, আব আমবা তাবস্ববে বলছি 'ঐতিহ্য', 'ঐতিহ্য'। তাসেব দেশেব মতান্ধবা এভাবেই চিৎকাব কবেছিল, 'কৃষ্টি'। 'কৃষ্টি'। মনে আছে?

বামাযণেব বাবণ না হয অনার্য আব মন্থবা না হয দাসী কিন্তু কৈকেযী তো আর্য বমণী। আব আর্য দশবথ? তিনি তো স্ত্রৈন। এবং সেই মহামতি বাম। তাঁকে অনুসবণ কবে তুমি কি আজও হিন্দু স্ত্রীদেব জীবন্ত আগুনে চড়াতে বা সহায সম্বলহীনভাবে বনবাসে দিতে বল? বামেব শূদ্রক বধ তুমি কি সমর্থন কব? মহাকাব্যেব কুরু পাণ্ডব বা বামেব বিচাব কবতে আমি বসিনি। কাবণ এ যুগেব নিবিখে তাব বিচাব কবা হবে ভুল। তেমনি এ যুগে বাম বা হনুমান সাজতে যাওযাটাও বাতুলতা। তোমাব মত ভালো মানুষেবা কেউ কেউ যে তা বুঝতে চায না, সেটাই বিস্ময।

বেদ, ব্রাহ্মণ, পুবাণ, সংহিতায তোমাব অচলা ভক্তি বযেছে। কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি যদি একবাব পড়ে দেখতে তাহলে বুঝতে যে সে সব গ্রন্থেব অনেক কিছুই আজকেব দিনে পালনীয নয। মাংসভোজী, সুবাপাযী, দ্যূতাসক্ত, গো-অপহবণকাবী, পবস্ত্রীগামী, মাতা পিতা হন্তাবক দেবতাদেব যে চিত্র বেদে পুবাণে বযেছে, তা অনুকবণ যোগ্য নয। আমাব ভাঙা শবীব নিযে খুঁজে পেতে ঐ সব গ্রন্থ থেকে কোনও উদ্ধৃতি আজ তোমায দিতে পাবলাম না। হাতেব কাছে 'অগ্নিপুবাণ'টি বযেছে। তাব ২১৫ তম অধ্যায থেকে দু-এক লাইন তোমাব চক্ষুরুন্মিলনেব জন্য তুলে দিলাম। মন দিযে অবধান কব ঃ

'অগ্নি কহিলেন, সাতবাব গাযত্রী মন্ত্র জপ কবিলে পাপেব বিনাশ হয। গাযত্রী, অষ্টপাদ, ঋগর্ধ এবং ঋক-এই সমূদয আবৃত্তি কবিলে ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, স্বর্ণহবণ কিংবা পবপত্নী গমনেব পাপ হইতে মুক্ত হওযা যায।........লক্ষবাব গাযত্রী জপ কবিলে গো হত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নী গমন, স্বর্ণস্তেয এবং মদ্যপানেব পাপ বিদূবিত হয।' অতএব মাভৈঃ। এই সমস্ত পাপগুলি নিশ্চিন্তে কবে যাও, শুধু অন্তিমে গাযত্রী জপ কব, তা হলেই মোক্ষলাভ হবে। অবশ্য তোমাব এতে কোনও সুবাহা নেই। কাবণ, এই প্রেশক্রিপশনটি কেবল ব্রাহ্মণেব জন্য, গাযত্রী ও বেদ পাঠে একমাত্র তাদেবই অধিকাব।

এতগুলি পাপ কবেও যখন মুক্তিব উপায বযেছে, তখন সাধু মহাবাজ আমাব মত শূদ্রকে বেল লাইনে ধাক্কা মেবে ফেলে যে চলে যাবেন, তাতে আব বিস্ময কি? আসলে 'সনাতন' হিন্দু ধর্মে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিব পথে 'মোক্ষলাভ'কেই পবমকাম্য জ্ঞান কবা হযেছে। কিন্তু যে ছেলে দুটি আমাকে বক্ষা কবল, তাদেব সেই সেবা ও করুণাব আদর্শটিও অবশ্যই ভাবতীয। এই প্রেম, অহিংসা ও করুণাব বাণীটি ভাবতবর্ষে প্রচাব কবেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। এদেশেব হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ কেমন কবে বলপ্রযোগে বৌদ্ধধর্মকে উৎখাৎ কবে বুদ্ধকে অবতাবেব আসনে বসিযেছিল, সে কথা আব একদিন না হয লিখব, নচেৎ চিঠি বড় হযে যাবে। শুধু একবাব স্মবণ কবিযে দেব তোমাদেব 'পবমত সহিষ্ণু' হিন্দুধর্ম কেমন কবে বৌদ্ধধর্মকে উচ্ছেদ কবেছিল, ববীন্দ্রনাথেব অবিস্মবণীয 'পূজাবিনী' থেকে তাবই বর্ণনাব দুএকটি পংক্তি। বিম্বিসাবেব পুত্র বাজা হযে পিতাব আসনে বসে

"পিতাব ধর্ম শোনিতেব স্রোতে / মুছিযা ফেলিল বাজপুবী হতে--/সঁপিল যজ্ঞ অনল আলোতে বৌদ্ধ শাস্ত্র বাশি"। সেই ভযংকব বৌদ্ধ নিধন যুগে বুদ্ধভক্তবা যেদিন ঘবে ভযে কম্পমান, 'শ্রীমতী নামে সে দাসী' যেদিন দুঃসাহসে ভব কবে বুদ্ধস্তূপমূলে একা অর্ঘ্যব থালি নিযে এল, প্রাসাদ প্রহবীবা এল কৃপাণ হাতে ছুটে, "সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল বক্তলিখা।.....স্তূপ পদমূলে নিভিল চকিতে শেষ আবতিব শিখা"।

বৌদ্ধদেব ওপব নির্মম অত্যাচাব সত্ত্বেও বুদ্ধেব অহিংসা, প্রেম ও করুণাব মন্ত্র আমাদেব ঐতিহ্যেব অঙ্গীভূত হযে গিযেছে। এদেশেব নিবামিষ আহাব, মদ্যপান বিবোধিতা, যৌন শুচিতা প্রভৃতি জিনিসগুলিও আমাদেব হিন্দু দেবদেবীব অবদান নয; তাদেব চবিত্রেব কথা তো আগেই বললাম, এই সবই হল ভাবতবর্ষে বৌদ্ধ ঐতিহ্যেব ফসল। বিভিন্ন নদী যখন এক হযে মিশে যায, তখন যেমন তাদেব আব আলাদা কবে চেনা যায না, তেমনি বহু সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও চিন্তাব স্রোত আমাদেব বক্তে মিশে আছে–তাকে আলাদা কবে সনাক্ত কবা আজ কঠিন। এই ঐতিহ্যে একটা বড় অবদান ইসলামেবও, সে কথা পবেব বাবে বলব।

আজকে তোমাকে একটা প্রশ্ন কবেই এই চিঠি শেষ কবব। কিছু অপবিণামদর্শী, অবিমৃষ্যকাবী বাজনীতিক আপোসেব সুবে একটা কথা তুলেছেন। বলেছেন "অযোধ্যায মন্দিব ভেঙে বাববি মসজিদ গড়া হযেছিল কিনা, তা নিযে একটা বিচাব বসুক। যদি ভাঙা হযে থাকে, তবে সেখানে আবাব মন্দিব গড়তে দেওযা হোক।" ইতিহাসেব দস্যুবৃত্তিব সুবিচাবেব পথ যদি এই হয, তবে যে অসংখ্য বৌদ্ধ মঠগুলি ভাঙ্গা হযেছিল, যে নেড়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবা পূর্ব বাংলায পালিযে গিযে পবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেছিল বলে তাদেব নাম হযেছিল 'নেড়ে' বা 'লেড়ে', যে অসংখ্য একলব্য, শূদ্রক আব শ্রীমতীবা ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞ বেদীমূলে প্রাণ দিযেছিল, তাব বিচাব কে কববে? সেই প্রাণগুলি আবাব ফিবিযে আনা যাবে তো?

॥ দুই ॥

আমাব গতদিনেব চিঠি পেযে নিশ্চযই খুব চটেছ। আসলে আমি যে তোমাকেই শুধু কথাগুলি শোনাচ্ছিলাম তা নয। তোমাকে উপলক্ষ কবে আব দশজনকেই কেবল নয, নিজেকেও কথাগুলি বলছিলাম। পুবনো নাটকেব 'সলিলকি' অর্থাৎ স্বগতোক্তিব মত, তবে কিনা ঠিক বিপবীতভাবে। সেখানে অভিনেতা নিজেব মনে কথা বলে কিন্তু অপবে শুনতে পায। এখানে আমি অপবেব কাছে কথাগুলি বলছি কিন্তু নিজেকেও শোনাচ্ছি।

নিজেকে কেন? অথবা বলতে পাব নিজেদেবকে কেন? জান তো, আমাদেব প্রায প্রত্যেকেব মধ্যে একটা 'বিপবীত ব্যক্তিত্ব' বযেছে, ইংবেজিতে যাকে বলে 'অল্টাব-ইগো'। আমবা নাবী স্বাধীনতাব কথা বলি, কিন্তু নিজেব স্ত্রীটি স্বাধীনতাব একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম কবে যাক, তা চাই না। প্রগতিশীলতাব কথা বলি, কিন্তু স্ত্রীব নামে সম্পত্তি কবে ট্যাক্স ফাঁকি দেওযাব মত বাবা–মা সমাজেব নামে বিযেব যৌতুক গ্রহণ কবে বিবেককে ফাঁকি দিই। মুখে যুক্তি তর্কেব কথা বলি। কিন্তু মাদুলি কবজ ধাবণ কবি, বিপদে মানত কবি আব ঘটা কবে কবি সর্বজনীন পুজো! আমাকে একজন দোর্দণ্ড প্রতাপ বামপন্থী কর্মী কালি পুজোব চাঁদা চাইতে এসে আমাব মৃদু আপত্তি শুনে বলেছিল, "ঐসব

ছাড়ান দ্যান তো প্রদীপদা, কার্লমাক্স বাংলাদেশে জন্মাইলে হে-ও কালী পূজা কবত'। সত্যি কথা, আপসে আমাদেব জুড়ি পৃথিবীতে পাওয়া ভাব! 'প্র্যাগমেটিজম্' বা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাব তত্ত্ব আমাদেব এমন মজ্জাগত যে বাব বাব আমাদেব বহু ট্র্যাজেডিব সম্মুখীন হতে হযেছে। আমাদেব দেশেব ইতিহাস থেকে তাব প্রমাণ দেওযাব আগে একটি অসাধাবণ শিল্প সৃষ্টি নিযে তোমাব সাথে আলোচনা কবা যাক। বহুদিন আমবা বাজনীতিব বাইবে কথা বলিনি।

অনেক অনেক দিন বাদে সেদিন আবাব সত্যজিৎ বাযেব 'দেবী' দেখলাম। জানই তো টি ভি আমাব বড় একটা দেখাব অভ্যাস নেই, কিন্তু হাত পা ভেঙ্গে গৃহবন্দী হযে থাকাব কল্যাণে কদিন আঁগে ঐ অবিস্মবণীয ছবিটি দেখে ফেললাম। পুবোটা দেখা অবশ্য হল না, প্রতিদিনেব অতিথি 'লোডশেডিং' এসে খানিকটা ব্যাঘাত ঘটিযে গেলেন! সে যাই হোক, তোমাব নিশ্চয মনে আছে সত্যজিৎ বাযেব প্রথম আবির্ভাবেব সেই বছবগুলিতে আমবা কি উল্লসিত, উত্তেজিত, গর্বিত বোধ কবতাম। বড় বড় বহুল প্রচাবিত 'পত্র–পত্রিকাগুলি' যাবা এখন সত্যজিৎ বায বলে পাগল, তাবা তখন তাঁকে তেমন পাত্তা দিত না। একটি সর্বাগ্রগন্য সাহিত্য পত্রিকা 'দেবী'কে একেবাবে নস্যাৎ কবে দিযেছিল। অথচ ঐ ছবিব অসাধাবণ কাব্যময দৃশ্য–সৌন্দর্য, পবিমিতি বোধ, স্বাভাবিক সংযত অভিনয, সংলাপ ,বাহুল্য বর্জিত অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতিব প্রকাশ যা দযাময়ীব একটি চোখেব কটাক্ষে বা শিশুটিব অন্তবাল থেকে কণ্ঠস্ববে কিংবা মন্দিবে ভক্তি আপ্লুত বৃদ্ধেব অনর্গল ঠোঁট নাড়ায ধবা পড়ে, গ্রামেব প্রাসাদে বা নদীতীবস্থ ঘাসবনে কিংবা কলকাতাব বাজপথে ক্যামেবায ধবে বাখা আলোছাযাব আলপনা এবং সর্বোপবি এই ছবিব সুগভীব মানবিকতা আমাদেব শিল্পানুভূতিকে মূল ধবে নেড়ে দিযেছিল, মুগ্ধ কবেছিল, মথিত কবেছিল। মনে পড়ে সে কথা ? মনে পড়ে ?

শিল্প সাহিত্যেব ফিবিওযালাবা সে দিন 'দেবী'কে খুশি মনে গ্রহণ কবতে পাবেনি, কাবণ সত্যজিৎ বায আপোসহীন ভাবে অন্ধবিশ্বাসেব সঙ্গে যুক্তিবাদ ও মানবিকতাবাদেব দ্বন্দ্বটিকে তুলে ধবেছিলেন এবং তাঁব নিবাসক্ত 'পক্ষপাতহীন' শিল্পসম্মত পবিচালনা সত্ত্বেও তিনি যে কোন পক্ষে তা স্পষ্ট কবে দিযেছিলেন, কোনও সংশয বাখেননি। 'পক্ষপাতহীন' বলছি এই কাবণে যে এই ছবিব অন্যতম মুখ্য চবিত্র ছবি বিশ্বাস অভিনীত দযাময়ীব শ্বশুবকে কোথাও এতটুকু হেয তিনি কবেননি, কিন্তু তাঁব অন্ধ বিশ্বাস ও ধর্মান্ধতা যে তাঁব সমস্ত পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, স্নেহ, ভালবাসা সত্ত্বেও মানবিকতাব বিরুদ্ধে পাপ, তা তাঁব পুত্রেব জবানিতে যতটা তাব চেযেও বেশি প্রকট দযাময়ীব অপ্রকৃতিস্থতায ও মৃত পুত্রেব জননী সংসাবেব বড় বউযেব মর্মভেদী বিলাপে।

কিন্তু এবাবে নূতন কবে 'দেবী' দেখতে গিযে একটি 'দৃশ্য হঠাৎ আমাকে আকৃষ্ট করল অন্য একটি কাবণে, যা প্রথম দেখাব সময আমি লক্ষ্য কবিনি দযাময়ীব যুক্তিবাদী স্বামী তাব পিতাব ধর্মোম্মাদনায অন্তবে ক্ষত বিক্ষত, কিন্তু কী কবতে হবে তা জানে না। পবামর্শেব জন্য সে গেছে তাব অধ্যাপকেব কাছে। অধ্যাপক দু–এক কথাব পব বলছেন যে, তুমি যদি বিশ্বাস কব যে তোমাব স্ত্রী দেবী নয, তাহলে তোমাকে তাব জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। 'লোডশেডিং'-এব সৌজন্যে সব সংলাপগুলি শুনিনি, কিন্তু তিনি যা বললেন তাব মর্মার্থ হচ্ছে এই যে সত্যকে জানাই যথেষ্ট নয, সত্যেব জন্য বিদ্রোহী হতে হবে। সে দেশে ফিবে এল। কিন্তু তখন দেবি হযে গেছে, ভযংকব ঘটনা ঘটে গেছে, ধর্মান্ধতাব মিথ্যা প্রমাণিত হযেছে চূড়ান্ত ট্র্যাজেডিতে। দযাময়ীব স্বামী আগেব বাবে যখন

তাকে নিযে পালাতে চেযেছিল, সেদিন দযামযীব সামযিক দুর্বলতাব কাছে সে যদি আত্মসমর্পণ না কবত, যদি সে আজকেব মত দ্বিধাহীনভাবে বিদ্রোহ কবতে পাবত, যদি যুক্তিকে অন্ধ-বিশ্বাসেব বিরুদ্ধে তীক্ষ্ম বর্শাফলকেব মত তুলে ধবতে পাবত, তবে হযত দযামযী বক্ষা পেত। কিন্তু তবে তা বাস্তব হত না; আত্মসমর্পণ, দ্বিধা ও ট্র্যাজেডিই আমাদেব জীবনেব এক করুণ বাস্তবতা।

সত্যজিৎ বাস্তবকেই তুলে ধবেছেন এবং সে বাস্তব আমাদেব চোখে আঙুল দিযে দেখিযে দিচ্ছে যে আমবা সাধাবণ মানুষেব অজ্ঞতা ও দুর্বলতাব দোহাই মেনে জাত-পাত, কুসংস্কাব, ধর্মান্ধতাব সঙ্গে অহবহ কী অন্যায আপোস কবে চলেছি। আমাদেব চাবধাবে প্রতিনিযত এই ঘটনা ঘটছে। যুক্তিবাদী ইউবোপ থেকে আমবা সংসদীয গণতন্ত্র নিযেছি, কিন্তু এদেশে কেবল তা বুর্জোযা শাসনেব যন্ত্র হযে উঠেনি, জাত ও ধর্মেব এক জটিল সংসদীয ধাবাপাত আমাদেব বাজনৈতিক পটভূমিকে ক্রমাগত এমনই বিষাক্ত কবে তুলেছে যে আজ স্বাধীনতাব চল্লিশ বছবেবও বেশি পবে ধর্মান্ধতা বাজনীতিব এক প্রধান উপাদান হযে উঠেছে, একটি ধর্মান্ধ-দল 'প্রধান বিবোধী দলে'ব মর্যাদা লাভ কবেছে— মর্যাদা! দিল্লীব শাসন ক্ষমতায অধিষ্ঠিত এমন কোনও শাসক দল নেই যাবা কখনও কোনও না কোনও ভাবে ধর্মীয কুসংস্কাবেব সঙ্গে, মৌলবাদেব সঙ্গে, ধর্মীয দলেব সঙ্গে আপোস কবেনি কিংবা কোনও না কোনও সময তাদেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ ভাবে যুক্ত থাকেনি। এমন কি বামপন্থীবাও সেই দোষ থেকে মুক্ত নয।

অধুনা প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকাবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক বামশবণ শর্মা তিবস্কাব কবে বলেছেন, "মৌলবাদীদেব সাম্প্রদাযিক প্রচাবেব ঠিকমত মোকাবিলা কবা হযনি বলেই আমি মনে কবি। বামপন্থীবা তথা ধর্মনিবপেক্ষ শক্তিগুলি দেশজুড়ে যোগ্য প্রচাব আন্দোলন গড়ে তোলেনি। এটা জরুবি ছিল।" অধ্যাপক শর্মা বামপন্থীদেব তিবস্কাব কবেছেন এ জন্য যে, মৌলবাদেব বিরুদ্ধে বামপন্থীবাই সবচেযে স্থিবচিত্ত সংগ্রামী–কি পাঞ্জাবে, কি অযোধ্যায কি কাশ্মীবে বক্ত ঢেলে তাবা তা প্রমাণ কবছে। বামপন্থাব শত্রুবাও তা স্বীকাব কবে এবং সে জন্যই তাদেব দাযিত্ব সর্বাধিক। দযামযীব স্বামীব অধ্যাপকেব মত এই অধ্যাপকও বোঝাতে চাইছেন, যুক্তিবাদীকে যুক্তি প্রতিষ্ঠাব দাযিত্ব নিতে হবে। দাযিত্ব! শুধু কথা বা বিশ্বাস নয।

'দেবী' দেখাব পব অনেকক্ষণ ধবে আমাব কেবল এটাই মনে হচ্ছিল যে দুর্বলতাব কাছে নতি স্বীকাব, মুহূর্তেব ভুল, দাযিত্ব পালনে বিলম্ব কী ভযানক ট্র্যাজেডিই ডেকে আনে। আমাদেব দেশেব ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বাজনৈতিক পটভূমিতেও কি এই আশঙ্কাই ঘনিযে উঠেছে? এক ভযংকব ট্র্যাজেডিই কি কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাব আড়ালে অপেক্ষমান?

॥ তিন ॥

তোমাব দুঃখ ও ক্রোধ ভাবাক্রান্ত চিঠি পেলাম। সাধুটি আমাকে ফেলে দিযে আহত কবাব জন্য তোমাব দুঃখ ও ক্রোধেব অবধি নেই, আবাব ধর্মকে আক্রান্ত কবাব জন্য তুমি আমাব ওপবেও ক্রুদ্ধ। সব মিলিযে তোমাব অবস্থা এখন আমাব মতই করুণ।

তুমি অভিযোগ কবেছ যে আমি শুধু হিন্দু ধর্মেব নেতিবাচক দিকগুলিকেই আক্রমণ কবছি

কিন্তু তার সুমহান ঐতিহ্যের পক্ষে একটা কথাও বলিনি। তুমি উপনিষদের 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' থেকে শুরু করে বিবেকানন্দের 'হে ভারত ভুলিও না' পর্যন্ত অনেক উদাত্ত বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছ। বুঝলাম, তুমি বেদ, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থগুলি না পড়েই ভক্তিমান বলে আমি যে খোঁচাটা দিয়েছিলাম, তুমি তার শোধ নিলে। কিন্তু, তুমি ভাই, এই মুক্তোগুলি অকারণেই ছড়ালে। আসলে আমি তো হিন্দু ধর্মের ভালমন্দ নিয়ে তোমার সাথে কোনও ডিবেট জুড়ি নি। আমার বক্তব্য ছিল এই যে, 'হিন্দু ঐতিহ্য' কোনও সর্বজনগ্রাহ্য নিরিখ হতে পারে না। কারণ, (১) তার সব কিছুই ভালো নয় (যদিও তার অনেক কিছু ভালো থাকতে পারে), (২) ভারতীয় ঐতিহ্য শুধুমাত্র 'হিন্দু ঐতিহ্য' নয়, তা হল বিভিন্ন ঐতিহ্যের মিশ্রণ, এবং (৩) শুধু অতীত নিয়েই তো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রয়েছে ঃ যে ঐতিহ্য বর্তমানে বেঁচে থাকতে ও ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হতে সহায়ক, ততটুকু নিয়ে বাকিটুকু অবশ্যই বর্জনীয়। আমার এই মোদ্দা কথাগুলিতে নিশ্চয়ই তুমি আপত্তি করতে পারবে না। কারণ, তুমি নিজেও যুক্তিবাদী।

দেখ, ঐতিহ্যের এমন সব উত্তরাধিকার আছে, যা তুমি ফেলে দিতে পার না। কিন্তু তার ব্যবহারিক অর্থ এ যুগে হয়ত একেবারেই পালটে গেছে। আমার ঠাকুমার তৈরি কাঁথাখানি তুমি যে উৎসাহভরে নিয়ে গেলে, তুমি তো তাকে কাঁথা হিসেবে ব্যবহার করনি, পূর্ববঙ্গের এক অপূর্ব লৌকিক শিল্পের নিদর্শন-রূপে যত্ন করে রেখে দিয়েছ। আমাদের প্রাচীন অনেক কিছুর নিদর্শনকেই এখন এমনি তারিফ করার জন্য রেখে দিতে হবে, ব্যবহার করার জন্য নয়। ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি যদি পড়ে থাক, তবে দেখেছ যে তাতে ছড়ানো রয়েছে ঐহিক জীবনে খাদ্য, পানীয়, ধন, যৌনসুখ, শান্তি ইত্যাদি পাবার জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা। আজকের দিনে এই সব অভীষ্ট লাভের জন্য 'মন্ত্র' হিসেবে এই প্রার্থনাগুলির যে কোনও কার্যকারিতা নেই, তা তোমার না বোঝার কথা নয়। কিন্তু ঐসব মন্ত্রগুলির মধ্যে আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, ঊষা, পর্জন্য, এই বিশ্ব প্রকৃতি তথা অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে যে অসাধারণ কবিত্ব, কল্পনা শক্তি, সুগভীর জিজ্ঞাসা ও কখনও আশ্চর্যজনক দার্শনিক উপলব্ধি ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তা আমাদের আজও মুগ্ধ করে। অথচ আবার ঐ ঋগ্বেদেরই দশম মণ্ডলে যে বিখ্যাত 'পুরুষসূক্ত'টি রয়েছে, যা পণ্ডিতেরা অনেকে পরবর্তীকালের রচিত বলে মনে করেন, তাতে আমাদের দেশের অতিনিন্দিত বর্ণভেদপ্রথা ও শূদ্রের নিকৃষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আজকের দিনে মানুষের মধ্যে এমন হীন অসাম্যকে মেনে নেওয়া যায় না।

আমাদের প্রতিটি উত্তরাধিকারকে এভাবেই বিচার করতে হবে। বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, মন্দির, তীর্থস্থান, বিভিন্ন আচার আচরণ, প্রথা, নানা ঐতিহাসিক কীর্তি, প্রভৃতি সব কিছুকেই আমাদের নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো নানা কীর্তির ব্যবহারিক মূল্যের যে পরিবর্তন হয়েছে তার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। তাছাড়া শাস্ত্রের, বিশেষত হিন্দু শাস্ত্রের অসংখ্য উক্তির মধ্যে যে বিরাট অসামঞ্জস্য রয়েছে, তাকেও বিচার করতে হবে। এই সব অসামঞ্জস্যের ফলে হিন্দু শাস্ত্রের অসংখ্য রকমের ভাষ্য হয়েছে আর সম্প্রদায়ও সৃষ্টি হয়েছে রাশি রাশি। খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এই অসামঞ্জস্য এত বিরাট যে তাতে হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তিটাই ধ্বসে পড়ে। সেই জন্যই অত বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে ভারতীয় ঋষি বলে দিয়েছেন, "একম্ সৎ, বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" সত্য একটাই, নানা ব্রাহ্মণে নানা কথা বলে। ব্যস, সমস্ত বিতর্কের এখানেই ইতি। এই কথার মধ্যে হিন্দুধর্মে যে সামঞ্জস্য

বিধানেব ব্যবস্থা বয়েছে সে প্রসঙ্গে পবে একদিন বলব। আজ আপাতত অসামঞ্জস্যেব কথাটা বলি।

তুমি তো জান এই অসামঞ্জস্যেব সুযোগ নিযে মহামতি বিদ্যাসাগব মশাই হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা বিবাহেব বিরুদ্ধে ভুবি ভুবি মত থাকা সত্ত্বেও, তাব পক্ষেও কিছু মত উদ্ধৃত কবতে পেবেছিলেন। গোমাংস ভক্ষণ, নাবীব অধিকাব, ঈশ্বব আছেন কি নেই, তাতেও হিন্দু শাস্ত্রে 'নানা মুনিব নানা মত'। এমন কি ঋগ্বেদেব ঐ দশম মণ্ডলেব আব একটি বিখ্যাত সূক্ত 'নাসদীয় সূক্তে' বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কী বলা হচ্ছে, তা হযত তুমি জান। ঐ সূক্তে ঋষি বলছেন ঃ

"কেই বা প্রকৃত জানে ? কেই বা বর্ণনা কববে ? কোথা হতে সব জন্মাল? কোথা হতে এ সব নানা সৃষ্টি হল ? দেবতাবা এ সব নানা সৃষ্টিব পব হযেছেন। .....এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হল, কাব থেকে হল, কেউ সৃষ্টি কবেছেন কি কবেন নি, তা তিনিই জানেন, যিনি এব অধ্যক্ষ, যিনি মহাব্যোমে বযেছেন। অথবা তিনিও না জানতে পাবেন।"

তা হলে কী দাঁড়াল? বেদেব ঋষি বলছেন, দেবতাবা তোমাব আমাব মতই 'সৃষ্ট' জীব। আব, কোনও পবমেশ্বব এই বিশ্ব সৃষ্টি কবেছিলেন কি কবেন নি, এবং তা তিনি জানেন কি জানেন না–তা কেউ জানেনা। অর্থাৎ, সমস্তই অজ্ঞেয। অথচ এই বেদই হল হিন্দু শাস্ত্রেব ভিত্তি। সুতবাং ঈশ্ববেব ঈশ্ববত্ব নিযে স্বযং বেদই যদি সন্দিহান, তবে তুমি আমি কোন্ ছাব ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বব, প্রভৃতি দেবতাদেব নিযে তবে এত মাবাদাঙ্গা কেন বলতে পাব ? এবং এই যুগে ?

অথবা ধব শ্রীমদ্ভগবদগীতাব কথা। মাযাবাদী শঙ্কবাচার্য থেকে একালেব 'চবমপন্থী' তিলক আব 'অহিংসাবাদী' গান্ধীজী–কত ববেণ্য মানুষই তাঁদেব নিজেব নিজেব মতবাদ ঐ গ্রন্থেব ভাষ্য লিখে প্রতিষ্ঠা কবেছেন। আবাব সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ক্ষুদিবাম-কানাইলালেবও গীতা ছিল আবাধ্য। অথচ, এঁদেব প্রত্যেকেবই একেব সঙ্গে অপবেব কী মৌলিক প্রভেদ। অর্থাৎ গীতাব মধ্যেই একটা স্ববিবোধিতা বযেছে। সুখে বিগতস্পৃহ ও দুঃখে নিরুদ্বিগ্নমনা হবাব অথবা ফলেব আশা না কবে নিষ্কাম কর্ম কবাব যে উপদেশ গীতায বযেছে, তা তো বহু নাস্তিক সমাজসেবক এবং বিপ্লবী যোদ্ধাও তাঁদেব জীবনে মেনে নিযেছেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধকে তুমি কি 'নিষ্কাম কর্ম' বল? কুযেতেব তেলেব যুদ্ধ সাদ্দাম হুশেন আব বুশ সাহেবেব কাছে যতটা 'নিষ্কাম'–কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধ পাণ্ডব ও কৌববেব কাছেও সে বকমই 'নিষ্কাম' ছিল। তদুপবি তা ছিল ভ্রাতৃকলহ, যে কলহে কোনও পক্ষেবই দাবি সন্দেহাতীত ছিল না; অন্তত সূক্ষ্মদর্শী মহাকবি পাণ্ডবদেব দাবিকে নিশ্ছিদ্র বাখেন নি, প্রথম থেকেই সমস্ত ব্যাপাবটিকে গোলমেলে কবে দিযেছেন। সেই গোলমালে, সেই ভযংকব ভ্রাতৃকলহে, ঐ মহাকাব্যেব কুশীলবেবা কেউ কি গীতাব নিষ্কাম কর্মেব উপদেশ শুনেছেন ? ঐ সমস্ত তত্ত্বকথাই শেষ পর্যন্ত কেবল বাজত্বেব জন্য, সম্পত্তিব জন্য আত্মীয বন্ধু স্বজন হত্যাকে সমর্থনযোগ্য কবে তুলেছে। ভাবগতিক দেখে মনে হয, এই সমস্ত উপদেশ বাজ-বাজবা উচ্চবর্ণেব মানুষদেব জন্য নয, এগুলি হল নিম্নবর্ণেব মানুষবা যাতে নিষ্কামভাবে ইহজগতে ফলেব আশা না কবে, উচ্চবর্ণেব সেবা কবে যায তাবই জন্য বচিত বিধান। দেশেব যে আপামব জনসাধাবণ শূদ্র, তাবা তাদেব 'কর্ম' কবে যাবে অর্থাৎ উচ্চবর্ণেব সেবা কববে, ক্ষত্রিয কববে দেশ শাসন ও বাজ্যভোগ এবং ব্রাহ্মণ পঠন পাঠন, শাস্ত্র ও ধর্মাচবণেব খববদাবিতে থাকবে। এই অসাম্যেব ব্যবস্থাকে গীতায অত্যন্ত চতুব, সুকৌশলী ও স্থানে স্থানে কাব্যময যুক্তিজালেব দ্বাবা প্রতিষ্ঠিত কবা হযেছে।

গীতাব অনেক উপদেশই আলাদাভাবে মূল্যবান ও গভীব প্রজ্ঞাযুক্ত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সব কিছুকেই যুগেব ও উপবোক্ত শ্রেণী বিন্যাসেব পটভূমিতে বিচাব কবতে হবে। অন্যনিবপেক্ষ ভাবে তাকে গ্রহণ কবা চলে না। খোদ মহাভাবতেব চবিত্রবাই যখন তা কবেনি, তখন আমবা কেন তা কবব ?

এক এক জনে এক এক ভাবে তাঁদেব বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এতদিন পর্যন্ত যখন গীতাব ইচ্ছানুরূপ ভাষ্য কবে গেছেন, তখন দেশেব অগণিত শোষিত মানুষেব তাব একটা নূতন ভাষ্য তৈবি কবাব অধিকাব আছে বৈকি। ঐতিহ্যেব দোহাই দিয়ে গুটি কতক 'উচ্চবর্ণেব ক্ষমতালিপ্সু' মানুষ 'হিন্দুধর্মে'ব নামে একটা বায দিয়ে দিলেই তা শুনতে হবে কেন ?

হিন্দু ধর্মেব সব কিছুকেই নির্বিচাবে মানবাব যে কোনও যুক্তি নেই, সে কথাটা কিঞ্চিৎ বললাম। এবাবে আমাব দ্বিতীয বক্তব্যকে একটু বিশদ কবা যাক। আমাদেব দৈনন্দিন জীবনেব দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে আমাদেব সংস্কৃতি কেবল 'হিন্দু সংস্কৃতি' নয, তা এক মিশ্র সংস্কৃতি। ধব, হিন্দুদেব জন্ম মৃত্যু বিবাহেব নানা অনুষ্ঠানে পুবোহিত কিছু সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে যান ঠিকই, কিন্তু আসল অনুষ্ঠানগুলি সব হল লোকাচাব। তা কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই। আব ঐ যে পুবোহিতেব শালগ্রাম শিলা, ওটি কোথা থেকে এল ? হিন্দু ধর্মেব ভিত্তি হল বেদ, আব বেদে তো শালগ্রাম শিলাব উল্লেখ নেই। বেদে ধর্মীয ক্রিযা হল যজ্ঞ, তাতে অগ্নিই দেবতা। কিন্তু শালগ্রাম শিলা ? শিলা কাদেব দেবতা ? কাবা পাথব পূজা কবে ? আমাদেব অসংখ্য আদিবাসী, অনার্য ব্রাত্যবা। প্রাক হিন্দু ভাবতবর্ষেব শিলাপূজা এইভাবে হিন্দু আচাবে অনুষ্ঠানে আবশ্যিক অঙ্গ হযে উঠেছে। অনার্য সংস্কৃতিব প্রভাব তো তুমি হিন্দুদেব অসংখ্য দেবদেবীব তালিকাতেই পাবে। দুর্গা, কালি, শিব প্রভৃতি দেবতাদেব কেউই আর্য নয। আব প্রতাপশালী বৈদিক দেবতা ইন্দ্র বরুণেবাই বা এখন কোথায ? ব্রহ্মা তিন প্রধান দেবতাব মধ্যে নামকা ওযাস্তে বযে গেছেন, বেচাবাকে বিযেব নিমন্ত্রণ চিঠিতে ছাড়া বড় একটা দেখা যায না, প্রজাগণেব পতি প্রজাপতি ব্রহ্মা সেখানেও আবাব কিনা এক পতঙ্গ প্রজাপতিব চেহাবায! বাম আব কৃষ্ণ, বিষ্ণুব যে দুই অবতাবেব জন্য তোমাদেব ভক্তিব ছড়াছড়ি—লক্ষ্য কবেছ কি যে তাঁদেব কারুবই গাযেব বং আর্য দেবতাদেব মত গৌববর্ণ নয, অনার্যদেব মত কালো ? 'দোষ' ঢাকাব জন্য বলা হয 'দুর্বাদলশ্যাম'। কিন্তু ঐ বংএব প্রতি আমাদেব হিন্দু সমাজে বড় বিতৃষ্ণা, বিযেব আসবে তো একেবাবে নাকচ। এই কালো বং এল কোথা থেকে ? সন্দেহ নেই যে এই দুই দেবতাব মূল বযেছে অনার্য সংস্কৃতিতে।

আমাদেব দৈনন্দিন জীবনে ও জীবনবোধে বৌদ্ধ প্রভাবেব কথা গত চিঠিতে লিখেছিলাম। এবাবে মুসলিম প্রভাবেব কথা কিছু বলি। তুমি তো জানই হিন্দুদেব বর্ণাশ্রম ধর্মে বিভক্ত সমাজে নানা গোষ্ঠীব মানুষেব জন্য নানা বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল-চাষী, কুমোব, জেলে, তাঁতি ইত্যাদি। কিন্তু কযেকটি জিনিসেব জন্য আমবা ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি মুসলমানেব দ্বাবস্থ হতে হয। বাজমিস্ত্রি, দর্জি, বাবুর্চি, কিংবা বিযেতে সানাই বাদক- এইসব বৃত্তিব জন্য হিন্দুদেব পাওযা যেত না। তাব কাবণ কি ? বাবব তাঁব কাব্যময আত্মজীবনীতে ভাবতবর্ষেব সম্পদ ও সৌন্দর্যেব অনেক গুণগান কবলেও দুঃখ কবে লিখেছিলেন যে এদেশেব লোক খাওযা পবা একেবাবেই জানে না। বাস্তবিক এদেশেব 'স্বনির্ভব গ্রাম্য অর্থনীতি'তে বিলাস ব্যসনেব সুযোগ ছিল সীমিত। মন্দিবগুলি ছিল বিত্ত ও বৈভবেব ভাণ্ডাব-যে কাবণে বহিবাগত তুর্কী আক্রমণকাবীবা আমাদেব মন্দিবগুলিকে লুঠ কবেছিল। সাধাবণ মানুষেব জীবনযাপন ছিল একেবাবেই আটপৌবে। ভাষাচার্য

সুনীতিকুমাব গোপাল হালদাবকে তাঁব জেলে পাঠ কবাব জন্য একটি ধ্রুপদী সাহিত্যেব তালিকা দিযেছিলেন এবং তাতে 'আববা বজনী'ব উল্লেখ কবেছিলেন। আববা বজনীকে ভাষাচার্য বিশ্বেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেব মর্যাদা দিযেও সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য কবেছিলেন, 'কিন্তু বড় mundane'।

সমাজজীবনে বর্ণাশ্রমেব অনড় অসাম্য ও আটপৌবে জীবনযাত্রাব মাঝখানে মুসলিম সংস্কৃতি এদেশে তাব সাম্যেব বাণী ও mundane অর্থাৎ অতিমাত্রায জাগতিক জীবনযাত্রা নিযে এসেছিল। ফলে আমাদেব আহাবে, পোশাকে, সঙ্গীতেব জলসায, গৃহনির্মাণে, জীবনবোধে তা প্রবল প্রভাব বিস্তাব কবেছিল এবং হিন্দু শাস্ত্রে প্রতিশ্রুত 'পবজন্মে সুখে'ব জন্য অপেক্ষা কবতে না পেবে অনেক নিম্নবর্ণেব মানুষ ইহজগতে সাম্য ও সুখেব আশায ইসলাম ধর্ম গ্রহণও কবেছিল। এদেশে 'সুফী'বাদ নামক কবীবেব সমন্বযবাদী ধর্ম প্রচাব, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে কোলে টেনে নেওযাব নব্য ভক্তিবাদ যা শ্রীচৈতন্যেব মধ্যে পবাকাষ্ঠা লাভ কবেছিল—এব সব কিছুব পিছনেই ইসলামেব সাম্যবাদেব প্রভাব বযেছে। কুৎসিৎ জাতিভেদ প্রথাদুষ্ট হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদে কোথাও সাম্যেব নামগন্ধও নেই।

মোটেব ওপব তাহলে এই দাঁড়ায যে আমাদেব ঐতিহ্য কোনও বিশেষ ধর্মেব সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা নয। নানা ধর্মেব মিলিত ধাবা বেযে তা প্রবাহিত। আজকে এখানেই শেষ কবছি। কাবণ, বাইবে ডাক্তাববাবু এসে গেছেন। তিনি এসব লেখালেখি বাবণ কবেছিলেন। তাঁব কাছে আবাব ধবা না পড়ি।

॥ চার ॥

গত দিনেব চিঠি লিখতে লিখতে ডাক্তাববাবু যে এসে গিযেছিলেন, সে কথা তোমাকে লিখেছিলাম এবং তাড়াতাড়ি চিঠি বন্ধ কবেছিলাম। কিন্তু ডাক্তাববাবুব কাছে লুকোতে পাবিনি, ধবা পড়ে গিযেছিলাম। ধবাই যখন পড়ে গেলাম, তখন আব আত্মসমর্পণ ছাড়া পথ বইল না। কিন্তু তাতে লাভ হল। প্রথম লাভ হল এই যে দেখে শুনে উনি আমাকে বাড়িতে বসে লেখাব পাবমিশানটুকু দিযে দিলেন। দ্বিতীয লাভ হল আড্ডা। ডাক্তাববাবুকে তো জানই, কথায ভিড়িযে দিতে পাবলে, তাঁব আব কোনও খেযাল থাকে না। বিশেষত তা যদি বাজনীতি ঘেঁষা হয। রুগিব বুকে স্টেথিস্কোপ বসিযেই তখন তিনি আমেবিকা–চীন–ভাবত–বাশিযা আনাগোনা কবতে থাকেন। তো, সে দিন ধবা পড়ে তোমাকে লেখা চিঠিব কথা, কী লিখছি, আমাব বক্তব্য কী ইত্যাদি ওঁকে বলতেই উনি আলোচনাব খোবাক পেযে গেলেন। এবং আমাব গত চিঠিব নিষ্কাম কর্ম ও ইবাক–আমেবিকা যুদ্ধেব প্রসঙ্গটি উত্থাপন মাত্রই সোৎসাহে আলোচনায লেগে গেলেন।

শুরুতেই ডাক্তাববাবু নিষ্কাম কর্ম আদৌ হয কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কবলেন। একথা ঠিকই, মনস্তত্ত্ববিদবা বলেন যে সব কাজেব পেছনেই প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষভাবে কোনও না কোনও কিছু লাভ কবাব প্রেবণা থাকে। অর্থ, যশ, ভালবাসা, আধিপত্য অথবা স্রেফ আত্মতৃপ্তি, এব মধ্যে কিছু একটা আমাদেব সমস্ত কাজেব পেছনে ক্রিযা কবে। বৈষ্ণবদেব বাধাকৃষ্ণেব 'নিষ্কাম' প্রেমেব তত্ত্ব নিযে তো হাসি ঠাট্টাই আছে। চণ্ডীদাসেব "বজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায"—কে ঠাট্টা কবে পবশুবাম গল্প লিখেছিলেন। নাযিকাব 'হবমোন' পবিবর্তনে সে ছেলে হযে দাড়িগোঁফ গজিযে যেতেই, নাযকেব 'নিষ্কাম প্রেম' কেমন কবে উবে গেল।

এইসব গেল একদিক। কিন্তু মানুষ সব সময়েই স্বার্থবশতই কাজ করে, এই তত্ত্ব মানা যায় না। মানুষের তথা সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই আত্মরক্ষার তাগিদ সহজাত, তা না থাকলে জীবজগৎ বাঁচতে পারে না। সেই জন্যই মানুষকে বাঁচার জন্য, টিকে থাকার জন্য লড়াই করতে হয়। এটা তার 'স্বার্থ'। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে আবার অপরকে রক্ষার তাগিদও মানুষের সহজাত, তা না হলেও মানুষ বাঁচত না। মা যদি ছেলেকে রক্ষা না করত, পড়শিরা যদি বিপদে আপদে ছুটে না আসত, সমাজ যৌথভাবে যদি ব্যক্তিকে রক্ষা না করত, তা হলে আমরা কেউ বাঁচতাম না। মানুষ মানুষকে রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে, এমন ঘটনার অভাব নেই। আমাকে যে ছেলে দুটি ট্রেন লাইন থেকে তুলে নিয়ে এল, আমাদের ডাক্তারবাবু যে আমাকে বিনা ভিজিটে দেখে যাচ্ছেন, প্রতিবেশীরা যে আমার এই বিপদে নানাভাবে সাহায্য করছেন–এ সবই সেই পরার্থপরতার নিদর্শন। স্বার্থ আর পরার্থপরায়ণতায় মিলিয়েই মানুষ।

কিন্তু গীতার নিষ্কাম কর্ম জিনিসটা অন্য। হিন্দু শাস্ত্রে 'কামনা বাসনা শূন্য হয়ে কাজ করা'র তত্ত্ব এসেছে বৌদ্ধধর্ম থেকে। 'কামনা শূন্য হয়ে কাজ করলে নির্বাণ লাভ হয়'–এটা হল বুদ্ধের বাণী। কৃষ্ণের মুখে এর থেকে কামনাশূন্য হয়ে কাজ করার কথাটা বসিয়ে দিয়ে গীতায় তার সাথে যেটা যোগ করা হয়েছে তা হল এই যে 'সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করতে হবে'। শেষোক্ত এই ধারণাটা বুদ্ধের নয়, কারণ বুদ্ধ ঈশ্বর মানতেন না। এইভাবে বৌদ্ধ মতবাদটা ঈশ্বর যোগ হয়ে হিন্দু হয়ে গেল এবং তার তাৎপর্যও গেল গুণগতভাবে পালটে।

কামনা বাসনা পরিত্যাগ, প্রেম, করুণা, মৈত্রী ইত্যাদি বৌদ্ধ ধারণাগুলি ভোগসর্বস্ব বৈদিক হিন্দুধর্মকে যেভাবে টলিয়ে দিয়েছিল এবং সারা দেশে বৌদ্ধধর্মের যে প্রসার হয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় বুদ্ধের ঐসব নীতিগুলিকে গ্রহণ করে নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হিন্দু ধ্যানধারনাগুলিকে সংস্কার করে নিয়েছিল। তার ফলে হিন্দু আচার আচরণগুলি সহজ হয়ে গিয়েছিল, প্রেম করুণা মৈত্রীর কথা এসে গিয়েছিল, কিন্তু পুরনো 'বর্ণাশ্রম ধর্মে'র শোষণমূলক কাঠামোটি তারা বজায় রেখেছিল। বৌদ্ধধর্ম বর্ণাশ্রম ভেঙে ফেলে হিন্দু সমাজের মাথাদের বিপদে ফেলে দিয়েছিল। সেই বিপদ কাটাতেই বৌদ্ধধর্মের খানিকটা রেখে, খানিকটা ছেড়ে এই আপোস। নব্য হিন্দু মতে, তুমি যদি রাজা হও, তুমি রাজ্য ভোগ কর, যুদ্ধ কর, মানুষকে হত্যা কর, সবই ভালো, তবে এর 'ফলে'র প্রতি তুমি লোভ কর না, ওটা ঈশ্বরকে সমর্পণ কর। আর যদি তুমি শূদ্র হও, তবে তুমি উদয়াস্ত পরিশ্রম কর, তুমি তোমার নিজের, পরিবারের, ছেলে মেয়ের জীবন মৃত্যুকে উচ্চবর্ণের হাতে সঁপে দাও–কিন্তু তুমি 'ফল' চেওনা, সেটা ঈশ্বরকে সমর্পণ কর। ঈশ্বর যখন সত্যি সত্যি সেই ফল নিতে আসে না–তখন এই ব্যবস্থায় ভারি মজা। ঈশ্বরকে মধ্যস্থ রেখে উচ্চবর্ণ নিম্ন বর্ণকে শোষণ করতে থাকে, প্রকৃত 'ফল' টা সমাজের অধিপতিদের হাতেই গিয়ে পৌঁছে যায়।

বর্ণাশ্রম ধর্মই যে আমাদের দেশে শোষণের প্রধান উপায়, 'মণ্ডল কমিশন' নিয়ে হৈ চৈ-এর আগে আমাদের রাজনীতিবিদরা তা ভাল করে ভেবে দেখেন নি। এ সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু কথা তোমাকে পরে লিখব। এখন সেদিনকার কথাটা সেরে নিই।

সেদিন আড্ডায় ইরাক–মার্কিন যুদ্ধের প্রসঙ্গটা এসে গিয়েছিল অনিবার্য ভাবেই। কারণ, প্রথমত আড্ডায় প্রসঙ্গের হাতপা থাকে না, সে অনায়াসে এক কথা থেকে অন্য কথায় ভেসে চলে যায়। দ্বিতীয়ত এখন এইটেই সবচেয়ে জ্বলন্ত 'টপিক'। এবং তৃতীয়ত আমি

ঐ নিষ্কাম কর্ম প্রসঙ্গে গত চিঠিতে ইবাক–আমেবিকাব কথাটা উল্লেখ কবেছিলাম। সুতবাং বিষযটা উঠল এবং যখন উঠল, তখন আলোচনাও দীর্ঘস্থাযী হল, কিন্তু আমবা সিদ্ধান্তে আসতে পাবলাম না। আমেবিকা ও তাব সাঙ্গপাঙ্গবা যে কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে বা 'নিষ্কাম'ভাবে ইবাক আক্রমণ কবেনি এ বিষযে আমবা সকলেই একমত। এ বিষযেও কোনও দ্বিমত নেই যে ইবাকেব 'অপবাধে'ব শাস্তি দেবাব, আবব দুনিযায খববদাবি কবাব কোনও অধিকাব তাব নেই। ভিযেৎনামে, পানামায, নিকাবাগুযায এবং আবও অসংখ্য স্থানে যাবা স্বাধীনতাকে ধ্বংস কবাব অবিবাম প্রযাস চালিযে এসেছে, আবব ভূখণ্ড দখলদাবিতে ইজবাযেলকে যাবা মদৎ দিযেছে, কুযেতেব স্বাধীনতা নিযে অশ্রু বিসর্জনে তাব কোনও অধিকাব নেই। কিন্তু এই সব মতৈক্য সত্ত্বেও তর্কটা বেধে গেল এই যুদ্ধেব প্রকৃতি নিযে। ইবাকেব এই যুদ্ধ কি সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী যুদ্ধ, দেশপ্রেমিক যুদ্ধ, স্বাধীনতাব যুদ্ধ ? না কি এই যুদ্ধ দুই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেব যুদ্ধ ? কোনটা ? ডাক্তাববাবু সাদ্দামেব ঘোব সমর্থক হযে পড়েছেন, আমাব মত কিঞ্চিৎ ভিন্ন। আমি মনে কবি সাদ্দাম কখনওই হো চি মিন নয, এমনকি নাসেবও নয। সাদ্দাম বুশেবই ক্ষুদ্র সংস্কবণ।

যাই হোক, আড্ডায যা হয তাই হল, ঐ সব কূট প্রশ্নেব কোনও সমাধান হল না। আমাদেব আলোচনাব পক্ষে এসব অপ্রাসঙ্গিকও। অতএব, চল পুবনো কথায ফিবে যাই। তবে, সেটা আজ নয, পবেব চিঠিতে।

॥ পাঁচ ॥

তুমি ঠকই লিখেছ। 'একম সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' কথাটাব অর্থ আমি একটু পালটে দিযেছিলাম, লিখেছিলাম 'সত্য একটাই, ব্রাহ্মণেবা তাব নানা অর্থ কবেন'। হুবহু অর্থ হল ঃ 'একজনই আছেন, ব্রাহ্মণেবা নানা নামে তাকে অভিহিত কবেন'। অর্থাৎ ঈশ্বব এক, যে নামেই তুমি তাকে ডাক। বিবেকানন্দ এই ঋষি বাক্যকে গুরুত্ব দিযে একেই হিন্দু ধর্মেব মূল কথা বলে উল্লেখ কবেছিলেন। তুমি বলছ, "দেখ, হিন্দু ধর্ম কি মহান। একদিকে সে একেশ্ববাদী কিন্তু অন্যদিকে সে ঈশ্ববকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাকেই স্বীকাব কবে"। শ্রীবামকৃষ্ণ এ কথাটাকেই জলেব মত কবে বুঝিযে দিযেছিলেন জলেব উদাহবণ দিযে। বলেছিলেন ঃ জলকে কেউ বলে জল, কেউ বলে ওযাটাব, কেউ বলে পানি, কিন্তু জল সেই জলই। তেমনি ঈশ্ববকে তুমি ভগবান, আল্লা, গড–যে নামেই ডাক, তিনি সেই একজনই।

হিন্দু ধর্মেব এই মহত্ত্বেব তুমি জযগান গেযেছ। আমাব তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু, তাতে কি আমাদেব প্রশ্নেব সমাধান হল ? প্রথমেই দেখ ঈশ্বব যদি হিন্দু ধর্ম অনুযাযী একই হবেন, তবে মন্দিব মসজিদ নিযে এত কলহ কেন ? আমি হিন্দু, না মুসলিম, না খ্রীস্টান, তাতে কী এসে যায ? বাম কোন্ জাযগায জন্মেছিলেন, সেখানে কোনও মন্দিব ছিল কিনা, এই সব প্রশ্ন ওঠে কি কবে। সেটা যদি বামেব জন্মস্থানই হয, তাহলে সেখানে আল্লাব উপাসনা হতেই বা ক্ষতি কি ? ঈশ্বব আব আল্লা তো একই। একদিকে তুমি বলবে, 'হিন্দু ধর্ম উদাব, হিন্দু ধর্মই প্রকৃত ধর্ম নিবপেক্ষ' এবং আব একদিকে তুমি বলবে, 'হিন্দুবা সংখ্যাগবিষ্ঠ, তাদেব কথা মানতে হবে'–এই দুবকমেব উল্টো কথা তো ভাই একসাথে চলতে পাবে না। হিন্দু ধর্মই যদি 'ধর্ম নিবপেক্ষ' হয, তবে ভাবতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মেব মধ্যে হিন্দু ধর্মেব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাব কথা, 'হিন্দুবাষ্ট্রে'ব কথা আসে কি কবে ? ঈশ্ববকে যে

নামেই ডাকা হোক, তিনি যদি এক হন, তাহলে একটা বিশেষ নামে যে ডাকে, তাব বিশেষ মর্যাদা কি কবে হতে পাবে ? ঈশ্ববকে যে 'ভগবান' ডাকে, আব ঈশ্ববকে যে 'আল্লা' ডাকে–এই দুজনেব মধ্যে সমস্ত বিভেদ কি তাহলে কৃত্রিম নয ? তোমাব ঠাকুবমাকে তোমাব দাদা ঠাকুমা ডাকেন, তুমি ডাক ঠাম্মা, আব তোমাব অন্য তিন ভাই ডাকে নাম্মা–তাহলে যাবা 'নাম্মা' ডাকে তাবাই যেহেতু সংখ্যাগবিষ্ঠ, তাদেব কি সেজন্য তোমাদেব ভাইদেব মধ্যে কোনও বিশেষ অধিকাব থাকা উচিত ?

তাহলে দেখছ তো, তোমাব যুক্তি তোমাকে কোথায ঠেলে নিযে যাচ্ছে ? হিন্দুধর্মেব যে 'মহত্ত্ব' নিযে তুমি গৌবব বোধ কবছ, তাতে যদি তুমি সত্যিই বিশ্বাসী হও, তাহলে তুমি হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রীস্টান–এই সমস্ত ব্যাপাবটাই অবাস্তব হযে যায। তুমি মানুষ–এইটেই তাহলে বড় কথা হযে দাঁড়ায। ববীন্দ্রনাথ এই মনুষ্যত্বেব কথাটাকেই বড় কবে তুলেছিলেন বলে আমি তাঁকে আমাদেব কালেব সব মহানদেব মধ্যে মহত্তম ভাবতীয বলে মনে কবি।

সেদিন ববীন্দ্রনাথেব 'পাবস্যে' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্তটি পড়ছিলাম। তাতে ভাবতবর্ষ ও পাবস্যেব অতীত নিযে এত চমৎকাব সব কথা আছে যা ইতিহাসকে যুক্তিব আলোয উজ্জ্বল কবে তোলে। আজকেব দিনে ধর্ম ও ইতিহাস নিযে যখন পবিবেশকে পঙ্কিল কবে তোলা হচ্ছে, তখন তা থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিতে ইচ্ছে হয। তাব কোনও প্রযোজন অবশ্য নেই। কাবণ তোমাব কাছে ও বই আছে, তুমি আব একবাব মন দিযে পড়ে নিও। আমি শুধু প্রাসঙ্গিক দুএকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি। উনি লিখছেন, "মাদুবাব মন্দিব, ইস্পাহানেব মসজিদ প্রাচীনকালেব অস্তিত্বেব দলিল–এখনকাব কালকে যদি সে দখল কবে, তবে তাকে জবব দখল বলব।" বামেব মন্দিব আব বাববেব মসজিদ এখনকাব কালকে যে কি প্রচণ্ডভাবে 'জবব দখল' কবেছে, তা যদি তিনি দেখতেন। যাই হোক, এব একটু পবেই তিনি লিখছেন, "এদেব কৈফিযৎ এই যে, এবা যে ধর্মেব বাহন, এখনো সে টিকে আছে। কিন্তু আজকেব দিনে কোনও সাম্প্রদাযিক ধর্ম ধর্মেব বিশুদ্ধ প্রাণতত্ত্ব নিযে টিকে নেই।" লক্ষ্য কব মন্দিব, মসজিদ যে ধর্মেব বাহন, অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম, মুসলিম ধর্ম—এই সব ধর্মই ববীন্দ্রনাথেব মতে 'সাম্প্রদাযিক ধর্ম'। এই যে বিশেষ সম্প্রদাযেব ধর্ম—তা যে আজকেব দিনে আব ধর্মেব বিশুদ্ধ প্রাণতত্ত্ব নিযে টিকে নেই—সেটাই ববীন্দ্রনাথ বলছেন। ববীন্দ্রনাথ সেজন্য 'মানুষেব ধর্ম' বা Religion of Man এব কথা বলেছেন। তাঁব মতে অন্য সব ধর্মই কোনও না কোনও সম্প্রদাযেব ধর্ম, এবং তাই তা 'সাম্প্রদাযিক'। ধর্মেব যে বিশুদ্ধ প্রাণতত্ত্বেব কথা তুমি বলছ সেই 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' অথবা 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'–আজকেব ধর্মাচবণেব মধ্যে টিকে নেই। তা থাকতেও পাবে না, কাবণ তা অন্য এক কালেব জিনিস। ববীন্দ্রনাথ বলছেন, "যে সব ইট কাঠ দিযে সেই সব সম্প্রদাযকে কালে কালে ঠেকা দিযে খাড়া কবে বাখা হযেছে, তাবা সম্পূর্ণ অন্য কালেব আচাব বিচাব প্রথা বিশ্বাস জনশ্রুতি।" এক কালকে অন্য কালে চালাতে গেলে বিপর্যয বাধে। ববীন্দ্রনাথ নিজেকে কখনও প্রগতিশীল বলেন নি, কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যিকাবেব প্রগতিবাদী। মধ্যযুগেব ধর্মেব "যা কিছু অতীত তাকে আজ জোব কবে বক্ষা কবতে গেলে", তাঁব মতে "মানুষ নিজেব মনেব জোব খোওযাবে; বযস উত্তীর্ণ হলেও যে ছেলে মাযেব কোল আঁকড়ে মেযেলি স্বভাব নিযে থাকে তাবই মত অপদার্থ হযে থাকবে।" সনাতনবাদীদেব প্রতি ববীন্দ্রনাথেব এই তীক্ষ্ণ তিবস্কাব উন্মাদদেব কানে না ঢুকলেও, তোমাকে ভাবিত কববে বলে আমি নিশ্চযই আশা কবতে পাবি।

দেখতেই পাচ্ছ তোমাকে যে কথাটা আমি কয়েকটা চিঠিতে বোঝাবার চেষ্টা করছি, রবীন্দ্রনাথ তা কত সুন্দর উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ আবেগপ্রবণ কবি ছিলেন, কিন্তু কখনওই আবেগ বিহ্বল নন। 'মা, মা', 'হরি হরি' করে চোখের জলে বুক ভাসানোকে তিনি যে কতভাবে তাঁর গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায় ধিক্কার দিয়েছেন, তা তো তুমি জান। ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, বিসর্জন প্রভৃতিতে তাঁর যুক্তিবাদ ভক্তি ও অন্ধ বিশ্বাসকে কি চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে, তা তোমাকে আলোচনা করে বোঝানোর দরকার নেই।

অথচ বিবেকানন্দ বা গান্ধীজীর মত মহাপুরুষদের চিন্তাধারা ছিল এ দিক থেকে একেবারেই ভিন্ন। চিন্তায়, মননে, কর্মে তাঁরা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক সব রকমের সঙ্কীর্ণতার সর্বদাই বিরুদ্ধতা করেছেন। বিবেকানন্দ সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচার করেছেন, আর গান্ধীজী তাঁর জীবন বিসর্জন দিয়েছেন এক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী উন্মাদের হাতে। কিন্তু তবু এঁরা উভয়েই হিন্দু ধর্মের 'শ্রেষ্ঠত্বে' বিশ্বাসী ছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ একেবারে উল্টো কথা বলছেন। কালিদাস নাগকে লেখা একটি চিঠিতে, যা পরে 'হিন্দু মুসলমান' নামে 'কালান্তর' প্রবন্ধ সঙ্কলনে ছাপা হয়েছিল। তিনি লিখছেন ঃ "এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক, পারসিক, শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল।' কিন্তু মনে রেখ তা 'হিন্দু যুগে'র পূর্ববর্তী কালে। কথাটা লক্ষ্য কর ঃ আমরা যে ঔদার্যের গর্ব করি সেটা হিন্দু যুগের পূর্ববর্তী কালের। হিন্দু যুগে কি হয়েছিল ? তিনি লিখছেন, 'হিন্দু যুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।" এই হিন্দু ধর্মের 'প্রকৃতিই হচ্ছে' তাঁর মতে 'নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান'। একথা বলে তিনি যোগ করছেন, "সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুন কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয়নি"। বেদ, উপনিষদের যুগ হিন্দু যুগ নয়, হিন্দু ধর্ম তখনও তৈরি হয়নি। সে ছিল বৈদিক ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিক্রিয়ায যে হিন্দু ধর্মের সৃষ্টি, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মতটা তোমায় বললাম। এটাকে তুমি আমার মতামতের মত ক্রুদ্ধভাবে ঠেলে দিতে পারবে না। কিভাবে এই দুর্লঙ্ঘ্য ও দুষ্প্রবেশ্য প্রাকার গড়ে তোলা হল, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আরও কযেক কিস্তি চিঠি তোমাকে লিখতে হবে।

দেখতেই পাচ্ছ, রবীন্দ্রনাথের মতে অচল অনড় সনাতন হিন্দু ঐতিহ্য বলে কিছু নেই, আছে বৈদিক, বৌদ্ধ ও হিন্দু ঐতিহ্যের ক্রম বিবর্তন। বলা বাহুল্য এই ঐতিহ্য তো আর নিরালম্ব আকাশচারী নয়—এ দেশের জল বায়ু মাটিতেই তা জন্মেছিল—এবং তারও ইতিহাস আছে, ক্রম বিবর্তন আছে। এই সব কিছুই আমাদের বিশদ করে বুঝতে হবে, শুধু অন্ধ বিশ্বাস বা আবেগে চালিত হলে চলবে না। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের কথা উঠলেই মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গও আসবে অবধারিত ভাবেই। উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণী শোষণের কথা তাতে এসেই যাবে। কারণ, ঐতিহ্যকে লালন করে মানুষ, আর জীবন জীবিকা ও জীবন ধারনের লড়াই নিয়েই তো মানুষের ইতিহাস। কথাটা শুনতে কি জটিল মনে হচ্ছে ? আমরা দেখব যে আদৌ তা নয়, বরং এই ইতিহাস যথেষ্ট চিত্তগ্রাহী, কারণ তা মনগড়া নয়, বাস্তব।

এ কথা ঠিকই যে মার্ক্স ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেল্‌স্ সত্যানুসন্ধান করেছিলেন ইউরোপে বসে এবং তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ইউরোপের ইতিহাস। কিন্তু মনে রাখতে হবে তাঁরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে ইউরোপীয় উৎপাদন পদ্ধতির পাশাপাশি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র এশী .

উৎপাদন পদ্ধতি (Asiatic Mode of Production) –এব কথাও বলেছিলেন। দুঃখেব বিষয আমাদেব দেশে আমবা তাঁদেব ইউবোপীয ছকটি নিযেই যত আলোচনা কবেছি, ঐ এশীয পদ্ধতি নিযে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাইনি। এ বিষযে আমাব কিছু বিনীত মতামত তোমায পত্রান্তবে বলব। বলা বাহুল্য, তা আদৌ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হবে না, হবে মার্ক্সবাদেব ছাত্রেব কিছু জিজ্ঞাসা মাত্র।

যাই হোক, সে তো পবেববাবেব চিঠিব ব্যাপাব। আপাতত যে কথা বলছিলাম সেটা সংক্ষেপে সাবি। ববীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, বিবেকানন্দ—এঁদেব চিন্তাব মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে, তা আমবা অনেক সময উপেক্ষা কবি। বিবেকানন্দ তো ধর্ম প্রচাবক ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিলেন গভীব মানবতাবাদেবও পূজাবী। "জীবে প্রেম কবে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বব"—এ হল তাঁবই কথা। কিন্তু হিন্দু ধর্মেব ধ্বজাধাবী, মায সাধু সন্ন্যাসী, সেবাশ্রম সঙ্ঘগুলি পর্যন্ত যেভাবে ভযংকব হযে উঠেছে, তাতে তো বোঝাই যায, ববীন্দ্রনাথ যাকে সাম্প্রদাযিক ধর্ম বলেছেন, সে বকম একটি বিশেষ ধর্মেব মধ্য দিযে বিবেকানন্দেব আদর্শকে রূপাযিত কবা যাবে না। যদিও সেটাই ছিল তাঁব স্বপ্ন। গান্ধীজী প্রখব বাস্তব বুদ্ধিব লোক ছিলেন বটে, কিন্তু কতকগুলি মৌলিক ব্যাপাবে তিনি কঠোব তান্ত্রিকেব মত ছিলেন, কোনও যুক্তি দিযে সেখানে তাঁকে টলানো যেত না। 'অহিংসা' এই বকমই তাঁব একটি 'বদ্ধমূল ধাবণা' বা Dogma। তাব আত্মজীবনী গ্রন্থেব নাম 'An experiment with truth'–'সত্য নিযে পবীক্ষা নিবীক্ষা'। সেই পবীক্ষা নিবীক্ষাব একটা উদাহবণ তোমায দেব। তাঁব আত্মজীবনীব দশম পবিচ্ছেদটি একবাব খোল। সেখানে তিনি লিখছেন যে বৈষ্ণব পবিবাবে জন্মাবাব ফলে তাঁকে প্রাযই 'হাভেলি'তে যেতে হত। কিন্তু সেখানকাব ধর্ম–ব্যবসাযীদেব জাঁকজমক ব্যাভিচাব ইত্যাদি শিশু বযস থেকেই ওসবেব প্রতি তাঁকে বিরূপ কবে তোলে। খুবই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সন্দেহ নেই। কিন্তু এব পবেই হোঁচট খেতে হয। তাঁব এক ধাত্রীব নাম ছিল বম্ভা। ছেলেবেলায গান্ধীজীকে ভূত ও অপদেবতাব ভয থেকে বক্ষা কবাব জন্য বম্ভা তাঁকে বামনাম শিখিযেছিল। গান্ধীজী বলছেন, তখন ঐ বামনামেব চাইতে বম্ভাব ওপবই তাঁব বিশ্বাস ছিল বেশি। সেই বিশ্বাস বশতই তিনি ভূতেব ভয দূব কবাব জন্য বামনাম জপ শুরু কবে দেন। ক্রমে এই 'বাম নাম' তাঁব দৃঢ বিশ্বাসে রূপান্তবিত হয। গান্ধীজী মন্তব্য কবছেন, "আমি মনে কবি স্নেহমযী বম্ভা যে বীজ বপন কবেছিল, তাবই ফলে বামনাম আজ আমাব কাছে অব্যর্থ মহৌষধ।" এখানে গান্ধীজীব যে চিত্রটি ফুটে উঠছে, তা আদৌ বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিবাদী নয, একান্তভাবে বিশ্বাস নির্ভব। তিনি যে জিনিসকে তাঁব জীবনেব সমস্ত সমস্যাব 'অব্যর্থ মহৌষধ' বলে মনে কবেন, সেটি একান্তভাবে এক অন্ধ অনুবক্তিব ওপব প্রতিষ্ঠিত। এই মনোভঙ্গি ববীন্দ্রনাথেব চিন্তাধাবাব একেবাবে বিপবীত মেরুতে যে অবস্থিত, তা ব্যাখ্যা কবাব আব প্রযোজন পড়ে না।

ববীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, বিবেকানন্দেব মধ্যে এক অসাধাবণ তুলনামূলক আলোচনা তুমি জওহবলাল নেহরুব 'ডিসকভাবি অফ ইণ্ডিযা'ব সপ্তম পবিচ্ছেদেব দশম অধ্যাযে পাবে। এ সম্বন্ধে পবে একদিন আলোচনাব ইচ্ছে বইল। আজ আমি এই বৈপবীত্যগুলি উল্লেখ কবলাম, আমাব সেই আগেকাব কথাব সূত্র ধবেই যে আমাদেব মহৎ উত্তবাধিকাবকে কখনওই অন্ধভাবে নয, বিচাব বিশ্লেষণ কবে গ্রহণ অথবা বর্জন কবতে হবে। অন্ধভাবে বর্জন কবাব কথাও আমি বলছি না। এবং বিচাব কবে যা বর্তমানেব পক্ষে মঙ্গলময, আমাদেব ভবিষ্যতেব প্রগতিব পক্ষে সহাযক এবং যা যুক্তিগ্রাহ্য তাকেই গ্রহণ কবতে

হবে। আমি আমাদেব এক প্রাচীন উক্তিব প্রতিধ্বনি কবেই বলছি সত্য, শুভ এবং সুন্দবই হওয়া উচিত আমাদেব লক্ষ্য।

॥ ছয় ॥

জগন্নাথেব মূর্তিব সামনে উত্তবাস্য হযে বসে গঙ্গোদকে শুদ্ধ হযে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি, মন্ত্র পড়ছি, তিলক কাটছি,-এবকম একটা দৃশ্য তুমি কল্পনা কবতে পাব? গত সোমবাব নাটকীযভাবে এবকমই একটা ঘটনা ঘটে গেল। সে গল্প তোমায বলছি। আমবা যখন উত্তবপাড়ায থাকতাম সেখানে 'কিশোব ব্রিগেড' তৈবি কবেছিল একটি উজ্জ্বল প্রাণচঞ্চল তরুণ। আমাদেব বাড়িতে প্রাযই আসত, তোমাব হযত তাকে মনে আছে। সে ছিল সব শিশুদেব প্রাণেব বন্ধু, দাদাভাই। ও সর্বদাই ওদেব মাতিযে বেড়ায, ক্ষেপিযে বেড়ায, স্কুলেব পড়াশোনাব নিবানন্দ পবিবেশ থেকে হো হো হাসিব দমকা বাতাসে বিষণ্ণতাব সমস্ত ধুলো আব শুকনো পাতা উড়িযে নিযে যায। ওব জীবনেও যে কোথাও ধুলো মালিন্য জমতে পাবে, এমন সন্দেহ কখনও আমাব হযনি।

ওব মা বাবা ভাই বোনেবা চমৎকাব মানুষ। যখনই যেতাম ওদেব বাড়িতে, ওদেব আতিথেযতা, নম্র ব্যবহাব, ওব মাব সুগৃহিণীপনা ও জ্ঞান বুদ্ধি, বাবাব আভিজাত্য, ভাইবোনদেব ভদ্রতা আমাকে মুগ্ধ কবত। ববীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বামকৃষ্ণেব ছবিই শুধু এদেব দেযালে টাঙানো ছিল না, এই পবিবাবটিব আচাব আচবণে সর্বদাই এঁদেব অনুপ্রেবণা টেব পাওযা যেত। শিশুদেব দাদাভাইটি তাব বাড়িতেও প্রিযতম ব্যক্তি। দীর্ঘদিন পঙ্গু ওব বাবাব পবিবর্তে ওকেই সংসাবেব হাল ধবতে হযেছিল। বাড়িব বড় ছেলে কিনা!

বোনেদেব বিযে দেওযা, ভাইদেব নিজেব পাযে দাঁড় কবানো ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপাবে ছেলেটি তাব বাবাব পাশে দাঁড়িযেছে। ওদেব নানা অনুষ্ঠানে ওদেব বাড়িতে গেছি। তাবপব যখন ও তাব ছোট ভাইযেব বিযেব ব্যবস্থা কবল নিজে বিযে না কবেই, তখন আমবা বিস্মিত হলাম, ওকে নিযে ঠাট্টা তামাসাও কবলাম, কিন্তু এব মধ্যে যে বহস্য কিছু আছে, অনুমান কবতে পাবি নি। নিমন্ত্রণ বাড়িতে আমবা 'ইতব জনেবা' 'মিষ্টান্ন' খেযে সন্তুষ্ট হযে ফিবেছি।

কিছুদিন আগে ছেলেটি এসে বলল যে ওব বিযে। তবে বাড়ি থেকে পালিযে আমাদেব কাছাকাছি জাযগায সে আছে। এখানেই ওকে গোপনে বিযে কবতে হবে। কাবণ যে মেযেটিকে ও বিযে কবতে চায, সে বুদ্ধিমতী, সুরুচি সম্পন্না, কলেজ পড়ুযা, সুন্দবী বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ তো নযই, একেবাবেই 'ছোট জাতে'ব মেযে। মা বাবাব অমতেব ফলে বিযে না কবেই থাকবে ঠিক কবেছিল বাড়িব আদবেব এই ছেলেটি এবং মেযেটিব অন্য কোথাও বিযেব চেষ্টা কবছিল সে। কিন্তু মেযেটিই বিদ্রোহ কবল, বলল আব কাউকে সে বিযে কববে না। তাইতেই বাধল গোল। প্রথমে বলে কযে, পবে নানা বকম হুমকিতে ছেলেটিব বাড়িব সব বীব পুঙ্গবেবা মেযেটিকে এবং ওদেব পবিবাবকে নিবস্ত কবতে চাইল। তাতে কোনও কাজ না হওযায এই 'আর্য সন্তানে'বা 'অনার্য বমণী'ব স্পর্ধাকে চূর্ণ কবাব জন্য বীতিমত গুণ্ডাদেব সমবেত কবল। তখন বাধ্য হযে ওকে এই পড়শি সহায সম্বলহীন দবিদ্র পবিবাবটিকে আক্রমণ থেকে বক্ষা কবাব জন্য এদেব অন্য জাযগায স্থানান্তবিত কবাব ও মেযেটিকে বিযে কবাব সিদ্ধান্তই নিতে হল। ছেলেটিকে আমি অ[illegible]বে

সাধুবাদ জানালাম এবং ওকে যথাসাধ্য সহযোগিতার আশ্বাস দিলাম।

এই সৎকাজে আমাদের পাড়ার বহু লোকের সহায়তাও সে পেল। ও বলেছিল ও শাস্ত্র মতে বিয়ে করবে। তারও ব্যবস্থা হল। পুরোহিতটি দরদি। বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণে, যথাবিহিত নিয়মে তিনি বিবাহ সম্পন্ন করালেন। হিন্দুশাস্ত্রে সব রকমের ব্যবস্থা আছে তোমায় বলেছি, সুতরাং তাতে আটকাল না। আমার ভাঙা শরীরটাকে ওরা গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিল। এখন তো আমি অনেকটা ভালো। উপস্থিত ওখানে আমাকে পাওয়া গেল পাত্রের অভিভাবকরূপে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করাবার জন্য। অতএব, আমি বসে গেলাম বিয়ে বাড়িতে ঠাকুর ঘরের জগন্নাথ দেবের সামনে কৃতাঞ্জলি হয়ে। নানক বলেছিলেন, চারদিকেই যখন ভগবান, তখন ঠাকুরের মূর্তির দিকে পা দিলে ক্ষতি কী। আর আমি ভাবলাম, কোথাও যখন ভগবান নেই, তখন ঠাকুরের মূর্তির সামনে হাতজোড় করলে ক্ষতি কী। উপস্থিত, বিয়েটা তো হোক।

বিয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে। এরপর কী ঘটে তার জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু এই যে কাহিনী তোমায় বললাম, তার মধ্যে আমাদের পত্রালাপের মাঝখানে যে তর্কবিতর্ক জমে উঠেছে, তার কিছু উত্তর তুমি পাচ্ছ কি? প্রথমত দেখ, আমি ধর্মে অবিশ্বাসী, কিন্তু ধর্মদ্বেষী নই। আর যারা ধর্মে বিশ্বাসী তারাই যে সব অসৎ এবং প্রতিক্রিয়াশীল–তাও নয়। অতএব, এ ব্যাপারে বন্ধুত্বপূর্ণ বিতর্ক চলতে পারে। দ্বিতীয় বিষয়টা হল এই যে ধর্ম খুব সহজেই প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার হতে পারে। ধর্মকে তো ব্যবহার করা হচ্ছে, পিছনের আসল ব্যাপারটি কী? অপরাধতত্ত্বে একটা কথা ছিল ঃ যে কোনও অপরাধীদলে একটি মক্ষিরানি থাকে, তাকে ধর। তাহলেই অন্য সবাইকে পেয়ে যাবে। তেমনি যে কোনও সামাজিক অন্যায়ের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু থাকে, তাকে ধর। তাহলেই সব উত্তর পেয়ে যাবে। উপসাগরীয় যুদ্ধের কেন্দ্র বিন্দুতে আছে তেল ও সাম্রাজ্যবাদী মুনাফা, তোমার আমার দুর্দশার মূলে আছে নানা ধরনের অর্থনৈতিক শোষণ। আমি ভাবছিলাম, ঐ রকম একটি রুচিশীল পরিবার, তাঁরা এতদূর অধঃপাতে কিভাবে যেতে পারে। ছেলেটির প্রতি ভালবাসা, কৃতজ্ঞতাবোধ, কিছুই কি তাদের নেই? উত্তর পাওয়া গেল অর্থনৈতিক। মেয়েটির পরিবারের দারিদ্র্যই হল মূল কারণ। এখানে বিয়ে হলে অন্য ভাই ও পরিবার পরিজনের আর্থিক স্বচ্ছলতায় আঘাত লাগবে এবং সে কারণেই সমস্ত উদারনীতির মুখোশ খুলে এত মরিয়া হয়ে ওঠা। মেয়েপক্ষ যদি খুব বড়লোক হত, তা হলে এরা টিভি, ফ্রিজ, অলঙ্কার আর আলোর রোশনাইয়ে দিব্যি দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে করে সব মেনে নিত। আসল কথা হল, সাধারণ মানুষ, সাধারণ অবস্থায় ধর্ম ব্যাপারে উদার। ছেলেটির বিয়েতেও তো তাই দেখলাম। অথচ ধর্ম নিয়ে এই এত যে বিদ্বেষ, তার পেছনে স্বার্থ সক্রিয় রয়েছে। চুনোপুঁটি থেকে রাঘব বোয়াল নানা অর্থনৈতিক স্বার্থ তার সাথে জড়িত। এ ব্যাপারে একদিন তোমার সাথে বিশদ আলোচনা করব।

এবারে তৃতীয় প্রশ্ন, এবং এটি খুব জরুরি। গত চিঠিতে তুমিও প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছ। একটু গভীরে গেলেই দেখবে, আমার এই বিচিত্র বিবাহ কাহিনীটির সঙ্গে তোমার এই প্রসঙ্গের যোগ রয়েছে। তুমি লিখেছ, ইসলাম, এদেশে বহিরাগত। একেশ্বরবাদী ঐ ধর্মের প্রকৃতিই হচ্ছে তরবারি নিয়ে আক্রমণ ও জেহাদ। অপরপক্ষে ভারতবর্ষের প্রকৃতি হল সমন্বয়। একেশ্বরবাদ ও বহু-ঈশ্বর বাদের সমন্বয় সে করেছে। নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধকে অবতার বলে মেনে নিতেও তার বাধেনি। কিন্তু আপোসহীন ইসলাম এই 'ভারতীয়' তিহ্যের বিরোধী। তোমার এই কথাগুলি ধর্মতত্ত্ব বা ইতিহাস, কোনও কিছুরই ধোপে

টেকে না। সমন্বযেব এই তো নমুনা তুমি দেখলে। আব বহিবাগত ? ইতিহাসে কে যে বহিবাগত, তাব কোনও মীমাংসা নেই।

কোনও এক আদিম যুগে আজকেব এই বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলি একত্রিত ছিল। তখনও হিমালয জেগে ওঠেনি। আমাদেব সেই বিশাল সংযুক্ত ভূখণ্ডেব কাল্পনিক একটি নাম দেওযা হযেছে 'গোণ্ডোযানাল্যাণ্ড'। ভূতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, সকলে মিলে গবেষণা কবছেন, কিভাবে সে সব ভেঙে গিযে নানা বিচিত্র দেশ, জাতি, ভাষাব উৎপত্তি হল। কিন্তু ভাবতবর্ষে একটা জিনিস আমবা দেখি। এদেশে অস্ট্রেলিযা, ইউবোপ, আফ্রিকা, মঙ্গোলিযাব দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সব বকম মানুষেব অস্তিত্ব বযেছে। নৃতাত্ত্বিক মতে মানুষকে যতগুলি জাতি বা বটডগ এ ভাগ কবা যায, তাব সব কটিব নিদর্শন এদেশে পাওযা যায। হাজাব হাজাব বছব ধবে সাবা পৃথিবীব মানুষেব আগমন বহিবাগমনে এই সুবিশাল জনসমষ্টি গড়ে উঠেছে। তাব মধ্যে যে খাঁটি 'ভাবতীয' বক্তেব দাবি কবে, সে হয মূর্খ, নয মিথ্যাবাদী।

এবাব ধব আর্যদেব কথা। নৃতত্ত্ব অনুযাযী তাবা কোনও 'জাতি'নয, একটি ভাষা গোষ্ঠী। এই আর্য ভাষীবা প্রধানত ইন্দো-ইউবোপীয বলে পবিচিত। তুমি যদি ইসলামকে বহিবাগত বল, তবে আমি বলব এই আর্যবাও 'বহিবাগত'। অথচ তোমাব হিন্দু ধর্মে শুধু ইসলামকে নয, সেই আর্য পবম্পবায বচিত 'বর্ণাশ্রম প্রথা' এদেশেব আদিবাসী কোটি কোটি শূদ্রকেও বাইবে দাঁড় কবিযে বেখেছে। তোমাব ব্রাহ্মণ পবিবাবে ঐ 'ছোট জাতে'ব প্রবেশ নেই, প্রবেশেব স্পর্ধা দেখালেই আক্রমণ। বিযে কবতে চাইলে আক্রমণ, শিক্ষা দিতে তাচ্ছিল্য, সম্মান চাইলে অসন্তোষ। আব 'মন্ডল কমিশন' দেশেব শতকবা ৮০ ভাগ লোকেব জন্য সামান্য কিছু চাকুবী সংবক্ষিত কবলে তুলকালাম। তোমাব মতে কে বহিবাগত ? এই আশিভাগ নাকি আর্যবা ? 'ধর্মীয উদাবতা'ব কথা ঐ ছেলেটিব পবিবাবেব মত মুখে যতই তুমি বল, আসল অর্থনৈতিক প্রশ্নে জীবন জীবিকা ও দৈনন্দিন মিলনেব ক্ষেত্রে, তোমাব ধর্ম কি উদাব ? মুসলমানবা বহিবাগত, শূদ্রবা অপাংক্তেয। শুধু তোমবা গুটি কয বর্ণহিন্দুই ভাবতীয ? এ কোন ভাবতবর্ষ ?

ইসলাম তববাবিব জোবে ভাবতবর্ষ দখল কবেছে, একথাও ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয। তা যদি হত, তা হলে শত শত বৎসব মুসলমান শাসনেব পবও ভাবতবর্ষে মুসলমানবা এত সংখ্যালঘু হত না, আব তাবাই দেশেব দবিদ্রতম মানুষও হত না। হিন্দু উচ্চবর্ণেব অর্থনৈতিক বমবমা তাহলে সে আমলেই খতম হযে যেত, একালে 'মন্ডল কমিশন' বসাতে হত না। আসলে যে বিপুল সংখ্যক শূদ্রকে হিন্দুধর্ম চূড়ান্ত অপমান, দাবিদ্র্য ও লাঞ্ছনাব মধ্যে চিবকাল ফেলে বেখেছে, তাবাই বাঁচাব তাগিদে ইসলাম ধর্মেব সমতায আকৃষ্ট হযে ঐ ধর্ম গ্রহণ কবেছিল। তখন হিন্দুধর্ম ভক্তিবাদেব উদাব নীতি দিযে তাকে ঠেকিযেছিল। কিন্তু ইসলাম কিংবা নানক, কবিব বা শ্রী চৈতন্যেব বাণী কোনও কিছুই এদেশেব মজ্জাগত বর্ণভেদেব বিষকে দূব কবতে পাবেনি। যতই 'ভাবতীযত্বে'ব জযগান কব, এই বর্ণভেদ তাব এক দুবাবোগ্য ব্যাধি। দাদাভাইযেব বিযেতে আব একবাব তা হাড়ে হাড়ে টেব পেলাম।

আসমুদ্র হিমাচল ভাবতবর্ষেব দিকে তাকিযে তোমাব কি মনে হয না যে আর্য অনার্য, বৌদ্ধ, ইসলাম এসবই ভাবতীয সংস্কৃতিব অচ্ছেদ্য অংশ ? আমাদেব দৈনন্দিন জীবনে মুসলমান সংস্কৃতিব অবদানেব কথা তোমাকে আগে এক চিঠিতে লিখেছিলাম। ইংবেজবা ভাবতবর্ষকে বেল লাইন পেতে একত্রিত কবেছিল, কিন্তু তাব আগে শেব সাহ তৈবি

[illegible] ট্রাঙ্ক রোড। আকবর সারাদেশের জরিপ করিয়ে এক অভিন্ন শাসন বিধি, আইন ব্যবস্থা ও ট্যাক্স প্রবর্তন করেছিলেন। তাজমহল, দিল্লীর দূর্গ, আর কুতুবমিনার তো মুসলমান কীর্তিই কেবল নয়, এসব হল ভারতীয় স্থাপত্যেরই অমর নিদর্শন ও আদর্শ। ভারতীয় সঙ্গীত সাধনার ভগীরথ যে তানসেন, সে কথা ভোলা যায় কী করে? আমাদের আহারে, পোষাকে, স্থাপত্যে সর্বত্র যে মুসলিম প্রভাব ছড়িয়ে আছে, তা বাদ দিলে ভারতবর্ষের কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে? শুধু শিখ ধর্ম এবং সুফীবাদ নয়, হিন্দু 'ভক্তিবাদে'ও যে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের জয়গান রয়েছে, তা তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মে পাবে না, তা ইসলামেরই অবদান, সন্দেহ নেই!

ভারতীয় তীর্থ যাত্রার পথ আবিষ্কারেও মুসলিম অবদানের অনেক উদাহরণ আছে। গোমুখী আবিষ্কার করেছিল আকবরের পাঠানো লোক, আর অমরনাথের আবিষ্কারক আক্রামবাট মল্লিক, যার বংশধর মল্লিকেরা মুসলমান হয়েও অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের দেওয়া প্রণামীর এক তৃতীয়াংশ আজও পেয়ে থাকেন। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্য যে শিল্পীর সুনিপুণ তুলিতে মোগল দরবারে লিখিত ও চিত্রিত হত সে তো জানই। হিন্দু গণিত, দর্শন, লোককথা বিশ্বময় ছড়িয়ে গিয়েছিল আরবের মুসলমানদেরই মারফৎ। এত সবের পরও কি তুমি ইসলামকে, মুসলিম সংস্কৃতিকে বহিরাগত বলবে? বরং, আত্মানুসন্ধান কর। কোটি কোটি মানুষকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে দেশের কোনও মঙ্গল হতে পারে কি?

দ্বিতীয় পর্ব

॥ সাত ॥

একটা চিঠি ছিঁড়ে ফেলে নূতন করে আবার তোমাকে লিখছি। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ কথিত হিন্দু ধর্মের 'অলঙ্ঘ্য ও দুষ্প্রবেশ্য প্রাকার' কেমন করে তৈরি হয়েছিল সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু লিখব এবং সেই প্রসঙ্গে এদেশে শ্রেণী শাসন ও শোষণের পদ্ধতির মৌলিকত্ব বিষয়ে আলোচনা করব, আগের একটা চিঠিতে তোমাকে তাই জানিয়েছিলাম। এবারের চিঠিতে সেটাই আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমার পত্রাঘাত এল। তুমি লিখেছ যে আমি নাকি শ্মশানের রচনা লিখতে বসে গরু মেরে শ্মশানে নিয়ে এসে গরুর রচনা লিখতে চাইছি। হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদের উল্লেখই তোমার এই অভিযোগের কারণ। তোমার মতে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য আলোচনায় মার্ক্সবাদ অপ্রাসঙ্গিক, কারণ আধ্যাত্মবাদী ভারতের মাটিতে মার্ক্সীয় জড়বাদের কোনও স্থান নেই। তাছাড়া মার্ক্সবাদ এখন ভ্রান্তও প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং ওসব নিয়ে আবার আলোচনা কেন। প্রশ্নটা যখন তুলেছ, তখন এর একটা সদুত্তর দিযে আলোচনায অগ্রসর হওয়াই ভালো। নতুবা আমার কথাবার্তা অনেকটাই তোমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। সে কারণেই চিঠি ছিঁড়ে আবার এই নূতন করে লেখা।

মার্ক্সবাদ নিয়ে তোমার এই বক্রোক্তি অভাবিত নয়। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কিছু কিছু ঘটনায় মার্ক্সবাদের বিরোধী মহল খুশি হয়ে তুড়ি বাজাতে শুরু করে দিয়েছেন, তাঁরা বলেই দিচ্ছেন মার্ক্সবাদের মৃত্যু ঘন্টা বেজে গেছে। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে সাময়িক কিছু ঘটনা রাতারাতি একটি বিজ্ঞানকে নস্যাৎ করে দিতে পারেনা। আমি অবশ্য দেওয়ালে লেখা শ্লোগান আউড়ে বলছিনা যে 'মার্ক্সবাদ অভ্রান্ত, কারণ তা একটি বিজ্ঞান'। জগতে অভ্রান্ত বলে কিছু নেই, বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিকেও নিরন্তর যুক্তি ও অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয়। নিউটনের অনেক সিদ্ধান্ত পরবর্তী অভিজ্ঞতা ও বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানী মনীষা আইনস্টাইনের নব্যতত্ত্বের আলোকে বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু নিউটনীয় বিজ্ঞান নস্যাৎ হয়ে যায়নি, তার বিকাশ ঘটেছে। মার্ক্সবাদ তোমাকে এ কারণেই মানতে বলব যে তার মূলসূত্রগুলি যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন কী অমার্ক্সবাদী মহলেও। যে কোনও বাদেরই গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত তার যুক্তিগ্রাহ্যতার ওপরে। মার্ক্সবাদের যুক্তিগুলোকে খুব সহজভাবে তোমার কাছে তাই তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

মার্ক্সবাদ কী, তা বোঝার জন্য মার্ক্সবাদ কী নয় তা থেকে শুরু করাই সহজ। মার্ক্সবাদ ভাববাদ নয়, অর্থাৎ যে তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের চিন্তা ও চেতনা ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করে,

এ তাব বিবোধী। একজন বিখ্যাত ভাববাদীব কথা ধবা যাক, মনস্তাত্ত্বিক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। ফ্রয়েড কেন ? প্রথমত তাঁব একটি লেখাব বাংলা তর্জমা আমাব হাতেব কাছে আছে, ভাঙা শবীব নিয়ে খোঁজাখুঁজি কবতে হবেনা। তুমি তো জান একটি অমার্ক্সীয় গোষ্ঠীব ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'জিজ্ঞাসা'ব আমি একজন নিযমিত পাঠক। 'ব্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' নামে পবিচিত অনেক বুদ্ধিজীবী এই 'মানবতাবাদী' ও 'যুক্তিবাদী' পত্রিকাটিব পবিচালনায বযেছেন। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী শিবনাবাযণ বায পত্রিকাটিব সম্পাদক। বর্তমান বাংলা বছবেব গোড়ায, পত্রিকাটিব একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যায 'কেন যুদ্ধ ? নাম দিয়ে আইনস্টাইন ও ফ্রয়েডেব মধ্যে একটি অসাধাবণ পত্রালাপ প্রকাশিত হয। ১৯৩২ সালে আইনস্টাইন একটি পত্রে যুদ্ধেব কাবণ ও তা প্রতিহত কবাব উপায সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন কবেছিলেন এবং ফ্রয়েড তাব জবাবে কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক বক্তব্য উপস্থিত কবেছিলেন। বলাবহুল্য ফ্রয়েডেব বক্তব্য ছিল একজন মনোবিজ্ঞানীব দৃষ্টিকোণ থেকে। বা আবও সুস্পষ্টভাবে বললে, একজন ভাববাদী মনোবিজ্ঞানীব দৃষ্টিকোণ থেকে। ফ্রয়েডেব সমস্ত উত্তবটিই প্রণিধানযোগ্য এবং একজন মনোবিজ্ঞানীব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁব এই আলোচনা চিন্তাব খোবাক যোগায। বাংলায এটি প্রকাশ কবাব জন্য 'জিজ্ঞাসা'ব ধন্যবাদ প্রাপ্য। কিন্তু পত্রিকাটিব সম্পাদক তাতেই সন্তুষ্ট না হয়ে, পত্রিকাটিব ঐ সংখ্যাব ১২৪–১২৫ পাতায মন্তব্য কবেছেন "বিশ শতকেব আধুনিক মনে যে দুজন মানুষেব চিন্তাব প্রভাব সব চাইতে ব্যাপক তাঁদেব ভিতব একজন হলেন কার্ল মার্ক্স, অন্যজন সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। মার্ক্সেব প্রভাব এখন কমতিব দিকে, কিন্তু ফ্রয়েডেব বিচাব বিশ্লেষণ এখনো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।" তোমাব কাছে ফ্রয়েড ও মার্ক্স এব তুলনামূলক আলোচনা শুরু কবাব দ্বিতীয কাবণ শিবনাবাযণ বায মহাশযেব এই মন্তব্যটি।

মার্ক্স-এব প্রভাব এখন 'কমতিব দিকে' কিনা, এবং তা যদি হযও তাহলে তাতে তাব প্রাসঙ্গিকতা কমে কিনা,–সে প্রশ্নে যাওয়াব প্রযোজন আমাদেব এখন নেই। আমবা শুধু বিচাব কবে দেখব মার্ক্স ও ফ্রয়েড এই দুজনেব মধ্যে কাব বক্তব্য বেশি প্রাসঙ্গিক।

ফ্রয়েড অবশ্য নিজেই অকপটে নিজেব সীমাবদ্ধতাব কথা বলেছেন। ঐ চিঠিতে নিজেব সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ 'দেখছেন তো ? একজন তাত্ত্বিকেব সঙ্গে পবামর্শ কবে বিশেষ লাভ হয না, বিশেষত যে তাত্ত্বিকেব বাস্তব ও জরুবি সমস্যাবলিব সংগে জাগতিক সংযোগ নেই।' অপবপক্ষে মার্ক্স হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি আপাদমস্তক 'জাগতিক' এবং জগতেব 'বাস্তব ও জরুবি সমস্যাবলিব' বিচাব বিশ্লেষণই যাঁব কীর্তি। অতএব, ঐ সব সমস্যাবলিব প্রসঙ্গে মার্ক্সই অধিকতব প্রণিধানযোগ্য হওয়াই স্বাভাবিক। যাই হোক, ফ্রয়েডেব বক্তব্যটি অনুসবণ কবাব চেষ্টা কবা যাক।

তাঁব মতে, অন্যান্য জীবেব মতই 'মানবিক চিত্তবৃত্তি দুবকমেব। যেগুলি বক্ষণ ও ঐক্যবদ্ধ কবে তাদেব আমবা বলি "ইবটিক"......। দ্বিতীযত ধ্বংস ও হত্যাব বৃত্তি যা আমবা সংজ্ঞাযিত কবি আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক বৃত্তি বলে। এই চিত্তবৃত্তিগুলিব প্রতিটি তাব ঠিক বিপবীতটিব মতই অপবিহার্য এবং জীবনেব সব ঘটনা তাদেব দ্বৈতক্রিযা থেকেই উদ্ভুত। ..... মনে হয এদেব একটি বৃত্তি অপবটি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ কবতে পাবে না। .....যেমন আত্মবক্ষাব বৃত্তি অবশ্যই ইবটিক প্রকৃতিব, কিন্তু তাব লক্ষ্য অর্জনেব জন্য এই বৃত্তিই মানুষকে আগ্রাসী ক্রিযায প্রবৃত্ত কবতে পাবে।' একটু পবে ফ্রয়েড আবাব

লিখছেন, 'ধ্বংসকামী চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে আব একটু বলব। .... প্রতিটি প্রাণীব ভিতব এই বৃত্তি কাজ কবে চলেছে, চেষ্টা কবছে জীবনকে আদিম জড় অবস্থায ফিবিযে নিযে যেতে। বস্তুত, একে যথার্থই বলা যায "মৃত্যুবৃত্তি" বা "মর্ত্যুকাম বৃত্তি"। ইবটিক বৃত্তিগুলি বেঁচে থাকাব সংগ্রামকে সমর্থন জোগায। মৃত্যু বৃত্তি পবিণত হয ধ্বংসেব আবেগে.........'। দুই বিপবীত চিত্তবৃত্তিব মিলন ও দ্বন্দ্বে সভ্যতাব বিকাশেব এই তত্ত্ব স্পষ্টতই 'ডাযেলেকটিক,' কিন্তু তা বস্তুবাদী নয ভাববাদী। মানুষেব মন ইতিহাসেব ঘটনাপুঞ্জকে নিযন্ত্রিত কবে, অর্থাৎ মনই প্রধান, বস্তু তাব অধীন–এটাই এই তত্ত্বেব মূল কথা। এখন যদি প্রশ্ন কবা যায যে মনুষ্যেতব জীবজগতেও এই দুই বিপবীত বৃত্তিব মিলন ও দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও, তাদেব মধ্যে কেন 'সভ্যতাব বিকাশ' হল না, মনুষ্য সমাজেব 'সভ্যতাব বিকাশে'ব বিশেষ কাবণটি তবে কী,–তাব 'বাস্তব' উত্তবটি পেতে গেলে আমাদেব একজন 'ডাযেলেকটিক' বা দ্বন্দ্ব-সমন্বযী 'বস্তবাদী'ব দ্বাবস্থ হতে হবে, নিঃসন্দেহে যাঁদেব মধ্যে মহত্তম হলেন কার্ল মার্ক্স। ফ্রযেডেবই কথা অনুযাযী পশু ও মানুষ উভযেব মধ্যেই সৃষ্টিকামী ও ধ্বংসকামী দুই চিত্তবৃত্তিব সংঘর্ষ থাকা সত্ত্বেও, মানুষেব ইতিহাসে বিকাশ আছে, পশুব ইতিহাসে নেই কেন, এ প্রশ্নেব জবাব ফ্রযেডেব জানা নেই। কিন্তু তাব জবাবে মার্ক্সবাদ আমাদেব শেখাচ্ছে যে মানুষেব বৈশিষ্ট্য তাব 'চিত্তবৃত্তি'তে নয, অন্যত্র।

মানুষ পশুজগৎ থেকে আলাদা এ কাবণে যে সে 'উৎপাদন' কবে, পশুবা তা কবে না। তাব দুটি মুক্ত হাত দিযে সে হাতিযাব ধবে, হাতিযাব তৈবি কবে, তা দিযে উৎপাদন হয। এখন পশু পাখি যা দিযে খাদ্য ও জীবিকা আহবণ কবে, তাব দাঁত, ঠোঁট, নখ, জিভ ইত্যাদিব বিকাশেব একটা প্রকৃতি নির্দিষ্ট সীমা বযেছে। কিন্তু মানুষেব জীবন ধাবণেব এই যে অতিবিক্ত অর্জন হাতিযাব–তাব বিকাশ অনন্ত সম্ভাবনামঘ, আব তাই এই বিকাশেব সঙ্গে মানুষেব সভ্যতাব ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গীভাবে এগোয। ইতিহাসবিদবা যখন মানুষেব আদিম ইতিহাসকে প্রস্তব যুগ, নব্যপ্রস্তব যুগ, তাম্র যুগ, লৌহ যুগ ইত্যাদিতে ভাগ কবেন, তখন সভ্যতাব ইতিহাসেব সঙ্গে উৎপাদনেব উপকবণেব এই অঙ্গাঙ্গী সংযোগেব কথাই প্রকাশ কবেন।

এবাবে আবাব একটা অন্যদিক চিন্তা কব। মানুষেব হাতিযাব ব্যবহাবেব পাশাপাশি আবও কতকগুলি দিক বিকশিত হতে থাকে, যা পশু জগতে অনুপস্থিত। তাব ভাষা, তাব সমাজ, উৎপাদন কবতে গিযে উৎপাদন সম্পর্ক (পশু পাখিদেব কেবল যৌন সম্পর্ক বযেছে, এ তাব অতিবিক্ত, অথচ ফ্রযেড শুধু যৌন সম্পর্কেব ওপব জোব দেন), এইসব কিছুই বিকাশ হতে থাকে। উৎপাদনেব উপকবণ যেমন বিকাশ লাভ কবে, উৎপাদন সম্পর্কও তেমনি বিকশিত হয, তাব পবিবর্তনও ঘটে। উৎপাদন সম্পর্কেব এই বিকাশেব ফলে ইতিহাসে আদিম সাম্যাবস্থা, দাস ভিত্তিক সমাজ, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ইত্যাদি অধ্যাযগুলিব যে সৃষ্টি হযেছে, তা আজ প্রায সর্বজন স্বীকৃত।

মানুষেব বৈশিষ্ট্য, সে উৎপাদনশীল জীব। এই উৎপাদনেব জন্য হাতিযাব তৈবি হয এবং এই উৎপাদনেব পাশাপাশি তাব ভাষা, সমাজ, সমাজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হাতিযাবেব বিকাশ হয, সমাজ সম্পর্কেবও বিকাশ হয। এই বিকাশেব ধাবায যখন উৎপাদনেব উপকবণেব এমন বিকাশ ঘটে যে পুবনো উৎপাদন সম্পর্কেব সঙ্গে তা খাপ খায না, তখন সেই সম্পর্কটিব পবিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই শেষোক্ত পবিবর্তন সহজে ঘটে না। পুবনো

কায়েমি স্বার্থ পুরনো ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়; নূতন শক্তিশালী শ্রেণী তাকে ধ্বংস করতে চায়। এই লড়াইয়ের অনিবার্য ফল বিপ্লব। রোম, গ্রীস, মিশর, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, কিউবা ইত্যাদির ইতিহাস এই সমাজ পরিবর্তন ও বিপ্লবের সাক্ষী।

ইতিহাসের এই মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা তত্ত্ব ও তথ্যের এত দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, এত ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং সচেতনভাবে মার্ক্সবাদী নন এমন ইতিহাসবিদদের ইতিহাস চর্চায়ও তা আজ এত গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট, যে 'মার্ক্সের প্রভাব এখন কমতির দিকে' বলেই তাকে হটিয়ে দেওয়া যাবে না। ইতিহাসের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যাকে বাতিল করতে গেলে যে বিকল্প তত্ত্ব খাড়া করতে হবে, তা অদ্যাবধি কেউ আবিষ্কার করতে পারেননি। ফ্রয়েড দিয়ে তা ব্যাখ্যার চেষ্টা একেবারেই নিরর্থক। দেখেছ তো, স্বয়ং ফ্রয়েডই ওতে রাজি নন!

॥ আট ॥

গত চিঠিতে জীব জগতের মধ্যে মানুষের বিশিষ্টতার প্রসঙ্গটি উঠেছিল। মানুষের বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, মন, সমাজবদ্ধতা, ভাষা ইত্যাদির কথাই আমরা সাধারণত মনুষ্যজাতির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলে থাকি। দয়া, মায়া, পরার্থপরতা ইত্যাদিকে আমরা নাম দিয়ে থাকি মানবিকতা। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে এবং প্রায় সকল চিন্তাবিদই কোনও না কোনও প্রসঙ্গে বলেছেন যে এই সব গুণাবলি মানুষের একচেটিয়া নয়, অরণ্যের পশুদের মধ্যেও এসব দেখতে পাওয়া যায় এবং অপরপক্ষে এই সব মানবিকতার অভাবকে যদি 'পশুত্ব' বলি, তবে তা সত্যেরই অপলাপ হয়। কারণ মানুষ 'মানবিকতা'-হীনতার যে পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, পশু কখনও তা পারে না। ইরাকে জর্জ বুশ যা করছে, কোনও পশুর পক্ষে এ হেন হিংস্রতা অসম্ভব। তবুও বুশ একজন মানুষ। একজন 'সম্মানিত মানুষ'।

গত চিঠিতে আলোচনা প্রসঙ্গে কথাটা উঠেছিল যে ফ্রয়েড জীবজগতের চিত্তবৃত্তিকে সংরক্ষণকারী ও সংহারকারী,–এই দুইভাগে ভাগ করেছিলেন। জীবের আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের প্রবণতা থেকে এক দিকে জন্মায় নিজের ও অপরের প্রতি ভালবাসা, আবার ঐ একই তাগিদে তাকে বাঁচার জন্য সংহার করতে হয়, ধ্বংস করতে হয়। এই আদিম প্রবৃত্তিগুলি থেকেই জন্ম নেয় প্রেম, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। মানুষের ক্ষেত্রে এগুলিকেই আমরা বলি মন। শুধু পশুপাখি কেন, গাছপালারও আনন্দ, বিষাদ, ক্লান্তি, উত্তেজনা রয়েছে,–এ কথা প্রমাণ করেছেন আমাদেরই জগদীশ চন্দ্র বসু। তোমার বাড়ির পোষা বিড়ালটির বুদ্ধি, তোমার কুকুরটির দয়ামায়ার কথা তুমি প্রায়ই বলে থাক। জিম করবেটের কাহিনীর বাঘগুলি তো রীতিমত উপন্যাসের নায়ক। সোভিয়েত প্রাণী সংক্রান্ত ছোটদের যে চমৎকার বইগুলি পাওয়া যায় তাতে পশু পাখিদের বহু 'মানবিক গুণ' তুমি পাবে। পশু পাখিরা যে নিজেদের মধ্যে নানা শব্দের সাহায্যে সংবাদ বিনিময় করে ও নানা ভাব প্রকাশ করে এমন কি প্রেম নিবেদন করে, তাও নিশ্চয়ই তুমি জান। যে সব পতঙ্গদের আমরা শব্দহীন মনে করি, তারা আসলে যে শব্দ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে "কথা" বলে তা আমাদের কানে ধরা পড়ে না, কিন্তু বাতাস তাদের কোলাহলে পূর্ণ হয়েই থাকে। বিভিন্ন

পশুর মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক 'সমাজ' এবং মৌমাছি, পিঁপড়ে প্রভৃতি পতঙ্গের মধ্যে আশ্চর্যজনক মাতৃতান্ত্রিক 'সমাজ' বৈজ্ঞানিকদের রীতিমত বিস্ময় সৃষ্টি করে থাকে।

আমি বলতে চাইছি যে ভাষা বল, বুদ্ধি বল, মন বল, মানবিকতা বা সমাজ বল, কোনও কিছুই মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য নয়। সমস্ত জীব জগতেরই এগুলি সাধারণ সম্পদ, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তার বিকাশ হয়েছে এত বিপুল যে তা গুণগতভাবে একেবারে গেছে পালটে। কী করে তা সম্ভব হল ? মানুষ অন্য জীব থেকে গুণগতভাবে সম্পূর্ণ যে আলাদা হল, তার বৈজ্ঞানিক কিছু কারণ নিশ্চয়ই আছে এবং তা বিশ্লেষণ করার কৃতিত্ব কার্ল মার্ক্স ও তাঁরই বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্– এই দুই জার্মান মহা মনীষীর।

অ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত বিবর্তনের যুগান্তকারী তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন, আর ক্রমবিবর্তনের ধারা মানুষের ক্ষেত্রে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে কেমন করে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হল, তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল মার্ক্সবাদে। মানুষের হাত দুটি মুক্ত হল, সেই হাত দিয়ে সে হাতিয়ার তৈরি করল, সেই হাতিয়ারে সে পরিবেশকে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে লাগল, এটাই হল মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য জীব জগতের এই নবতম আগন্তুকের কাছে নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল, যা তার পূর্ব পুরুষদের কাছে ছিল একেবারে রুদ্ধ। অন্য সব জীব প্রকৃতিদত্ত বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে, মানুষ সেই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এল। এতদিন ছিল শুধু প্রাণী জীবনের বিবর্তন, এবার শুরু হল সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ঘটনা নবীনতম এবং অভূতপূর্ব।

হাতিয়ার দিয়ে মানুষ উৎপাদন করে, হাতিয়ার তৈরিতে ও উৎপাদনে মানুষের 'শ্রম' নিযুক্ত হয় এবং এই উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক সৃষ্ট হয়–এই যে উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক,–মানব ইতিহাসের নিয়ামক যে এগুলিই, অন্য কিছু নয়, তাতে কি কোনও সন্দেহের অবকাশ আছে ? মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা শুধু তার ইতিহাস তৈরি করেছে তাই নয়, এঙ্গেলস দেখিয়েছেন মানুষ নিজেই এই ক্ষমতার সৃষ্টি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পূর্ব পুরুষ বানর জাতীয় প্রাণীদের থেকে উন্নততর মস্তিষ্ক, অনুভূতি, বাক, দেহ ও মন গঠিত হয়েছে পুরুষানুক্রমিক শ্রমের মধ্য দিয়ে।

গত চিঠিতে এবং আজকের চিঠিতে এ পর্যন্ত যা লিখেছি, তাতে তুমি যদি অযৌক্তিক কিছু খুঁজে না পেয়ে থাক, তাহলে তুমি এই মার্ক্সবাদী সূত্রটিকে মেনে নেবে যে উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্কই ইতিহাসের নিয়ামক, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা। মার্ক্সবাদে এটাকেই বলা হয় কাঠামো। তার ওপরে ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি মানুষের সব কিছু বিপুল অর্জনকে বলা হয় উপরিকাঠামো। কাঠামো হল ভিত্তি, উপরিকাঠামো তার ওপর নির্ভরশীল। অতএব, প্রথমটির পরিবর্তনের সঙ্গে দ্বিতীয়টিও পালটে যায়, কোনও চিরস্থায়ী শাশ্বত অন্যনিরপেক্ষ সত্য বলে কিছু নেই। সমাজ, ধর্ম, আইন, ভাষা—সবই পালটায় এবং তাতে নিয়ামক হল উৎপাদন অর্থাৎ অর্থনৈতিক উপাদান।

এই কথাগুলি তত্ত্ব আকারে বলা যত সোজা, বাস্তব জীবনে তাকে ব্যাখ্যা করা অত সহজ নয়। কারণ, জীবন অত্যন্ত জটিল। অর্থনৈতিক মূল নিয়ামক শক্তি এবং তার দ্বারা প্রভাবিত উপরিকাঠামোর হাজারো রকমের শক্তির টানাপোড়েন এমনভাবে জট পাকিয়ে

থাকে যে সেগুলিকে আলাদাভাবে সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে অনেক 'মার্ক্সবাদী' যান্ত্রিকভাবে কেবল অর্থনৈতিক উপাদানের ওপরই জোর দিয়ে থাকেন। এঙ্গেলস ১৮৯০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জোসেফ ব্লককে লেখা একটি চিঠিতে এই বিভ্রান্তির কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন যে কার্ল মার্ক্স বা তিনি কখনওই বলেননি যে অর্থনীতিই হল মানব ইতিহাসের একমাত্র চালিকা শক্তি। ইতিহাস দ্বিঘাত সমীকরণের মত সোজা নয় যে সামান্য অঙ্ক কষেই 'এক্স' এর মান পাওয়া যাবে। তা ভুলে গিয়ে 'মার্ক্সবাদীরা' যে অজস্র 'rubbish' বা জঞ্জাল সৃষ্টি করেছেন, তা তিনি পরিষ্কার করেই লিখেছিলেন।

অর্থনীতি তথা উৎপাদন সম্পর্ক মানব-ইতিহাসের একমাত্র চালিকা শক্তি না হলেও, তা যে ইতিহাসের মূল কিংবা কেন্দ্রীয় উপাদান, মার্ক্স এঙ্গেল্স-এর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ইতিহাসের ঘটনাবলিই নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেছে। ইতিহাসে যে বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান ও পতন ঘটেছে, তার প্রত্যেকটির ভিত্তিতেই বিভিন্ন ধরনের 'অর্থনৈতিক' স্বার্থ সক্রিয় ছিল। উৎপাদিকা শক্তির অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের এক একটি চূড়ান্ত স্তরে এসে দেখা গেছে যে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক আর টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, তখন বিপ্লব হয়েছে, সমাজ পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীন মিশরে গ্রীসে বা রোমে দাস ব্যবস্থা, মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, আধুনিক কালে ফরাসী ইংল্যান্ড আমেরিকা প্রভৃতির বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদির বিকাশ ঘটেছে। অতঃপর রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বিপ্লব বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন করেছে। এই সমস্ত বিপ্লবের মূল চরিত্রই অর্থনৈতিক, কোনও না কোনও অর্থনৈতিক স্বার্থ এই ঘটনাগুলির মূলে ক্রিয়া করেছে। এমনকি রাশিয়ায় এখন যে পশ্চাদপসরন বা প্রতিবিপ্লব চলছে, তারও তো কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাজার অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলিই।

বিপ্লবগুলির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র, সমাজ, আইন, চিন্তাধারা সমস্ত কিছুরই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। অ্যারিস্টটলের মত জ্ঞানী মানুষ মনে করতেন যে পশু, দাস আর স্ত্রীলোক মানুষের সম্পত্তি মাত্র। রুশো, মিল বা ওয়াশিংটন এরকম কথা ভাবতেও পারতেন না। মনু বলেছেন নারী নরকের দ্বার, বিবেকানন্দের কাছে এ ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, দেখা যাচ্ছে অর্থনীতি সমাজকে পালটায়, সমাজ পালটায় মানুষের চিন্তাধারা। তাই বলে অর্থনীতি এমন একটা কল নয় যা একটা নির্দিষ্ট নমুনা মাফিক সমাজ তৈরি করবে এবং সমাজের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে এক একটা ছাঁচে ঢালা মানুষ। এ প্রসঙ্গে জোসেফ ব্লককে লেখা এঙ্গেলস্ এর চিঠির হুঁশিয়ারিটি মনে রাখতে হবে। না হলেই রবীন্দ্রনাথ হয়ে যাবেন 'বুর্জোয়া কবি', আর জওহরলাল নেহরু হয়ে যাবেন 'সাম্রাজ্যবাদের' দালাল।

মার্ক্সবাদ যেহেতু বিজ্ঞান, সমাজ বিপ্লবকে তাই তা কোনও আকস্মিক বা কার্যকারণসূত্রহীন ঘটনা বলে মনে করে না। বিপ্লবের পিছনের সমাজতাত্ত্বিক কারণটিকে তা তুলে ধরে। আমরা আগেই দেখেছি মানুষের ইতিহাস উৎপাদন শক্তির অগ্রগতির ইতিহাস। হাতিয়ার অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ যদি সে তৈরি না করত তবে পশুর মত সে থেকে যেত প্রকৃতি নির্দিষ্ট স্বভাবের বৃত্তে। কিন্তু হাতিয়ারের উন্নতি হয়, মানুষের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে এবং তা বেড়ে এমন একটা সময় আসে যখন তা পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের সাথে খাপ খায় না। তখনই বিপ্লব ঘটে এবং তা সম্পন্ন করে পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেকার সবচেয়ে প্রাগ্রসর শ্রেণী। কথাটা বুঝিয়ে বলছি।

একেবাবে প্রাথমিক অ৲স্থাব কথা ধব। মানুষেব উৎপাদিকা শক্তি ছিল সীমিত। পাথবেব অস্ত্রশস্ত্র দিযে অতি প্রতিকূল প্রকৃতিব বিরুদ্ধে লড়াই কবে তাকে বাঁচতে হত। তাই সেই আদিম যুগে সকলে একসাথে থাকা মানেই জীবন, গোষ্ঠীচ্যুত হওযা মানেই ছিল মৃত্যু। সেখানে উৎপাদন এত সীমিত যে গোষ্ঠীব সবাব তাতে কোনও বকমে কুলোয, উদ্বৃত্ত থাকে না। অতএব এই সমাজে অসাম্যেব কোনও প্রশ্নই নেই। সমাজতত্ত্ববিদবা আদিম যেসব জনগোষ্ঠী পৃথিবীতে টিকে থেকেছে, তাদেব বিশ্লেষণ কবে এই আদিম সাম্যবাদী সমাজেব অস্তিত্বকে স্বীকাব কবেছেন। এই আদিম সাম্যবাদী সমাজ প্রসঙ্গে বিখ্যাত আমেবিকান সমাজতাত্ত্বিক লুই হেনবী মবগ্যানেব অসাধাবণ বচনা Ancient Society গ্রন্থটিব ওপব ভিত্তি কবে এঙ্গেলস লিখেছিলেন 'Origin of the Family Private Property and State। এঙ্গেলস এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা কবেছেন, এই সাম্য ব্যবস্থাব পতন হল কী কবে। আদিম সমাজে উৎপাদনেব উপকবণেব যখন উন্নতি হতে লাগল, উৎপাদনও তখন বাড়তে লাগল আব স্বভাবতই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হল। কিছু বেশি বুদ্ধিমান মানুষ অবকাশভোগী হযে উঠল, শ্রেণীভেদ শুরু হল, সাম্য ঘুচতে লাগল। মানুষ তখন এক জাযগা থেকে আব এক জাযগায ঘুবছে। এই সঞ্চবণশীল মানুষেব ছবি আমাদেব বেদ সহ সমস্ত আদিম সাহিত্যে পাওযা যায। তাতে বিভিন্ন গোষ্ঠীব মধ্যে যুদ্ধ হত। প্রথমে যখন উদ্বৃত্ত বলে কিছু ছিল না—দুটি হাতে যা উৎপন্ন হয, একটা মুখে তা খেযে ফেলে—তখন পবাজিত শত্রুপক্ষকে বাঁচিযে বেখে কোনও লাভ ছিল না। কিন্তু, উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হতেই পবাজিত পক্ষকে বাঁচিযে বেখে তাকে 'দাস' কবে নিলে লাভ হতে থাকল। কাবণ, এখন উৎপাদনেব উন্নতিব কল্যাণে একটা মুখ যতটা খায, দুটো হাত উৎপাদন কবে তাব চেযে বেশি। এইভাবে উৎপাদন পদ্ধতিব ও উৎপাদনেব উপকবণেব অর্থাৎ সমগ্র উৎপাদিকা শক্তিব উন্নতিব ফলে তা আব পুবনো উৎপাদন সম্পর্কেব মধ্যে টিকে থাকা সম্ভব হল না। উৎপাদন সম্পর্ক পালটে গেল, 'দাস ব্যবস্থা' এল। আজ আমবা এই ব্যবস্থাকে যতই ঘৃণিত মনে কবি, সে যুগে তাই ছিল প্রগতিব অনিবার্য ফল। এবং শত্রুদেব জানে মেবে ফেলাব চেযে তা ছিল মানবিক। দেখছ তো ? মানবিকতা, মহত্ব, ঔদার্য ইত্যাদি ধাবণাগুলি কিছু অচল অনড় বস্তু নয। যাদেব এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি বযেছে, তাবাই সত্যকে অনেক ভালভাবে জানে। কতগুলি মন্ত্র উচ্চাবণ কবে কিংবা 'বোম বোম' 'হবি হবি' বা 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' বলে সত্যকে চেনা যায না।

॥ নয় ॥

আজ দোল। বাইবে হাসি খুশি ও বং এব হবুবা চলছে। মানুষেব দৈনন্দিন দুঃখ কষ্টেব মধ্যে এই বকম দিনগুলি এক একটা বিবতি নিযে আসে। সে কাবণেই উৎসব টিকে থাকে। কবে, কিভাবে তা উদ্ভব হযেছিল, তা নিযে কেউ মাথা ঘামায না, বড়জোব এক একটা কাল্পনিক কাহিনী খাড়া কবে নেয। দোল নিযেও এমনি নানা কাহিনী আছে। সে সব কাহিনী চুলোয যাক, কাবণ সত্যি কথাটা হল এই যে আমি অসুস্থ বলে আজ এই খেলায শুধুই দর্শক, দোল খেলা এবাবে আমাব হল না। অমবেশ, তরুণ, চন্দ্রশেখববা এসেছিল, কালান্তবেব সব উজ্জ্বল উদীযমান সাংবাদিক। ওদেব দেখে চেনা

যায় না। নানা রঙের জবরজং জোড়াতালির মধ্যে শুধু চোখের মণির চারধারটা ফ্যাটফেটে সাদা। ওদের সঙ্গে যে সব বৌ মেয়েরা এসেছে, তারাও এক একটি হনুমতী। কাউকে চিনতে পারা শক্ত। আসার পথের রঙে রঙে ওদের চেহারা একেবারেই বদলে গেছে। ওদের দেখছিলাম আর ভাবছিলাম আমাদের উৎসব অনুষ্ঠানগুলিও তেমনি অতিদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে করতে শত শত, হাজার হাজার বছরে এমন রূপান্তরিত হয়ে গেছে যে তাদের রূপ, অর্থ, তাৎপর্য আর চেনা যায় না।

সমাজতত্ত্ববিদরা এ ব্যাপারে সবাই একমত যে আমাদের দেশের বিভিন্ন উৎসবগুলি কৃষি–কেন্দ্রিক, ফসলের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। বিনয় ঘোষ, আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত পণ্ডিতেরা এসব নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন। পৃথিবীকে শস্যের জননী রূপে কল্পনা করে ক্রমে আদিম সমাজে শস্য, ধন ও ঐশ্বর্যের দাত্রীরূপে যে মাতৃদেবতার ধারণা গড়ে উঠেছিল, আমাদের দেশে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লোকায়ত দর্শন' ও অন্যান্য গ্রন্থে ও প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করেছেন। কৃষিকাজ ও যৌনক্রিয়াকে সমান্তরাল চিন্তা করাটাও ছিল আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য। ইংরেজিতে 'হাজব্যাণ্ড' মানে স্বামী আর 'হাজব্যাণ্ড ম্যান' মানে যে কৃষক, আমাদের দেশে বর্ষাকালে পৃথিবীকে যে রজঃস্বলা কল্পনা করে অম্বুবাচিতে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ থাকে, এই সব কিছুর পিছনেই এই বিশ্বাস আদিতে সক্রিয় ছিল। আদিম সমাজে বৃষ্টি দেবতাকে আকৃষ্ট করার জন্য রুক্ষ পিপাসার্ত কৃষি জমিতে নারীদের নগ্ন নৃত্যের প্রথা ছিল (আজও কোথাও কোথাও আছে), প্রচলন ছিল ভূমিকে উর্বরা করার জন্য শস্য কাটার পর বসন্তে কৃষি ক্ষেত্রে নরনারীর অবাধ যৌনক্রিয়ার। যাদু বিশ্বাস ছিল এই যে নারীর গর্ভবতী হওয়ার মতই তাতে ভূমিও উর্বরা হয়ে উঠবে। ক্রমে এই উৎসব পরিণত হয় বসন্ত উৎসবে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই আদিম বিশ্বাসগুলি সরে গিয়ে থেকে গেছে উৎসব, উর্বরতার দ্যোতক রজঃস্রাবের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত সেদিনের লাল রং ও কর্দমাক্ত শস্য ক্ষেত্রের কাদা নিয়ে খেলা এবং নবনারীর অবাধ মেলামেশা যা বৎসরের অন্যান্য দিন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আদিম বিশ্বাস যাকে কৃষিকার্যের সহায়ক রূপে গণ্য করত, আজ তা রূপান্তরিত এক নিছক উৎসবে। নানা রং বদলের ফলে তার আদিম রূপটিকে অমরেশদের হোলির দলের রং বেরঙের মূর্তিগুলির মত আজ আর সহজে চেনা যায়না। যারা 'বিশ্বাস, বিশ্বাস' বলে চেঁচাচ্ছে, যারা মনে করছে যে সম্প্রদায় বিশেষের 'বিশ্বাস' অন্য সব কিছুর উর্ধ্বে, তারা হয়তো খবরই রাখেনা যে বিশ্বাস জিনিসটিও অন্য সব কিছুর মত পালটায়, ওটা সনাতন নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আরও অনেক কথা পরে বলব। এখন হোলি প্রসঙ্গটি সারি।

হোলিতে বুড়ির ঘর পোড়ানোর সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য পুরনো খড়কুটো পাতা পুড়িয়ে ফেলার আদিম পদ্ধতিরও সম্বন্ধ রয়েছে। এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরবর্তীকালে ধর্মকে যুক্ত করা হয়েছে এবং কৃষ্ণকে এর সাথে যোগ করে দেওয়া হযেছে। সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন কৃষ্ণও আদিতে ছিলেন কৃষি সমাজের দেবতা। কৃষ্ণ যে গোপাল, গরু এবং কৃষ্ণ যে সহচর, দাদা বলরাম যে হলধর অর্থাৎ কৃষক—এ সব কিছুই সমাজ তত্ত্ববিদদের মতকে সমর্থন করে। মহাকবি ও পুরাণকারেরা দ্বারকার কৃষ্ণ ও হস্তিনাপুরের রাজশক্তির সমন্বয় করে বৃন্দাবনের লৌকিক কৃষ্ণকে, শ্রীরাধার কৃষ্ণকে, গোপিনী বিলাসী কৃষ্ণকে অন্য মাত্রা দান করেছিলেন সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ এবং ক্রমশ আলোচ্য।

তুমি হয়তো ভাবছ, আমি সমাজতত্ত্ব নিয়ে আজ কচকচি করতে বসেছি কেন। না, আমার অল্পবিদ্যা নিয়ে এসব বিষয়ে প্রবন্ধ ফেঁদে বসার বাসনা নেই। তুমি তোমার 'সমাজতত্ত্ব' বিশারদ ঘরণীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমার এইসব কথায় ভুল আছে কিনা। আমি ইতিপূর্বে ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেছি, এবারে সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দেখাতে চাইছি যে মার্ক্স-এর প্রভাব এখন 'কমতির দিকে' হোক বা নাই হোক, এই সহজ সত্যকে নাকচ করা যাবে না যে ঐতিহাসিক বল, সমাজতত্ত্ববিদ বল, সকলেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তি বা কাঠামো হিসেবে সাধারণভাবে অর্থনীতিকে, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। বিজ্ঞান হিসেবে মার্ক্সবাদের এই সূত্রটি বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত। আজকের এই চিঠিতে উপরে আমরা যে আলোচনা করলাম তাতে মার্ক্সবাদের প্রাসঙ্গিক আর একটি উপধারাও প্রমাণিত হল যে কাঠামো বদলের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার ওপরে গড়ে ওঠা উপরিকাঠামোটি ধ্বংস হয়ে যায় না, পরবর্তী বহুকাল পর্যন্ত তা নানাভাবে ও নানা রূপে টিকে থাকে। এই উপধারাটির নিচে মোটা করে দাগ দিয়ে রাখ। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় কাজে লাগবে। কাঠামোর সঙ্গে উপরিকাঠামো যান্ত্রিকভাবে পালটায় না বলেই সমাজ-ইতিহাসে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারণা ধনতন্ত্রে, প্রাক সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বিশ্বাস সংস্কার নানাভাবে সমাজতন্ত্রে থেকে যায়। সমাজতন্ত্রের পরিকল্পিত অর্থনীতিতেও যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে, এও তার একটা কারণ। অবশ্য একমাত্র কারণ নিশ্চয়ই নয়।

কাঠামো উপরিকাঠামোর বিষয়টি আর একটু খুলে বলি। কাঠামো কারু খেয়াল খুশিতে বা নিছক বলপ্রয়োগে পালটায় না, তার একটি সুনির্দিষ্ট সূত্র আছে। ডাক্তাররা যেমন বলেন জ্বরজারি হাঁচিকাশি 'সিম্পটম' মাত্র, আসল রোগ রয়েছে ভিতরে, তেমনি রাজা বাজরা আর তাদের যুদ্ধবিগ্রহ 'সিম্পটম' মাত্র, সমাজ পরিবর্তনের কারণ রয়েছে সমাজের গভীরে তার উৎপাদন ব্যবস্থায়, তার অর্থনীতির মধ্যে। অনেকে মনে করেন সমাজ পরিবর্তন ঘটে কেবল বলপ্রযোগে। কথাটা শর্তসাপেক্ষ ভাবে সত্য। ইতিহাসে বলপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, শ্রেণী সংগ্রাম একটি সত্য এবং এই সংগ্রাম সমাজকে পালটায়, মার্ক্সবাদ একথা বলেছে, কিন্তু বলপ্রয়োগকেই চূড়ান্ত সত্য বলে সে কখনও মানে নি।

ইতিহাস সৃষ্টিতে বলপ্রয়োগের ভূমিকা সম্পর্কে এঙ্গেলস আলাদা প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত দুই গ্রন্থ 'অ্যান্টিডুরিং' এবং 'ডায়েলেকটিকস অফ নেচার'-এ বলপ্রয়োগের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর সেই সব তত্ত্বকে কঠিন করে বলতে চাইছি না। সহজ কথায় বলতে গেলে, একটি কাঁঠাল তুমি জোর করে পাড়তে পার, কিন্তু কিলিয়ে তুমি সত্যিকারের পাকা কাঁঠাল তৈরি করতে পার না। স্বাভাবিক ক্রিয়াশীল নিয়মের ওপরে ভরসা করা ছাড়া এ ব্যাপারে গত্যন্তর নাই।

সমাজ পরিবর্তনের পিছনে যতই বলপ্রয়োগ লক্ষিত হোক, প্রকৃত পক্ষে প্রতিটি বিপ্লবই সমাজের অভ্যন্তরীণ কতকগুলি বিরোধের স্বাভাবিক পরিণতি রূপেই ঘটে এবং সে কারণেই তা আপেক্ষিকভাবে মঙ্গলময় ও প্রগতিশীল। গত চিঠিতে তাই আমি এমন কি 'দাস ব্যবস্থা'রও প্রগতিশীলতা ও মানবিকতার কথা উল্লেখ করেছিলাম। আসলে যে কোনও বিপ্লব বা পরিবর্তনই সফল হয় এ কারণেই যে তা অধিকাংশ মানুষের প্রয়োজন।

সিদ্ধ করে এবং তা অনিবার্য। কিন্তু এই প্রগতির পথ কখনওই অবিমিশ্র মঙ্গল ও আনন্দময় হয়নি। আদিম সাম্য ব্যবস্থা থেকে দাস ব্যবস্থায় উত্তরণ প্রসঙ্গে এঙ্গেল্‌স তাঁর অনবদ্য ভাষায় তাঁর সেই 'অরিজিন অব ফ্যামিলি' গ্রন্থের ৩নং অধ্যায়ের শেষে কী লিখছেন তোমাকে একটু শোনাই। লিখেছেন ঃ 'এই যুগের লোকেরা' অর্থাৎ আদিম যুগের লোকেরা 'আপাত দৃষ্টিতে যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন', (আপাতদৃষ্টিতে কথাটা লক্ষ্য কর। বাইবেলের ইডেন উদ্যান বা রুশোর 'সোশ্যাল কন্‌ট্রাক্ট'-এ আদিম মানুষের জীবন যাত্রাকে যতই স্বর্গীয় মনে করা হোক, বাস্তববাদী বৈজ্ঞানিক এঙ্গেলস তা মনে করেন না)-'তাদের মধ্যে কোনও স্বাতন্ত্র্য ছিলনা। মার্ক্সের কথায় তারা তখনও আদিম গোষ্ঠীর নাড়ির সঙ্গে বাঁধা। এই আদিম গোষ্ঠীর আধিপত্য ভাঙ্গা দরকার ছিল, তা ভাঙ্গাও হল।' কথাগুলি লক্ষ্য কর। যারা মনে করে মার্ক্সবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মূল্য দেয় না, গোষ্ঠী বা সমাজের আধিপত্যকেই চূড়ান্ত কাম্য মনে করে, তারা যে কত ভুল দেখতেই পাচ্ছ। এঙ্গেলস বলছেন এই আধিপত্য, এই গোষ্ঠীর দাসত্ব ভাঙ্গার দরকার ছিল। অর্থাৎ ব্যক্তির ওপর গোষ্ঠীর আধিপত্যকে তিনি মঙ্গল বলে মনে করেন না। কিন্তু তা ভাঙ্গার ইতিহাসও বড় বেদনাদায়ক। এঙ্গেলসের কথায় 'যে সব প্রভাবের ফলে এটি ভাঙ্গল, সেগুলি আমাদের কাছে মনে হয় প্রাচীন গোত্র সমাজের সহজ নৈতিক গরিমা থেকে একটি অধোগতি, পতন। হীন লোভ, পাশবিক কামনা বৃত্তি, জঘন্য লালসা, সকলের মিলিত সম্পদের স্বার্থপর লুণ্ঠন, এর মধ্য দিয়েই নূতন সভ্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এল। চৌর্য, ধর্ষণ, প্রবঞ্চনা ও বেইমানি শ্রেণীহীন প্রাচীন গোত্র সংগঠনকে ধ্বংস করল।'

ফ্রয়েড ও এঙ্গেলস উভয়েই ইতিহাসের কূটাভাসের কথা বলছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মৌলিক প্রভেদটি লক্ষ্য কর। উভয়েই কল্যাণ ও অকল্যাণ, অধোগতি ও প্রগতি, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রসার ও স্বার্থপরতা এবং বিকাশ ও ধ্বংসের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সমন্বয়টিকে লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু উভয়ের সত্যদৃষ্টিতে কী প্রভেদ। ফ্রয়েডের কাছে এসব নিছকই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, এর মধ্যে তিনি সমাজের ইতিহাসের কোনও বাস্তব ছবি প্রত্যক্ষ করেন না। অপরপক্ষে মার্ক্স এঙ্গেলস এর রচনায় তা চলচ্চিত্রের মত আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এঙ্গেলস লিখছেন সেই আদিম সাম্যব্যবস্থার পতনের পর থেকে সমাজের ইতিহাস শোষিত ও উৎপীড়িত বৃহত্তম জনসংখ্যার স্বার্থের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণীর বিকাশের ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে ইতিহাস তো স্থানু নয়। উৎপাদনের উপকরণের ক্রমোন্নতি ঘটেছে এবং একসময় দেখা গেছে যে তা পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে আর খাপ খায় না। তখনই নূতন শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে পুরনো ব্যবস্থাটিকে ভেঙ্গে দিয়েছে। দাস ব্যবস্থা গেছে, এসেছে সামন্ততন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের পরে এসেছে ধনতন্ত্র। এশিয়ায় এই বিকাশ পদ্ধতি কিছু স্বতন্ত্র, মার্ক্স তার নাম দিয়েছেন 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি'। সে সম্বন্ধে ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে আলোচনার সময় পরে একটু বিশদভাবে বলব। কিন্তু অন্যগুলি সম্বন্ধে তোমাকে বিশেষ বিস্তৃত লেখার প্রয়োজন নেই। ইতিহাসের পাঠক হিসেবে সাধারণভাবে এই পর্যায়গুলি তোমার জানাই আছে। এ সম্বন্ধে আরও দু-এক কথা আগামী চিঠিতেও লিখব বটে তবে সেটা আমার আসল উদ্দেশ্য নয়, আমি আমার মূল আলোচনার মুখবন্ধ হিসেবে তোমাকে সংক্ষেপে শুধু দেখাতে চাইছি যে 'মার্ক্সবাদ' একটি বিজ্ঞান। সমাজ ও মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়মটিকে পদার্থবিজ্ঞানের 'ল অব মোশান'-এর মত কার্ল মার্ক্স আবিষ্কার করেছিলেন। কোনও

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেব অভ্রান্ততাব প্রমাণ হল তিনটি ঃ (এক) তাব অভ্যন্তবীণ যুক্তি শৃঙ্খলা, (দুই) বাইবেব ঘটনা তাব দ্বাবা ব্যাখ্যাত হওযা এবং (তিন) অতীত ও ভবিষ্যতেব ঘটনাবলীব সঙ্গে তাব সামঞ্জস্য। মার্ক্সেব তত্ত্ব এই তিনটি শর্তকেই পূবণ কবেছে। এই তত্ত্বেব যুক্তি শৃঙ্খলা দৃঢ়নিবদ্ধ, পৃথিবীব অতীত ইতিহাসকে তা ব্যাখ্যাই শুধু কবেনি, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিযেছে এবং বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রেব বিকাশ মার্ক্সবাদেব যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত কবেছে।

এখানে একটা কথা মনে বাখা দবকাব। কার্ল মার্ক্স-এব প্রধান যুগান্তকাবী আবিষ্কাব দুটি ঃ (এক) ইতিহাসেব বিকাশেব সাধাবণ নিযম—উৎপাদনেব উপকবণেব বিকাশেব ফলে উৎপাদিকা শক্তিব সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কেব বিবোধ, শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লব এই নিযমেব অন্তর্ভূক্ত। এই নিযমেবই অনিবার্য ফল রূপে আদিম সাম্যব্যবস্থা থেকে ধনতন্ত্রেব বিকাশ এবং সেই একই ধাবা বেযে অতঃপব সমাজতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদেব উদ্ভবেব ভবিষ্যৎবাণী মার্ক্সবাদেব মূলকথা। সমাজতন্ত্রেব যে ধাবণা এতদিন ছিল 'কাল্পনিক' বা 'ইউটোপীয', মার্ক্স তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিলেন। 'ভিত্তি দিলেন' কথাটা মনে বাখতে হবে, সমাজতন্ত্রেব সাধাবণ লক্ষ্য বর্ণনা কবলেও, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাব নির্দিষ্ট কোনও রূপবেখা তিনি বচনা কবে যাননি। সে কাজটি কবেছিলেন লেনিন এবং অন্যান্যবা। (দুই) মার্ক্স–এব দ্বিতীয় যুগান্তকাবী কীর্তি পুঁজিবাদী সমাজেব বিকাশেব বিশেষ নিযম আবিষ্কাব। এটি উক্ত (এক)নং সাধাবণ নিযমেব অন্তর্ভুক্ত। এই বিশেষ নিযমেব অন্তর্ভূক্ত 'উদ্বৃত্ত মূল্যেব তত্ত্বে'ব দ্বাবা এ যাবৎ লুক্কাযিত পুঁজিবাদী শোষণেব স্বরূপটি তিনি নগ্ন কবে দেন এবং বুর্জোযা শ্রেণী ও সর্বহাবা শ্রেণীব মধ্যে সংগ্রামেব মধ্য দিযে পুঁজিবাদেব অবলুপ্তিব অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিষ্ঠা কবেন। এই বিষযগুলি নিযে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনাব মধ্য দিযে মার্ক্সবাদেব প্রাসঙ্গিকতা নির্দেশ কবেই আগামী চিঠিতে এই প্রসঙ্গেব ইতি টানব। আজ শুধু তোমাকে দুটো কথা বলে শেষ কবি। মার্ক্সবাদ এমন একটি বিজ্ঞান যাব পবীক্ষাগাব হাজাব হাজাব বছবেব ইতিহাস। বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী বা দু–পাঁচ বছবেব ইতিহাস দিযে তাব কিছুই প্রমাণ বা অপ্রমাণ হয না। তুমি তো জান, আমাব একমাত্র দাদা বেল অ্যাক্সিডেন্টে মাবা গিযেছিল। তদবধি আমাব দাদামশাই যে কোনও বেল দুর্ঘটনাব কথা শুনলেই বুক চাপড়ে চিৎকাব কবতেন, 'হায হায বে, শযতান গুলান কী সর্বনাইশ্যা কল বানাইছে বে।' সমাজতান্ত্রিক জগতেব কিছু দুর্ঘটনায যাবা মার্ক্স লেনিনকে অভিশম্পাত দিচ্ছে আব সমাজতন্ত্রকে বলছে শযতানেব কল, তাদেব দৃষ্টি আমাব দাদামশাইযেব মতই আচ্ছন্ন। তোমাব আমাব এই আচ্ছন্নতা সাজে কি ?

॥ দশ ॥

গতকাল ডাক্তাববাবু এসেছিলেন। আমাব স্বাস্থ্যেব খবব যথাবীতি নিলেন, কিন্তু আমি এখনও মার্ক্সবাদেব মূলনীতি নিযে কচকচি চালিযে যাচ্ছি দেখে আমাদেব পত্রালাপ সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ দেখালেন না। ভাবতেব ধর্ম সংস্কৃতি ইত্যাদি যে প্রসঙ্গ নিযে আমাদেব আলোচনা শুরু হযেছিল, সেটা এতদিন বন্ধ হযে থাকায তিনি হতাশ হলেন। আমি তাকে বুঝিযে বললাম, 'আপনি যেমন অপাবেশন কবাব আগে স্টেবিলাইজ কবে

নেন, আমিও তেমনি বন্ধুর চিন্তাধারাটাকে শোধন করে নিচ্ছি। এরপরই আমি আমার যুক্তি তর্কের ছুরি কাঁচি নিয়ে কাজ শুরু করে দেব।' আসলে ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি আলোচনা প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদকে টেনে আনার যৌক্তিকতা আর নেই, এমন একটা আপত্তি তুমিই উথাপন করেছিলে, বলেছিলে যে আজকের দিনে মার্ক্সবাদ তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। সে কারণেই আমি কয়েকটা চিঠিতে আমাদের মূল প্রসঙ্গ ছেড়ে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করছি। বলাবাহুল্য খুবই সংক্ষেপে।

এখন তুমি স্বীকার করছ যে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি যে অর্থনৈতিক, মার্ক্সের এই আবিষ্কার এবং মানব ইতিহাসের ধারার চালিকা শক্তিরূপে তাঁর আবিষ্কৃত মূল সূত্রগুলি যে অবশ্যই বিজ্ঞান পদবাচ্য এতে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি নাকি মার্ক্সকে কখনও খাটো করতে চাওনি। খাঁটি বাঙালি ভাল ছেলের মত কথা ঃ 'রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, মার্ক্স— সবাইকেই মানি। সে কেবল তাঁদের ছবিতে ফুল চন্দন দিয়ে। তাঁদের কথাগুলি ভেবে দেখার দায় আমার নেই।' তোমার আর দোষ কী ? অনেক 'মার্ক্সবাদী'ই তাবিজ কবচ পরে, মন্দিরে মানত করে–এও তো সত্যি! তুমি আবার আমার তারিফও করেছ এই বলে যে আমি নাকি 'গোঁড়া' মার্ক্সবাদী নই, কারণ, অনেক জায়গায় মার্ক্সবাদীদের সমালোচনাও করেছি এবং জগতের সব কিছুর পিছনেই অর্থনীতির নিয়ম যে যান্ত্রিকভাবে সক্রিয় নয় এ কথাও স্বীকার করেছি। কিন্তু এই কমপ্লিমেন্টটা তো আর আমার প্রাপ্য নয়, আমি মার্ক্স–এঙ্গেলস্ এর মতামতকেই প্রকাশ করেছি মাত্র। মার্ক্স সাহেব কখনওই 'গোঁড়া মার্ক্সবাদী' ছিলেন না।

এরপরই তুমি বুদ্ধিমানের মত একটা কথা বলতে চেয়েছ যে মার্ক্স–এঙ্গেলস প্রধানত ইউরোপের ইতিহাস ঘেঁটেই তাঁদের তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। লেনিন বলেছিলেন কার্ল মার্ক্স জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ অর্থনীতি ও ফরাসী সমাজতন্ত্রের ধারণার শ্রেষ্ঠ সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। এই সমস্ত কিছুই তো ইউরোপীয়। মার্ক্স যখন তাঁর মহাগ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' রচনা করেছিলেন, তখন ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের সৃষ্টি হয়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস এগিয়েছে অন্য খাতে, সংগ্রাম নয় সমন্বয়ই ছিল তার প্রধান কথা। সুতরাং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কার্ল মার্ক্সের কথাগুলি প্রাসঙ্গিক নয়, এই হল তোমার মত। তুমি আর একটা কথাও বলতে চেয়েছ এই যে, যে কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রমাণ তার প্রয়োগে। বর্তমানকালে সমাজতান্ত্রিক জগৎ যেভাবে ভেঙে পড়ছে, তাতে মার্ক্সীয় তত্ত্ব কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে কিনা তাতে তুমি সন্দিহান হয়ে পড়েছ।

তোমার এই যুক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি আমাদের আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক, সেগুলি একটু বিশদভাবে এবং অন্যগুলি খুব সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করব। ভারতবর্ষের ইতিহাস যে স্বতন্ত্র সে কথা তো আমি আগেই উল্লেখ করেছি, মার্ক্স–এঙ্গেলসও করেছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বাতন্ত্র্য পৃথিবীর সমস্ত কিছুরই লক্ষণ, এটা ভারতবর্ষের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য নয়। পৃথিবীর কোনও দুটি মানুষের টিপছাপ কখনও এক নয় বলে কে না বলবে যে সমস্ত মানুষের হাতই সাধারণ বিচারে এক রকম। তোমার আদরের বিড়ালটাও তো নিশ্চয়ই অন্য বিড়ালের থেকে আলাদা, অসংখ্য বিড়ালের মধ্যেও তুমি তাকে চিনতে পারবে। তাই বলে বিড়াল জাতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির থেকে সে নিশ্চয়ই ভিন্ন নয়। মূলগত ঐক্য এবং পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য–এ দুটো একই সঙ্গে একটি জাতি বা 'গণ'-এর সকলের

পক্ষে সত্য। মানবজাতির অংশ হিসেবে ভারতীয়দের সম্বন্ধেও কথাটা তাই সত্য।

ভারতবর্ষের মাটি খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আদিম ভারতীয় সভ্যতা সৃষ্টির যে অসংখ্য নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন, তাতে একেবারে আদিম প্রস্তর যুগের থেকে শুরু করে নব্য প্রস্তর এবং তৎপরবর্তী সভ্যতার বিকাশের একটি রূপরেখা খুঁজে পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রায় আকস্মিক আবিষ্কারের পর থেকে তাঁরা যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী খনন কার্য চালিয়েছেন এবং তাতে যেসব চাঞ্চল্যকর ইতিহাস ধরা পড়েছে, তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ভারতীয় ইতিহাস তোমাদের প্রিয় 'আর্য আগমনের' সঙ্গেই শুরু হয়নি। এই সব খোঁড়াখুড়িতে খ্রীস্টের জন্মের অন্তত হাজার পাঁচেক বছর আগেকার বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে। তুমি জান আধুনিক কার্বন-১৪ গণনা দ্বারা এইসব নিদর্শনের বয়স নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে এইসব আবিষ্কারের ওপর কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা অধ্যাপক পিগট, গর্ডন চাইল্ড, মার্টিমার হুইলার, এ. এল বাশাম, ডি. ডি. কোশাম্বি প্রমুখের গ্রন্থে পাওয়া যাবে। আরও সাম্প্রতিক বিবরণ আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রকাশনায় তুমি পাবে। এই সব ইতিহাস যদি তুমি পড় তাহলে দেখবে যে ভারতের ইতিহাস তোমাদের রোমান্টিক ধারণা অনুযায়ী অরণ্যে অরণ্যে ঋষিদের ওঙ্কার ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়নি, হয়েছে ঠিক অন্যান্য ভূখণ্ডের মতই প্রায় জান্তব অস্তিত্বের মধ্য থেকে হাতিয়ার অর্থাৎ পাথরের হাতিয়ার তৈরি করে উৎপাদন পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ধারা বেয়ে।

একথা সত্য যে গ্রীসে, রোমে, মিশরে বা মায়া সভ্যতার দেশ মধ্য আমেরিকা অঞ্চলে যে প্রাচীন সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল কিংবা মধ্যযুগে তথাকথিত 'বর্বর' জার্মানিক জাতিগুলির মহাঅভিযানের ফলস্বরূপ ইউরোপে যে সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল,-ভারতবর্ষে কিংবা চীনে ইতিহাসের ধারা ঠিক সেভাবে এগোয়নি। মার্ক্স এঙ্গেলস নিজেরাই অজস্রবার তার উল্লেখ করেছেন। ১৮৫৩ সালেব জুন মাসে মার্ক্স-এঙ্গেলস পত্রালাপে, ঐ একই মাসে প্রকাশিত মার্ক্স-এর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'British Rule in India'তে এবং জুলাই মাসে প্রকাশিত 'The Future Results of British Rule in India' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ভারত ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ প্রবন্ধ দুটিতেই প্রথম এবং তারও পবে ১৮৫৭-৫৯ সালে লিখিত Economic Manuscripts-এ ও The Critique of Political Economy-র মুখবন্ধে কার্ল মার্ক্স 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং তাঁর মহাগ্রন্থ 'ক্যাপিটালে'ও এ সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ রয়েছে। ভারতবর্ষের 'স্বাতন্ত্র্য' ভারতীযদের আবিষ্কার নয়, এ সম্বন্ধে অন্যরাও, বিশেষত ইউরোপীযরাও অনেক ভেবেছেন। কিন্তু 'স্বাতন্ত্র্য' কোনও বৈজ্ঞানিক নিয়মকে পরাজিত করতে পারে না, বরং exception proves the law, স্বাতন্ত্র্য নিয়মকেই প্রমাণ করে। খুব সহজ একটা বৈজ্ঞানিক নিয়মের কথা ধর-মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম। এ নিয়ম ইউরোপীয় খ্রীষ্টান পণ্ডিতের আবিষ্কার বলে শিবের খাস এলাকা কাশীতে বা বিষ্ণুর অবতার স্বয়ং রামের জন্মস্থান অযোধ্যায খাটবে না-তা তো হতে পারে না, তা হলে তো বাবরি মসজিদটাকে ফুঁ দিয়েই উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু এ কথাও ঠিক মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব মেরুতে আর নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমান নয়, ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে যাবে, তত তা কম, আবার পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে তা একেবারে শূন্য। চাঁদে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মত লাফ দিতে গেলে অনেক ওপরে উড়ে যাওযার সম্ভাবনা থাকবে। এ সবই 'স্বাতন্ত্র্য' কিন্তু

সাধারণ নিয়মের বাইরে তা নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসের স্বাতন্ত্র্যকেও এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করতে হবে। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ কী, তার ফল কী এবং কিভাবে তা মার্ক্সবাদের সাধারণ নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—এই কথাগুলি আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। বলাবাহুল্য মার্ক্সবাদকে কোনও আপ্তবাক্য হিসেবে গ্রহণ করব না, তাকে বিচার বিশ্লেষণ করেই অগ্রসর হব। আমাদের আলোচনায় অন্যান্যদের মতামতও গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা উচিত হবে। আমার মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলি সুগভীর তাৎপর্য আমাদের দেশের যে মহত্তম মনীষী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। পরিমাণে খুব অল্প হলেও তাঁর সেই আলোচনাগুলি মূল্যবান রত্নের আকর।

তোমার দ্বিতীয় সমালোচনা ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ও সমাজতন্ত্রের বর্তমান সঙ্কট প্রসঙ্গে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ কম। মার্ক্সের দুই যুগান্তকারী যে আবিষ্কারের কথা ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছিলাম, তার মধ্যে প্রথমটির বিষয়ে খুব আলতোভাবে কিছু আলোচনা করলেও, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'উদ্বৃত্ত মূল্য' বা surplus value আত্মসাৎ মারফৎ শোষণের পুঁজিবাদী পদ্ধতিটির বিষয়ে আমি কিছুই বলিনি, কারণ, ভারতবর্ষের প্রাক-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়ায়, আমাদের পক্ষে তা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক।

এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে, তা থেকে আমরা নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তগুলি টানতে পারি ঃ

(১) মার্ক্সবাদ কোনও রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সূত্রমাত্র নয়, এটি একটি 'বিশ্ববীক্ষা'— সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর আদ্যন্ত ঘটনার বিশ্লেষণের একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞান ও দর্শন। এই দর্শন বস্তুবাদী। বিপরীতের সমন্বয় ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসের অগ্রগতির সূত্র মার্ক্সবাদ উপস্থিত করে। সে কারণেই মার্ক্সবাদ হল 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'। 'দ্বন্দ্ব' কথাটির অর্থ বিরোধ ও মিলন, দুইই। ভারতচন্দ্রের সেই বিখ্যাত শ্লেষালংকারটি মনে আছে নিশ্চযই ?—'কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ ভরা বিষ; কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।' এই দ্ব্যর্থ্যবোধক 'দ্বন্দ্ব' কথাটি 'ডায়েলেকটিক্‌স্'—এর চমৎকার প্রতিশব্দ।

(২) সমাজের প্রতিটি বিকাশের স্তরের অভ্যন্তরেই তার ধ্বংসের ও পরবর্তী স্তরে বিকাশের উপাদানগুলি বর্তমান থাকে। যেমন সামন্ততন্ত্রের গর্ভেই পরবর্তী বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছিল। ধনতন্ত্রের সাম্য মৈত্রীর ঘোষণা কিন্তু লুপ্ত করল না দাসত্বকে। দাসত্ব নূতন আকারে এল। মার্ক্স তাকে বললেন 'মজুরি দাসত্ব'। সমস্ত সম্পদই শ্রমের ফসল হওয়া সত্ত্বেও, সেই ফসলের সিংহভাগ গিয়ে জমা হতে থাকল 'মুনাফা'র আকারে, কোনওক্রমে বেঁচে থাকার উপযুক্ত মজুরির বিনিময়ে পরিশ্রমকারী অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্যের পাশাপাশি জমতে থাকল মুনাফার অভ্রভেদী পাহাড়। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এবারে যে নূতন বিরোধ সমূহের সৃষ্টি হল সেগুলি হল এই ঃ

(ক) আগেকার অচলায়তন থেকে মুক্ত শ্রমিকশ্রেণী একই সঙ্গে এক সচল শক্তিতে এবং সর্বরিক্ত সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হল; (খ) সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃত দায়িত্বে রইল সমগ্র শ্রমজীবী সমাজ, সমস্ত উৎপাদন হয়ে গেল 'সামাজিক' অথচ তার আইনি মালিকানা রইল মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণীর হাতে; (গ) উৎপাদন শক্তির বিপুল প্রসার ঘটল, কিন্তু তার 'বাজারে' পণ্য কেনার লোকের অভাব, কারণ ক্রেতা সেই আপামর জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র এবং তার ফলে ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী চক্রাকার সঙ্কট মন্দার

আবির্ভাব–অর্থাৎ এক কথায় বিজ্ঞানের যুক্তি ও প্রবল সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি উৎপাদন ব্যবস্থার নৈরাজ্য, অসহ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, মৃত্যু ও হাহাকার।

বলা বাহুল্য পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে এই প্রবল বিরোধগুলির সমাধান সম্ভব নয়। অতএব, বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এই বিপ্লবের নায়ক কে ? স্বভাবতই উৎপাদনের প্রকৃত কর্তা, সবচেয়ে প্রাগ্রসর ও বিপ্লবে যার সব চেয়ে বেশি স্বার্থ সেই সর্বহারা শ্রেণী–'শৃঙ্খল ছাড়া তার হারাবার আর কিছু নেই'। সর্বহারা শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে উৎপাদনের উপায় গুলিকে–যা বস্তুত সামাজিক–তাকে আইনত সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে নেবে। এভাবেই উৎপাদন ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান ঘটবে–এটাই হল সমাজতন্ত্রের মার্ক্সীয় বিজ্ঞান সম্মত মডেল।

মডেল তো ভালই, পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিতও হল, কিন্তু এখন আবার উল্টো হাওয়া কেন ? এ প্রশ্নের একটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত বৈকি। এবং তা করতে গিয়ে প্রথমে তোমার চিঠির বক্তব্য দিয়েই শুরু করা যাক।

তুমি লিখেছ, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলোও তো পাল্টায়, তাই মার্ক্সবাদ বিজ্ঞান বলেই তাকে চিরন্তন সত্য বলে ধরে নিতে হবে কেন ? নিশ্চয়ই চিরন্তন সত্য বলে 'ধরে নেওয়ার' কোনও প্রশ্নই নেই, প্রতিটি সত্যকে বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে, এটাই মার্ক্সবাদীর দৃঢ় বিশ্বাস। সত্য চলমান, গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ হয়। আবার আজ যা সত্য, রাতারাতি কাল তা মিথ্যা হয়ে যায় না। সমস্ত প্রক্রিয়াটিই দ্বান্দ্বিক। বিজ্ঞানের সত্যগুলি যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনা, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দুই মহা বিজ্ঞানী নিউটন ও আইনস্টাইনের কালের মধ্যে বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক রূপান্তর। কিন্তু সত্য চিরন্তন নয় বলে কী সত্য কথাটাই মায়া ? এ সম্বন্ধে আইনস্টাইন নিজে ভারি সুন্দর কথা বলেছিলেন। 'বাউলমন প্রকাশনে'র প্রকাশিত আলবার্ট আইনস্টাইন ও লিওপোল্ড ইনফেল্ড লিখিত 'পদার্থ বিদ্যার বিবর্তন' বইটির ১২২ পাতা থেকে কথাটা তুলে দিচ্ছি। 'নূতন তত্ত্বসৃষ্টি ধানের গোলা ভেঙে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি বানানো নয়। একাজ অনেকটা পাহাড়ে ওঠার মত, উঠতে উঠতে নূতনতর এবং বিস্তৃততর দৃশ্যের সঙ্গে পবিচিত হওয়া এবং আমাদের যাত্রাপথের প্রারম্ভিক বিন্দুর সঙ্গে তার পরিবেশের বিভবের অপ্রত্যাশিত সংযোগ আবিষ্কার করা। কিন্তু যে বিন্দু থেকে আমাদের যাত্রা শুরু সে বিন্দু এখনও বর্তমান এবং এখনও দেখা সম্ভব।'

আইনস্টাইনের এই উক্তির আলোকে মার্ক্সবাদী অবস্থানটি কেমন ? যে পুঁজিবাদী জগতের মধ্যে কার্ল মার্ক্স কাজ করেছিলেন, সেই জগতের কোনও মৌলিক পরিবর্তন আজও ঘটেনি। পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের উন্মেষের মধ্য দিয়ে যে নতুন জগৎ উন্মোচিত হবে, তখন মার্ক্স-উত্তর কোনও মহাবিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়ত ঘটতে পারে, কিন্তু আইনস্টাইনের কথা অনুযায়ী যে বিন্দু থেকে মার্ক্সবাদীরা যাত্রারম্ভ করেছেন, সেটি নিশ্চয়ই হারিয়ে যায়নি। পুঁজিবাদের যে মৌলিক সঙ্কটগুলির কথা মার্ক্স এঙ্গেলস আলোচনা করেছিলেন সেগুলি তেমনি থেকে গেছে। মার্ক্সের দুটি ঐতিহাসিক আবিষ্কারের একটিও যখন আজও বাস্তবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়নি, তখন তুমি তাকে বাতিল করবে কিভাবে?

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে মার্ক্সবাদ যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মত একটা চিরন্তন

অনড় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নয়, তার একটা বড় প্রমাণই তো মার্ক্সবাদ–লেনিনবাদের আবির্ভাব। কার্লমার্ক্স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ পুঁজিবাদের বিকাশের যে স্তর প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা ছিল তার বিজয় যাত্রার যুগ। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের নির্মমতাকে উদ্‌ঘাটন করেও কার্লমার্ক্স তখন ইংল্যাণ্ডের ভারত অধিকারকে ভারতবর্ষে বিপ্লব সংগঠনের 'অচেতন অস্ত্র' বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং 'প্রাচীন এক জগতের ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্য যতই কটু লাগুক,' ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি এক বেদনাসিক্ত প্রাজ্ঞজনোচিত আনন্দেই গ্যেটের একটি কবিতা থেকে আবৃত্তি করেছিলেন, যার বাংলা অর্থ হল ঃ 'নির্যাতন থেকে যদি পাই এক বৃহত্তম সুখ, তবে কেন সেজন্য মনঃপীড়া। তৈমুরের শাসনের মাধ্যমে কি হয়নি আত্মার অশেষ নির্বাণ ?'

কিন্তু লেনিনের সময় পুঁজিবাদের এই ইতিবাচক ভূমিকা গত হয়েছে, সে তার 'সর্বোচ্চ' দশায় পৌঁছেছে যার নাম সাম্রাজ্যবাদ এবং লেনিনের বর্ণনায় এ হল তার 'মরণ দশা'। লেনিনীয় তত্ত্ব অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যখন সারা বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে এবং সেই ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে তাদের মধ্যে চলছে সংঘাত ও যুদ্ধ, তখন সাম্রাজ্যবাদের 'দুর্বলতম গ্রন্থিতে আঘাত হেনে' বিপ্লব সমাধা করতে হবে। পুঁজিবাদী বিকাশের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফল স্বরূপ বিকশিত পুঁজিবাদী সমাজে মার্ক্স এঙ্গেলস কল্পিত বিপ্লবের পরিবর্তে এই নূতন তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটল অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশে, প্রথমে রাশিয়া এবং পরে অন্যত্র বিশ্বের বহুস্থানে। মনে রাখতে হবে, লেনিন মার্ক্সবাদের মূল নীতিগুলিকে অবিকৃত রেখেই ইতিহাসের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী বিপ্লবের কৌশল নূতন করে রচনা করেছিলেন এবং তাঁর পূর্বসূরীরা যা করে যাননি, সমাজতন্ত্র গঠনের সেই ব্যবহারিক নিয়মাবলী রচনা শুরু করেছিলেন।

এঙ্গেলস এর লেখা 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নামক পুস্তিকার শেষের দিকে সমাজতন্ত্র কায়েম হওয়ার ছকটা দেওয়া হয়েছে এইভাবে ঃ 'পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি জনসংখ্যার বিপুল অধিকাংশকে ক্রমেই পরিপূর্ণ সর্বহারায় পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক শক্তির সৃষ্টি করবে যা হয় বিপ্লব সাধন করবে আর না হয় ধ্বংস হবে। ইতিমধ্যেই বিপুল উৎপাদনের উপায়কে এই পদ্ধতি সমাজীকৃত করে তুলে তাকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হতে বাধ্য করার সঙ্গে নিজেই এই বিপ্লবের পথ দেখাবে। সর্বহারা শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে উৎপাদনের উপায়কে পরিণত করবে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে। কিন্তু, তা করতে গিয়ে সর্বহারা হিসাবে তার আত্মাবসান ঘটবে, লুপ্ত হবে সমস্ত শ্রেণী বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী বৈরিতা। রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হিসাবে যে অস্তিত্ব তা বিলুপ্ত হবে। রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে হবে না, তা মরে যাবে।'

ওপরের কথাগুলি যদি একটু মন দিয়ে পড়, দেখতে পাবে যে এই ছক অনুযায়ী বিকশিত পুঁজিবাদ (১) অধিকাংশ মানুষকে সর্বহারায় পরিণত করে, (২) সমস্ত উৎপাদনের উপায়কে নিজেই সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে ফেলে, (৩) তখন সর্বহারার কাজ থাকে শুধু সেই মালিকানাটা রাজনৈতিকভাবে অর্থাৎ আইনত সমাজের বা রাষ্ট্রের করে দেওয়া এবং (৪) এই ভাবে সব উৎপাদনের উপাদান যখন সকলের হয়ে যায়, তখন অধিকাংশের উপর মুষ্টিমেয়র খবরদারির জন্য যে রাষ্ট্র অর্থাৎ পুলিশ, মিলিটারি, আমলা, জেল হাজতের প্রয়োজন তার আর দরকার থাকে না, রাষ্ট্র 'মরে যায়,' সূচনা হয় সাম্যবাদের।

বুঝতেই পারছ, লেনিনের রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ওপরের এই ছকে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বা

এগোযনি। সেখানে পুঁজিবাদেব বিকাশ না ঘটায ওপবেব শর্তগুলি পূবণ হয়নি। উৎপাদনেব উপকবণকে বাষ্ট্রীয সম্পত্তিতে পবিণত কবে ফেলাব ঐতিহাসিক ভূমিকাটি সেখানে পুঁজিবাদ সেবে বেখে যাযনি, অসংখ্য ছোট মালিক ও কৃষক নিযে তাই কাজ শুরু কবতে হযেছে সমাজতন্ত্রকে। বিপুল অধিকাংশ মানুষ ইতিপূর্বে সেখানে সর্বহাবাও হযে যায নি। সংখ্যালঘু সর্বহাবাব কাজ সেখানে সহজ হযনি। অনেক জোব জববদস্তি জটিলতাব সৃষ্টি হযেছে। ফলে বাষ্ট্র 'মবে যাওযা' দূবেব কথা, সত্তব বৎসবে বাষ্ট্র ক্রমেই আবও প্রবল হযেছে। সাম্যবাদ বযে গেছে মবীচিকা। রুশ দেশে সমস্ত জটিলতাব উৎস এইখানে।

ওপবে যা বললাম, তা থেকে আমবা কী কী সিদ্ধান্ত নিতে পাবি ? (এক) সমাজতান্ত্রিক জগতেব বর্তমান ঘটনাবলি মার্ক্সবাদ প্রযোগেব জটিলতাব প্রমাণ, মার্ক্সবাদী কোনও সূত্র এতে অপ্রমাণিত হয নি। তুমি তো জান যে কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কত বাধা বিপত্তি ব্যর্থতাব মধ্য দিযে প্রমাণ কবতে হয; বিশেষত এখানে যখন সমগ্র মানব সমাজই হল তাব ল্যাববেটবি।

(দুই) বাশিযা, চীন, ভিযেৎনাম, কিউবা, পূর্ব ইউবোপেব সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাগুলি নানা প্রতিকূলতা ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও আগামী দিনেব পূর্ণতব সমাজতন্ত্রেব আগাম নমুনা। এই সমাজগুলি মনুষ্যত্বেব বহুমুখী বিকাশেব—তাদেব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বার্ধক্যে নিবাপত্তা, বিনোদন, ক্রীড়া ইত্যাদিব যে ব্যাপক আযোজন কবতে পেবেছে, পৃথিবীব ইতিহাসে তাব কোনও তুলনা নেই। এমন কী আমেবিকান কূটনীতিবিদ তথা অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গলব্রেথ তাঁব 'The Affluent Society' গ্রন্থে সমাজতন্ত্র কর্তৃক সর্বসাধাবণেব অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনেব ঐতিহাসিক অবদানকে স্বীকাব কবেছেন। পূর্ব ইউবোপেব দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিযে এখন হাড়ে হাড়ে টেব পাচ্ছে পুঁজিবাদেব ক্ষুধা, বেকাবি আব নৈবাজ্যেব অভিশাপ কী বকম।

(তিন) পুঁজিবাদ পুঁজিবাদই। নজরুলেব ভাষায বলা যায, বাঘ কখনও ঘাস খাযনা। মুনাফা ভোগী পুঁজিবাদ সমাজে বাজনৈতিক গণতন্ত্রেব পাশাপাশি অর্থনৈতিক দাসত্ব, বিপুল সম্পদেব পাহাড়েব পাশাপাশি বিস্তীর্ণ দাবিদ্র্যেব প্রান্তব এবং উৎপাদন ব্যবস্থাব সামাজিকীকবণেব পাশাপাশি সংকীর্ণ ব্যক্তি মালিকানা সমগ্র ব্যবস্থাব মধ্যে সঙ্কটকে অবশ্যম্ভাবী কবে তোলে। সংঘর্ষ শুধু পুঁজিবাদেব সঙ্গে জনসাধাবণেব নয। সংঘর্ষ এক পুঁজিবাদীব সঙ্গে অন্য পুঁজিবাদীবও। মীমাংসাব অতীত এই সমস্ত বিবোধ ও দ্বন্দ্বেব অনিবার্য ফল বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র—তা থেকে কোনও নিস্তাব নেই।

বিজ্ঞানেব ও প্রযুক্তিবাদেব উন্নতি, ঔপনিবেশিক শোষণ, সমব সজ্জা ইত্যাদি ঘটনা বিকাশশীল পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লবকে ঠেকিযে বাখছে। কিন্তু চুলে কলপ, বাঁধানো দাঁত, সালসা আব ববকন্দাজেব পাহাবা কি মৃত্যুকে ঠেকাতে পাবে। সাদ্দাম হুসেনেব হঠকাবিতা জর্জ বুশকে নবজীবন দান কবেছে ঠিকই কিন্তু ঔদ্ধত্য পতনেব লক্ষণ। ইতিহাসেব অমোঘ বিধান'কে হিটলাব ঠেকাতে পাবে নি, জর্জ বুশ কি পাববে ?

তৃতীয় পর্ব

॥ এগার ॥

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার ভোটের দামামা বেজে উঠল। ভোট দেবীর অকাল বোধন এর আগেও অনেক হয়েছে, কিন্তু এরকম পনের মাসের মাথায় সারা দেশ জুড়ে ভোটের বাদ্যি আর কখনও বেজে ওঠেনি। এই কমাসে আমাদের সারা দেশের পক্ষে লজ্জাজনক যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে তাও এক কথায় নজির বিহীন। দেশের মানুষের খাওয়া পরা জীবন যাপনের দৈনন্দিন সমস্যাকে ভুলে গিয়ে এক মহাকাব্যের নায়কের কল্পিত জন্মভূমিকে ইস্যু করে একটি সভ্য দেশের পার্লামেন্টের একটি রাজনৈতিক দল অন্যের কৃপায় 'বড় দল' হওয়ার সুবাদে এমন ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দিল যে সরকারের পতন ঘটল, সারা দেশে তারা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির নামে অন্য ধর্মের শিশু নারী নির্বিশেষে, সাধারণ মানুষকে হত্যা করল, কয়েকজন বিবেকহীন দলছুট মানুষ গোলেমালে লুটে পুটে খাবার বাসনায় এই সুযোগে সরকার গড়ল তাদেরই সাহায্যে যাদের তারস্বরে গাল পেড়ে তারা নির্বাচিত হয়েছিল। অতঃপর যা প্রত্যাশিত ছিল, তাই ঘটল। জনগণের স্বার্থের প্রতি নির্বিকার এই 'সমর্থনকারী' মহান জাতীয় দলটি স্রেফ রাজনৈতিক জুয়া খেলায় মেতে অতি তুচ্ছ অজুহাতে সেই 'সিঁদেল' সরকারটির পতন ঘটাল। কী অজুহাত? না তোর পুলিশ আমাদের নেতার ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল কেন ? ভাবতে পার ? চন্দ্রশেখরের দলছুট সরকার তার পাপের মূল্য ঠিকই ফেরৎ পেয়েছে, কিন্তু মজার ব্যাপার হল, যখন ঐ সরকার আমেরিকান হানাদারদের বিমান বাহিনীকে তেল জুগিয়ে সারা দেশের মাথা হেঁট করে দিয়েছিল, তখন কিন্তু ঐ সমর্থনকারী মহান জাতীয় দলটি সমর্থন তুলে নেয়নি। আসলে একটি দুর্বল সরকারকে ব্লাকমেইল করে এরা আখের গোছাতে চাইছিল, কিন্তু হুট করে পোষমানা বিড়ালও যে কামড়ে দেবে, তা বেচারারা বুঝতে পারে নি। সরকার আচমকা পদত্যাগ করে এখন এদের বিপাকে ফেলে দিয়েছে।

অতএব, এখন নির্বাচন। বুঝতেই পারছ, এবারকার এই নির্বাচনে ধর্ম, সংস্কৃতি, ধর্ম, নিরপেক্ষতা বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রাধান্য পাবে। তার সঙ্গে প্রাধান্য পাবে জাত পাতের সমস্যাও, মণ্ডল কমিশনকে কেন্দ্র করে যা আমাদের দেশের তথাকথিত 'ঐতিহ্যে'র আর একটি লজ্জাজনক ক্ষতকে গত রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকারের আমলে নগ্ন করে দিয়েছিল। অর্থাৎ আমরা আশা করতে পারি আগামী কিছুদিন বাইরে সারা দেশ জুড়ে যখন নির্বাচনের ঝড় তুমুল আলোড়ন তুলবে, তখন আমাদের এই নিভৃতালাপও তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কখনও দীপ্ত, কখনও রুদ্র কখনও করুণ মল্লারের আলাপের মত বাজতে থাকবে; কারণ, আমরাও এই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা শুরু করেছিলাম। মাঝখানে

তোমার কিছু আপত্তি খণ্ডনের জন্য মার্ক্সবাদ প্রসঙ্গ উঠেছিল। এখন আবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যেতে পারি।

যেকথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই গোড়ার কথায় ফিরে যাওয়া যাক। একটা চালু ধারণা আছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস উচ্চ চিন্তা, সহজ জীবনযাত্রা, মানবপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস, ইউরোপীয় 'জড়বাদে'র থেকে তা ভিন্ন। এই বক্তব্য ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে আরও অনেক ভুল ধারণার মতই মিথ্যে। এটাই আমার প্রথম প্রতিপাদ্য। তুমি প্রমাণ চাইবে, আমিও প্রমাণ দেব। তবে, আগেই বলে রাখি–ভারতীয় ইতিহাসের প্রমাণ সংগ্রহে বাধা অনেক। সিন্ধু সভ্যতার পাথুরে প্রমাণ পাওয়া গেছে, কিন্তু তার লিপি উদ্ধার হয়নি বলে সে ইতিহাস এখনও রয়ে গেছে 'ভীষণ মৌন'। অপরপক্ষে আর্য আগমণের পরবর্তী ইতিহাস যদিও যথেষ্ট মুখর, কিন্তু তার পাথুরে প্রমাণ বড়ই অকিঞ্চিৎকর। তদুপরি আমাদের শাস্ত্রকারেরা এমন কথায় কথায় অতিশয়োক্তি করেন, এক একজনের আয়ুষ্কাল এমন অবলীলাক্রমে সহস্র, শত সহস্র বছর বলে চালিয়ে দেন, আমাদের পুরাণকারেরা একই গল্প এমন নানাভাবে বলেন, এবং একই পুরুষকে বহু পুরুষানুক্রমে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়ে রাখেন, যে তাতে গল্পের নীর থেকে সত্যের ক্ষীরটুকু বের করা যে কোনও পরমহংসের পক্ষেও কষ্টকর হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে "ইতিহাস-চেতনা হীনতা"ও একটি।

যাই হোক, আমার সুবিধা হল এই যে 'পণ্ডিতেরা সেখানে চুপ করে থাকেন, মূর্খেরা যেখানে অনায়াসেই বাচাল হতে পারে'। আমি আমার প্রথম প্রতিপাদ্যের প্রমাণ স্বরূপ সিন্ধু সভ্যতা নয়, তোমার 'বেদ' নিয়েই প্রথমে আরম্ভ করব, যে 'বেদ' অপৌরুষেয়, স্বতঃ সিদ্ধ এবং যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তি বলে পূজিত। 'ঋগ্বেদসংহিতা'টি নিয়ে যে কোনও একটি পাতা খুলে দেখা যাক। আমি প্রথম খুলেই পেলাম ১ম মন্ডলের ১৩তম সূক্তটি। রচয়িতা গৌতম ঋষি, দেবতা হলেন অগ্নি ও সোম। আদিম মানুষের কাছে এঁরা দেবতা হলেও, এঁরা আসলে যে 'জড় বস্তু'ই, তা তুমি নিশ্চয়ই মানবে। কিন্তু, আজ যাকে আমরা নিতান্তই জড় বলে চিহ্নিত করি, তার সম্পর্কে আদিম মানুষের ধারণা ছিল অন্যরকম। তাদের কাছে জড়জগতের সব কিছুই ছিল এক একটি বিস্ময়। কোনও অজানা উৎস থেকে সহসা দেহ নিয়ে আবির্ভূত সেই রহস্যময় সৃষ্টি, যার কায়া আছে অথচ যাকে কঠিন বা তরল কোনও আকারেই ধরা যায় না, কখনও কখনও যা লেলিহান হয়ে ভয়ঙ্কর, ভয়াল ও সর্বগ্রাসী, আবার প্রতিনিয়ত যা গৃহপালিত ধেনুর মতই কল্যাণপ্রদ, এমন যে অগ্নি, খুব সহজেই তা এই বিস্ময়াপন্ন মানুষদের কাছে দেবতা হয়ে উঠেছিল। আর সোম? যে সোমলতার নির্যাস দেহে রোমাঞ্চ, মনে উত্তেজনা, বার্ধক্যে তারুণ্য ও পল্লীতে পল্লীতে স্ফূর্তি ও যৌবনের জোয়ার আনে, তাও তো পাবকের মতই জ্বালাময়ী–অতএব নিশ্চয়ই তিনিও দেবতা। এখন এই তথাকথিত 'দেবতা'দের কাছে ঋষি গৌতম কী প্রার্থনা জানাচ্ছেন? শোনা যাক তাঁরই মুখ থেকে ঃ 'হে ইষ্টদায়ী অগ্নি ও সোম, আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান কর। যে তোমাদের স্তুতি অর্পণ করছে, তাকে বলবান গো ও সুন্দর অশ্ব দান কর। হে অগ্নি ও সোম, যে তোমাদের আহুতি দিচ্ছে সে পুত্র পৌত্রাদির সাথে বীর্যযুক্ত সমস্ত আয়ু প্রাপ্ত হোক। হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের যে বীর্যের দ্বারা পণির নিকট হতে গোরূপ অন্ন অপহৃত করেছিলে, যে বীর্যদ্বারা

বৃষয়েব পুত্রকে বধ কবে সকলেব উপকাবেব জন্য একমাত্র জ্যোতিপূর্ণ সূর্যকে প্রাপ্ত হযেছ, তা আমাদেব বিদিত আছে। .....হে অগ্নি ও সোম, যজমানেব বোগ ও ভয দূব কব। .....একত্রে এস, ...আমাদেব যজ্ঞ ধনযুক্ত কব।'

ত্রিষ্টুপ ও গাযত্রী ছন্দে বচিত এই সূক্তে আধ্যাত্মিকতাব পবিবর্তে আমবা পাই তৎকালীন সমাজেব আশাআকাঙ্ক্ষাব ছবি এবং সাধাবণ মানুষেব ঐহিক কামনা ও কল্পনায বচিত কাব্য। অশ্ব, অশ্ববাহিত শকট ও গোধন নির্ভব সমাজেব মানুষেব ধনসম্পদ, পুত্রপৌত্রাদি ও দীর্ঘ আয়ু কামনাব পাশাপাশি বযেছে সূর্য শিকাব ও পণিদেব কাছ থেকে গোধন অপহবণেব কল্পকথা। এই সব কল্পকাহিনীব যাস্ক বা সাযণ থেকে শুরু কবে ম্যাক্সমুলাব পর্যন্ত প্রদত্ত নানা অর্থ বযেছে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায বা ডি ডি কোশাম্বিব মত আধুনিক পণ্ডিতেবা এই সব কাহিনীব অন্য বকমেব ব্যাখ্যা কবেছেন। কিন্তু, সে সবেব মধ্যে না গিযেও যে ছবিটা স্পষ্ট হযে ওঠে তা হল আদিম মানুষদেব, বিশেষত আর্য অনার্যেব মধ্যে লড়াইযেব স্মৃতি, ধন লাভেব জন্য হত্যালীলাব কাহিনী। গোধন লাভেব জন্য অগ্নি ও সোম বসেব কৃতিত্ব থাকাই সম্ভব, কাবণ কল্পনা কবে নেওযা যায আর্যবা অনার্য বসতিগুলিতে আগুন লাগিযে দিযে অথবা কখনও তাদেব সোমবস অর্থাৎ মদ্যপানে বশীভূত কবে তাদেব গরুগুলি অপহবণ কবে নিত। এই সব কীর্তিব আবও প্রমাণ তোমাকে আগামী চিঠিতে দেব।

আজ তোমাকে একটি মজাব খবব দিযে চিঠি শেষ কবব। কদিন আগে ডাক্তাববাবুব কাছ থেকে একটা চিবকুট পেলাম। কী ব্যাপাব ? জানা গেল তোমাকে লেখা চিঠিগুলিব যে কার্বন কপি আমি অভ্যাস বশত বাখি সেগুলি ডাক্তাববাবু কী ভাবে যেন, বোধ হয অমবেশেব সহযোগিতায, 'কালান্তবে' পাঠিযে দিচ্ছেন এবং তা ছাপা হচ্ছে। তবে, চিঠিতে যে সব নিছক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আসে সেগুলি সযত্নে তিনি সম্পাদনা কবে দিয়েছেন। ধব, তোমাব মত পত্নীগত প্রাণ ব্যক্তিব কাছে সুমিতাব যতটুকু সম্ভব নিন্দাবাদ আমি কবেছিলাম, তাও তিনি বাদ দিযেছেন। অথচ সাদ্দামপ্রেমী ডাক্তাব বাবু সাদ্দাম হুসেন বিষযক আমাব উক্তিগুলিকে সেন্সাব কবেন নি। দেখা যাচ্ছে সাদ্দামেব চেযে সুমিতাব প্রতি ওঁব পক্ষপাত বেশি। খববটা সুমিতাকে দিও, ওব নাবীসুলভ অহঙ্কাব পবিতৃপ্ত হবে।

॥ বার ॥

ভাবতবর্ষ ইউবোপেব মত 'জড়বাদী' নয, সে চিবকাল অমৃতেব সাধনা, ব্রহ্মবাদেব সাধনা, আধ্যাত্মিকতাব সাধনা কবে এসেছে; হিংসা, আঘাত ও দ্বন্দ্বেব প্রবেশ এদেশে ঘটেছে কেবল মুসলমানদেব আগমনেব সঙ্গে; এই সমস্ত কথাগুলি যে কত মিথ্যে, তা আমি 'বেদে'ব একটি সূক্ত উদ্ধৃত কবে তোমাকে গত চিঠিতে বোঝাতে চেয়েছিলাম। আমাদেব ঐ ধর্মগ্রন্থে এ জাতীয উদাহবণ বযেছে ভূবি ভূবি। তেমনি আবাব এ কথাও সত্য যে ভাবতবর্ষেব আদিম অধিবাসীদেব সঙ্গে সংঘর্ষ, যুদ্ধ, হত্যা, চৌর্য ও প্রবঞ্চনা এবং ঐহিক ধন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেব জন্য লজ্জাহীন লালসাব পাশাপাশি, বেদে রযেছে অসাধাবণ কবিত্ব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিষযে নিবন্তব জিজ্ঞাসা ও নব নব উপলব্ধি এবং

দেহ-প্রাণ-আত্মা-পরমাত্মা ইত্যাদি, বিশ্বের উৎপত্তি ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব বিষয়ে নানান দার্শনিক প্রশ্ন ও মীমাংসার প্রচেষ্টা, যা প্রাচীন চিন্তা-ভাবনা-প্রজ্ঞা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ্বে প্রায় অতুলনীয়।

সন্দেহ নেই, বেদের সূক্তগুলি দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত। আমাদের দেশে ঠাকুর দেবতারও অভাব নেই। কিন্তু ঠাকুর দেবতাকে ডাকা আর 'আধ্যাত্মিকতা' যে এক নয়, তা আমরা ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। আমাদের বিধবা পিসিমা নিয়ম করে কত হাজার বার মালা জপ করতেন। কিন্তু, সেই সঙ্গে সর্বদাই 'অরে, গরুটা খ্যাতে ঢুইক্যা পড়ল রে', 'বৌমা, অম্বুরে শচাইলা না ?' ইত্যাদি নানা উক্তি অনর্গল করে যেতেন। তাতে আমরা ছোটরা হাসাহাসি করতাম কিন্তু বড়রা নির্বিকার থাকতেন, কারণ তাঁরা জানতেন, ধর্মাচরণ জিনিসটা ঐরকমই। আর, আমরাও পিসিমার ঠাকুর ঘরে যে পেন্নাম ঠুকতাম তা কতটা দেবভক্তিতে আর কতটা প্রসাদের লোভে, সে তো তুমি জানই। ঐভাবে ছোটবেলা থেকেই আমাদের মনে কিছু পাবার বাসনা আর ভগবদ্ভক্তি দুটো এক সাথে পাঞ্চ করে ঢুকিয়ে দেওয়া হত, এ একেবারে অব্যর্থ ককটেল, নেশা না ধরে যায় না।

নিতান্ত দৈহিক সুখকে ঠাকুর দেবতার নামে ব্যাখ্যা করার আর এক উদাহরণ আমাদের শুনিয়েছিল সুমিতা। তখন তোমাদের বাড়িতে প্রায়ই 'বাবা'দের আনাগোনা ছিল। এমনি এক বাবার অঙ্গে সারাক্ষণই সিল্কের পোষাক দেখে সুমিতা কিছু একটা প্রশ্ন করায় তিনি অবলীলাক্রমে বলেছিলেন, 'মা, কেউ যখন রাজার সাথে দেখা করতে যায়, তখন সে তার সবচেয়ে ভাল পোষাকটি পরেই যায়। আমি তো নিত্য সেই রাজার সাথে দেখা করছি, তাই আমাকে এই তুচ্ছ সাজে সেজে থাকতেই হয়।' বলেই আর কোনও প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে 'বাবা' ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। তোমার 'সোশিওলজি' পড়া সুমিতা তা নিয়ে আমাদের কাছে পরে খুব হাসাহাসি করেছিল বটে, কিন্তু উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী চমৎকৃত হয়ে ভেবেছিলেন, 'অহো! বাবার কী মহিমা!'

কথার মারপ্যাচে এই রকম সব ব্যাখ্যা দিয়ে ভক্তদের মন ভোলানো গেলেও, প্রকৃত ব্যাখ্যা যে এগুলো নয়, তা তো তুমি মানবে। 'বেদে'রও এই রকম নানা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে। যাস্কের 'নিরুক্তে,' সায়নাচার্যের টীকায় 'বেদে'র বিভিন্ন 'আধ্যাত্মিক' ব্যাখ্যা আছে। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে ইউরোপীয় আর্যদের দেবগণের সঙ্গে ভারতীয় আর্য দেবতাদের সংযোগ আবিষ্কার করেছিলেন এবং গ্রীক কল্পকাহিনী বা মাইথোলজির সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছিলেন 'বেদে'র দেবতারা প্রকৃতপক্ষে আকাশ, সূর্য, মেঘ, বৃষ্টি, দিবা, রাত্রি, ঊষা প্রভৃতিরই প্রতিরূপ। দেবতাদের বিভিন্ন কাহিনীগুলি নানা প্রাকৃতিক ঘটনারই শৈল্পিক রূপান্তর। ইন্দ্রের বৃত্রাসুর বধকে তিনি আকাশের মেঘের বাজ্রের দ্বারা অনাবৃষ্টির 'অসুর' বধ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যাস্ক তাঁর 'নিরুক্তে' বৃত্র বা অহি নামক অসুরের ঐ রকম ব্যাখ্যা করলেও, তাঁর ব্যাখ্যায় বা সায়নাচার্যের টীকায় প্রকৃতি-তত্ত্বের চাইতে প্রাধান্য পেয়েছে অতি-প্রাকৃতিক তত্ত্বই।

অপরপক্ষে একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ইতিহাসবিদ দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি তাঁর 'An Introduction to the Study of Indian History' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ঐভাবে প্রাকৃতিক বা অতি-প্রাকৃতিক তত্ত্বের দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। ঐ গ্রন্থের তৃতীয়

অধ্যায়ের শেষভাগে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, 'বৃত্র' অর্থ বাঁধ। প্রাকআর্যসভ্যতার মানুষেরা ফসল ফলাবার জন্য নদীর ওপর যে বাঁধ দিয়েছিল, নদীর জলে তা অহি বা সাপের মত ভেসে থাকত এবং জলকে তা কৃত্রিমভাবে আটকে রাখত বলে বেদে তাকে কখনও অহি', কখনও বা 'কৃত্রিম রোধ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আক্রমণকারী ইন্দ্র প্রাক্-আর্য সভ্যতার উৎপাদনের এক প্রধান উপায় এই বাঁধ ধ্বংস করার ফলেই বৃত্র বা অহি নামক 'অসুর' বধের উপাখ্যানের জন্ম হয়। সিন্ধু সভ্যতা হঠাৎ কোনও বন্যায় আকস্মিকভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বলে যে একটি ঐতিহাসিক অনুমান রয়েছে, কোশাম্বির এই ব্যাখ্যায় তা সমর্থিত হয়। কারণ, বাঁধ ভেঙে ফেললে হঠাৎ ভয়ঙ্কর বন্যা হওয়াই সম্ভব।

তবে, একটা কথা হল এই যে সমগ্র বেদের কোনও সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আজও কেউ দিতে পারেন নি। সমস্ত পণ্ডিতের ব্যাখ্যাকেই সম্ভাব্য মনে হয়, আবার সব ব্যাখ্যাতেই অনেক কথা অস্পষ্ট থেকে যায়। তার একটা কারণ সম্ভবত এই যে 'বেদ' কোনও এক বিশেষ সময়ে রচিত ধর্মগ্রন্থ নয়, এবং যে হাজার দুহাজার বছর ধরে এর মন্ত্রগুলি সৃষ্ট হয়েছিল, তারও বহু পূর্বেকার স্মৃতি তাতে ধরা পড়ে আছে। ফলে একই শব্দের অর্থ, তাৎপর্য, দ্যোতনা এই হাজার হাজার বছরে পালটে গেছে।

'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ সম্পর্কে কিছু কথা প্রসঙ্গে একটা চমৎকার উপমা ব্যবহার করেছিলেন। সেই উপমাটি অনুসরণ করে আমি বলব যে দূরের আকাশে হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত তারাদের যেমন পাশাপাশি দেখা যায়, তাদের ব্যবধান ধরা যায় না, তেমনি আজ 'বেদে'র মন্ত্রগুলিকে যখন আমরা পাশাপাশি দেখতে পাই, তখন তাদের বহু যুগের ব্যবধানটিকে ধরতে পারিনা। এই সব মন্ত্রের কোনও 'ইন্দ্র' এক মহাবলশালী গোষ্ঠী নায়ক রক্ত মাংসের মানুষ, আবার কোনও 'ইন্দ্র' বহু পরবর্তী যুগের এক দেবতা, কোনও 'অসুর' পুরনো অর্থে অসুর আবার কোনওটি পরবর্তীকালের কল্পকাহিনীর অসুর (এ সম্বন্ধে পরে বলছি), কোনও স্মৃতি আর্যদের পুরনো বাসস্থানের যুদ্ধের আবার কোনও বর্ণনা ভারতীয় আদিম মানুষদের সঙ্গে লড়াইয়ের। অন্য দিকে আবার আর্যদের হাজার হাজার বছরের যুদ্ধ-বিগ্রহ-জীবন-মৃত্যু-ভালবাসার কাব্য দিন-রাত্রি-ঝঞ্ঝা-বজ্র-শরৎ-হেমন্তে কখনও আলোড়িত, কখনও স্তম্ভিত, কখনও ঢলো ঢলো এই পৃথিবী ও আকাশের স্তুতির সঙ্গেও একাকার হয়ে গেছে। এ সব কিছুর পারম্পর্য আজ আর সহজে বোঝা যায় না।

তুমি চোখে কোনও ঠুলি না পরে সহজ সরল বুদ্ধি নিয়ে যদি 'বেদ' পড় তবে এই নানা ব্যাখ্যার অরণ্যের মধ্যেও আর্যদের ঐহিক জীবনযাত্রার ক্রমবিকাশের একটা ধারা দেখতে পাবে এবং তারই পাশাপাশি দেখবে তাদের চিন্তাভাবনার বিবর্তনেরও একটা সামন্তরাল ধারা। কাঠামোর সঙ্গে উপরি কাঠামোর বিবর্তনের চলমান ছবি। বিবেকানন্দ 'বেদে' আধ্যাত্মিক চিন্তার বিবর্তনের কথাটির ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু, আর্যরা যখন জলে জঙ্গলে লড়াই করে কোনওক্রমে খেয়ে পরে বাঁচছিল, তখন আধ্যাত্মিক চিন্তার অবকাশ কোথায় ? তখন শুধু 'হা অন্ন! হা অন্ন !' তখন শুধু জীবনযাপন ও 'রিপুর তাড়না'। ওসব বড় বড় চিন্তাভাবনা অনেক পরের যুগের কথা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু, 'বেদ' হোক 'রামায়ণ'

মহাভারত' হোক–সর্বত্রই মানুষের নিতান্ত জৈবিক প্রবৃত্তির ছবিগুলিকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতের 'চিরন্তন আধ্যাত্মিকতা'র ধোঁয়াটে কথাবার্তায় সে সব ছবি তাঁর দৃষ্টিতে অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। 'সমাজ' গ্রন্থে সংকলিত 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ 'ভারতে আর্যেরা প্রথমে ছিলেন বনচারী, তারপর ক্রমে হলেন পল্লীবাসী, পুরবাসী। প্রথমে ধেনু ছিল তাদের ধন, পশু চারণ তাদের জীবিকা। অবশেষে আর্যাবর্তের ...নদীলালিত প্রশস্ত সমভূমির উপরে কুলপতি–শাসিত গোষ্ঠীগুলি রূপান্তরিত হয়ে নরপতি শাসিত রাজ্য আকারে চাক বেঁধে উঠতে লাগল। বনের জায়গায় দেখা দিল শস্য ক্ষেত্র। তখন বৃহৎ জনসংঘের জীবিকার জন্য কৃষিই প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল। বৈদিক লড়াইয়ের মূল ছিল ধেনু হরণ। রামায়নিক লড়াইয়ের মূল হচ্ছে সীতাহরণ অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রের প্রতি উপদ্রব।' রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা বাস্তব ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন, মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে যার চরিত্রগত মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের এই ঐতিহাসিক সুলভ মনোভাব নিয়ে তুমি যদি ঋগ্বেদ পড়তে থাক, তবে দেখতে পাবে ভারতবর্ষে আসার অনেক আগে থেকেই এবং এই দেশে আসার পরও আর্যরা বহু দিন পর্যন্ত নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল। ঋগ্বেদের প্রতিটি মণ্ডলেই বার বার করে ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি যাবতীয় দেবতাকে 'অসুর' বলে বিশেষিত করা হয়েছে। অথচ, ঐ ঋগ্বেদেই আবার বৃত্র প্রভৃতি অসুর বধের কথা, অসুরঘ্ন ইন্দ্র ও দেবশত্রু অসুরের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী কালে পুরাণের যুগে ও রামায়ণ মহাভারতে তো দেবতা অসুরের লড়াইয়ের গল্পের ছড়াছড়ি। এই আপাত দুর্বোধ্য ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করতে প্রাচীন টীকাকারেরা হিমসিম খেয়ে গেছেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেছেন যে ভারতবর্ষে আসার আগে দেব ও অসুর–উভয়েই আর্যদের উপাস্য ছিল। তাদের মধ্যে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বের পর এক দল আসে ভারতবর্ষে, তাদের উপাস্য হয় দেবতা, আর অন্য গোষ্ঠী যায় ইরানে, তাদের উপাস্য হয় অসুর, যা তাদের উচ্চারণে অবশেষে হয়ে যায় 'অহুর'।

এই অসুর–উপাসনার স্মৃতিটুকু ঋগ্বেদে রয়ে গেছে, যদিও পরে ক্রমেই তা গেছে বিলুপ্ত হয়ে। ভারতবর্ষে আসার পর এখানকার প্রাক্–আর্য কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার সঙ্গে এই দুরন্ত, রথচারী, পশুপালক আর্য গোষ্ঠীর যে লড়াই হয়েছিল, তার উল্লেখ বেদে অসংখ্যবার করা হয়েছে। আর্যদের কাছে এখানকার অধিবাসীরা ছিল দাস বা দস্যু। তাদের পুর বা নগরীগুলিকে আর্যরা ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাদের ধনসম্পদ বিশেষত গরুগুলিকে তারা নিয়েছিল লুটপাট করে। বিজিত অনার্যরা সভ্যতার বিচারে যথেষ্ট উন্নত হলেও শ্বেতবর্ণ, উচ্চনাসা, দীর্ঘকায় আর্যরা তাদের কৃষ্ণবর্ণ ও খর্বনাসা বলে ঘৃণা করতে শিখছিল। এই ঘৃণা বেদের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের যুদ্ধের প্রাগৈতিহাসিক সেই দিনগুলিতেই দেবতা ও অসুরের যুদ্ধের কাহিনীগুলিও ক্রমে গড়ে উঠতে থাকে।

অন্যদিকে আবার ভারতবর্ষের নদীতীরে আর্যদের নিজেদের মধ্যেও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিবাদ, সুদাস রাজার সঙ্গে "ভরত" প্রভৃতি দশ জাতির যুদ্ধের অনেক বর্ণনা ওতে আছে। হতে পারে এসব কাহিনীই পরে পল্লবিত হয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের রূপ পেয়েছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্র ও কৃষ্ণ নামক এক অনার্যের মধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে 'পুরাণের' যুগে ইন্দ্র ও কৃষ্ণের মধ্যে যে রেষারেষি দেখতে পাওয়া যায়, হতে পারে, তাও এরই রেশ।

এইসব অবিবাম যুদ্ধ বিগ্রহেব মধ্য দিযে আর্যদেব মধ্যেকাব আদিম সমতা ঘুচে গিযে কেমন কবে ক্রমে সর্বব্যাপক অসাম্য গড়ে উঠতে থাকল, একটু আগে উদ্ধৃত ববীন্দ্রনাথেব ভাষায 'কুলপতি'ব জাযগায 'নবপতি'ব আসন পাকা হতে থাকল,আবাব কেমন কবে তাবই পাশাপাশি আদিম দেবপূজাব পবিবর্তে জন্ম নিতে থাকল দর্শন ও 'আধ্যাত্মিক' চিন্তা, ঋগ্বেদ থেকেই তাব কিছু প্রমাণ তোমাকে আগামী চিঠিতে দেব।

॥ তের ॥

তোমাব চিঠি পেলাম। ধর্ম ও বাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস হওযা সত্ত্বেও এবাব নির্বাচনে যেভাবে ধর্মেব প্রসঙ্গ টেনে আনা হচ্ছে তাতে তুমি ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ কবেছ। তোমাব মত আস্তিক ও আমাব মত নাস্তিকে এই খানটায মিল। আমবা উভযেই সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতি ও ধর্মনিবপেক্ষ বাজনীতিব পক্ষে। কিন্তু এবাব এই ধর্ম নিবপেক্ষতাকেই আক্রমণ কবা হচ্ছে এবং আমাদেব সংবিধানেব ধর্মনিবপেক্ষতাকে 'মেকি ধর্মনিবপেক্ষতা' বলা হচ্ছে। এবা চাইছে 'হিন্দু ধর্ম নিবপেক্ষতা'। এবা 'সংখ্যালঘু কমিশন,' সংখ্যালঘুব অধিকাব ইত্যাদিকে অপছন্দ কবে। মুসলমানেব ধর্মস্থান, সামাজিক বিশেষ আচাব প্রভৃতিব প্রতি কোনও সম্মান দেখানোব কথায এবা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। ধর্মধ্বজীবা ভণ্ডামিতে ও বাগাড়ম্ববে কেমন পটু হয, তোমাকে আগেই বলেছি। ইতিমধ্যে কাগজে নিশ্চয দেখেছ এই সব 'হিন্দুত্ব ওযালা'বা ভণ্ডামি কবে বলছে, 'মুসলমান আমাদেব দেশে মুসলমান হযে থাকবে কেন ? আমবা কাউকে মুসলমান বলে মনে কবিনা। আমাদেব চোখে সবাই মানুষ।' চমৎকাব! কিন্তু, মশাইবা, তবে হিন্দুকে আপনাবা হিন্দু বলে মনে কবেন কেন ? হিন্দুবা কি মানুষ নয ?

প্রশ্নটা তর্কচ্ছলে কবছি বটে, কিন্তু বাস্তব ট্র্যাজেডী হল এই যে আমাদেব দেশে মুষ্টিমেয বর্ণ হিন্দু কখনওই শূদ্রনামধাবী অধিকাংশ হিন্দুকে মানুষ বলে মনে কবেনি। অথচ এখন এই ক্ষমতালোভী ভণ্ডবা নির্যাতিত, অবহেলিত ও অপমানিত অধিকাংশ হিন্দুব কাছে হিন্দুত্বেব নামে ভোট চাইছে এবং তাতে কাজ হবে না আশংকা কবে 'বামে'ব সাথে 'রুটি'ও জুড়ে দিযেছে। অর্থাৎ স্বীকাব কবে নিযেছে যে বাম দিযে পেট ভববে না।

অত্যন্ত ক্ষোভেব কথা কী জান ? যে 'বেদ' কে হিন্দুধর্মেব ভিত্তি বলে স্বীকাব কবা হয সেই 'বেদ'কেই শূদ্রেব জন্য হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ কবে বাখা হযেছে। মনু বিধান দিযে গেছেন, যদি কোনও শূদ্র বেদ উচ্চাবণ কবে, তবে তাব জিভ কেটে ফেলতে হবে, আব যদি কোনও শূদ্র বেদ শুনে ফেলে, তবে তাব কানে ঢেলে দিতে হবে তপ্ত সিসে। মনে আছে তো, ববীন্দ্রনাথেব সেই উদ্ধৃতি দিযেছিলাম ঃ 'হিন্দুধর্মেব মত সকল প্রকাব মিলনেব বিরুদ্ধে সুকৌশলে বচিত নিষেধ ও প্রত্যাখ্যানেব এমন দুর্লঙ্ঘ্য আচাবেব প্রাকাব জগতে আব কোথাও নেই' ?

একটা ধর্ম সম্প্রদাযেব অধিকাংশেব জন্য সেই ধর্মেব মূল গ্রন্থ নিষিদ্ধ কবে বাখাব কাবণ কী ? একটা কাবণ ছিল মন্ত্রতন্ত্রেব একচেটিযা অধিকাব ব্রাহ্মণদেব কবাযত্ত কবে বাখা। কিন্তু,মনে হয অন্য গূঢ়তব কাবণও ছিল। সাধাবণ মানুষকে সমাজপতিবা সামাজিক নানা আচাব–আচাবণেব যে সব নিষেধেব বেড়াজালে আবদ্ধ কবে বাখতে চান, বেদে বর্ণিত

সমাজে সে সব নিষেধ একেবারেই নেই। অন্যদিকে আবার যে লোভ, হিংসা, দ্বেষ থেকে মুক্ত হবার অহরহ উপদেশ তাঁরা দিয়ে থাকেন, বেদের দেবতাদের মধ্যে তারই ছড়াছড়ি। বেদে আর যে একটা জিনিস ছড়িয়ে আছে, তা হল অনার্যদের অর্থাৎ পরবর্তীকালের শূদ্র চণ্ডাল, আদিবাসী, হরিজনদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। তাদেরকে ব্রতহীন, যজ্ঞহীন, অমানুষ ও দ্বিপদ পশু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে তাই এসব জিনিস আড়াল করে রাখাই শাস্ত্রকারেরা সমীচীন মনে করেছিলেন।

কিন্তু সত্যকে চিরকাল আড়াল করা যায় না। বেদ আজ আমাদের কাছে সেকালের আর্যদের সমাজ-বিকাশের, ভারতবর্ষে আর্য আগমনের এবং আর্য-অনার্য সংঘর্ষ ও মিশ্রণের ইতিহাসের এক অতি চিত্তাকর্ষক দলিল। তোমাকে লেখা গত চিঠিতে বৈদিক আর্যদের মধ্যে কুলপতি থেকে নরপতির অভ্যুদয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করেছিলাম। এই 'কুলপতি' ও 'নরপতি' শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'কুলপতি' হলেন সমানাধিকার সম্পন্ন কোনও গোত্র, গোষ্ঠী বা কুলের প্রধান, আর নরপতি হলেন পদানত জনগোষ্ঠীর রাজা। অথাৎ রবীন্দ্রনাথ আমাদের মার্ক্সীয় পরিভাষা ব্যবহার না করেই বৈদিক আর্যদের মধ্যে আদিম সাম্যাবস্থা থেকে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে উত্তরণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আমি তোমাকে এঙ্গেলস-এর Origin of Family, Private Property and State' গ্রন্থের কথা আগের দুএকটা চিঠিতে বলেছি। এঙ্গেলস্ ঐ গ্রন্থে অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সাবলীল ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে আমরা যে পরিবার প্রথা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর রাষ্ট্রকে চিরন্তন বলে মনে করি, আদিম মানুষের মধ্যে এসব কোনও কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। 'বন্য' অবস্থায় যূথবদ্ধ মনুষ্যগোষ্ঠীগুলি যখন বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করছিল, তখন তাদের 'দিন এনে দিন খেয়ে' এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকত না যে তাদের মধ্যে অসাম্য হতে পারে। এই মানুষগুলি নিজেদের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মে যৌন ক্রিয়া চালাত। প্রথমে কোনও বিধি নিষেধ ছিল না। পরে মাতা-পিতার সঙ্গে পুত্র-কন্যার যৌন মিলন নিষিদ্ধ হলো; ভ্রাতা-ভগ্নীদের মিলনই হয়ে উঠল নিয়ম। এই বন্যাবস্থার পরবর্তী ধাপ 'বর্বরতা'। এই অবস্থায় মানুষের গোষ্ঠীগুলির পরিধি বেড়েছে, জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠী সংখ্যা বৃদ্ধি ও নূতন নূতন গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষ ও মিশ্রণে নূতন পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তখন সহোদর-সহোদরার যৌন মিলন নিষিদ্ধ হয়েছে, সূত্রপাত হয়েছে 'সমষ্টি বিবাহে'র-তাতে এক দল পুরুষ ও অন্য এক দল নারী পরস্পরের স্বামী স্ত্রী (বলা বাহুল্য, বর্তমান অর্থে নয়)। কিন্তু একই মায়ের গর্ভজাত সন্তানরা স্বামী স্ত্রী হতে পারে না। তখনই গোত্র প্রথা গড়ে উঠতে থাকে। একই গোত্রে বিবাহ নয়, কিন্তু সে গোত্র 'মাতৃতান্ত্রিক', কারণ, সমষ্টি বিবাহে মা চেনা যায়, বাবা চেনা যায় না। এই পর্যায়ে উৎপাদনের বিকাশ ঘটেছে, লুটপাটের ধনও আসছে, ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও কিছু কিছু গড়ে উঠছে, কিন্তু তখনও বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী ও কুলের মধ্যেকার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়ে যায়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জোর জবরদস্তি ও পুরুষের আধিপত্য বাড়তে থাকে এবং যে 'সমষ্টি বিবাহ' ছিল নর-নারীর মধ্যে নির্বাধ সাবলীল সম্পর্কের প্রকাশ, তাই হয়ে উঠতে থাকে নারীর পক্ষে অবমাননাকর। তখন থেকেই নারী চায় বহুভোগ্যা না থেকে এক পতির অধিকার। পুরুষ তাকে তা দেয়, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিবাহের আগে নারীকে প্রথম যুগে অন্য

অনেকের কাছে, পরবর্তী যুগে মন্দিরে বা কুলপতি বা পুরোহিতের কাছে আত্মদান করতে হত। এবং সভ্যতার যুগে এসে পুরুষ যে এক পতি–পত্নীর ব্যবস্থার প্রবর্তন করে; তার কারণ একনিষ্ঠ প্রেম নয়, কারণ হল এই, যে ততদিনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবলভাবে কায়েম হয়ে গেছে, বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রূপে একজন নিশ্চিত পিতা ও একটি নির্দিষ্ট 'ছেলের মা' চাই। এঙ্গেলস্ বলছেন, এই সভ্য ব্যবস্থার দু'পিঠে দুটি কলঙ্ক আছে–একটি গনিকাবৃত্তি, অন্যটি ব্যাভিচার। সমষ্টি বিবাহ থেকে এক পতি–পত্নীর যুগে আসার মাঝখানে ছিল 'জোড় পরিবার'। সেখানে পতি–পত্নীর বাঁধা 'জোড়ে'র বাইরে পুরুষের অন্য নারী ও নারীর অন্য পুরুষের সংসর্গের অধিকার রয়েছে। এখানেও সন্তান মায়ের গোত্রভুক্ত, কারণ মা–ই এখানে নিশ্চিত। বর্বর অবস্থার শেষ দিকে এ ব্যবস্থা ছিল। সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার বন্ধন, পুরুষের আধিপত্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিপত্তি দৃঢ় হল, অন্য দিকে গড়ে উঠতে থাকল এইসব কিছুকে রক্ষা করার জন্য আইন কানুন, পুলিশ, মিলিটারী, আদালত ইত্যাদি অর্থাৎ রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কুলপতির পরিবর্তে অভ্যুদয় হল রাষ্ট্রপিতার।

এঙ্গেলস-এর বিশদ বিশ্লেষণের যে সামান্য নমুনা তোমাকে দিলাম, তার সমর্থনে বেদে চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়। অবশ্যই উক্ত পারম্পর্য অনুযায়ী নয়, গত চিঠিতে উল্লিখিত সুদূর আকাশে পাশাপাশি তারাদের মত, কে কাছে কে দূরে, খালিচোখে সহজে বোঝা যায় না।

আমাদের পুরাণে এবং পৃথিবীর তাবৎ মাইথোলজিতে লক্ষ্য করবে বিখ্যাত সব নায়ক–নায়িকাদের রহস্যাবৃত জন্মকথা। রাম, সীতা, দ্রৌপদী, পঞ্চপাণ্ডব, কর্ণ, দ্রোণ, ভরত প্রমুখ অনেকেই, কোনও বিবাহিত দম্পতির স্বাভাবিক সন্তান নন। তার কারণ হল এই যে, পরবর্তী যুগে যখন এই পুরাণগুলি রচিত হয়েছে, তখনকার দম্পতি প্রথায় এই সব নায়ক নায়িকাদের জন্ম হয় নি। বন্য বা বর্বর যুগের পরিবার প্রথার উল্লেখ লজ্জাজনক বলেই পুরাণকারেরা অনেক ক্ষেত্রে তা রহস্যে আবৃত করে দিয়েছেন। তবু কিছু কিছু নিদর্শন থেকে গেছে। পুরাণে দক্ষ প্রজাপতি কর্তৃক তার নিজ কন্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের কথা আছে। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের বিখ্যাত দশম সূক্তে যম ও যমীর মধ্যে যে কথোপকথন রয়েছে, তাতে যমী এক নির্জন দ্বীপে তার সহোদব ভাই যমের সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করছে। কিন্তু ভগ্নী অগম্যা বলে যম তা প্রত্যাখ্যান করছে। তখন যমী বলছে, 'যদিচ কেবল মনুষ্যের মধ্যে এ প্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ তথাপি দেবতারা এ রূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করে থাকেন।' যম তাতেও অবিচলিত থাকায় ক্রুদ্ধ যমী এই বলে অনুযোগ করছে যে অন্যান্য রমণীদের সহবাসে যমের কুণ্ঠা নেই অথচ তার বেলাতেই সে নিরাসক্ত। যম তখন ভগ্নীকে অন্য যে কোনও মনোমত পুরুষ সন্ধান করে তার সঙ্গে সুখ সম্ভোগ করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে।

ব্যাখ্যাকারেরা অনেকে এই সূক্তটিকে ভ্রাতা ও ভগ্নীরূপ দিবা ও রাত্রির মধ্যে মিলনের অসম্ভব প্রয়াসের রূপক বলে চালাতে চেয়েছেন। কিন্তু, প্রথমত দিবা ও রাত্রিকে যম ও যমী রূপে কল্পনা কষ্টকল্পনা। দ্বিতীয়ত কোন কবি কল্পনাই বাস্তব বর্জিত হয় না, সোনার পাথর বাটির কল্পনা কোনও কবিত্ব হতে পারে না। সুতরাং এই সূক্ত যদি কল্পনাও হয় তা হলেও তার বাস্তব সামাজিক ভিত্তি অবশ্যই রয়েছে। তৃতীয়ত দিন রাত্রির রূপক দিয়ে

সমস্ত সূক্তটির অর্থ করা যায় না। যমী যে বলছে 'দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করে থাকেন', তার কী ব্যাখ্যা হবে ? আসল ব্যাপার হল এই যে, এই সূক্তটি রচনাকালে স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলনে যদিও অন্য কোনও বিধি নিষেধ নেই, কিন্তু ভ্রাতা ভগ্নীর মিলন নিষিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ তা এঙ্গেল্‌স্‌ কথিত বর্বর অবস্থার আদিকাল। তারা সেই বন্যাবস্থা পেরিয়ে এসেছে যখন মানুষ এই সব অগম্য গমনের বিধি নিষেধ মানত না। সেই মানুষেরাই আজ দেবতা, আর তাই যমী দেবতাদের সম্বন্ধে ও কথা বলছে।

পরবর্তী সমাজ বিকাশের স্তরের আর্য নারী পুরুষের সম্পর্কের উদাহরণ আমি ঋগ্বেদের রহস্যমণ্ডিত উর্বশী পুরুরবা সূক্ত ও বিবাহ সূক্ত থেকে তোমায় পরের বারে দেব এবং সেই সঙ্গেই পরিবার, বিবাহ, রাষ্ট্র ইত্যাদির বিকাশ ও বিবর্তনের কথাও আসবে। আমার মূল বক্তব্যে পৌঁছাতে একটু দেরি হচ্ছে, সেজন্য তোমাকে ধৈর্য ধরতেই হবে। তবে, এ কদিনে একথাটা তোমাকে কি বোঝাতে পেরেছি যে, যতই 'আধ্যাত্মিকতা' আর 'অনন্যতা'র গর্ব কর, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পদ্মগুলি অন্য সব 'জড়বাদী' সভ্যতার মত পাঁকে–জলে–মাটিতেই জন্মেছে, নির্মল আকাশে নয়।

॥ চৌদ্দ ॥

উর্বশী পুরুরবার কাহিনী প্রায় সকলেই জানে। তুমিও জান। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ৯৫ নম্বব সূক্তে এই কাহিনীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে তা কাব্যে, নাটকে, গল্পে নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তের মত এটি নিয়েও টীকাকারেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। অনেকে বলতে চান উর্বশী পুরুরবার স্বল্পকালীন প্রণয় এবং অবশেষে উর্বশীর অন্তর্ধান ও পুরুরবার বিরহবেদনার কাহিনী আসলে উষা ও সূর্যের ক্ষনিক মিলনেব কাব্যিক রূপায়ণ। হাজার হাজার বছর ধরে কোন্ আখ্যান কিভাবে কবি কল্পনায় রঞ্জিত হয়ে ভোল পালটে ফেলেছে তা বলা শক্ত। কিন্তু এজাতীয় ব্যাখ্যায় যম যমীর আখ্যানের মতই উর্বশী পুরুরবা সূক্তেরও অনেক কিছুই রহস্যাবৃত থেকে যায়, তার অর্থ বোঝা যায় না। উর্বশীকে আকাশের অপ্সরা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং তার পক্ষে উষা হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু পুরুরবাকে সূক্তটিতে বারবার 'মনুষ্য' বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। সুতবাং সূক্তের রচযিতা তাকে সূর্য বলে কল্পনা করেছেন বলে মেনে নেওয়া মুশকিল।

কিন্তু এহ বাহ্য। প্রকৃতপক্ষে কথোপকথনের আকারে এই সূক্তটিতে যে সব সংলাপ আছে, তাতে এমন কতগুলি সমাজসত্য প্রতিফলিত হয় যা কেবলমাত্র ঐ কষ্টকল্পিত সূর্য–উষার প্রণয়ের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি তোমাকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। বিরহী পুরুরবা উর্বশীকে বারবার ফিরে আবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে তা প্রত্যাখ্যান করার পর উভয়েই তাদের গভীর প্রণয়ের দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থন করছিল। উর্বশী বলছিল, 'তোমার গৃহে কোনও সপত্নীর সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুমি একান্তভাবে ছিলে শুধু আমারই।' পুরুরবা বলছিল, 'সুজর্ণি, শ্রেণী, সুম্ন, আপি, গ্রন্থিনী প্রভৃতি আমার যে কয়জন মহিলা ছিল তুমি আমার গৃহে আসার পর থেকে তারা আমার গৃহে আর আসত না।' এই 'মহিলা'রা কারা? তারা যদি পত্নীই হবে, তবে পুরুরবা

তাদেব 'মহিলা' বলবে কেন? তাবা 'আগে ছিল' কিন্তু উর্বশী আসাব পব তাবা আব পুরুববাব গৃহে আসত না, এমনই বা হবে কেন? পত্নীবা তো গৃহেবই বাসিন্দা হওযাব কথা। আব এক্ষেত্রে 'গৃহ' অর্থ যদি ঘব হয, তা হলে বহুপত্নীব স্বামীবই কোনও এক পত্নীব ঘবে যাবাব কথা। পত্নীদেব স্বামীব ঘবে আসাব কথা নয।

উর্বশী এবপব এক জাযগায পুরুববাকে সান্ত্বনা দেওযাব জন্য বলছে, 'পুরুববা, তুমি শোক কব না। স্ত্রীলোকেব প্রণয স্থাযী হয না, স্ত্রীলোকেব হৃদয আব বৃকেব হৃদয দুই‌ই এক প্রকাব।' উর্বশীব এই উক্তি তুমি সুমিতাব সঙ্গে কলহে চমৎকাব ব্যবহাব কবতে পাব। কিন্তু, কথা হল ওপবেব এই সংলাপগুলি থেকে উর্বশী পুরুববাব সমাজেব কোন্ চিত্র আমবা পাই ? নাবীব প্রণয যে সমাজে ক্ষণস্থাযী, পুরুষ ও নাবীব মিলনে সেখানে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। পুরুববাব যেমন অনেক মহিলা ছিল, সেই মহিলাবাও তেমনি স্বাধিকাবপ্রমত্তা। কেবল, কিছুদিনেব জন্য তাবা জোড় বাঁধে এবং যতদিন সেই জোড় থাকে, ততদিন সেখানে অন্য পুরুষ বা নাবীব অনুপ্রবেশ ঘটে না। এটাই হল এঙ্গেল্‌স্ কথিত 'বর্বব' সমাজেব শেষ ভাগেব 'জোড়বাঁধা' পবিবাব। গত চিঠিতে আমি এসম্বন্ধে তোমাকে বলেছি।

'হৃদযেব সমস্যা' ছাড়াও এখানে একটি অন্য বাস্তব সমস্যা বযেছে, সভ্যতাব আগমনেব সঙ্গে সঙ্গে যা গভীবতব হযে ওঠে। সেটি কী ? উর্বশী পুরুববা সংলাপ থেকেই তাব জবাব পাবে। উর্বশী বলছে, 'তুমি পৃথিবী পালনেব জন্য পুত্রেব জন্মদান কবলে। (কথাটা লক্ষ্য কব : পৃথিবী পালনেব জন্য পুত্র উৎপাদন) আমি তোমাকে বাববাব সাবধান কবে দিযেছিলাম, কী হলে আমি তোমাব কাছে থাকব না। তুমি তা শুনলে না। এখন পৃথিবী পালনেব কাজ ছেড়ে দিযে কেন বৃথা কথা বলছ ?' পুরুববা বলছে, 'তোমাব পুত্র কবেই বা আমাকে ভালবাসবে? সে যদি আমাব কাছে আসে, সে কি বোদন কববে না ?' উর্বশী সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'না, সে বোদন কববে না। আমি তাব মঙ্গল চিন্তা কবব। আমাব গর্ভে তুমি যে পুত্রেব জন্ম দিযেছ, তাকে আমি তোমাব কাছে পাঠিযে দেব। হে নির্বোধ, গৃহে ফিবে যাও। আমাকে আব পাবে না।'

ওপবেব এই কথোপকথন থেকে কতগুলি জিনিস বুঝে নেওযা যায। এই কাহিনীতে, কিংবা অন্যান্য অনুরূপ নানা কাহিনীতে, যেমন ধব ভীষ্মেব বাবা মা শান্তনু ও গঙ্গাব ক্ষেত্রে, পুরুষ ও নাবীব মধ্যে একটি শর্ত বযেছে এবং সেটি পূবণ না হলেই নাবীব পুরুষকে ছেড়ে নিজ গৃহে চলে যাবাব অধিকাব থাকে। আজও যে সুমিতা মাঝে মাঝে বাগ কবে বাপেব বাড়ি চলে যায, এ কি তাবই দূবাগত প্রতিধ্বনি ? তবে বলাই বাহুল্য আজকেব সুমিতাদেব সেই স্বাধীনতা নেই, উর্বশী বা গঙ্গাদেব যা ছিল। আসলে তখনও পর্যন্ত সমাজে পুরুষেব প্রাধান্য সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পাযনি। গঙ্গা তাব সন্তানদেব গঙ্গায ভাসিযে দিত, অর্থাৎ তাব নিজেব কূলে দিযে দিত, কিন্তু শেষ সন্তানটিকে সে শান্তনুকে দিতে বাধ্য হযেছিল। উর্বশী আব শকুন্তলা অবশ্য স্বেচ্ছায তাদেব পুত্রদেব ফেবৎ পাঠিযে দিযেছিল তাদেব পিতাব ঘবে। এই ছেলেদেব দবকাব 'পৃথিবী পালনেব জন্য' অর্থাৎ সাদা কথায পুরুববাব, দুষ্যন্তেব, শান্তনুব বাজত্বেব উত্তবাধিকাব লাভেব জন্য। আগেকাব প্রথা অনুযাযী সন্তানেবা মাতাব গোত্রে চলে যেত। তাব পবিবর্তে এখন তাদেব পিতাব গোত্রে আসাব প্রযোজন হযে পড়ছে। গঙ্গা–শান্তনু, দুষ্যন্ত–শকুন্তলা, উর্বশী–পুরুববাব কাহিনীগুলি সেই যুগ–সন্ধিক্ষণেবই পবিচয বহন কবছে। পুত্রেব ওপব পিতাব অধিকাব

প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতা ঋগ্বেদের সূক্তটির একটি প্রধান দিক। সূক্তের শেষ ঋকে উর্বশী পুরুরবাকে 'ইলাপুত্র' বলে সম্বোধন করে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। লক্ষ্য কর, মায়ের পুত্র হিসাবে পরিচয় প্রদানের মাতৃতান্ত্রিক প্রথা সভ্যতার ঐ উষালগ্নে তখনও রয়ে গেছে।

এই উর্বশী পুরুরবা সূক্তের অল্প আগেই দশম মণ্ডলের ৮৫নং সূক্তে কিন্তু তুমি পাবে পরবর্তী সমাজের ছবি, যেখানে নারীর অধিকার অন্তর্হিত, স্ত্রীর জন্য 'এক পতি পত্নী প্রথা', কিন্তু পুরুষের জন্য বহু নারী ভোগের অধিকার। পূর্ববর্তী সমাজের অনেক স্মৃতিও এই বিখ্যাত 'বিবাহ সূক্তে' পাশাপাশি রয়ে গেছে। যেমন ধর, প্রথমে রয়েছে সূর্যের কন্যা সূর্যার পতি হিসেবে অশ্বিদ্বয়ের কথা। এরা দুজন দেবতা। অর্থাৎ এক নারীর একাধিক পতির উদাহরণ শুধু দ্রৌপদী নয়, অন্যত্রও দেখা যাচ্ছে।এটা এঙ্গেলস্ বর্ণিত বর্বর সমাজেরই অন্যতম স্বীকৃত প্রথা। ঐ সূক্তে বিশ্বাবসু নামক এক দেবতাকে আহ্বান করে বলা হচ্ছে ঃ 'হে বিশ্বাবসু, এখান থেকে চলে যাও, কারণ এই কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। আর কোনও কন্যা পিতৃগৃহে তোমার ভাগ রূপে জন্মেছে, তার কাছে যাও।' অর্থাৎ বিবাহ হয়ে গেলে নারী একজন পুরুষের ভাগ বা সম্পত্তি হয়ে গেল, তার সঙ্গে আগেকার মত যে কোনও পুরুষের স্বাধীন মিলনের অধিকার আর রইল না–এই সূক্তে সে কথাই বলা হচ্ছে। আর এক জায়গায় কন্যাকে বলা হচ্ছে ঃ 'প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্য সন্তান তোমার চতুর্থ পতি।' এখানেও প্রাচীন সমাজে নর–নারীর বহু মিলনের স্মৃতি থেকে যাচ্ছে। কিন্তু উর্বশী–পুরুরবা সূক্তের সঙ্গে এখানে তফাৎ এই যে, এখানে নারীর স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়। এই মন্ত্রে স্বামী বলছে, 'আমাকে পতি পেয়ে তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এ প্রার্থনা করি। সকল দেবতা আমার সঙ্গে গৃহকার্য করার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পন করছেন।' স্ত্রী হবে একনিষ্ঠা, সংসারের দেখাশুনা সেই করবে, এবং খুব জরুরি যে কথাটা তা হল এই যে সে হবে 'বীর পুত্র প্রসবিনী।' প্রার্থনা করা হচ্ছে, 'হে ইন্দ্র, এ নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। এর গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর।'

স্বামীর 'হস্তে সমর্পিত' অর্থাৎ স্বামী অধীন এই নারীকে স্তোকবাক্য শোনানো হচ্ছে সেই আদিকাল থেকেই। মন্ত্রে বলা হচ্ছে, 'হে বধূ, তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের ওপর সম্রাটের ন্যায় হও।' পরাধীন, স্বাতন্ত্র্যবর্জিতা, পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র রূপ রমণীর পক্ষে এ সব যে শুধুই কথার কথা, কেবলই প্রবঞ্চনা, তা তো আমরা সীতা দ্রৌপদীর মত মহীয়সী রমণীদের ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করি, সাধারণ রমণীর আর কথা কী ?

আমাদের আলোচনার মধ্যে নরনারীর সম্পর্কের প্রসঙ্গটি যে টেনে এনেছি, তা যে ধান ভানতে শিবের গীত নয়, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। একটা কথা হল যে আজকের 'হিন্দুত্বওয়ালা'রা যে 'শাশ্বত হিন্দুধর্মে'র কথা বলতে চায়, তা কল্পনা মাত্র। 'হিন্দু সমাজ' যুগে যুগে পালটেছে, আজকের সামাজিক বিধানগুলি বেদ–উপনিষদের যুগে চালু ছিল না, আবার আগামী দিনেও থাকবে না। অন্য ধর্মের বেলায়ও একই কথা। সুতরাং যে কোনও ধর্মের চিন্তা ভাবনা রীতিনীতিগুলিকে আঁকড়ে থাকা, তা নিয়ে অহঙ্কার করা অর্থহীন। সামাজিক রীতিনীতি সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী পালটায়, ধর্ম তাকে স্বীকৃতি দেয় মাত্র। আমার এ কথার পক্ষে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে আমি সাক্ষী মানব।

তুমি জান, বৈদান্তিক দার্শনিক চিন্তার মহান আধার বলে পরিচিত দুটি বিখ্যাত উপনিষদ

হল 'ছন্দোগ্য' ও 'বৃহদারণ্যক'। সেই 'ছান্দোগ্যে'র দ্বিতীয় অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ডে এবং 'বৃহদারণ্যকে'র ষষ্ঠ অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণে স্ত্রী পুরুষের দৈহিক মিলনকে ব্রহ্মলাভের অন্যতম উপায় বলে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে যে কোনও কামিনীতে উপগত হবার এবং এমনকি অনিচ্ছুক রমণীকে উপহারাদি বা বলপ্রয়োগ দ্বারা বশীভূত করার উপদেশ ও মন্ত্রশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে বহু পণ্ডিতের দ্বারা অশ্লীল বলে পরিগণিত এই মন্ত্রগুলি সম্বন্ধে বিখ্যাত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় মন্তব্য লিখছেন, 'যে যুগে বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যে যুগে নরনারীর দৈহিক সম্পর্ককে আহার নিদ্রার ন্যায় একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করা হইত, যে যুগে স্ত্রীজাতিকে গো, অশ্ব ও ধনধান্যের ন্যায় সম্পত্তি ও শস্যক্ষেত্রের ন্যায় ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইত....উপনিষদের পূর্বোক্ত উপদেশ সেই যুগের নীতি। ইহা অতি বর্বর যুগের নীতি।......উপনিষদের ঋষি....প্রচলিত নীতিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।' হরফ প্রকাশনার 'উপনিষদ' (২য় খণ্ড) ৫০৭–৮ পৃষ্ঠা থেকে পুরো মন্তব্যটা দেখে নিতে পার।

বেদ থেকে উপনিষদ–নারী জাতির স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতার ক্রমবিলুপ্তির ছবি। সেই সঙ্গে তা আদিম সাম্যাবস্থা থেকে ব্যক্তিগত ধনসম্পদের একাধিপত্যে উত্তরণেরও চলচ্ছবি। এ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা বারান্তরের জন্য রইল। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের তত্ত্ব নিয়েও তখন কিছু তর্ক তোলা যাবে।

॥ পনের ॥

বাংলায় উপনিষদ চর্চার পথিকৃৎ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত 'উপনিষদ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমার গতবারেব চিঠি শেষ করেছিলাম। উপনিষদের কিছু উপদেশকে 'বর্বর যুগের নীতি' বলে উল্লেখ করে সেই মন্তব্যে আবার যোগ করা হচ্ছে যে উপনিষদের যুগটাই যে বর্বর যুগ, তা নয়। কারণ, তখন যাজ্ঞবল্ক্যের মত ঋষি এবং মৈত্রেয়ী ও গার্গী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 'কিন্তু জনসাধারণের আদর্শ উন্নত ছিল না। এ সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল ছিল।' তার অন্যতম প্রমাণ হিসেবে মন্তব্যকারক লিখছেন, 'মহাভারতের আদিপর্বে (১২২ অধ্যায়ে)...লিখিত আছে যে এক সময় এক ব্রাহ্মণ উদ্দালক ও তাহার পুত্র শ্বেতকেতুর সমক্ষেই উদ্দালক পত্নীকে যেন বলপ্রকাশ করিয়াই (বলাৎ ইব) অন্যত্র লইয়া গেল। ইহাতে শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু উদ্দালক বলিলেন–তাত! কোপ করিও না; এষঃ ধর্মঃ সনাতনঃ অর্থাৎ ইহা সনাতন ধর্ম। ইহার পর তিনি আরও বলিলেন, পৃথিবীতে সববর্ণের অঙ্গনাগণ অনাবৃতা। মনুষ্যগণ স্ব–স্ব বর্ণের নারীর সহিত গোবৎ আচরণ করে।' এই উদ্দালক 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের একজন ঋষি।

লক্ষ্য কর, উদ্দালক যাকে সনাতন ধর্ম বলছেন, তাঁর শাস্ত্রানুসন্ধিৎসু পুত্র শ্বেতকেতু তার প্রতিবাদ করছেন। প্রতিবাদী একজন পুরুষ। পুরুষের তরফ থেকে প্রতিবাদ আসার প্রথম কারণ ছিল নারীতে তার সত্ত্ববোধ। নারী সন্তানের জন্মদাত্রী আর সেই সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তাধিকারী। পুরুষ যদি নারীকে অচলা 'সতীত্বে'র বন্ধনে আটকে দিতে না পারে, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই, আমি খেটেখুটে সম্পত্তি তৈরি করলাম, তা ভোগ

কববে নেপো অর্থাৎ অপবেব সন্তান ? এ চলতে পাবে না। অতএব, পুরুষ শাসিত সমাজ অত্যন্ত কঠোব ভাবে ক্রমে নাবীব জন্য একটি মাত্র পুরুষেব ব্যবস্থা কবল, তাবই ফলস্বরূপ তৈবি হল বিধবাব জন্য আজীবন ব্রহ্মচর্যেব নীতি অথবা প্রযোজন হলে জ্বলন্ত চিতায শবানুগমন। লক্ষ্য কববে, এ সব নিযম উচ্চবর্ণেব ও অল্প বিস্তব বিত্তশালী মানুষদেব জন্যই। একেবাবে সম্পত্তিহীন অন্ত্যজ মানুষদেব এ সব সতীপনাব বালাই নেই।

আমি জানি তুমি এসব কথায চটছ। প্রথমত উপনিষদেব প্রতি তোমাব দুর্বলতা। তুমি ইতিমধ্যেই আমাকে বিবেকানন্দ উদ্ধৃত কবে জানিযেছ যে বেদ বলতে আমি যেন শুধু চতুর্বেদ না বুঝি, আসল বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদই হল বৈদিক জ্ঞানেব পবাকাষ্ঠা, আব বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত নিযেই হল সম্পূর্ণ বেদ। মানলাম। বেদ থেকে বেদান্ত পর্যন্ত যে অ... উচ্চ চিন্তাব খোবাক বযেছে, তাও মানলাম। কিন্তু ওহে উপনিষদ ভক্ত, প্রদীপেব নিচেকাব ক্লেদাক্ত পিলসুজটিকে এক বাব উঁকি মেবে দেখবেনা? উপনিষদেব যুগেব কথা আমি পবে আলোচনা কবব এবং সে যুগ যে আদৌ 'সুবর্ণ যুগ' ছিল না, উপনিষদ থেকেই তোমাকে তাব প্রমাণ দেব। তুমি লিখেছ, সুমিতা বলছে যে আমি নাকি শুধু নর্দমা ঘাটছি। তা, সুমিতা যদি শুধু বৈঠকখানাটা সুন্দবভাবে সাজিযে বাখে, আব ভেতবেব ঘবগুলিকে কবে বাখে নোংবা–তবে আমাব মত দুএকজন যাদেব অন্দব মহলে যাতাযাত আছে, তাবা সমালোচনা কববেই, অবশ্য যদি তাবা ঠোঁটকাটা হয।

তোমাব দ্বিতীয আপত্তি তুমি জানিযেছ, নাবী পুরুষেব সম্পর্কেব মধ্যে সম্পত্তিব ব্যাপাবটাব ওপব আমাব বেশি জোব দেওযাতে। তা, কী কবা যাবে ? উর্বশী–পুরুববা প্রেমালাপে পুরুববা তাব বাজত্বেব উত্তবাধিকাবী রূপে পুত্রকে চাইছে। বেদেব বিবাহ সূক্তে পুরুষ ভার্যা সম্বন্ধে বলছে 'দেবতা... আমাব সম্পত্তি বক্ষণাবেক্ষণেব জন্য এই নাবীকে আমাব হস্তে সমর্পন কবছেন'। বামাযণ, মহাভাবত–আমাদেব দু'দুটো মহাকাব্য তথা ধর্মগ্রন্থেব যত কাণ্ড ঘটে গেল বাজত্বেব উত্তবাধিকাব নিযে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিষয সম্পত্তিই প্রধান, দাম্পত্য প্রেম তাব অনুগামী। বাম তাঁব বাজত্ব বক্ষাব জন্য প্রিযা সীতাকে অকাতবে বিসর্জন দিতে পাবেন, পুরুষদেব বাজ্যলিপ্সাব দ্যূতক্রীড়ায যুধিষ্ঠিব অনাযাসে বাজি বাখতে পাবেন প্রেযসী যাজ্ঞসেনীকে,–বেচাবি আমি সেই সম্পত্তিব কথাটা বললেই কি দোষ হযে যায ?

সম্পত্তিব উত্তবাধিকাবে যদি কোনও বিপত্তি না ঘটে, তাহলে পুরুষ যে নাবীব বহুচাবিতাকে মেনে নেয এবং নিজেব বাসনা চবিতার্থতাব জন্য তাকে পোষণও কবে, তাব প্রমাণ তো গণিকালয আব হাই সোসাইটিব চাকচিক্যেব অন্তবালে ব্যাভিচাবেব আণ্ডাবগ্রাউণ্ড ড্রেনগুলি। কিন্তু আমি তোমাকে আবও পাকা প্রমাণ দেব এবং গতবাবে যেমন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে সাক্ষী মেনেছিলাম, এবাবে সাক্ষী মানব একজন অমার্ক্সবাদী বিদুষী লেখিকাকে।

কেবলেব নাযাবদেব মধ্যে যে 'মারু মাক্কাতাযাম' নামে মাতৃতান্ত্রিক উত্তবাধিকাব প্রথা প্রচলিত ছিল, তা হযতো তুমি জান। এই প্রথা অনুযাযী একটি পবিবাবে মা, তাব ছেলে মেযেবা, মেযেদেব ছেলে মেযেবা এবং তাদেব মেযেদেব ছেলে মেযেবা একত্রে বাস কবত। 'স্বামী'বা কিছুদিনেব জন্য তাদেব 'স্ত্রী'দেব সঙ্গে 'স্ত্রী'দেব বাড়িতে বসবাস কবে

যেত এবং এই অস্থায়ী সম্পর্ককে বলা হত ‘সম্বন্ধম’। নাবীরা তাদেব ইচ্ছে অনুযায়ী ‘সম্বন্ধম’ পবিবর্তন কবত। সম্পত্তিব দেখাশোনা কবত সাধাবণত পবিবাবেব প্রবীণতম পুরুষটি এবং অন্য পুরুষেবা যোগ দিত বাজাব সৈন্যদলে অথবা অন্য কোনও কাজে। এবই পাশাপাশি ছিল উচ্চবর্ণেব ব্রাহ্মণেবা, যাদেব মধ্যে নাম্বুদিবিবা প্রধান। এই নাম্বুদিবিদেব পবিবাব পিতৃতান্ত্রিক। এদেব আবাব প্রথা ছিল, কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়ে কববে, অন্যান্যবা নাযাব বা অন্য মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে সাময়িক ‘স্ত্রী’ খুঁজে নেবে। নাম্বুদিবিবা ছিল সামন্তপ্রভু, আব নাযাববা ছিল প্রজা। নাযাববা অবশ্য নিজেবা চাষ কবত না, চাষ আবাদ কবত তাদেব চেয়ে নিম্নবর্ণেব ভূমিদাসেবা। এই প্রথায় নাম্বুদিবিদেব পিতৃতান্ত্রিক পবিবাব থাকত সীমাবদ্ধ, কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র বিয়ে কবায় তাদেব সম্পত্তি বিভাজনেব হাত থেকে বক্ষা পেত, আবাব নাযাবদেব মাতৃতান্ত্রিক পবিবাবেব যৌথ সম্পত্তিও থাকত অটুট।

নাম্বুদিবি ও নাযাবদেব উক্ত বিবাহপ্রথা ও সম্পত্তিব উত্তবাধিকাব সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী বীণা আগবওয়ালেব একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যক্তিত্বময়ী লেখিকা এককালেব খ্যাতনাম্নী কবি কেতকী কুশাবী ডাইসন ‘জিজ্ঞাসা’ পত্রিকাব দশম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় মন্তব্য কবছেন : ‘এখানে দ্রষ্টব্য.....একদিকে ছিল ব্রাহ্মণ জমিদাব শ্রেণী, অন্যদিকে ছিল তাদেব প্রজা যোদ্ধৃশ্রেণী যাবা বাজ্যেব জন্য সৈনিক জোগাত, নিম্নতব শ্রেণী তথা বর্ণকে দিয়ে জমি চাষ কবাত এবং জমিদাব বাড়িব বিবাহাধিকাব বঞ্চিত বেচাবি ছোট ভাইযেব যৌন প্রয়োজন মেটাবাব জন্য স্ত্রীলোক জোগাত।.....যৌথ সম্পত্তিকে অবিভক্ত বেখেও উভয় বর্ণ যাতে বংশবৃদ্ধি কবতে পাবে তাব জন্য মাতৃবৈখিক আব পিতৃবৈখিক উত্তবাধিকাব ব্যবস্থাব মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেব একটা বিধান দেওয়া হয়েছে এবং উভয় বর্ণেব মধ্যে অনুমোদিত যৌন সংসর্গেব জন্য নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নাযাব মেয়ে নাযাব অথবা নাম্বুদিবি প্রেমিক নিতে পাবে কিন্তু নাম্বুদিবি মেয়ে নাযাব প্রেমিক নিতে পাবে এমন দেখতে পাচ্ছিনা। জমিদাব শ্রেণীব জনসংখ্যাও এই ব্যবস্থাব দ্বাবা সীমাবদ্ধ থাকবে, কেননা নাযাব নাম্বুদিবি ‘সম্বন্ধম্’ এব সন্তানপুঞ্জেব ভবণপোষণেব দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই নাযাব যৌথ পবিবাবেব ওপব ন্যস্ত।’ এই চমৎকাব বিশ্লেষণেব পব কেতকী দেবী যে মন্তব্যটি কবছেন তা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি অমোঘ। তিনি লিখছেন, ‘লক্ষণীয়, সমাজেব স্থিতিব জন্য স্ত্রীলোকেব একাধিক পুরুষ সংসর্গ যদি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, তা কত অনায়াসে প্রকাশ্য ছাড়পত্র পেয়ে যায়।’

নাম্বুদিবিবা তো প্রচণ্ড ব্রাহ্মণ। তাবা এতদিন এই প্রথা সম্বন্ধে নিশ্চযই বলে এসেছেন– এষঃ ধর্মঃ সনাতনঃ। তাহলে যে ‘হিন্দুত্বওয়ালা’বা মুসলমানদেব বিবাহ প্রথাকে জঘন্য মনে কবে, তাদেব কাছে জিজ্ঞাস্য : সনাতন হিন্দু প্রথা কোনটা? বেদে যমী দেবতাদেব যে প্রথাব কথা বলছে, দেবপ্রিয় পুরুষবা যে প্রথায় সন্তান উৎপাদন কবেছে, উপনিষদে যে প্রথাব কথা বলা হচ্ছে, মহাভাবতে যে প্রথাব ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, কেবালাব নাম্বুদিবি-নাযাবেবা যে প্রথা মেনেছে বহু শতাব্দী ধবে,–এ সবই কী ‘সনাতন’ হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী নয় ? তুমি বলবে, যুগ অনুযায়ী প্রথা পালটায়। সেটাই তো ঠিক কথা। কিন্তু তাহলে তো যুগটাই প্রধান, সনাতন ধর্ম নিয়ে এত মাতামাতি কেন ? ভাবতবর্ষে বর্ণ হিন্দুব সমাজেব বাইবে বিশাল সীমান্ত প্রদেশে আজও যে কত বকমেব বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, ‘হিন্দুত্বওয়ালা’বা তাব কি কোনও খবব বাখে ? এ বিষয়ে তুমি ডঃ অতুল সুবেব

'ভারতবর্ষে বিবাহের ইতিহাস' বইটিতে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাবে।

কথায় কথায় আমরা বেদ থেকে উপনিষদ মহাভারত পেরিয়ে আধুনিক যুগে চলে এসেছি। আমরা বেদের যুগের কথা আলোচনা করছিলাম। উপনিষদ থেকে পূর্ববর্তী উদ্ধৃত মন্তব্যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয় যে বলছেন, ঋষিদের উচ্চ চিন্তা সত্ত্বেও 'জনসাধারণের আদর্শ উন্নত ছিল না' বলেই সামাজিক আচরণে বিকৃতি ঘটছিল–তাতে মনে হতে পারে সব দোষ বুঝি জনসাধারণের। উপনিষদের ঋষি স্বয়ং যখন বিশেষ সামাজিক আচারকে 'এষঃ ধর্মঃ সনাতনঃ' বলছেন তখন 'জনসাধারণ' কী করতে পারে ? আসলে সে যুগটা ছিল মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পাকাপোক্ত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের মধ্যবর্তী কাল। যুগ সন্ধিক্ষণ সব সময়ই খুব টালমাটাল হয়ে থাকে। যম–যমী বা উর্বশী–পুরুরবার সময়কার নারীর যৌন স্বাধীনতার অবসান ঘটিয়ে পুরুষ যখন কী অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায়, কী পুত্র উৎপাদন ব্যবস্থায় সবে তার আধিপত্য বল প্রয়োগের দ্বারা কায়েম করতে শুরু করেছে, উপনিষদে বা মহাভারতের উদ্দালক–কাহিনীতে সে সময়েরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

অনার্যদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কথা পরে বলব, ঋগ্বেদের যুগে পুরুষ প্রধান আর্যদের মধ্যেও যে মাতৃতান্ত্রিক অতীতের কিছু ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে, সে কথা তোমায় আগে বলেছি। বৈদিক সাহিত্যে এই প্রসঙ্গে আরও কতগুলি জিনিস লক্ষ্য কর ঃ

(১) ঋষিদের বা রাজাদের নামে সব সময়ই তুমি পিতা বা মাতার উল্লেখ পাবে। যেমন উদ্দালক আরুণি অর্থাৎ অরুণের পুত্র উদ্দালক, উষস্তি চাক্রায়ণ অর্থাৎ চক্রের পুত্র উষস্তি, প্রবাহণ জৈবলি অর্থাৎ জিবলের পুত্র প্রবাহন, সত্যকাম জাবাল অর্থাৎ জাবালার পুত্র সত্যকাম, ঐতরেয় মহিদাস অর্থাৎ ইতরার পুত্র মহিদাস, উশীজ কক্ষীবান অর্থাৎ উশিজের পুত্র কক্ষীবান ইত্যাদি। এই উদাহরণগুলির শেষ তিনটিতে পুত্রের পরিচয় মায়ের নামে দেওয়া হচ্ছে। একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিখ্যাত ঋষিরা মায়ের নামে পরিচিত এবং সেটা যে কোনও দোষের বিষয় নয়, তাতেই প্রমাণ হয় যে এই সমাজ একটি মাতৃতান্ত্রিক অতীত সবেমাত্র পার হয়ে এসেছে যখন পুত্রকন্যার পরিচয় মায়ের নামেই হত, কারণ পিতা থেকে যেত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত।

(২) অন্যদিকে দেবতাদের বেলায় পুরাণে যদিও তাদের বংশ তালিকা সৃষ্টির একটা ব্যর্থ চেষ্টা দেখা যায়, ঋগ্বেদের যুগে তাদের বাপ মায়ের পরিচয় নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা নেই। বরুণ, মিত্র, দক্ষ আদি দেবগণ অদিতির পুত্র আদিত্য বলে উল্লিখিত হয়েছেন। পরে অদিতি দেবমাতা এবং দিতি দৈত্যমাতা বলে খ্যাতা হন। দেবতা বা দৈত্যদের কোনও সঠিক পিতৃ পরিচয় নেই। পুরাণের যুগে এই অদিতির পুত্র দক্ষ প্রজাপতি বা ব্রহ্মাকেই দেবতাদের পিতামহ বলা হতে থাকে। এই ধারণার উৎস হিসেবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৭২নং সূক্তে পাবে অদিতি দক্ষের মাতা এবং কন্যা দুই–ই। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধারণা অনুযায়ী আদিপুরুষ এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ধারণা অনুযায়ী আদিমাতার মধ্যে গোঁজামিল দিয়ে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা এখানে দেখা যাচ্ছে। ইন্দ্রের বাবা মার সঠিক খবর বেদে পাওয়া যায় না। যদিও কোথাও কোথাও ইন্দ্রকে আকাশ ও পৃথিবীর সন্তান বলা হচ্ছে, আবার ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৫৪ নম্বর সূক্তে আছে ইন্দ্রই আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। বলা বাহুল্য প্রথম জন প্রাকৃতিক ইন্দ্র, দ্বিতীয়জন

ঈশ্বব ইন্দ্র। কিন্তু প্রচন্ড বলশালী সমবনাযক ইন্দ্রেব পিতা মাতা কে ? ইন্দ্রেব পত্নীই বা কে? তাব বা তাদেব নাম কী ? অন্যান্য দেবতাদেব স্ত্রীবা কাবা ? এই সব বৈদিক ক্যুইজ নিযে দুজনে মিলে একটু মাথা ঘামাও, দেখবে চিন্তাব অনেক জট খুলে যাচ্ছে, দেখবে যে ইন্দ্রেব পিতামাতাব পবিচয যেমন অস্পষ্ট তেমনি তাব বা অন্য দেবতাদেব স্ত্রীদেব নামও ঋগ্বেদে উল্লেখ কবা নেই। দ্যু ও পৃথিবীকে ইন্দ্রেব বাবা মা বলে কোথাও কোথাও উল্লেখ কবা হলেও আবাব অন্যত্র বলা হচ্ছে ইন্দ্রই আকাশ ও পৃথিবীব স্রষ্টা। কোথাও আবাব অদিতিকে ইন্দ্রেব মা বলে উল্লেখ কবা হচ্ছে। অন্যদিকে ইন্দ্র বরুণ অগ্নি ইত্যাদিব স্ত্রীদেব নামেব কোনও হদিশই পাওযা যায না। অনেক জাযগায, ধবো, প্রথম মন্ডলেব ২২,৬১, ৭২, ১০৩ নম্বব সূক্তে এবং এমনি অন্যত্রও ঢালাও 'দেবপত্নীগণে'ব উল্লেখ পাওযা যায। অনেক ক্ষেত্রে ইন্দ্রানী, বরুণানী প্রভৃতিব কথা পাওযা যায, কিন্তু তাবা নামহীনা। পবে পুবানেব যুগে দেবতাদেব প্রত্যেকবই একটি বা একাধিক নির্দিষ্ট বৌ জুটেছিল, কিন্তু তাঁদেব নামকবণেব কাহিনী বেশ মজাদাব। ইন্দ্রেব কথাই ধবো। বেদে ইন্দ্রকে শচীপতি অর্থাৎ যজ্ঞপতি বলে উল্লেখ কবা হযেছে, এখানে শচী মানে হল যজ্ঞ। তা থেকে ইন্দ্র হযে গেলেন শচী নাম্নী স্ত্রীব পতি। অগ্নিও ঐবকম। 'অগ্নযে স্বাহা' বলতে বলতে স্বাহাই হযে গেল অগ্নিব স্ত্রী। পবে যেমন দেব সেনাপতি অর্থাৎ দেবতাদেব সেনাপতি কার্তিক হযে গিযেছিল দেবসেনাব পতি। দেবতাদেব স্ত্রীব জন্য এবকম সন্ধিসমাসেব দ্বাবস্থ হতে হয কেন? প্রাচীন গ্রন্থে এদেব জন্য স্ত্রী ববাদ্দ কবা নেই কেন? পুরুষ প্রধান বৈদিক সমাজে স্ত্রীলোকেব প্রতি অবহেলাই কি এব কাবণ ? আমাব কিন্তু তা মনে হয না।

বৈদিক আর্যবা যোদ্ধৃরূপে এদেশে প্রবেশ কবেছিল বলে স্বভাবতই তাতে পুরুষেব নেতৃত্ব ছিল এবং সে কাবণে পুরুষ দেবতাদেব প্রাধান্য বৈদিক সাহিত্যে দেখতে পাওযা যায বটে, কিন্তু তাই বলে সেই সমাজে পুরুষেব একাধিপত্য প্রথমাবধিই কাযেম হযে গিযেছিল, এ বকম মনে কবাব কোনও কাবণ নেই। বেদেব নাবী কেবল যজ্ঞেব অধিকাবিণীই নয, বহু মন্ত্রেব ঋষিও। বেদেব যুগেব স্বাধিকাবপ্রমত্তা নাবীদেব উদাহবণ তোমায আগেও দিযেছি। দেবমাতা অদিতি বেদেব এক প্রধান দেবী। 'মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও দৌঃ আমাদেব বক্ষা করুন', এই মন্ত্র সেখানে বাববাব উচ্চাবিত; এই উপাসিতদেব মধ্যে অদিতি ও পৃথিবী, দুজন দেবী। অন্যান্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দেবীদেব মধ্যে আছেন সবস্বতী ও উষা। লক্ষ্য কবে, সমব নাযক যদিও ইন্দ্র, পববর্তী আর্যসমাজ যখন স্থিতি লাভ কবল এবং বৈদিক ঋষিদেব মনে হতে লাগল যে দৈহিক বল বা ধন নয, জ্ঞান এবং বাকই মানুষেব আসল শক্তি, তখন তাঁবা সেই নব আবিষ্কৃত শক্তিব নাযকত্ব অর্পণ কবলেন দেবীব হাতে; স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তবীক্ষেব বাগেদবী হলেন যথাক্রমে ভাবতী, ইলা ও সবস্বতী। ঋগ্বেদেব দশম মণ্ডলেব দেবীসূক্ত নামে বিখ্যাত ১২ নং সূক্তেব বক্তা বাগেদবী ঘোষণা কবছেন যে তিনিই সমগ্র বিশ্বেব অধিশ্ববী, পৃথিবীব সমস্ত কর্মেব কর্ত্রী, বল বুদ্ধি ও জ্ঞানেব অধিষ্ঠাত্রী এবং সমস্ত ভূবনেব জনযিত্রী।

এ সবেব পব আমবা বৈদিক সাহিত্যে নাবীকে উপেক্ষিতা বলতে পাবিনা এবং তাই ইন্দ্র আদি দেবতাদেব স্ত্রীদেব নাম উল্লেখ না থাকাটাকে বৈদিক সমাজেব পুরুষ প্রাধান্যেব দ্বাবা ব্যাখ্যা কবা ভুল হবে। পুবাণেব যুগে এসে কিন্তু দেবতাদেব এক একটা পবিবাব বেঁধে দেওযাব চেষ্টা লক্ষ্য কবা যায। অপেক্ষাকৃত নবীন দেবতাবা তো বীতিমত দাবা-পুত্র পবিবাব নিযে সংসাবী। শিবেব পবিবাব সে যুগেব হিসেবে দুই পুত্র দুই কন্যাসহ

বীতিমত 'সুখী পবিবাব'। কন্যাদেব মধ্যে লক্ষ্মী হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুব প্রাধানা মহিষী। বিষ্ণুব অন্য স্ত্রী হিসেবে বৈদিক দেবী সবস্বতী কিন্তু ততটা মানিযে নিতে পাবেনি। তাব নামে 'স্বৈবিণী'ব কলঙ্ক বযে গেছে। ব্রহ্মাকে দাদুব পোস্টে বসিযে দেওযা হযেছে এবং অন্যান্য ছোট বড় দেবদেবীদেবও প্রায প্রত্যেকেবই জুটেছে নির্দিষ্ট ধর্মপত্নী ও প্রাণনাথ। গন্ধর্ব আব অপ্সবাবা অবশ্য এই পবিবাব প্রথাব বাইবেই বযে গেছে এবং তাদেব মধ্যে বযে গেছে ইচ্ছামিলনেব প্রথা। মানুষেব মধ্যে এ জাতীয মিলনেব নাম দেওযা হযেছে 'গন্ধর্ব বিবাহ'। বেদেব যুগে দেব ও দেবপত্নীদেব মধ্যে পববর্তী পুবাণেব যুগেব মত কোনও পবিবাবিক বন্ধনেব অনস্তিত্ব কি এটাই প্রমাণ কবেনা যে, প্রাচীনতব যে সমাজ এই দেবতাদেব সৃষ্টি কবেছিল, তাদেব মধ্যে 'পবিবাব' বলে কোনও কিছু ছিল না ? এঙ্গেলস্ কথিত আদিম সাম্যাবস্থাব এ এক অন্যতম লক্ষণ।

বিবেকানন্দই সম্ভবত বলেছিলেন যে দেবতা মানুষ সৃষ্টি করুন আব নাই করুন, মানুষ নিঃসন্দেহে তাব নিজেব আদলে দেবতাকে সৃষ্টি কবেছে এক অতিমানবরূপে। গরু যদি দেবতাব কল্পনা কবতে পাবত, তবে তাব দেবতাও হত এক অতিগরু। বৈদিক সমাজেব আদি যুগে যখন ইন্দ্র আদি দেবতাবা কল্পিত হযেছিল, তখন মানুষেব মধ্যে পবিবাব প্রথাব সৃষ্টি না হওযায সেইসব দেবতাবাও পবিবাববিহীন বযে গেছেন। এতে অস্বাভাবিকতাব কিছু নেই।

পবিবাবেব অনস্তিত্ব থেকে পবিবাবে উত্তবণ এবং নাবী পুরুষেব যৌন স্বাধীনতা (যথেচ্ছাচাব নয) থেকে পবিবাবেব মধ্যে নাবীব ক্রম–পবাধীনতাব উদাহবণ বেদ ও বেদান্ত থেকে ইতিপূর্বে আমি তোমাকে কিছু দিযেছি। এই সব উদাহবণগুলি অকাট্যভাবে প্রমাণ কবে যে হিন্দু বা যে কোনও সমাজ বলতে আজ আমবা যা মনে কবি, চিবকাল তা ছিল না। সমাজ, সামাজিক সম্পর্ক, বাষ্ট্রব্যবস্থা, কোনও কিছুই স্থানু নয। ঋগ্বেদেব আদি যুগে দেখতে পাচ্ছি, সে সমাজে বর্ণভেদ, সামাজিক বর্ণভেদ, প্রজাব উপবে ধনশালী ও বাজাব আধিপত্য কিংবা সাধাবণ মানুষেব দাসত্ব অনুপস্থিত। পুরুষ সূক্তে চাববর্ণেব সৃষ্টিব কথা বলা হযেছে বটে, কিন্তু পণ্ডিতবা বলেন এটি পববর্তীকালেব সংযোজন। ঋগ্বেদেব দশম মণ্ডলেব এই বিখ্যাত ৯০ নং সূক্তটিতে এক জাযগায বলা হচ্ছে 'সেই যজ্ঞ হতে ঋক ও সামসমূহ উৎপন্ন হল, ছন্দ সকল আর্বিভূত হল, যজু তা হতে জন্ম গ্রহণ কবল।' অর্থাৎ এই সূক্ত বচনাব সমযে ঋক, সাম ও যজুর্বেদেব পৃথকীকবণ হযে গেছে, যা নিঃসন্দেহে অনেক পববর্তীকালেব ঘটনা। এই সূক্তটি ছাড়া ঋগ্বেদেব কোথাও চাবিবর্ণেব কোনও উল্লেখ নেই। দুটি মাত্র বর্ণেব কথা সেখানে বলা হচ্ছে, তা হল আর্য এবং দাস, একটি শ্বেতবর্ণ, অপবটি কৃষ্ণবর্ণ। বলা বাহুল্য বর্ণ শব্দটি এখানে তাব আদি অর্থ বং হিসেবেই ব্যবহাব কবা হচ্ছে। আর্য বর্ণভেদ গোড়ায ছিল এই গাযেব বঙেএব ভেদ। এব আব কোনও সামাজিক অর্থ ছিলনা। অন্য দিকে 'দাস' কথাটিও ছিল গোড়ায জাতিবাচক। ঋগ্বেদে সবত্র অনার্য ভাবতীয আদিম অধিবাসীদেব দাস বা দস্যু বলে বর্ণনা কবা হচ্ছে। ইন্দ্র এই দাসদেব পুবীগুলিকে ধ্বংস কবছেন এবং তাদেব নির্বিচাবে হত্যা কবছেন–এবকম বর্ণনা ঋগ্বেদে ছড়ানো বযেছে। অষ্টমমণ্ডলেব ৪০ নং সূক্তেব ৬নং ঋকটি এই বকম ঃ 'হে ইন্দ্র! প্রাচীন লোকে যেরূপ লতাব শাখা ছেদ কবে, সেরূপ তুমি সমস্ত শত্রুদেব ছেদ কব। দাসেব বল বিনাশ কব। আমবা ইন্দ্রেব অনুগ্রহে এ দাস কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ ভাগ কবে নেব।'

এই দাস ইংরেজীতে যাকে 'স্লেভ' বলে তা নয়, কারণ সেই দাসপ্রথায় দাসকে বিনাশ করে তার সংগৃহীত অর্থ ভোগ করার প্রশ্ন ওঠে না–দাসই সেখানে সম্পদ সৃষ্টির যন্ত্র। তোমাকে আগেই বলেছিলাম দাস ব্যবস্থায় মানব সমাজের একটা 'অগ্রগতি' হল এই যে বিজেতারা আর বিজিতকে পাইকারিভাবে মেরে ফেলত না, বিজিতকে নিয়ে যেত বন্দী করে 'উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য' উৎপাদনের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে। ঋগ্বেদের ইন্দ্র কিন্তু পুরীগুলিকে ধ্বংস করেন, দাসদের মেরে ফেলেন এবং লুণ্ঠিত ধন 'নিজেদের মধ্যে ভাগ করে দেন।' এটা দাস প্রথার লক্ষণ নয়, বরং এই 'ভাগ করে দেওয়ার' কথায় বোঝা যায় যে ইন্দ্র ছিলেন সমর নায়ক, দলপতি বা 'গোষ্ঠীপতি মাত্র,' নরপতি নন –লুণ্ঠিত দ্রব্যে তাঁর একার অধিকার ছিলনা, অর্থাৎ সেই সমাজে অভ্যন্তরীণ সাম্য ছিল।

পশুপালক যাযাবর আর্যরা যখন ভারতবর্ষে এল, তখন তাদের আদৌ কোনও উন্নতমানের উৎপাদন ব্যবস্থা জানা ছিল না, সে তুলনায় অনার্য আদিবাসীরা ছিল অনেক সভ্য। তাদের পুরী বা নগরীগুলিই তার প্রমাণ, আর ইন্দ্র যে সেই নগরীগুলিকে ভেঙে ফেলেছে, দখল করেনি বা আর্যদের শ্রম নিয়োগ করে নূতন নগরী বা কোনও উচ্চতর উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলেনি, এটাই অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার সাক্ষী। দাসব্যবস্থার সাথে এ অর্থনীতির সম্পর্ক নেই।

'বর্ণে'র মতই 'দাস' শব্দটিরও ক্রমে অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে, এবং তা ভৃত্য বা সম্পূর্ণরূপ অধীন ব্যক্তির সমার্থক হয়ে উঠেছে। সেই রূপান্তরের কথা পরে বলব। আপাতত ইন্দ্রের 'গোষ্ঠীপতি' চরিত্রটি সম্পর্কে আর একটু বলি। পুরাণের যুগে এসে ইন্দ্র হয়ে গেছেন মহিমাহীন দেবরাজ, কিন্তু বেদে তিনি মহা পরাক্রমশালী নেতা, কখনওই রাজা নন। তিনি 'দেবগণের মধ্যে প্রথম', তিনি 'নেতৃশ্রেষ্ঠ', 'সমস্ত দেবগণ তাঁকে একমতে অগ্রণী করেছেন, ইত্যাদি বর্ণনা ঋগ্বেদে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র। প্রথম মণ্ডলের ১০০ নং সূক্তের ১৮ নং ঋকে আছে যে ইন্দ্র তাঁর 'শ্বেতবর্ণ মিত্রদের সঙ্গে ক্ষেত্র ভাগ করে নিলেন,' ১০২ নং সূক্তে পাচ্ছি, 'হে ইন্দ্র, তুমি সংগ্রামে শত্রু বিজয়ী এবং বিজিত ধন অবরুদ্ধ করে রাখনা,' এবং ১০৩ নং সূক্তে ঋষি বলছেন, 'তিনি গো এবং অশ্ব লাভ করেছেন, তিনি শস্যসমূহ ও জলসমূহ এবং বনসমূহ লাভ করেছেন। শূর ইন্দ্র যজ্ঞ বিহীন লোকদের নিকট হতে সে ধন নিয়ে যজ্ঞ পরায়ণদের মধ্যে তা ভাগ করে দেন'।

এই সব বর্ণনা থেকে ইন্দ্রের যে ছবি আমরা পাই, তা হল এই যে তিনি সকলের দ্বারা নির্বাচিত একজন প্রধান এবং তাঁর বিজয়লব্ধ ধন সম্পদ সকলের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়, তিনি নিজের জন্য তা 'অবরুদ্ধ করে রাখেন না'। ঋগ্বেদের প্রায় সর্বত্র ইন্দ্র তাই ধনের বন্টনকারী রূপে স্তুতি লাভ করেন। বলা বাহুল্য এই সাম্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। ভারতবর্ষের মত এই রত্নগর্ভা দেশে এক বিজেতা, বলদর্পী ও ধনগৃধনু জনগোষ্ঠীর পক্ষে সাম্য বজায় রাখা সম্ভব ছিলনা। যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে একদিন তারা স্থায়ী হয়ে বসল, সম্পদও ক্রমে উপছে উঠতে লাগল, আর সমাজে শুরু হয়ে গেল সম্পদের কেন্দ্রীভবন। ধনী ব্যক্তি ও রাজার প্রাদুর্ভাব ঘটল, আর তারই সঙ্গে উৎপত্তি হল দারিদ্র্য ও দাসত্বের। নারীর স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল ব্যাভিচার। আদি বৈদিক সমাজের সাম্য ঘুচে গিয়ে তার বিদ্বেষ, অসূয়া, ধনলিপ্সা ও বলপ্রয়োগের নীতিই সমাজকে ক্রমে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। এই রূপান্তরের ছবি বেদ ও উপনিষদেই রয়েছে।

লক্ষ্য কর 'হিন্দুত্ব ওয়ালা'রা রামরাজত্বের কথা বলে, কিন্তু তাদের মুখে কখনও আদি বৈদিক যুগের বর্ণভেদ ও বর্গভেদহীন আদিম সাম্যাবস্থার দিনগুলির জয়গান শোনা যায় না। 'সকলের মধ্যে ধন বন্টন করে দেওয়া'র বৈদিক প্রার্থনায় এদের সায় নেই। এরা বরং এখন সকলের সম্পত্তি পাবলিক সেকটরকে মুষ্টিমেয় ধনপতি টাটা বিড়লাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার আওয়াজ তুলেছে। সেটাই নাকি হবে রাম রাজত্ব!

॥ ষোল ॥

কাল তোমার চিঠি পেলাম। লিখেছ আমি বেদের পক্ষে না বিপক্ষে, তা তুমি বুঝে উঠতে পারছ না। তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, বালক ব্রহ্মচারী যে বলে থাকেন যে বেদে সাম্যের কথা আছে, আমার মতও কি সেই রকম?

তোমার অভিযোগের জবাবে বলব, আমি বেদের পক্ষেও নই, বিপক্ষেও নই। আমি বেদের বাস্তব মূল্যায়নের পক্ষপাতী। বেদ একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ সমাজের অস্তিত্ব, কর্মকাণ্ড ও চিন্তাভাবনার দর্পণ। সেই সমাজের মানব গোষ্ঠীকে টিকে থাকার জন্য তার পরিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে অহরহ যে লড়াই করতে হয়েছিল, তাদের চিন্তায় ও কল্পনায় তার যে প্রতিফলন ঘটেছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই সব চিত্তকর্ষণের ফলে যে কাব্য দর্শন ও বোধের অঙ্কুরোদগম হয়েছিল, সমগ্র বেদ সেই বিচিত্র ইতিহাসের এক অসাধারণ দলিল। ভারতবর্ষে আর্য আগমনের কোলাহলপূর্ণ রক্তাক্ত দিনগুলি এবং তার পরবর্তী যুগে এদেশের নদী-স্তন্য লালিত কৃষি ক্ষেত্রে তাদের ক্রমশ বসতিস্থাপন ও সভ্যতার বিস্তারের ইতিহাস বৈদিক সাহিত্যে মুখর হয়ে আছে। হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে সে ভাষা অস্পষ্ট, কিন্তু কান পাতলে তার কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়।

বেদের এই ইতিবাচক মূল্যকে মানতেই হবে। কিন্তু সেই সমাজের প্রথা ও সংস্কারগুলি আজ অচল হয়ে গেছে। যম-যমী কিংবা উর্বশী-পুরুরবার দিনগুলি আর ফিরে আসবে না। আগুন আবিষ্কারের পর হাজার হাজার বছর ধরে 'অগ্নি' যে মহিমাময় দেবতার স্থান অধিকার করেছিল এবং ফলে সেই অগ্নিযজ্ঞ মানুষের সমস্ত ধন ও সাফল্যের উৎস রূপে পরিগণিত হয়েছিল, আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে সে সব একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে। বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই যজমানের ধন সম্পদবৃদ্ধি, আরোগ্যলাভ, পুত্র পৌত্রাদির জন্য, রাজ্য জয় ইত্যাদির কামনায় উচ্চারিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য আগুন জ্বালিয়ে মন্ত্র পাঠ করে এই সব অভীষ্ট লাভ করা যায়, আজকের দিনের কোনও সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ তা ভাবতেও পারেন না। সুতরাং এই হোম যজ্ঞাদি এখন যা আছে তা অনুষ্ঠান মাত্র। এই আচারগুলিকে বা এই ধর্মবিশ্বাসগুলিকে যদি আজ অর্থনীতি বা রাজনীতির বাস্তব কর্মকাণ্ডের মূল নিয়ামক করে তোলার চেষ্টা করা হয়, তবে তা হবে বাতুলতা মাত্র।

ভারতবর্ষের আজকের দিনের মানুষের বাস্তব অভীষ্ট কী? নানা জাতি ধর্ম ভাষা সম্প্রদায় মিলে এক সুখী ও সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে তোলাই তো? সেই অভীষ্ট সিদ্ধিতে নানা মত ও পথের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, কিন্তু এ সবের ওপরে 'হিন্দুত্ব ওয়ালা'রা যে ধর্মীয় বিশ্বাসকে স্থান দিতে চাইছে, তা একেবারেই চলতে পারে না। বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের যুগের চিন্তা ভাবনা, আচার আচরণগুলি সেই যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং তখনকার

দিনে ঐ সব ক্রিয়া কর্মই ছিল জরুবি। উদাহবণ স্বরূপ ঋগ্বেদে দেখবে তাব সমগ্র তৃতীয় মণ্ডলেব ঋষি অর্থাৎ বচযিতা হচ্ছেন বিশ্বামিত্র ও তাব বংশীযগণ, আব সপ্তম মণ্ডলেব ঋষি হলেন বশিষ্ঠ ও তদ্বংশীযগণ। সেখানে দেখবে এই দুই ঋষিব মধ্যে প্রচণ্ড বৈবিতা বযেছে এবং এক জন আব একজনকে শাপশাপান্ত কবছেন! কেন? না, বিশ্বামিত্র ছিলেন ভবত বংশীযদেব পুবোহিত, আব বশিষ্ঠ ছিলেন সুদাস বাজাব পুবোহিত। এখন, ভবত, যদু, মৎস প্রভৃতি দশটি বাজগোষ্ঠী সুদাসেব বিরুদ্ধে অভিযান কবেছিল এবং উভয পুবোহিতই মন্ত্রোচ্চাবণ ও যজ্ঞেব দ্বাবা নিজ নিজ যজমানকে বিজযী কবতে চেযেছিলেন। বিশ্বামিত্রেব 'মন্ত্র বলে' ভবতবা অলংঘ্য নদী অতিক্রম কবেছিল, আব বশিষ্ঠেব 'মন্ত্র বলে জযী হযেছিল সুদাস। সুদাস এই যুদ্ধজযেব পুবস্কাব স্বরূপ বশিষ্ঠকে দু'শত গরু, দুখানি বথ ও চাবটি ঘোড়া দান কবেছিল, ৭ম মন্ডলেব ১৮নং সূক্তেব ২২ নং ঋকে বশিষ্ঠ সে কথা স্পষ্টভাবে বলছেন। যাগযজ্ঞ ও মন্ত্র উচ্চাবণেব ফলে বাজাদেব জয হয, এই বিশ্বাস অত্যন্ত তীব্র থাকায সুদাস বশিষ্ঠকে পুবস্কৃত কবেছিল। আজকেব দিনে, ধব যদি পাকিস্তানেব সঙ্গে ভাবতেব যুদ্ধ হয, তবে কি জযেব আশায যজ্ঞ ও মন্ত্রোচ্চাবণেব জন্য ভাবতবর্ষেব মন্ত্রীমণ্ডলী বা প্রধানমন্ত্রী পুবোহিতেব শাবণাপন্ন হবেন? বেদেব পক্ষ বা বিপক্ষে থাকাব প্রশ্ন এটা নয। বেদ এক পুবাতাত্ত্বিক সম্পদ, কিন্তু আজকেব যুগে তা প্রাসঙ্গিক নয। গীতা, বামাযণ, মহাভাবত সম্বন্ধেও এই একই কথা।

বেদেব আদি যুগেব আদিম সাম্যাবস্থাব কথা আমি বলেছি বটে, তাই বলে আমি বালক ব্রহ্মচাবীব শিষ্য নই। আমি মনে কবিনা যে আজকেব যুগে যাকে আমবা কমিউনিজম বলি, বেদে কোথাও তা পাওযা যাবে। কাবণ, বেদেব যুগ আব আজকেব জটিল সমাজব্যবস্থা একেবাবেই ভিন্ন। বেদেব আদি যুগে এক ধবনেব প্রাকৃতিক সাম্য ছিল, তখনও শ্রেণীভেদ, বর্ণভেদ, বর্গভেদ গড়ে ওঠেনি, বা উঠলেও পুবো বিকশিত হযনি। আজকেব সমাজে অত্যন্ত জটিল শ্রেণীভেদ পাকা হযে বসেছে এবং তাকে উচ্ছেদ কবাই বর্তমান কমিউনিজমেব লক্ষ্য। বেদেব যুগে অন্তত আদিতে এ জিনিস ছিলই না, তাই তাকে উচ্ছেদ কবাবও প্রশ্ন ছিল না। আজকে আমবা যে সাম্যবাদেব কথা বলি তা একটা লড়াই,—তাব একদিকে বযেছে সাম্রাজ্যবাদ, টাটা বিড়লা ইত্যাদিবা; অন্যদিকে শ্রমিক, কৃষক, সাধাবণ মানুষেব দল। বেদেব যুগে এসব কি ছিল নাকি? আমবা আজ অসাম্য থেকে সাম্যে যেতে চাইছি, আব বেদে ঠিক তাব উল্টো প্রক্রিযাব ছবি বযেছে। সেখানে সাম্য থেকে অসাম্যে উত্তবণ ঘটছে। বেদেব সাম্যেব সঙ্গে একালেব সাম্যভাবনাব এখানেই একটা মৌলিক পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদেব নবম মণ্ডলেব ১১২ নং সূক্তটি উদ্ধৃত কবছি, তাতে তৎকালীন সমাজেব গতিপ্রকৃতিটি বোঝা যাবে। শিশু নামক ঋষি বলছেন ঃ

'হে সোম। সকল মানুষেব বৃত্তি এক প্রকাব নয। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিব কার্যও ভিন্ন ভিন্ন, আমবা সকলেই নানা ধবণেব কাজ কবি। দেখ, তক্ষ কাষ্ঠ তক্ষণ কবে, বৈদ্য বোগেব প্রার্থনা কবে, স্তোতা যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিব অন্বেষণ কবে। অতএব, তুমি ইন্দ্রেব জন্য ক্ষবিত হও।

'দেখ, শুষ্ক বৃক্ষ শাখা, পক্ষীব পালক ও শান দেবাব জন্য উজ্জ্বল পাথব,এ কটি জিনিস নিযে কর্মকাব বাণ প্রস্তুত কবে সেই বাণ ক্রয কবাব উপযুক্ত কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তিব অন্বেষণ কবে। অতএব হে সোম, ইন্দ্রেব জন্য ক্ষবিত হও।

'দেখ, আমি স্তোত্রকার পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জনে নিরতা। আমরা সকলে ভিন্ন কর্মে নিযুক্ত আছি। গাভীগণ যেরূপ গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, আমরা সেরূপ ধন কামনাতে তোমার পরিচর্যা করছি' অতএব হে সোম, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

'বহন ক্ষম ঘোটক সুগঠিত রথে যোজিত হতে ইচ্ছা করে, নর্মসচিবেরা হাস্য পরিহাস কামনা করে, পুরুষ কামিনীকে প্রার্থনা করে, ভেক জলের কামনা করে। অতএব হে সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।'

সোম স্তুতির আড়ালে এই বাস্তবধর্মী কবিতাটিতে সেকালের সমাজের এক চমৎকার চিত্র আমরা পাই। এই সমাজের মানুষ দেবতাদের পরিবারহীন গোষ্ঠী জীবনকে অনেকটা দূর পিছনে ফেলে চলে এসেছে। আদিম সাম্যাবস্থায় যেখানে সকলেই গোষ্ঠীর জন্য কাজ করে এবং সকলের সাধারণ ধন সম্পদ সকলে ভাগ করে নেয়, এখানে তা অনুপস্থিত। এখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ও পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে, ছুতার বৈদ্য স্তোত্রকার কর্মকার প্রভৃতি বৃত্তির বিভিন্ন মানুষ তাদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুসরণ করে জীবিকা অর্জন করছে। লক্ষ্য করার বিষয়, এই সমাজে শ্রেণী ভেদ শুরু হয়েছে কিন্তু পরবর্তী হিন্দু সমাজের কলঙ্কময় বৈশিষ্ট্য বৃত্তি অনুসারে জাতিভেদ প্রথার তখনও সূত্রপাত হয়নি। স্তোত্রকারের পুত্র বৈদ্য এবং কন্যা যবভর্জনকারিণী, ব্রাহ্মণ বৈদ্য শূদ্রের কোনও প্রভেদ এখানে দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে তার পণ্য বিক্রি করছে, এমন কি স্তোত্রকারও ধনী যজমানের অন্বেষণ করেছে। সমাজে এই ভাবে ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। নর্মসচিব অর্থাৎ মোসাহেবের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে যে এক অবসরভোগী বিলাসপ্রিয় উচ্চবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এই যুগে ঘটে গেছে।

এই শ্রেণীভেদের তীব্র রূপ বর্ণনা করা হচ্ছে দশম মণ্ডলের ১১৭নং সূক্তে। মজার ব্যাপার হল এই সূক্তটিতে দানের প্রশংসা ও ক্ষুধাতুরকে ক্ষুধার্ত রেখে যে নিজের আহার করে তার নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু এই 'ধর্মোপদেশের আড়ালে যে বাস্তব সত্য ধরা পড়েছে তা হল 'প্রাণঘাতিনী ক্ষুধা'য় আতুর ব্যক্তির 'বর করে ভিক্ষা'র ছবিটি। এই সত্যবাদী কবি আরও কি বলছেন শোন ঃ

'যার এক অংশ মাত্র সম্পত্তি থাকে, সে দু অংশ সম্পত্তির অধিকারীকে উপাসনা করে, আর যার দু অংশ আছে সে তিন অংশ বিশিষ্টের পশ্চাদ্বর্তী হয়। চতুরংশবান আবার তাদের উপরে স্থান গ্রহণ করেন। এইরূপ অগ্রপশ্চাৎ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে।'

এই শ্রেণী ভেদের অকপট উল্লেখের পাশাপাশি তার পক্ষে যুক্তিও উপস্থিত করা হচ্ছে ঃ 'আমাদের দু হস্ত সমানাকৃতি বটে কিন্তু ধারণ ক্ষমতা সমান নয়। এবার আমি উলটে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ঃ বেদোক্ত এই যে শ্রেণীভেদ এবং তার হয়ে এই যে সাফাই, তুমি এর পক্ষে না বিপক্ষে ?

॥ সতের ॥

সেদিন ডাক্তাববাবু এসে বললেন, 'কি হে, তোমাদেব মল্লাবেব আলাপ তো শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু বাইবে তুমুল ঝড় কোথায় ? তোমাদেব সবই তো এক তবফা ব্যাপাব দেখছি। বাছাধনদেব তো কোথাও দেখতে পাচ্ছিনা।'

বুঝলাম ডাক্তাববাবু নির্বাচনেব কথা বলছেন। সেই যে গত এক চিঠিতে, তোমাকে লিখেছিলাম বাইবে নির্বাচনেব তুমুল ঝড়েব সঙ্গে সঙ্গতি বেখে আমাদেব নিজেদেব মধ্যে আলাপ মল্লাবেব আলাপেব মত বাজতে থাকবে, উনি সেই প্রসঙ্গটা টানছেন। আমাদেব এসব এলাকায দেখা যাচ্ছে বামপন্থীবা ভোটেব কাজে নেমে পড়েছে, বাড়ি বাড়ি যাওযা, দেযাল লেখা, মাইক প্রচাব ইত্যাদি চলছে এই গবমে যতটা সম্ভব জোব কদমে। কিন্তু বিপক্ষীযদেব উপস্থিতি বাস্তায ঘাটে বাড়িতে বা দেযালে টেব পাওযা যাচ্ছে না। সে কাবণেই ডাক্তাববাবু বলছেন যে নির্বাচনী ঝড়েব কোনও দেখা নেই।

আমি ওঁকে বললাম যে এটা আপাত দৃশ্য। ঝড় উঠেছে, সাবা ভাবতবর্ষ জুড়ে বেশ প্রবল বেগেই উঠেছে। একদিকে চল্লিশ বছব ধবে ভাবত শাসনে অভ্যস্ত দলটি 'স্থাযী সবকাবেব' স্লোগান দিযে মাঠে নেমে পড়েছে। ওঁদেব নেতা মন্দিবে দবগায যাচ্ছেন, আবাব সেই পুবনো নেহরুব কাযদায জনসাধাবণেব দিকে মালাও ছুঁড়ে দিচ্ছেন, কখনও বাস্তাব পাশেব ন্যাংটো ছেলেটিব গাল টিপে দিচ্ছেন। এই ববাভয মূর্তিব হাতছানিব পবেই আবাব অন্য দিক থেকে আসছে 'হিন্দু বাষ্ট্র' তৈবিব আহ্বান। মুসলমান বিবোধী উত্তেজক বক্তৃতাব ক্যাসেট বাজিযে ও ভিডিও ছবি দেখিযে ওবা গ্রাম গঞ্জে ঘূর্ণিঝড়েব সৃষ্টি কবছে। এবাবকাব নির্বাচনে আব এক ধবনেব মানুষ গুরুত্ব পাচ্ছে। যাদেব এভাবে আগে মাথা তুলতে দেখা যাযনি। এবা বামপন্থী পবিভাষাব 'শ্রেনী সচেতন' মানুষ নয। এবা নিজেদেব 'নিপীড়িত শ্রেণী' বলে জানে না, কিন্তু যুগ যুগ ধবে অবহেলিত 'জাত' বলে জানে। এবা এবাব চোযাল শক্ত কবে দাঁড়িযেছে সংখ্যালঘু উচ্চবর্ণীযদেব বিরুদ্ধে। 'হিন্দুত্ব ওযালা'দেব বিদ্বেষবিষ প্রচাব এদেব স্পর্শ কবছে না, কাবণ তাবা জানে যে হিন্দু ধর্মেব মধ্যে থেকেও তাবা উচ্চবর্ণেব কাছ থেকে কোনওদিন অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই পাযনি। নিম্নবর্ণেব মানুষদেব এই আত্ম–আবিষ্কাব যে সংখ্যালঘু বিবোধী দাঙ্গা ঠেকাতে পাবে, বিহাব তাব প্রকৃষ্ট উদাহবণ।

অতএব ঝড় উঠেছে, কিন্তু এই সব এলোমেলো ক্ষ্যাপা হাওযাব দাপট আমাদেব পত্র পত্রিকাগুলি পড়ে ঠিক বোঝা যাবে না। এই পত্রিকাগুলিই আবাব এই বাজ্যে জোব কদমে নির্বাচনী প্রচাব চালিযে যাচ্ছে। ডাক্তাববাবুব 'বাছাধন'দেব কাজ তো কবে দিচ্ছে এবাই। অথচ দেখ, নির্বাচনী বিধি ভেঙে একদল লোক যে সাম্প্রদাযিকতাব প্রচাব কবে যাচ্ছে, এমন কি নির্বাচনী ইস্তাহাবে বামমন্দিব তৈবি কবে দেওযাব ধর্মীয প্রতিশ্রুতি দিযেছে যা একটি আধুনিক সেক্যুলাব বাষ্ট্রে সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত, এ সম্বন্ধে কী নির্বাচন কমিশন, কী এই 'গণতন্ত্র প্রিয' পত্রিকাগুলি সকলেই নীবব। এবা শুধু সেই সব বাজ্যেব আইন শৃঙ্খলা পবিস্থিতি নিযে অত্যন্ত সবব, যে সব বাজ্যে এদেব প্রিয দলটি বিপাকে পড়তে পাবে বলে তাদেব ধাবণা। তা না হলে পশ্চিমবঙ্গেব মত শান্ত বাজ্যেব আইন শৃঙ্খলা নিযে তাঁদেব এত মাথাব্যথা কেন, অথচ ত্রিপুবা নিযে কোনও কথা নেই। বিহাব

এদের সকলেরই ঘুম কেড়ে নিয়েছে; কারণ, দলিতরা সেখানে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

নিম্ন বর্গের মানুষ যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে, মুষ্টিমেয় উঁচুতলার মানুষদের বিষয় বৈভব ও প্রতিষ্ঠাকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য সে চেষ্টার কখনও বিরতি ছিলনা। তোমাদের 'সনাতন ধর্মের' দেশ ভারতবর্ষ অন্য 'জড়বাদী' দেশগুলির থেকে এ ব্যাপারে একেবারেই আলাদা নয়, কেবল কায়দাটা হল আলাদা। তোমাকে গত চিঠিতে দানস্তুতি বিষয়ক যে সূক্তটির উদাহরণ দিয়েছিলাম, তার মূল কথাটা কী ? দান কর, কেউ যদি অভুক্ত থেকে তোমার কাছে খেতে চায়, তাকে ফিরিয়ে দিওনা, কারণ 'দাতার ধন হ্রাস পায় না', 'যখন কোনও ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যাচঞারব করতে করতে এসে উপস্থিত হয় এবং অন্ন ভিক্ষা করে' তখন নিজে অগ্রে ভোজন না করে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিও। তোমাকে গত চিঠিতে লিখেছিলাম, এই সূক্তে আমরা পাশাপাশি দুটি বিপরীত ছবি পাই, এক দিকে রাস্তায় রাস্তায় 'হা অন্ন! হা অন্ন!' ভিক্ষার রব, এবং অন্যদিকে অল্প ধনী কর্তৃক 'অধিকতর ধনীর উপাসনা।' সূক্তটিতে এই উপাসনার সমর্থন করে বলা হয়েছে, 'যে তোমাকে উপাসনা করে তাকে খুশি কর'। এই ব্যবস্থায় ধনের বিকট বৈষম্য থাকবে, বৃহৎ ধনী, অল্পধনী, দরিদ্র ও ভিক্ষুক থাকবে এবং পাশাপাশি এই বৈষম্যকে সহনীয় করে তোলার জন্য 'দান'ও থাকবে। বিড়লারা সেজন্য দান করে। এতে গরিব থাকবে, 'গরিবি হঠাও' থাকবে, ন্যাংটো দরিদ্র শিশুরা থাকবে এবং থাকবে দিল্লীর তখ্‌ত্‌ থেকে নেমে আসা দেবীপুত্রদের মসৃণ মোলায়েম হাতে ঐ অভুক্ত অবহেলিত শিশুদের গাল টেপা। কিন্তু দেখতে হবে যে সবাই যেন সমান না হযে যায়, সমান ধনবন্টনের কথা বা সমান সুযোগ সুবিধার কোনও দাবি যেন কখনও না ওঠে। তুমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা কব, যৎকিঞ্চিৎ পাবে। দাবি কর না। ঋগ্বেদের উক্ত সূক্তে ঋষি বলছেন, 'আমাদের দু হস্ত পরস্পর সমানাকৃতি বটে, কিন্তু ধারণ ক্ষমতা সমান নয। দুটি গাভী এক মাতার উদরে জন্ম গ্রহণ করলেও সমান দুধ দেয না। দু ব্যক্তি যমজ ভ্রাতা হলেও তাদের পরাক্রম সমান হয় না।' অসাম্যের সাফাই কিভাবে গাওয়া হচ্ছে, সেটা লক্ষ্য কর। কূট যুক্তির দ্বারা মানুষে মানুষে ভেদকে এভাবেই তত্ত্ব আকারে মানুষের মাথায় যুগ যুগ ধরে ঢুকিযে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে পাঁচটা আঙুল কখনও সমান হয় না অর্থাৎ সাম্য জিনিসটা প্রাকৃতিক নয।

অথচ এই বেদের যুগেরই প্রথম দিকে সাম্য ছিল। সাম্য অর্থ সকলের সমান হয়ে যাওয়া নয়, সাম্য অর্থ বৈচিত্র্যহীনতা নয়। প্রকৃতি রাজ্যে প্রতিটি বস্তুর স্বকীয়তা রযেছে-প্রত্যেকের ক্ষমতা আলাদা, প্রত্যেকের সম্ভাবনা অনন্ত। কিন্তু মানুষের জৈবিক প্রয়োজনগুলি এক। প্রত্যেকের ক্ষুধা আছে, জৈব প্রয়োজন আছে, মাথা গোঁজার ঠাই ও লজ্জা নিবারণের অধিকার আছে। মা যেমন প্রত্যেক শিশুকেই সমান স্তন্য দান করে, মাটির কাছে তেমনি প্রত্যেক মানুষেরই সমান দান পাবার অধিকার রয়েছে। তাই সাম্যের নীতি হল : প্রত্যেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী দেবে, প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজন মাফিক। এই নীতি ক্রমে ভেঙে গিয়ে যে অসাম্যমূলক সমাজ বেদের আমলের শেষ দিকে গড়ে উঠেছিল, সেই 'ট্র্যাডিশন' আজও সমানে চলেছে। তাকে ভঙ্গ করতে চাইলেই সমাজের মাথারা প্রমাদ গোনেন।

পশ্চিমবঙ্গেব কথাই ধব। স্বাধীনতাব পব তেলা মাথায় তেল তো কম ঢালা হয়নি, দান খযবাৎও নেহাৎ কম হযনি। দেশেব মানুষেব তাতে যৎকিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি যে হযনি, তা নয, কিন্তু মৌলিক প্রভেদটা সর্বত্র থেকেই গেছে।

অথচ গত চৌদ্দ বছবে এবাজ্যেব ব্যবস্থায একটা মৌলিক পবিবর্তন এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সবকাব কৃষি নীতিকে আমূল পালটে ফেলে ভূমিহীন কৃষক এবং ছোট ও মাঝাবি কৃষককে দানেব পবিবর্তে 'স্বাধিকাব' দেওযাব ফলে, বর্গা–অপাবেশনেব মধ্য দিযে ভাগচাষী জমিতে নিজেব অধিকাব খুঁজে পাওযায এবং পঞ্চাযেতেব স্বাযত্তশাসনেব বলে গ্রামীণ কৃষি ও শিল্পে সাধাবণ মানুষেব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায এতদিনকাব অবহেলিত কৃষি যে নবজীবন লাভ কবেছে, এ বাজ্যেব অনেক দোষ সত্ত্বেও তা অস্বীকাব কবাব উপায নেই। ববাববেব খাদ্যে ঘাটতি বাজ্য পশ্চিমবঙ্গ আজ অন্য বাজ্যে বপ্তানী কবছে, চাল উৎপাদনে সাবাদেশে প্রথম হযেছে, এতবড় বিস্ময়কব খববটা তুমি 'বহুল প্রচাবিত' দৈনিকগুলিতে সহজে খুঁজে পাবেনা। দাঁড়েবাই যে নৌকো টানে ববীন্দ্রনাথেব সেই 'বড় খববটা' চেপে বাখা হযেছে, কাবণ তাতে পালেব গুমোব নষ্ট হযে যাবে। কিন্তু সত্যকে কি চাপা দিযে বাখা যায ? আমাদেব মফঃস্বল শহবেব প্ল্যাটফর্মগুলি আগে বাবো মাস ভিখিবিতে গিসগিস কবত, বন্যায খবায বাড়ি বাড়ি অনাহাবী 'ক্ষুধাতুব' ব্যক্তিবা 'যাচঞা বব কবতে কবতে' এসে উপস্থিত হত সেই বৈদিক ট্র্যাডিশনেব ধাবা বেযে। আমবা বাঁ হাতে দু এক পযসা দান কবে কৃতার্থ বোধ কবতাম। আজ আব তাদেব দেখতে পাওযা যায না, আব তাবই ফলে 'বহুল প্রচাবিত' পত্রিকা আব উঁচু তলাব লোকদেব দারুণ ক্রোধ। কাবণে অকাবণে প্রতিদিন বামফ্রন্টেব বিরুদ্ধে বিষ ঢেলে দিচ্ছে। নির্বাচন পর্যন্ত এই ক্রোধ তুঙ্গে থাকবে।

নির্বাচনেব আব মাত্র দিন দশেক বাকি। বাবে বাবেই তাই চিঠিতে ঐ প্রসঙ্গ চলে আসছে। বাড়িব পাশেই এখন মাইকে নির্বাচনী প্রচাব চলছে। তাই আজ চিঠি আব বড় না কবে ধনস্তুতি কিভাবে বাজস্তুতিতে পবিণত হল, ঋগ্বেদ থেকে তাবই একটি উদাহবণ দিযে আজকেব আলোচনা শেষ কবব। ঋগ্বেদে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে সংযোজিত একটি মন্ত্র দশম মণ্ডলেব ১৭৩ নং সূক্ত। তাতে বলা হচ্ছে ঃ

'হে বাজন! তোমাকে বাজপদে আবোপিত কবলাম। তুমি এই জনপদেব মধ্যে প্রভু হও, অটল অবিচলিত ও স্থিব হযে থাক। সকল প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমাব বাজত্ব যেন নষ্ট না হয। তুমি এ স্থানেই পর্বতেব ন্যায অবিচলিত হযে থাক, বাজ্যচ্যুত হযো না।'

এখনকাব দিনে আব পুবোহিত নয, পত্রপত্রিকা আব ধনিকশ্রেণীব প্রতিভূবা এই 'স্থাযিত্বে'ব মন্ত্র আওড়ান। এই স্থাযী প্রভুত্বেব অর্থ যে স্থাযী শোষণ, বেদেব মন্ত্র বচযিতা সে কথাটাকে খুব গোপনও কবেন নি। তিনি বলছেন, 'অক্ষয হোমদ্রব্য পেযে ইন্দ্র এ নবাভিষিক্ত বাজাকে আশ্রয দিযেছেন। সোম তাকে আশীর্বাদ কবেছেন। ব্রহ্মণস্পতি আশীর্বাদ কবেছেন। ইন্দ্র তোমাব প্রজাদেব একাযত্ত ও কব প্রদানোন্মুখ কবেছেন।' বাজাব অভিষেকেব এই বৈদিক মন্ত্রটিতে কোথাও প্রজাব প্রতি বাজাব কর্তব্যেব কথা বলা নেই। এই মন্ত্রে শুধু বযেছে বাজাব অটল বাজত্ব, প্রজাদেব ওপব বাজাব একচ্ছত্র অধিকাব ও প্রজাদেব 'কব প্রদানোন্মুখ' হওযাব প্রার্থনা। ইন্দ্র যিনি নিজে কখনও বাজা ছিলেন না,

যিনি সকলেব মধ্যে প্রাপ্ত ধন বন্টন কবে দিতেন, তাঁকেই সাক্ষী মেনে শেষ পর্যন্ত উত্তববৈদিক ঋষি বাজাকে সমস্ত ধনেব প্রভু কবে দিলেন। ইন্দ্র, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, সকলে মিলে বাজাব প্রভুত্ব স্বীকাব কবে নিল। ববীন্দ্রনাথেব ভাষায় 'কুলপতি'ব জাযগায 'নবপতিব' আসন পাকা হযে বসল। বৈদিক সাহিত্যে সেই রূপান্তবেব যে কাহিনী তোমায বলতে শুরু কবেছিলাম, আজ এখানে তা শেষ হল। এবাবে আমবা বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদেব যুগে একটু উঁকি মেবে দেখব। আজ নয, পবেব বাবে।

॥ আঠার ॥

এইমাত্র আমাদেব বাড়িব পাশ দিযে কিছু ছেলে দুটো গাড়িতে হৈ হৈ কবতে কবতে চলে গেল। তাবা শ্লোগান দিচ্ছিল 'লাল হঠাও, দেশ বাঁচাও'। তাবা 'বাম, বোটি, ইনসাফ'-এব নামে পদ্মফুলে ছাপ দেবাব কথা বলছিল। বাম কেন? না, তিনি নাকি জাতীয নেতা, ঐ এক বাম নাম আমাদেব জাতীয মর্যাদা দিযেছে এবং ঐ নামেই নাকি আমাদেব জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পাবে। বামকে তো আমবা মহাকাব্যেব নাযক বলেই জানি এবং এও জানি যে হিন্দুদেব কাছে বাম বিষ্ণুব অন্যতম অবতাব বলে পবিচিত। বাম ছাড়াও বিষ্ণুব অন্য অবতাব আছেন, যেমন মৎস, কূর্ম, ববাহ ইত্যাদি। বাম ছাড়া অন্য যে অবতাব হিন্দু জন মানসে অত্যন্ত প্রভাবশালী, তিনি হলেন কৃষ্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব 'কৃষ্ণ চবিত্র' গ্রন্থ শুরু কবেছিলেন এই বলে যে, 'ভাবতবর্ষেব অধিকাংশ হিন্দুব, বাঙালাদেশেব সকল হিন্দুব বিশ্বাস যে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্ববেব অবতাব।' এই কথা থেকে বোঝা যায যে অবতাব সম্বন্ধে হিন্দুদেব মধ্যেও মতভেদ আছে, সকল বাঙ্গালী হিন্দুব কাছে যিনি অবতাব, বঙ্কিমচন্দ্রেব মতে তিনি অধিকাংশ ভাবতীয হিন্দুব কাছে অবতাব, সকলেব কাছে নয। সত্যি কথাই, আমবা হিন্দি বলযে বহু উগ্র বাম ভক্ত দেখেছি, যাদেব কাছে 'বাধাকৃষ্ণ' বললে ক্ষেপে ওঠে। মনে নেই, আমবা আমাদেব স্কুলেব দপ্তবি, শিউপুজনকে 'বাধেকৃষ্ণ' বলে খেপাতাম, আব কি প্রচণ্ড ক্রোধে সে আমাদেব অশ্লীল গালাগাল দিত? আসলে আমবা ঐ গালাগালটাই উপভোগ কবতাম। বাম বা কৃষ্ণেব কোনও কিছুই বুঝতাম না। বিষ্ণুব নবম অবতাব হিসেবে বুদ্ধকেও স্থান দেওযা হযেছে, দশম অবতাবেব এখনও জন্ম হযনি, তিনি হলেন কল্কি।

বুঝতেই পাবছ এই অবতাববাদ বুদ্ধ পববর্তী যুগে গড়ে উঠেছিল, বৌদ্ধধর্মকে হঠিযে তখন আমাদেব দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে পাকা কবে তোলা হচ্ছে। 'হিন্দুধর্ম' কথাটাব তখনও উৎপত্তি হযনি, ও নামটা অনেক পবেব যুগেব। পাবস্য দেশীয মুসলমানবা সিন্ধু নদীব নাম অনুসাবে ভাবতবর্ষকে নাম দিযেছিল 'হিন্দুস্থান', ওবা 'স' উচ্চাবণ কবতে পাবত না;—এসব কথা তো তুমি জানই। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। আমাদেব দেশে নানা জন-জাতিব নানা মানুষেবা ঈশ্ববকে নানা রূপে পুজো কবত। আদিবাসী মানুষদেব মধ্যে মাছ, কচ্ছপ, শুযোব প্রভৃতিব পুজো প্রচলন ছিল, এখনও তাই আছে। অনেকে বুদ্ধেব আবাধনা কবতেন, কেউ বামেব, কেউ কৃষ্ণেব। এই সব নানা ধবণেব উপসনাকে এক ছত্রতলে আনাব কৌশল হিসেবে এদেব সবাইকে ঈশ্ববেব অবতাবত্বেব মহিমা দান কবা হযেছিল। তাতে তোমাব সেই বৈদিক সূত্র 'একম্ সৎ, বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'বও প্রযোগ

সম্ভব হয়েছিল। নিজ নিজ উপাস্যকে আরাধনা করেই সকলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছিল, কাউকেই নিজের দেবতাকে পরিত্যাগ করতে হচ্ছিল না। স্বীকার করতেই হবে, পরবর্তীকালে যা 'হিন্দু ধর্ম' বলে পরিচিত হয়েছে, তার এই পদ্ধতিটি ধর্ম প্রসারের কৌশল হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য। শুধু বিষ্ণুর নানা অবতারের ধারণা নয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—তিন প্রধান দেবতার কল্পনার দ্বারাও ব্রহ্মাবাদী, বৈষ্ণব এবং শৈব—ভারতবর্ষের নানান উপাসকের মধ্যেই একটা সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং ভারতবর্ষে মুসলমান আগমনের আগে যদি কোনও ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনার প্রয়াস ঘটে থাকে, তবে তার কৃতিত্ব সেই সমন্বয়বাদীদের। রাম সেই সমন্বয় উপাদানের মধ্যে একটি অংশ মাত্র। রামের নামে 'সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল,' এই উক্তি সর্বৈব মিথ্যা। রাম ভারতবর্ষের অন্য ধর্মাবলম্বীদের তো নয়ই, হিন্দুদেরও সকলের প্রধান উপাস্য নন। বিষ্ণুর নানা অবতার তো আছেনই, তার ওপর শিব, দুর্গা, কালি, ধর্মঠাকুর, মা মনসা,–এই তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে আরও কত যে কে আছেন, তার ইয়ত্তা নেই। রামকে হিন্দীভাষীদের মধ্যে বিশাল এলাকায় এক প্রধান উপাস্য অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্বটি তুলসীদাসের প্রাপ্য, রাধাকৃষ্ণকে উপাস্যরূপে বিপুল জনপ্রিয়তা দানের কৃতিত্ব যেমন শ্রী চৈতন্যের। তুলসীদাস যদি 'রামচরিত মানস' রচনা না করতেন, তা হলে বাল্মীকির রাম এক অসাধারণ মহাকাব্যের নায়ক থেকে যেতেন, পুজোর আসনে এমন ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পেতেন না।

এই প্রসঙ্গে আমি হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুবাদিত বাল্মীকি রামায়ণের অখণ্ড ভারবি সংস্করণ থেকে প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয়ের লেখা ভূমিকার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি। মহাভারত ও রামায়ণের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে মহাভারতেব স্থান হচ্ছে বেদ ও পুরাণ সংগ্রহের মধ্যস্থলে। তাই মহাভারতকে যেমন পঞ্চম বেদ বলে অভিহিত করা হয়, তেমনি তাকে আদি পুরাণ বলেও বর্ণনা করা যায়।...মহাভারতেই দেখা যায়, এই গ্রন্থ বেদ, ইতিবৃত্ত, আখ্যান, ইতিহাস, সংহিতা, পুরাণ, কাব্য ইত্যাদি বহু বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে এই নামগুলির কোনওটাই নিরর্থক নয়...।' এর দু'তিন অনুচ্ছেদ পরে ভূমিকার ২নং অধ্যায় তিনি আরম্ভ করছেন এই বলে ঃ 'রামায়ণকে কিন্তু বেদ, পুরাণ, সংহিতা, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করার রীতি নেই।

...রামায়ণ একজন ব্যক্তি বিশেষের রচনা বলেই স্বীকৃত। সে রচনার প্রকৃতি সম্বন্ধেও দ্বিমত নেই। কেননা বাল্মীকি হলেন ভারতবর্ষের আদি কবি এবং রামায়ণ আদিকাব্য একথা সর্বস্বীকৃত। মহাভারতের অনেক অংশ সম্ভবত রামায়ণের পূর্ববর্তী এবং তাতেও অতি উঁচুদরের কাব্য আছে। কিন্তু ব্যাসদেবকে কখনও কবির আসন দেওয়া হয়নি......। রামায়ণই যে আদি কাব্য তার অন্য প্রমাণ এই যে এর প্রত্যেকটি কাণ্ড বিভক্ত হয়েছে কতকগুলি সর্গে। এই সর্গ বিভাগই কাব্যের মুখ্য লক্ষণ...রামায়ণের পূর্ববর্তী সাহিত্যে এই সর্গ বিভাগ দেখা যায় না। যেমন ঋগ্বেদের বিভাগ হচ্ছে মণ্ডল এবং মণ্ডল বিভক্ত হয়েছে সূক্তে। মহাভারতের পর্বগুলির যে বিভাগ তার নাম অধ্যায়।'

মুশকিল হল যারা 'লাল হঠিয়ে দেশ বাঁচাতে' চায়, তারা লাল নীল হলুদ সবুজ কোনও কিছুরই খবর রাখেনা, তারা বর্ণান্ধ। আমাদের সংস্কৃতির বিচিত্র বর্ণের কোনও হদিশই

তাদের জানা নেই। রামায়ণ যে ভারতবর্ষের আদি কাব্য ও মহাকাব্য, কোনও পুরাণ বা ধর্মগ্রন্থ নয়, বাল্মীকির মহাকাব্যে রামকে যে একজন মানুষ হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে, দেবতা রূপে নয়, তা এই সব অর্ধশিক্ষিত চিৎকারকারীর দল কখনও পড়ে বিচার করেও দেখেনি। পুরাণ বা ইতিহাস গ্রন্থ বলে বিবেচিত মহাভারতেও রামোপাখ্যান রয়েছে। সেখানে রাম কোনও 'জাতীয় বীর'-নন, একজন ইক্ষাকু বংশীয় নৃপতি মাত্র। মহাভারতের বনপর্বে জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণের এবং পাণ্ডবগণ কর্তৃক দ্রৌপদী উদ্ধারের কাহিনী রয়েছে। যুদ্ধশেষে দ্রৌপদীর প্রত্যাগমনের পর যুধিষ্ঠির কাম্যক বনে মুনি ঋষিদের সঙ্গে বসে তাঁদের ও নিরপরাধিনী সেবাপরায়ণা দ্রৌপদীর দুঃখের কথা আলোচনা করছিলেন। কথোপকথনের মধ্যে যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় ঋষিকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ত্রিকালজ্ঞ, অতএব আপনি কি কখনও আমার ন্যায় হতভাগ্য মনুষ্যকে দর্শন বা নাম শ্রবণ করিয়াছেন ?' এই প্রশ্নের জবাবে মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের ন্যায় হতভাগ্য এক নরপতির উদাহরণ হিসেবে রামচন্দ্রের কথা বলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেন, 'ভগবন্ ! রাম কোন বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার শৌর্যবীর্য পরাক্রমই বা কিরূপ...? তাঁহার সহিত কোন ব্যক্তির শত্রুতা হইয়াছিল'? তৎসমুদয় সবিস্তার কীর্তন করুন।' মার্কণ্ডেয় তখন এই পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করেন। মহাভারতের বনপর্বের ২৭২ থেকে ২৯১ অধ্যায় পর্যন্ত সেই 'রামোপাখ্যান পর্বাধ্যায়' রয়েছে।

লক্ষ্য কর এখানে ঋষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে তাঁর মত 'হতভাগ্য মনুষ্যে'র একটি উদাহরণ হিসেবেই রামের কাহিনী বলছেন এবং রাম এখানে পুরাকালের কোনও এক অজ্ঞাত নরপতি–অন্তত যুধিষ্ঠিরের কাছে এই নরপতির নাম বা পরিচয় একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং একথা বলাই বাহুল্য যে রাম কখনওই ভারতবর্ষের একজন 'জাতীয় নেতা' ছিলেন না। বাল্মীকি এবং পরবর্তীকালে তুলসীদাস তাঁদের অমর কাব্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে রাম চরিত্রটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। কাব্যের কোনও চরিত্র কি কখনও 'জাতীয় নেতা'র পদ পেতে পারে? এক মহাকাব্যের অনুপম চরিত্ররূপে রাম ভারতবর্ষে শুধু হিন্দু নয়, সমস্ত ধর্মের জনসাধারণের মধ্যেই জনপ্রিয়। ভারতবর্ষের বাইরেও বাল্মীকির রামায়ণ ও রাম সুপরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নে রামায়ণ অভিনয় যে কত জনপ্রিয়, তা তো তুমি জানই। বর্তমান ইন্দোনেশিয়াসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম প্রধান দ্বীপময় দেশগুলিতে গণসংস্কৃতিতে রাম যে কী ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তার চমৎকার আলেখ্য তুমি যদি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' পড়ে থাক, তাতে পেয়েছ। সাহিত্যে, নাটকে, সংস্কৃতি চর্চায় রামের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তার সঙ্গে তুমি যদি হিন্দুদের একাংশের মধ্যে অবতার রামের উপাসনার তুলনা কর, তাহলেই বুঝতে পারবে আজ যে মূর্খের দল অবতার রামকে জোর করে 'জাতীয় নেতা' বানাতে চাইছে তাতে ভারতের নানা বিশ্বাসের মানুষকে তা তো আহত করছেই, রামের জনপ্রিয়তাকেও তা খণ্ডিত করছে। যারা রামকে অবতার বলে, নেতা বলে মানে না কিন্তু এক মহাকাব্যিক বীর বলে ভালবাসে, তাদের মধ্যে রামবৈরিতার প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করছে। নিছক নির্বাচনে জেতার স্বার্থে দেশবাসীকে আবেগ ও অনুভূতিগতভাবে বিভক্ত করে ফেলার মারাত্মক এই যে খেলা শুরু হয়েছে, তার ফল কখনও শুভ হতে পারে না। নির্বাচন কয়েক দিনের মধ্যে মিটে যাবে। এই চিঠি যখন তুমি পাবে, পশ্চিমবাংলায় তখন ভোটপর্ব শেষ। তার কয়েকদিন পর থেকে ভোট গণনার মধ্য দিয়ে প্রার্থীদের জয় পরাজয়ের পালা শুরু হবে। এ নিয়ে আমি কিছু ভবিষ্যদ্বাণী

কবতে চাইছিনা। কিন্তু ফলাফল যাই হোক, বহু ধর্ম, বহু বিশ্বাস, নানা আবেগেব অনুবর্তী কোটি কোটি মানুষেব এই দেশে এই যে বিদ্বেষেব সৃষ্টি, তা আগামী দিনে এক ভযংকব সংঘর্ষেব বিপদকে ডেকে আনছে। আবাব দেখ, এই তথাকথিত বামভক্তবা মুখে হিন্দুত্বেব কথা, হিন্দু বাষ্ট্রেব কথা বলছে, কিন্তু অন্যদিকে স্বাধীন ভাবতবর্ষেব প্রথমাবধি বৈবী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেব সঙ্গে দোস্তি বাড়াতে চাইছে। অর্থাৎ এবা যদি কোনওদিন 'হিন্দুবাষ্ট্র' স্থাপন কবতে পাবে, তবে হিন্দুবাষ্ট্র ভাবতবর্ষ আব মুসলিম বাষ্ট্র পাকিস্তান উভযেই হবে মার্কিন সম্রাজ্যবাদেব বন্ধু, আব সাধাবণ হিন্দু আব মুসলমানেবা হবে পবস্পবেব শত্রু। কী চমৎকাব!

মুশকিল হল, বিদ্বেষ ও জোব জুলুমেব বাজনীতি শুভবুদ্ধি ও যুক্তিতর্ককে সামযিকভাবে আচ্ছন্ন কবে ফেলে, সাধাবণ মানুষ এইসব প্রচাবেব ফাঁদে পা দেয। আমাব বাড়িব পাশে ঐসব বিদ্বেষ পবাযণদেব উত্তেজক স্লোগান ও প্রচাব তাই আমাকে খানিকটা বিচলিত কবেছিল। বসেছিলাম তোমাকে আজ উপনিষদ প্রসঙ্গে কিছু বলাব জন্য। কিন্তু লাফিযে চলে গেলাম পবেব যুগে, বামাযণ মহাভাবতেব কালে। পবেব কথা একটু আগে বলা হযে গেল আব কি! তাতে আব ক্ষতি কী? ববং ভালই হল। ভোটেব পবে ফলাফল বেব হওযাব আগে পর্যন্ত কযেকদিন নিরুপদ্রব বিশ্রামেব ফাঁকে বেশ মন দিযে উপনিষদগুলি ঘাঁটাঘাঁটি কবা যাবে। প্রাচীন ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদেব ধাবণাব সত্যমিথ্যাগুলিব যাচাই তাতে সম্ভব হবে।

॥ উনিশ ॥

গত চিঠিতে তোমাকে যখন লিখেছিলাম যে নির্বাচনেব পব কটা দিন নিরুপদ্রব শান্তিতে কাটবে এবং সেই অবসবে উপনিষদগুলি নিযে ঘাঁটাঘাঁটি কবা যাবে, তখন তো আব জানতাম না ভাবতবর্ষেব বাজনীতিতে কি ভযানক বিপত্তি আমাদেব জন্য অপেক্ষা কবছে। ২২ তাবিখে সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাজীব গান্ধীব হত্যাব সংবাদে স্তম্ভিত বিহ্বল হযে গেলাম। এক তরুণ (বাজনীতিকদেব মধ্যে তাঁকে তরুণই বলা চলে) প্রাণবন্ত মানুষেব জীবন আকস্মাৎ এভাবে স্তব্ধ কবে দেওযা কী মর্মান্তিক, কী নিষ্করুণ! বিশেষ কবে মনে পড়ছে, মানুষটি বাজনীতিতে আসতে চাননি। তাঁব দলেব কিছু লোক এক বকম জোব কবে তাঁকে বাজনীতিব কেন্দ্রবিন্দুতে নিযে এসেছিলেন। সেই জোব জববদস্তি এখনও চলছে। বাজীব পত্নী সোনিযাকে কংগ্রেস সভাপতি হওযাব জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি কবা হচ্ছে, এমন কি বাজীবেব চিতা যখন জ্বলছে তখনও ঐ সব 'শোকাকুল' লোকেবা সদ্য বিধবাকে সভাপতি হওযাব জন্য ঘিবে ধবছেন। বাহুল নাকি বলেছে যে কিছু ক্ষমতালোভী মানুষ নিজেদেব ক্ষমতা হাবাবাব ভযে তাব মাকে ঐ পদে বসাতে চায। জানি না, কে কোথায কী বলছে, তবে ভাবতবর্ষেব বৃহত্তম বাজনৈতিক দলেব ঐ একটি পবিবাবেব প্রতি অসহায আনুগত্যই তাব 'অ্যাকিলিস হীল' বা মবণ ছিদ্র। ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতা ও স্থাযিত্বেব শত্রুবা প্রথমে ইন্দিবা গান্ধীকে, পবে তাব পুত্রকে এ কাবণেই হত্যাব লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিযেছে যে তা হলেই ঐ দলটিকে নেতৃত্বহীন ও দিশেহাবা কবে দেওযা যাবে এবং তাদেব ধাবণা তাহলেই ভাবতবর্ষকেও অস্থিতিশীল কবে তোলা যাবে। এবকম না হযে ঐ দলে যদি গণতন্ত্র থাকত, যদি নেতাব চেযে দল

বড় হত, তাহলে আততাযীবা হযতো তাদেব লক্ষ্য হিসেবে এইভাবে একেব পব এক নেতাদেব বেছে নিত না। কাবণ তাবা জানত যে নেতাকে মেবে ঐ দলকে কাবু কবা যাবে না। কিন্তু, দুঃখেব বিষয আমাদেব দেশে ধনতন্ত্রেব বিকাশ যেমন ব্যাহত গতিতে ঘটেছে, বুর্জোযা গণতন্ত্রও হযেছে বিকলাঙ্গ। তাই এদেশে এত হিংসা, এত লাঠিগুলি, দাঙ্গা, মৃত্যু, এত গণতন্ত্রেব টুঁটি টিপে ধবা আব এত ঘনঘন নেতাদেব শহীদত্ব ববণ। এদেশেব শাসক শ্রেণী গণতন্ত্রেব যে একটা কবন্ধমূর্তি তৈবি কবে ফেলেছে তা অহবহ সাধাবণ মানুষেব বং ।ন কবছে এবং কখনও কখনও তাদেব নিজেদেব ঘবেই প্রচণ্ড উৎপাৎ ঘটিযে বসছে এবং তে বক্ত লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী দানবেব স্বার্থসাধনও ঘটছে। তুমি হযতো বলবে এই হত্যাব পিছনে সাম্রাজ্যবাদীদেব হাত থাকাব অভিযোগ নিতান্তই কল্পনা। এ কথা ঠিক সি আই এ–ব হাত সর্বদাই অদৃশ্য থাকে। তাহলেও কঙ্গোব লুমুম্বা, চিলিব আলেন্দে থেকে শুরু কবে বাংলাদেশেব মুজিবব বহমান, ভাবতেব ইন্দিবা পর্যন্ত ঘাতকেব হাতে নিহত প্রায সকল বিশ্বববেণ্য নেতাব মৃত্যুব মধ্যে একটা সাধাবণ সূত্র তুমি লক্ষ্য না কবে পাববে না–তা হল এদেব প্রত্যেকেব প্রতি মার্কিন প্রশাসনেব তীব্র বিবাগ। এই সব দেশগুলিতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিব পালেব গোদা যে মার্কিন প্রশাসন, সে কথা আজ সর্বজন বিদিত।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম আমাদেব নিজেদেব কথা। বাসব ঘবে যদি ছিদ্র না থাকত, তাহলে লখিন্দব সাপে কাটা পডত না। আমবা যে সাম্রাজ্যবাদীদেব বিষে জর্জবিত হই, তাব কাবণ আমাদেব সমাজ দেহে শুধু ছিদ্র নয অসংখ্য ফোকব বযেছে। তুমি বলে থাক, আমাদেব দেশ অহিংসাব দেশ। কথাটা একেবাবেই মিথ্যে। আমাদেব দেশে একজন অহিংসাব বাণী প্রচাব কবেছিলেন, তিনি বুদ্ধ। সেই বুদ্ধেব মূর্তিটিকে ঘবে বেখে তাঁব ধর্মমত চিবতবে নির্বাসন দিযেছে আমাদেব দেশেব ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং সেই প্রক্রিযায কত বৌদ্ধ বিহাব ও মঠ ধ্বংস হযেছে, কত 'পূজাবিণী' স্তূপ বেদী মূলে প্রাণ দিযেছে তাব ইযত্তা নেই। আব একবাব বিংশ শতাব্দীতে অহিংসাব নীতিব প্রবল প্রচাবক মহাত্মা গান্ধী স্বযং নিহত হলেন প্রবল ব্রাহ্মণ্যবাদী আততাযীব হাতে। আজ যে সব হিন্দুত্ব ওযালাবা দেশময দাপাদাপি কবে বেড়াচ্ছে,তাবা সেই আততাযীব সাক্ষাৎ উত্তবসূবী। সেই আততাযীব জন্মদাতা আব.এস.এস–ই আজকেব হিন্দুবাষ্ট্রবাদীদেব মেরুদণ্ড।

ভাবতবর্ষ যে কখনওই 'অহিংসাব দেশ' নয,তা তোমাকে ইতিপূর্বে আমি বেদ, কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধ, যদুকুলেব আত্মঘাতী লড়াই, বামাযণেব তীব্র পাবিবাবিক হিংসা ও অসূযা এবং বৌদ্ধ বিতাড়নেব উদাহবণ দিযে প্রমাণ কবাব চেষ্টা কবেছি। এবাবে আমাদেব তথাকথিত 'হিন্দুযুগ' সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীব কিছু ভাষ্য তোমাকে শোনাচ্ছি। আজকেব আনন্দবাজাব পত্রিকাব ববিবাসবীযতে তিনি গুপ্তহত্যাব ইতিহাস লিখতে গিযে বলছেন, 'কৌটিল্যেব অর্থশাস্ত্র পড়লে বোঝা যায বাজনৈতিক হত্যা তখনকাব দিনেও অজ্ঞাত ছিল না। পৃষ্ঠাব পব পৃষ্ঠায, বাজাকে কীভাবে সুবক্ষিত বাখতে হবে তাবই বিস্তৃত বর্ণনা পাই। ছত্রধব, পাদুকাধব, তাম্বুল কবঙ্ক বাহিনী, বথচালক, দেহবক্ষী বোজই বদলানো হত। বানিব শযন কক্ষে বাজা ভদ্রসেনকে তাঁবই ভাই বধ কবেছিলেন, বাজা কারুষকে তাঁবই পুত্র। সেজন্য কৌটিল্যেব নির্দেশে কোন বাত্রে বাজা কোন বানিব কক্ষে বিশ্রাম কববেন, তা আগে ভাগে প্রকাশ কবা হত না। বিষ প্রযোগে হত্যা কবা সহজ ছিল বলে প্রতিবাব বাজাব খাদ্য ও পানীয পবীক্ষা কবানো হত।

অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসাবকে অনশনে বেখে হত্যা কবেন। নিমন্ত্রণ কবে নিযে গিযে বাজ্যবর্ধনেব হত্যাব কথা লিখে বেখে গেছেন বাণভট্ট। আব কাশ্মীবেব ইতিহাস 'বাজতবঙ্গিনী' তো বাজনৈতিক হত্যাব ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হবে না। এব প্রধান নাযিকা ছিলেন জনৈকা বানি–দিদ্দা।'

প্রবন্ধটি হযত তুমিও আজই পড়েছ। কিন্তু তা থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতিব কাবণ হল যে এসব অপ্রীতিকব প্রসঙ্গ আমাদেব খুব ভুলে যাওযাব প্রবণতা আছে। আমাদেব মধ্যে শিক্ষিতদেব মনেই এমন একটা বদ্ধমূল কুসংস্কাব আছে যে গুপ্ত হত্যা বিশেষত ভ্রাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা ইত্যাদি ঘটনাগুলি ঘটেছিল সব মুসলমান শাসক পবিবাবগুলিতে, হিন্দুবা এসব 'পাপ' থেকে মুক্ত। ইতিহাসকে আমবা প্রতিনিযত কতভাবে যে বিকৃত কবি'

তবে এসব হল ইতিহাসেব জাজ্বল্যমান হিংসা। আমাদেব ভাবতীয সমাজদেহেব বৈশিষ্ট্য হল অন্তর্লীন হিংসাব প্রবাহ, যাব কোনও উল্লেখ নেই, যাব প্রতিবিধান নেই, প্রাযশই প্রতিবোধও নেই, যে অপবাধে বিচাবেব বাণী নীববে নিভৃতে কেঁদে আসছে যুগ যুগ ধবে। এদেশে বিশেষত হিন্দু সমাজে 'নীচ জাতি'ব প্রতি মজ্জাগত বিদ্বেষ, শূদ্র ও চণ্ডালেব বিরুদ্ধে প্রতিদিন হত্যা লুণ্ঠন ও নাবী ধর্ষণেব অপবাধ, ভ্রূণহত্যা, কন্যা হত্যা, জীবন্ত নাবীকে চিতায সমর্পণ আব বিধবাদেব জন্য আজীবন দুঃসহ যন্ত্রণাব বিধান যদি নিম্নস্তবেব হিংসা না হয, তবে কী ? আব এসব সত্ত্বেও তোমবা হিন্দু 'অহিংসা'ব বড়াই কব। আমাদেব মজ্জাগত হিংসা এত অন্ধ ও প্রবল যে গান্ধীজীব মৃত্যুব পব বাব বাব আকাশবাণীতে ঘোষণা কবতে হযেছিল যে 'আততাযী একজন হিন্দু'। মজা দেখ, আততাযী যদি কোনও আপতিক কাবণে মুসলমান হত, তবে তাব জন্য হাজাব হাজাব নিবপবাধ মুসলমানকে প্রাণ দিতে হত, কিন্তু হত্যাকাবী হিন্দু হওযায তাব জন্য কোনও হিন্দুব দায বইল না' এটা কোন ধবনেব যুক্তি ? ইন্দিবা গান্ধী নিহত হওযায হাজাবেব বেশি শিখ পুরুষ নাবী শিশুকে নিহত হতে হল 'শোকাকুল জল্লাদেব হাতে, অথচ ঐ নিহতদেব মধ্যে কতজন যে ইন্দিবাব জন্য অশ্রু মোচন কবেছিল, কত শিশু যে জানতই না ইন্দিবা কে, আব কত মানুষ যে ছিল বাজনীতিব প্রতি উদাসীন, তা কে জানে ? আপতিক কাবণে 'শিখ' হাওযাটাই তাদেব অপবাধ হযে গেল। আবাব সেই একই হিংসাব পুনবাবৃত্তি দেখলাম বাজীব হত্যাব পব। 'শোকাকুল' অস্ত্রধাবীবা নির্বিচাবে বিপক্ষ দলীযদেব খুন কবল, একবাব ভাবল না, এইসব হত্যাব যাবা আসল নাযক, গডসে, বিযান্ত সিং বা জনৈকা তরুণীকে এইভাবে মবণেব দাবা খেলায যাবা ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহাব কবছে। আন্তর্জাতিক স্তবে যাবা এই নৃশংস চক্রান্তেব বুদ্ধি, অর্থ ও হাতিযাব জোগাচ্ছে, তাবা আড়ালে নিবাপদে বসে হাসছে। খুন হচ্ছে ভাইযেব হাতে ভাই, নিবপবাধ পুরুষ বমণী আব শিশু। তুমি একে 'অহিংসা' বল ? বুকে হাত দিযে বল তো, আমাদেব এই 'অহিংসা'ব দেশে বাব বাব বাষ্ট্রনাযকেবা কেন খুন হয, কেন সেইসব খুনেব কিনাবা হয না, কেন এইসব খুনেব বদলায হাজাব হাজাব নিবপবাধ মানুষ প্রাণ হাবায, কেন প্রতিদিন অসহায মানুষেব প্রাণ মান ধন খোযা যায, কেন আজও এই 'বৃহত্তম গণতন্ত্রে'ব দেশে হবিজনবা ভোট দিতে পাবে না ? এই সব কাপুরুষ হিংসাব মনস্তত্ত্ব আমাদেব পবম্পবাব কোন গভীবে নিহিত, তা কি কখনও ভেবে দেখেছ ?

বেদেব যুগেব হিংসা ছিল অকপট, আদিম ও নগ্ন। বৈদিক ঋষিবা তাকে গোপন কবেন নি। উপনিষদেব যুগেব হিংসা অন্তঃসলিলা। জ্ঞানেব সাধনা ও অমৃতেব আকাঙ্খাব

অন্তরালে সেখানে ক্ষুধা, শোষণ ও হিংসার ধারা সতত প্রবহমান। আজ সে সব উদাহরণ তোমায় দেওয়া গেল না। বস্তুত এই কদিন আগেও যিনি ছিলেন এক রাজনীতিক প্রতিপক্ষ, মাঠে ময়দানে বক্তৃতায় যাঁর তীব্র সমালোচনা হয়েছে, হঠাৎ একদিন সকালে উঠে যখন শুনতে পেলাম তিনি আর নেই, তখন সত্যি বলতে কি আবেগে আচ্ছন্ন মনের বৌদ্ধিক বৃত্তিগুলি বিকল হয়ে গেল। যার সাথে প্রতিদিন লড়াই তার অবর্তমানে সব কিছু কেমন হয়ে গেল শূন্য। কাজ রইল সব পড়ে। উপনিষদ ঘাঁটাঘাঁটি আর হয়ে উঠল না। অতএব, আজ থাক। আজকে শুধু তোমাকে একটা মোটা দাগের উদাহরণ দিয়েই চিঠি শেষ করব।

উপনিষদগুলির মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ আকারেই শুধু বৃহত্তম নয়, বিষয় গৌরবেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এই উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য–মৈত্রেয়ী সংবাদ এবং জনক রাজার যজ্ঞস্থলে যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিতর্ক খুবই বিখ্যাত। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। তবে এই বিতর্কের একটা জিনিস আমি আজ শুধু উল্লেখ করব, তা হল জবরদস্তি। বিতর্কের মধ্যে এত শাপ শাপান্ত, 'তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে' বলে এত হুমকি রয়েছে যে তাতে বিতর্কের আসরকে মনে হয় যেন যুদ্ধক্ষেত্র। একজনের মাথা তো খসেই পড়ল, আর গার্গী মাথা খসে যাওয়ার ভয়ে তর্কে ক্ষান্ত দিলেন। গার্গীর 'অপরাধ' তিনি ব্রহ্মলোকের ওপরে কী রয়েছে, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপনের 'ঔদ্ধত্য' দেখিয়েছিলেন। একজন আধুনিক ভাষ্যকার বলেছেন, এই সব 'মাথা খসে পড়া' তো আর শুধু কথায় হত না, ঘাতকদের হাতেই ঘটত। যুক্তি তর্কের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যাবার অধিকার কারুর ছিলনা, তাদের জন্য অপেক্ষা করত মৃত্যু। আজও বুঝি সেই ট্র্যাডিশনই চলছে।

চতুর্থ পর্ব

॥ বিশ ॥

উপনিষদ নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটা কথা স্পষ্ট করে বলে নেওয়া দরকার, তা না হলে তুমি ভুল বুঝবে। উপনিষদে যে আমাদের ভারতীয় মনীষা এক শিখর স্পর্শ করেছিল, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের পিতার আত্মচরিত থেকে আমরা শুনেছি যে উপনিষদের একটি ছিন্নপত্র তাঁর আশাশূন্য জীবনে অর্থ এনে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে উপনিষদের রসে এত জারিত ছিলেন যে অনেকে তাঁকে 'উপনিষদের কবি' বলতেই ভালবাসেন। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বেদের মধ্যে নিতান্ত ঐহিক বাসনা কামনার আধিক্য দেখে সম্ভবত কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করেছিলেন, বলেছিলেন যে বেদের শিক্ষার পরাকাষ্ঠা যে বেদান্ত,তাকেই বেদ বলে ধরতে হবে, বেদ সংহিতা অর্থাৎ ঋক সাম প্রভৃতি চতুর্বেদকে নয়। হিন্দু সনাতন মত অবশ্য ভিন্ন। হিন্দু ধর্মে ষড়দর্শন স্বীকৃত এ কারণেই যে, এই সব দর্শন বেদের প্রমাণ্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছে। আর বেদ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে চতুর্বেদ, কারণ, বেদান্তও এই ষড়দর্শনের মধ্যে একটি। বৌদ্ধ বা জৈন দর্শন স্বীকৃত নয়, কারণ তা বেদে অর্থাৎ চতুর্বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী নয়। সে য'ই হোক, এসব প্রসঙ্গে আমরা পরে আবার আসব। আপাতত যেটা মেনে নেওয়া দরকার, তা হল রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ উভয়েই উপনিষদের নিখিল বিশ্বে একাত্মতা বোধের দ্বারা আপ্লুত হয়েছিলেন। ইউরোপের মহান সাহিত্যিক ও চিন্তক রমঁ্যা রলাঁও এ বিষয়ে ভারতবর্ষের এই দুই মনীষীর সঙ্গে একমত ছিলেন।

বিভিন্ন উপনিষদের বক্তব্যকে একসূত্রে গ্রথিত করে 'বেদান্তসূত্র' বা 'ব্রহ্মসূত্র' রচনা করেছিলেন বাদরায়ণ। অনেকে মনে করেন মহাভারত প্র:ণেতা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসই হলেন এই বাদরায়ণ। সেই ব্রহ্মসূত্রের ওপর শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য প্রভৃতি ধর্মনায়কেরা টীকা লিখেছেন; এঁরা সবাই ঐতিহাসিক পুরুষ। আধুনিককালে রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকে উপনিষদের আলোচনা করেছেন, রাধাকৃষ্ণণ বই লিখেছেন, অসংখ্য দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতের এ বিষয়ে গ্রন্থ আছে। আমাদের দেশের মার্ক্সবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে উপনিষদ বা বেদান্ত তথা ভারতীয় দর্শন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

উপনিষদ শুধু দর্শন নয়, উপনিষদের রচয়িতারা একাধারে কবি ও দার্শনিক। প্রতিটি প্রধান প্রধান উপনিষদ কাব্যরসে সিক্ত। আমার একান্ত প্রিয় কঠ–উপনিষদ এক অতি সুসংহত ও সুসংবদ্ধ দার্শনিক সাহিত্য সৃষ্টি। সম্পূর্ণ ভিন্ন কোটির রচনার মধ্যে যদি তুলনা চলে তবে আমি বলব যে কঠোপনিষদে প্লেটোর 'লাস্ট ডেইজ অব সক্রেটিস'–এর মত উচ্চ দার্শনিক চিন্তা ও সাহিত্যের এক অনুপম সমন্বয় আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি অবশ্য

তোমাব কাছে উপনিষদেব দর্শন অথবা কাব্য নিযে কোনও আলোচনা কবতে চাই না, আমাব প্রতিপাদ্য প্রমাণেব পক্ষে সেটা জরুবি নয। আমি চাইছি সাহিত্য হিসেবে উপনিষদ সে যুগেব যে সমাজ চিত্রেব প্রতিফলন ঘটিযেছে, তাবই আলোচনা কবতে। উপনিষদ সম্বন্ধে আমাদেব মনে যে সব 'মিথ' বা অতিকথা বাসা বেঁধেছে, সেগুলি খণ্ডন কবাও আমাব উদ্দেশ্য।

উপনিষদ বিষযে আমাব কিছু কিছু উক্তিতে ক্ষুণ্ন হযে তুমি আমাকে যে কটি পত্রাঘাত কবেছ, তাতে মনে হযেছে যে তোমাব মতে উপনিষদেব যুগে সকলেই সবল জীবন, উচ্চ চিন্তা–অর্থাৎ কিনা plain living and high thinking-এ অভ্যস্ত ছিলেন, সকলেই মৈত্রেযীব মত বলতেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম ?' 'যাহা দ্বাবা আমি অমবত্ব লাভ কবিতে পাবিব না তাহা দ্বাবা কী কবিব ?' না হে ভাবুক মশাই, না। তোমাব ঐ ফর্মুলায সকলে কেন, মুনি ঋষিবাও পড়েন না। মৈত্রেযীব প্রতি কোনও অসম্মান না জানিযেও বলা যায, সর্বযুগে সর্বদেশেই মৈত্রেযীব মত দু'এক জন বিশিষ্ট মানুষকে পাওযা যায। কিন্তু তুমি যদি ভেবে থাকো যে উপনিষদেব মুনি ঋষিবা বনেব মধ্যে গাছেব নিচে ধুনি জ্বালিযে 'ওম' উচ্চাবণ কবেই বেঁচে থাকতেন, তবে তুমি ভুল কবছ, উপনিষদ ভাল কবে পড়ে দেখলেই তুমি তা টেব পাবে। বস্তুত এক শোষণমূলক সমাজে যখন মুষ্টিমেয কিছু মানুষ বিপুল বিষয বৈভব কবাযত্ত কবে দৈনন্দিন বেঁচে থাকাব হাড় ভাঙা খাটুনি থেকে মুক্তি পেল, তখন থেকেই 'দর্শনে'ব উদ্ভব।

সেজন্যই বেদে শুধুই 'কর্ম', আব বেদান্তে হল 'জ্ঞান'। এটা আমাব কথা নয, শাস্ত্রেই বেদেব সংহিতা অংশ অর্থাৎ চাব বেদ ও তাব 'ব্রাহ্মণ' অংশকে বলা হচ্ছে 'কর্মকাণ্ড' আব বেদান্তকে বলা হচ্ছে 'জ্ঞান কাণ্ড'। কর্ম থেকে অবসব না মিললে, জ্ঞান চর্চা হবে কোথা থেকে ? আব সে যুগে কর্ম থেকে অবসব লাভেব উপায ছিল আদিম বৈদিক সাম্যাবস্থাকে ভেঙে ফেলে শোষণমূলক সমাজ গঠন কবে, অধিকাংশেব শ্রমে কিছু মানুষেব বিশ্রাম। আপত্তি কববে ? আমি প্রমাণ ছাড়া কথা বলছিনা। সব নথিপত্র তোমায দেখাব। ক্রমে ক্রমে।

তোমাব দ্বিতীয ভুল অথবা জানা থাকলেও যে কথাটাকে তুমি পাত্তা দিতে চাওনা, তা হল এই যে, ব্রহ্মচিন্তাই ভাবতীয দর্শন চিন্তাব সব নয। আমাদেব ষড়দর্শনেব মধ্যে একমাত্র বেদান্তই পবম স্রষ্টা ঈশ্ববেব ধাবণাকে দার্শনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কবেছে, অন্য সবগুলি দর্শনই অল্প বিস্তব ঈশ্বব অবিশ্বাসী। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তো ঈশ্ববকে অস্বীকাবই কবেছে। তা ছাড়া আছে লোকাযত দর্শন, যাব গুরু বলে মানা হয চার্বাককে। সুতবাং প্রাচীন ভাবতবর্ষকে কোনও একটা বিশেষ চিন্তা ভাবনাব ছকে ফেলে দেওযা অর্থহীন। এদেশে দার্শনিক চিন্তা ভাবনাব স্তবে দীর্ঘকাল ধবে ভাববাদ ও জডবাদেব, ঈশ্ববে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসেব দ্বন্দ্ব চলেছে, এই সব নানা চিন্তাব মধ্যে বহু সমন্বয ও আপোসও ঘটেছে। তুমি এই ইতিহাসকে বাদ দিযে কেবল উপনিষদকে আকডে ধবলে 'ভাবতীয ঐতিহ্যে ব প্রতি সম্মান দেখানো হবে কি? শঙ্কবাচার্য তো জন্মেছিলেন এই সেদিন, খ্রীস্টীয ৭৮৮ অব্দে। তাঁব দেহাবসান হয ৮২০ খ্রীস্টাব্দে। তাঁব 'ব্রহ্মসূত্রে'ব ভাষ্য বচনাব পব থেকেই ভাবতবর্ষে বেদান্তেব আসন পাকা হযেছে। কিন্তু তাব আগেকাব দেড দু হাজাব বছবেব ইতিহাসটা কি ঐতিহ্য নয? অতএব লেনিনেব এই প্রশ্নেব জবাব তোমাকে দিতেই হবে

যে ঐতিহ্যেব কতটুকু আমবা বাখব, কতটুকু বর্জন কবব। কাবণ, এক ও অদ্বিতীয ঐতিহ্য বলে আমাদেব কিছু নেই। একটিকে বাখলে আব একটিকে তোমাব ছাড়তেই হবে।

তৃতীয যে কথাটা তুমি বলেছ সেটা আমাব বক্তব্যেব পক্ষেই যায। তুমি বলেছ উপনিষদেব অনেক চিন্তা আধুনিক বিজ্ঞান দ্বাবা সমর্থিত। বিবেকানন্দ এবং বলাঁ তাই বলেছেন। বিবেকানন্দেব সমযে আইনস্টাইনেব তত্ত্ব প্রকাশিত হয নি, কিন্তু বলাঁ বেদান্তেব বিবেকানন্দ কৃত ব্যাখ্যাব সঙ্গে আইনস্টাইনেব অপেক্ষিকতাবাদেব সঙ্গতি দেখিযেছেন। তাঁব লেখা বিবেকানন্দ-জীবনকথাব দ্বিতীয খণ্ডে এ সম্বন্ধে চমৎকাব আলোচনা আছে। বিশ্ব মানব বলাঁ প্রাচ্য বা প্রতীচ্য, হিন্দু বা খ্রীস্টান—যে কোনও তবফেব শ্রেষ্ঠত্ববাদেব প্রবল বিবোধী ছিলেন। বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গান্ধী-ববীন্দ্রনাথেব মধ্যে তিনি এই দুযেব একটা সমন্বযেব সূত্র আবিষ্কাবেব চেষ্টায ছিলেন। এ ব্যাপাবে তিনি যে খানিকটা আশাহতও হযেছিলেন, তাঁব Inde নানক বোজনামচায (বাংলায যা 'ভাবতবর্ষ' নামে নূতন কবে প্রকাশিত হযেছে) তাব প্রমাণ আছে। যা হোক, সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমি আপাতত এসব নিযে তর্ক তুলছি না। কিন্তু আমি অবশ্যই বলব যে তুমি যদি উপনিষদেব বাণীব যথার্থতা প্রমাণেব জন্য আধুনিক বিজ্ঞানেব দ্বাবস্থ হও, তবে তা বিজ্ঞানেবই জয। এবপব তুমি আব পাশ্চাত্যেব সাধনাকে জড়বাদ বলে উড়িযে দিতে পাব না। দ্বিতীযত, উপনিষদে যা কিছু বিজ্ঞানেব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তাকে যদি তুমি শ্রেষ্ঠত্বেব শিবোপা দাও, তাহলে সেখানে অজস্র যে সব কথা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, তাকেও বর্জন কবতে হয। কিন্তু একবাব যদি তা শুরু কবা যায, তা হলে উপনিষদেব শ্রেষ্ঠত্ব ঠিকই বজায থাকবে, কিন্তু তাব হিন্দুযানি একেবাবেই আব থাকবে না। হে হিন্দুত্ব-অভিমানী,সেই বিচাবেব জন্য প্রস্তুত হও। আপাতত তোমাব এক নম্বব ভ্রম নিযে আলোচনা শুরু কবা যাক।

মুনি ঋষিবা যে সবলজীবন যাপন কবতেন না, উপনিষদে তাব প্রমাণ বযেছে ভুবি ভুবি। তা ছাড়া উপনিষদেব উপদেশগুলি শুধু তো মুনি ঋষি ব্রাহ্মণেবাই দেন নি, ক্ষত্রিয বাজা বাজবাও দিযেছেন। তাঁবা সকলেই বিষয বৈভবেব অধিকাবী। প্রথমে কঠ-উপনিষদখানাই ধব। এই উপনিষদেব আখ্যান ভাগটি তুমি জান। এতে নচিকেতাব পিতা বাজশ্রবস নামক মুনি (অরুণেব পুত্র উদ্দালক বলেও তাঁব উল্লেখ আছে) যজ্ঞফল কামনা কবে তাঁব 'সর্বস্ব' দান কবেছিলেন। যজ্ঞেব পব দক্ষিণাব জন্য যখন গাভীগুলি নিয়ে আসা হল, তখন নচিকেতা দেখলেন যে গোশালায অনেক চমৎকাব গাভী থাকা সত্ত্বেও, দক্ষিণা হিসেবে দেওযা গরুগুলি সবই হাড় জিবজিবে, 'ইন্দ্রিয শক্তিহীন, প্রজনন ক্ষমতা শূন্য। এবা আব তৃণও ভোজন কববেনা, দুগ্ধদানও কববে না।'। নচিকেতা, তখন অনুশোচনা বশত পিতাকে গিযে বলতে থাকল 'তুমি আমাকে কাকে দান কববে'? পিতা শেষ পর্যন্ত বেগেমেগে বললেন, 'যমকে'। তাবপব নচিকেতাব যমলোক যাত্রা, তিনটি বব প্রাপ্তি এবং শেষ ববে ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ। সেই ব্রহ্মবিদ্যাই কঠোপনিষদেব মূল বিষযবস্তু।

এখন লক্ষ্য কব বিখ্যাত ঔপনিষদিক ঋষি উদ্দালকেব আচবণ। 'সর্বস্ব দান' একটা কথাব কথামাত্র। তাঁব প্রচুব গাভী থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণা দানে অর্থাৎ ধর্মাচবণে তিনি কৃপণ এবং তাঁব তঞ্চকতাই নচিকেতাব মনে 'ধর্ম জিজ্ঞাসা' জাগ্রত হওযাব কাবণ। এবাবে এস যমালযে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানী যমবাজ নচিকেতাকে বত্নহাব, সুন্দবী বমণী, গবাদি পশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, বিস্তীর্ণ আযতন বিশিষ্ট ভূমি ইত্যাদি দিযে 'ব্রহ্মজ্ঞান' লাভেব

ইচ্ছে থেকে নিবৃত্ত কবতে চাইছেন। এই যম কে জানি না, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মজ্ঞানেব অধিকাবীব এইসব বিপুল বৈভব থাকতে কোনও বাধা নেই। তুমি বলবে এসব রূপকার্থে গ্রহণ কবতে হবে, স্থূলার্থে নয়। বেশ তো! কিন্তু রূপক তো হাওয়া থেকে আসে না। তা ছাড়া যমেব উপদেশ থেকেই জানা যাচ্ছে যে এই সব বৈভবে আসক্তি 'ব্রহ্মলাভে'ব অন্তবায। বৈভব যদি নাই থাকবে, তবে তাতে আসক্তি এবং অন্তবাযেব প্রশ্নই বা কোথা থেকে আসবে। আবাব নচিকেতাব কথাও তাৎপর্যপূর্ণ। এই সব বিষয বৈভবে অনিচ্ছা দেখিযে সেই বালক বলছে, 'আপনাব সাক্ষাৎ যখন পেযে গেছি, তখন বিত্তলাভ আমি নিশ্চযই কবব। আব যতদিন আপনি প্রভু আছেন, ততদিন বেঁচেও থাকব। এ সবেব জন্য বব প্রার্থনাব দবকাব নেই। আপনি আমাকে ব্রহ্মজ্ঞানই দিন।' নচিকেতা যে বিত্তশালী হবেই তাতে কোনও সংশয নেই। তাব কথা হল, বিত্ত তো পাবই, কিন্তু এমন শিক্ষক যখন পেযেছি তখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবব না কেন?

এবাবে খুলে দেখ বৃহদাবণ্যক। এই উপনিষদেব তৃতীয অধ্যাযে জনক যজ্ঞ কর্তা। জনক একজন বাজর্ষি, অর্থাৎ বাজা ও ঋষি দুইই। তিনি যজ্ঞস্থলে এক সহস্র গরু ও প্রতিটি গরুব শৃঙ্গে দশ দশ পাদ সুবর্ণ মুদ্রা বেঁধে বাখলেন এবং ব্রাহ্মণদে, মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ তাঁকে এগুলি দিতে চাইলেন। কোনও ব্রাহ্মণ গাভী নিতে সাহসী না হওযায ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁব শিষ্য সামশ্রবকে গাভীগুলি আশ্রমে নিযে যেতে বললেন। এবপব ব্রাহ্মণবা প্রতিবাদ কবায কী প্রাণপণ এবং প্রাণঘাতী লড়াই কবে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই গাভীগুলি জিতে নিলেন, তাব কথা তো কিছু গত চিঠিতে তোমায বলেছি। এখন বলত এই দশ হাজাব গাভী আব অতো অতো স্বর্ণমুদ্রা যাজ্ঞবল্ক্য কোথায নিযে তুললেন? অবণ্যেব দীন কুটিবে নিশ্চযই এসব নিযে তোলাব জাযগা থাকে না। যাজ্ঞবল্ক্য যে এক বিশাল ভূ-সম্পত্তিব মালিক ছিলেন, তাতে আব সন্দেহ কী? এ বকম বাজকীয উপহাব এব আগেও তিনি অনেক পেযেছেন। সুতবাং ধনী হতে তাঁব বাধা কোথায?

॥ একুশ ॥

গত চিঠিতে তুমি লিখেছ, 'ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেব মত এক মহান দার্শনিককে তুমি যে প্রকাবান্তবে খুনীব স্তবে নামিযে এনেছ, তিনি ঘাতক দিযে হত্যা কবাতেন বলে ইঙ্গিত দিযেছ, এতটা স্থূলতা তোমাব কাছ থেকে আশঙ্কা কবিনি। উপনিষদেব দর্শন বিচাবেব এই কি তোমাব মার্ক্সবাদী পদ্ধতি?' বাজীবেব মৃত্যুব পব আমাব লেখা চিঠিব শেষাংশ তোমাব উষ্মাব কাবণ বুঝতে পাবি, কিন্তু ভাই, তোমাব আপত্তি ঠিক কিসে বলতো? দর্শনেব আলোচনাব আসবে 'মাথা খসিযে ফেলাব হুমকি', নাকি তাব উল্লেখ, কোনটায? হত্যা, না, ঘাতক দিযে হত্যা, কোনটা তোমাব অপছন্দ? হত্যাব কথা আমি তো বলিনি, বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য এবং এ সম্বন্ধে আধুনিক একজন পণ্ডিত যে মন্তব্য কবেছেন, চিঠিতে আমি তাবই উল্লেখ কবেছিলাম। মন্তব্যটি যে ঠিক কাব তা আমাব স্মবণে নেই বলে আমি দুঃখিত। সে যাই হোক 'বৃহদাবণ্যক'-এ ঠিক কী লেখা আছে একবাব পড়েই দেখা যাক না।

ঐ উপনিষদেব তৃতীয অধ্যাযেব ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে গার্গী — যাজ্ঞবল্ক্যেব মধ্যে এই বিশ্বেব বস্তু

সমুদয় কিসে ওতপ্রোত রয়েছে, সে বিষয়ে এক নাটকীয় উত্তর প্রত্যুত্তর চলছিল। এই অনন্ত বিশ্বের অসীমতা উপলব্ধি করার জন্যে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন গার্গী। এই জল, এই বায়ু, এই অন্তরীক্ষ, তারও পরে গন্ধর্বলোক, আদিত্যলোক, নক্ষত্রলোক– এইভাবে আমরা এগোতে থাকি। এইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য যখন শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মলোকের কথা বললেন, তখন গার্গী চ্যালেঞ্জের সুরে এই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'হে যাজ্ঞবল্ক্য, ব্রহ্মলোক কাহাতে ওতপ্রোত?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'তোমার মস্তক যেন নিপাতিত না হয়, যাঁহার বিষয়ে অতিপ্রশ্ন করা উচিত নহে, তুমি তাঁহারই বিষয়ে অতি প্রশ্ন করিতেছ।' এরপর লেখা আছে ঃ 'অনন্তর গার্গী বাচক্নবী বিরত হইলেন।' বিরত না হয়ে উপায় কী ছিল বল? পরাস্ত হয়ে নয়, 'মস্তক নিপাতিত' হবার ভয়ে গার্গী চুপ করলেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে তিনি এমন চেপে ধরেছিলেন যে চোখ রাঙিয়ে তর্ক থামিয়ে দেওয়া ছাড়া এই মহান দার্শনিকের আর কোনও গত্যন্তর ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্যের বিপত্তিটা বোঝ! গার্গীর তর্ককৌশলের কাছে তাঁর দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা তো বিপন্ন হচ্ছিলই, সোনায় মোড়া শিংওয়ালা গরুগুলিও হাত ছাড়া হতে চলেছিল।

ঐ অধ্যায়েরই অষ্টম ব্রাহ্মণে দেখা যায় বুদ্ধিমতী গার্গী প্রশ্নগুলি আবার উত্থাপন করছেন, কিন্তু এবারে অনেক সাবধানে যাতে 'অনুমোদিত' সীমা লঙ্ঘন না হয়। বলা বাহুল্য ধীমান যাজ্ঞবল্ক্য এবারে তাঁর নিজের নিয়মে খেলে অনায়াসে জিতে যান। তখন গার্গী ঘোষণা করেন, 'শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মবিচারে আপনারা কেহই ইঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।'

এখানেই মিটে যেত, কিন্তু 'বিদগ্ধ শাকল্য' ছিলেন কিঞ্চিৎ মাথা মোটা, বুদ্ধিমতী গার্গীর পরামর্শ তিনি কানে নিলেন না। শাকল্যের বিদ্যার দৌড় ছিল চতুর্বেদ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক শাস্ত্র। ফলে তাঁর অধিদৈবিক ও অধিভৌতিক জ্ঞান ছিল, উপনিষদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল না, অর্থাৎ তিনি দেবতাগণ ও ভূত সমূহ অর্থাৎ বস্তু বা matter সম্বন্ধে জানতেন, আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। তিনি নানা প্রশ্ন করে যাজ্ঞবল্ক্যকে উত্যক্ত করতে লাগলেন। একবার যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'এই ব্রাহ্মণগণ কিতোমাকে অঙ্গার দহণ যন্ত্র করিয়াছেন ?' অর্থাৎ সাদা বাংলায় 'এই ব্রাহ্মণেরা কি আমাকে কাঠি দেওয়ার জন্য তোমায় লাগিয়েছে ?' শাকল্য বললেন, 'কী? তুমি কুরু ও পাঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণদের অপমান করিতেছ ?' যাজ্ঞবল্ক্য কথাটার আমল না দিয়ে আরও প্রশ্ন করার জন্য শাকল্যকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। অভিমানী ও নির্বোধ শাকল্য তাতে ধরা দিলেন। প্রশ্নোত্তর যখন দেবতাদি ও প্রাণ দেহ ইত্যাদি পঞ্চভূতময় জগৎ ছাড়িয়ে আত্মার প্রসঙ্গে এল– যাজ্ঞবল্ক্যই ওভাবে সুকৌশলে প্রসঙ্গকে টেনে আনলেন, তখন তিনি শাকল্যকে প্রশ্ন করলেন 'আমি সেই ঔপনিষদ ব্রহ্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি যদি তাহার বিষয়ে বলিতে না পার তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে'। তারপর লেখা আছে, 'শাকল্য তাঁহার বিষয়ে জানিতেন না। তাঁহার মস্তক খসিয়া পড়িল।' .... অতঃপর, স্বভাবতঃই অন্য ব্রাহ্মণেরা চুপ করে গেলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বিজয়ী হলেন।

এখন, ওহে সূক্ষ্ম বিচার প্রেমী, তর্কের আসরে এই যে মস্তক খসিয়ে দেওয়ার হুমকি এবং মস্তক খসিয়ে ফেলা–তাকে কী তুমি সূক্ষ্ম বিচার বল? তুমি শুধু মার্ক্সবাদীর কাছে সূক্ষ্মচিন্তা প্রত্যাশা কর, উপনিষদের ঋষির কাছে নয়। এ অবশ্য নূতন কথা নয়। অহিংসা,

নিযমানুবর্তিতা, সংবিধানেব প্রতি আনুগত্য ইত্যাদিব দাবি সবই শ্রমজীবী মানুষেব ও তাদেব প্রতিনিধিদেব কাছে, শাসক শ্রেণী ও তাদেব সমর্থকদেব কাছে কখনই নয। বাবা বলতেন, 'কর্তাব বাযু নিঃসবণে গন্ধ নাই'। সুতবাং তোমাব এই দু'মুখো নীতি বুঝি।

'মস্তক খসানো'তে তোমাব মনে হয আপত্তি নেই, ওটা 'ঘাতক দিযে কবানো হত' বলাতেই তোমাব যত আপত্তি। আমবা তো জানি পৃথিবীব সমস্ত দেশেবই পুবোহিত শ্রেণীব বা ধর্মপ্রচাবকদেব নানা অলৌকিকতা প্রদর্শন ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয, যাকে বলে হাত সাফাই। 'বিসর্জন' নাটকে উগ্র ব্রাহ্মণ বঘুপতিব হাত সাফাইযেব কাহিনী তো তোমাব বইযেব ব্যাকেই আছে। কিন্তু তুমি হযত ভাবছ, উপনিষদেব যুগে ঋষিবা সাধনাব দ্বাবা এমন সত্য বল লাভ কবেছিলেন, যে তাঁদেব কথাতেই মাথা খসে পড়ত। বেশ, তাই মেনে নিলাম। ঋষি যদি সেই শক্তি লাভই কবে থাকেন, তবে 'ব্রহ্মেব উর্ধ্বে কে আছে' প্রশ্ন কবা বা ব্রহ্মকে না জানা কি এমনই অমার্জনীয অপবাধ যে তিনি তাব মাথা ফেলে দেবেন ? 'সত্যদ্রষ্টা' ব্রাহ্মণ যদি এই নীতি গ্রহণ কবেন, তবে সমাজেব অন্য ক্ষমতাবানেবাই তা কবেনো কেন ? ক্ষত্রিযবা তো উপনিষদেব ব্রহ্মবিদ্যাব অধিকাবী, তাঁবাও তো এমনি মাথা ফেলে দিতে পাবেন, এবং তাঁবা নিশ্চযই তা কববেন অস্ত্রেব জোবে।

আসলে যাজ্ঞবল্ক্য কিভাবে মাথা ফেলে দিযেছিলেন, বা আদৌ ফেলেছিলেন কিনা (ঋষিদেব ক্ষমতাকে প্রচাব কবাব জন্য বিভিন্ন গ্রন্থে এসব কথা লেখা হযত এক প্রকাবেব কৌশল মাত্র)—এগুলো খুব বড় কথা নয। আমি তোমাকে বাজীব হত্যা প্রসঙ্গে ঐ চিঠিতে লিখেছিলাম যে মুখে অহিংসাব কথা বলা হলেও, চতুর্বেদেব যুগে যা ছিল প্রকাশ্য হিংসা তাই পববর্তীকালে অন্তর্লীন ধাবায আমাদেব সমাজদেহে প্রবাহিত হযে চলেছে। এ এক অসহিষ্ণুতাব মনস্তত্ত্ব; এব মূল কথা হল নাস্তিকেব প্রতি, অবিশ্বাসীব প্রতি, বিবোধী মতাবলম্বীব প্রতি, 'নিম্নবর্ণেব' প্রতি বিদ্বেষ, ক্রোধ ও হিংসা, যা শেষ পর্যন্ত বক্তপানেও কুণ্ঠিত নয। 'বিসর্জনে' এই ধর্মীয হিংসাব প্রতিই ববীন্দ্রনাথ ধিক্কাব জানিযেছেন।

ধর্মেব নামে তখনও যে আসলে স্বার্থেব দ্বন্দ্বই চলত, বৃহদাবণ্যকেব এই কাহিনীটি তাব প্রমাণ। যাজ্ঞবল্ক্যেব সঙ্গে অন্যান্য ব্রাহ্মণদেব এই নাটকীয সংঘর্ষেব কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু 'ব্রহ্ম' নন, গরু। তুমি আপত্তি কববে ? বেশ, 'বৃহদাবণ্যকে'ব তৃতীয অধ্যায প্রথম ব্রাহ্মণ খোল। সেখানে দেখ লেখা আছে, যাজ্ঞবল্ক্য যখন জনকেব হাজাব গাভী নিযে যাওযাব জন্য তাঁব শিষ্যকে আদেশ দিলেন, তখন 'ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইযা বলিলেন, "ইনি আমাদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, ইহাব প্রমাণ কি'? বৈদেহ জনকেব অশ্বল নামে একজন হোতা ছিলেন। তিনি ইঁহাকে বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য তুমিই কি আমাদিগেব মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ"? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'ব্রহ্মিষ্ঠকে আমবা নমস্কাব কবিতেছি। কিন্তু আমবা গো লাভ কবিতেই ইচ্ছা কবি"।

বসিকতাচ্ছলে ঋষি তথা দার্শনিক স্পষ্ট কথাই বলেছেন। সম্রাট জনকেব সঙ্গে তাঁব ববাববই দোস্তি ছিল, পবে জনক যাজ্ঞবল্ক্যেব ব্রহ্মজ্ঞানে মুগ্ধ হযে তাঁকে তাঁব সর্বস্ব দান কবে দিযেছিলেন। সে কাহিনী আছে 'বৃহদাবণ্যকে'ব চতুর্থ অধ্যাযে। এই অধ্যাযেব প্রথম ব্রাহ্মণেব প্রথম মন্ত্রটি এই রূপ ঃ

'জনক বৈদেহ বসিযাছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাব নিকট উপস্থিত হইলেন। জনক বলিলেন

"যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি কী উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইযাছেন? পশুলাভেব ইচ্ছায, না সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা কবিবাব জন্য ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "হে সম্রাট উভয উদ্দেশ্যেই"।

সম্পদ লাভ ও সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনাব মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য কোনও বিবোধ দেখেন নি। মৈত্রেযী 'ব্রহ্মজ্ঞানী' ছিলেন না, তাই বলেছিলেন, 'যে বিত্ত অমৃত দেয না, তা নিযে আমি কী কবব'? 'বৃহদাবণ্যক' উপনিষদেব দ্বিতীয অধ্যায চতুর্থ ব্রাহ্মণ এবং চতুর্থ অধ্যায পঞ্চম ব্রাহ্মণেব বর্ণনানুযাযী যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেযীকে এই শিক্ষাই দিযেছিলেন যে সমগ্র বিশ্বই আত্মাস্বরূপ অর্থাৎ অমৃতময। সুতবাং যিনি এই জগৎকে পবমাত্মাব রূপ ভেবে ভোগ কবেন তিনি 'ভোগী' নন, 'যোগী'। উপনিষদ বলছে 'মা গৃধ'–লোভ কবনা, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'–ত্যাগেব সঙ্গে ভোগ কব। 'ভোগ কব না', এ কথা উপনিষদ বলেনি। ববীন্দ্রনাথ এই বাণীকে কাব্যরূপ দিযে লিখেছিলেন, 'বৈবাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমাব নয / সহস্র বন্ধনমাঝে মহামন্দ মষ / লভিব মুক্তিব স্বাদ'। 'ভোগ কব, কিন্তু আসক্ত হযো না', এটাই উপনিষদেব শিক্ষা। ভোগ সর্বস্বতা ও ভোগ বিমুখতাব এ হল মধ্যপন্থা। এই পন্থায আমাব কোনও আপত্তি নেই, সাম্যবাদী বন্টনেব নীতিও একে স্বীকাব কবে। কিন্তু, সেখানে একটি মৌলিক পার্থক্য বযেছে। তা হল এই যে ভোগেব অধিকাব সাম্যবাদী সমাজে সকলেব সমান। কিন্তু উপনিষদিক সমাজে কী তাই? উপনিষদেব এই বাণী কাদেব জন্য ? যাদেব ভোগ কবাব অধিকাব আছে সেই মুষ্টিমেয ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিযেব জন্য। অন্য যে বিপুল সংখ্যাক সাধাবণ মানুষ, যাদেব ত্যাগেব বা ভোগেব জন্য কিছুই নেই, তাদেব 'ত্যাগেব দ্বাবা ভোগ কব' বলাব কোনও অর্থই নেই, আব তাদেব 'মা গৃধঃ কস্যচিদ ধনম'– 'কাহাবো ধনে লোভ কবিও না' বলাব একটাই অর্থ ঃ 'তোমবা গবিব হযে থাক, শাসকশ্রেণীদেব ধনে লোভ কব না'। তাই নয কি ? 'শ্রেণীস্বার্থ' কথাটিতে তোমাদেব খুব আপত্তি, কিন্তু এটা বুঝতে কি কোনও কষ্ট হয যে উপনিষদেব উচ্চ দার্শনিক চিন্তা শোষকেব শ্রেণীস্বার্থকে অক্ষুন্ন বাখে এবং শোষিতকে যেই তিমিবে সেই তিমিবেই বেখে দেয ?

উপনিষদ যে কেবল ক্ষত্রিয ও ব্রাহ্মণেব জন্য, তা আমাব মন গড়া কথা নয। তাব মন্ত্রসমূহেই তা বাববাব উল্লিখিত হযেছে। আমি 'বৃহদাবণ্যক' থেকে পূর্বোল্লিখিত মৈত্রেযী ব্রাহ্মণেব একটি মন্ত্র উদ্ধৃত কবছি ঃ 'যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক বলিযা মনে কবে ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পবিত্যাগ কবিবে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিযজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক বলিযা মনে কবে ক্ষত্রিযজাতি তাহাকে পবিত্যাগ কবিবে। যে ব্যক্তি স্বর্গাদি লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক বলিযা মনে কবে স্বর্গাদি লোকসমূহ তাহাকে পবিত্যাগ কবিবে'। এইভাবে দেবগণ, ভূতসমূহ ও সকল বস্তুব উল্লেখ কবে যাজ্ঞবল্ক্য মন্ত্রেব উপসংহাবে বলছেন, 'এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিযজাতি, এই স্বর্গাদি লোকসমূহ, এই ভূত সমূহ, এই সমুদয বস্তুই এই আত্মা'। নিখিল বিশ্বে এই যে আত্মা বা ব্রহ্মেব উপলব্ধি, লক্ষ্য কব, তাব মধ্যে ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয জাতি আছে, কিন্তু বৈশ্য বা শূদ্র নেই। জাঁপল সার্ত্রে একবাব বলেছিলেন, 'বুর্জোযাবা বলে সমস্ত মানুষই ভাই, কিন্তু, তাবা জনান্তিকে বলে, কেবল বুর্জোযাবাই মানুষ'। সার্ত্রেব কথাটিকে সামান্য পালটে আমবা বলতে পাবি, উপনিষদেব ঋষি বলেন, 'নিখিল বিশ্বই ব্রহ্ম', কিন্তু জনান্তিকে বলেন, 'বিশ্বে মানুষ কেবল ব্রাহ্মণ আব ক্ষত্রিযবাই'।

উপনিষদ থেকে সেযুগেব সমাজেব উচুতলাব মানুষদেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দেব বিষয় বৈভব, ধনলিপ্সা, সম্পদেব জন্য পাবস্পবিক দ্বন্দ্ব, হত্যা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদিব উদাহবণ এই যে তুলে ধবলাম তা প্রাচীন ভাবতবর্ষেব কোনও নিন্দাব জন্য নয। সে যুগেব মুনি ঋষিবাও যে মানুষ ছিলেন, কোনও কল্পিত স্বর্গলোকেব বাসিন্দা নয, সমাজেব ধনসম্পদ যখন এক মেরুতে জমা হতে থাকে তখন তা থেকে যে স্বাভাবিক পবিণতি আশা কবা যায, 'উপনিষদে'ব যুগেও যে তাই ঘটেছিল, স্রেফ সেটা প্রমাণ কবাব জন্যই এই বিষযগুলিব অবতাবণা। তোমাব মত অনেকেব মধ্যেই উপনিষদেব যুগ ও বাণী সম্বন্ধে যে ধাবণাগুলি বযেছে তা আংশিক ও কল্পনা বঞ্জিত। 'ভূমৈব সুখম, নাল্পে সুখমস্তি' কিংবা 'বসো বৈ সঃ' এব মত সুভাষিতবলিতেই যে কেবল উপনিষদ পূর্ণ নয, কেবল আত্মা নয,ঐহিক সুখ সম্ভোগেব কথাও যে তাতে আছে সে কথা তোমবা ভুলিযে দিতে চাও। এমন কি যে কোনও বমণীকে পটিযে বা প্রযোজনে পিটিযে সম্ভোগেব সামগ্রী কবাব কথাও যে 'ছান্দোগ্য' ও 'বৃহদাবণ্যক' উপনিষদ দুটিতে বযেছে, আমি তোমাকে আমাব গত একটি চিঠিতে তা বিস্তাবিত লিখেছিলাম। তাতে সে যুগেব 'সমাজ সম্পর্ক' সম্বন্ধে কিছু কিছু সত্য উদ্‌ঘাটিত হযেছে। আমি আজ তোমাকে 'ছান্দোগ্য' উপনিষদ থেকে একটি আখ্যাযিকা পড়ে শোনাব। এই আখ্যাযিকায সে কালেব সামাজিক ও বাষ্ট্রীয ব্যবস্থা, বীতিনীতি ও ঋষিদেব চিন্তাভাবনাব কিছু পবিচয পাওযা যাবে। উপনিষদটিব প্রথম খণ্ডেব দশম ও একাদশ অধ্যাযেব প্রায সবটুকুই আমি নিচে তুলে দিচ্ছি ঃ

' কুরুদেশ শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলে চক্রেব পুত্র উষস্তি পত্নীব সহিত অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায ইভ্যগ্রামে বাস কবিতে ছিলেন। একজন ইভ্য মাষকলায খাইতেছে দেখিযা উষস্তি তাহাব নিকট মাষকলায ভিক্ষা কবিলেন। ইভ্য বলিল "আমাব ভোজনপাত্রে যে উচ্ছিষ্ট মাষকলায বহিযাছে, উহা ব্যতীত আব কিছু নাই।" উষস্তি বলিলেন, এই সমুদযেব কিযদংশ আমাকে প্রদান কব। ইভ্য তাঁহাকে সেই সমুদয প্রদান কবিযা জিজ্ঞাসা কবিল, "এই পানীয দিব কি"? উষস্তি বলিলেন, " তাহা হইলে আমাব উচ্ছিষ্ট পান কবা হইবে"।

'ইভ্য বলিল, " মাষকলায কি উচ্ছিষ্ট নহে?" উষস্তি বলিলেন, " ইহা না খাইলে আমি বাঁচিতাম না, কিন্তু জলপান আমাব ইচ্ছাধীন।"

'উষস্তি মাষকলায ভক্ষণ কবিযা অবশিষ্টাংশ স্ত্রীব জন্য লইযা আসিলেন। কিন্তু স্ত্রী পূর্বেই উত্তম ভিক্ষা প্রাপ্ত হইযাছিলেন। সুতবাং সেই মাষকলায তিনি বাখিযা দিলেন।

'পবেব দিন প্রাতঃকালে উষস্তি নিদ্রাত্যাগ কবিযা স্ত্রীকে বলিলেন, "হায ! যদি কিঞ্চিৎ অন্ন পাইতাম, তাহা হইলে তাহা আহাব কবিযা বাজসমীপে যাইতে পাবিতাম, কিছু অর্থলাভ হইত। ঐ বাজা যজ্ঞ কবিবেন, ঋত্বিকগণেব সমুদয কায সম্পাদনেব জন্য তিনি আমাকে ববণ কবিতে পাবিতেন।"

'স্ত্রী বলিলেন, "হে পতি ! এইখানে মাষকলায বহিযাছে।" উষস্তি তাহা খাইযা প্রাবব্ধ যজ্ঞে গমন কবিলেন।

'তিনি যজ্ঞস্থলে গমন কবিযা স্তোত্র পাঠকাবী উদ্‌গাতৃগণেব সম্মুখে উপবেশন কবিলেন।'

উষস্তি বসে থাকতে থাকতে বেদপাঠ সম্পর্কে কযেকটি জ্ঞাতব্য বিষয আলোচনা কবে নিতে হবে, কাবণ তা না হলে এই 'উদ্‌গা' বা পবেব কথাগুলিব অর্থ সব বোঝা যাবে না। যজ্ঞকালে যাঁবা যজ্ঞকার্য অনুষ্ঠান কবতেন, তাঁদেব বলা হত ঋত্বিক, যাঁব জন্য যজ্ঞ

অনুষ্ঠান হচ্ছে তাঁকে বলা হত যজমান। এই প্রসঙ্গে এখানে একটু বলে বাখা দবকাব, ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায দেখিযেছেন যে 'যজমান' সংস্কৃত শব্দটিব মূল অর্থ যেহেতু 'যিনি নিজে যজ্ঞ কবেন,' সুতবাং বলা যায আদিতে অপবেব মঙ্গলেব জন্য যজ্ঞকাবী ঋত্বিকেব কোনও ভূমিকা ছিলনা, তখন যজমান নিজেই যজ্ঞ কবতেন। এই ঋত্বিক তথা পুবোহিত নামক মধ্যস্থ শ্রেণীব উদ্ভব হযেছিল পবে। যাই হোক, এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ, পবে আলোচনা কবা যাবে। এই ঋত্বিকদেব মধ্যে শ্রেণী বিভাগ ছিল। যিনি প্রশস্তি পাঠ কবতেন তিনি হোতা, তাঁব পাঠ কবা মন্ত্রগুলি হল ঋক্ সংহিতা। যিনি গান গেযে স্তুতি কবতেন, তিনি উদ্‌গাতা, তাঁব গীত মন্ত্রগুলি হল সাম সংহিতা। যিনি আহুতি দিতেন তিনি অধ্বর্যু, সেই আহুতিব মন্ত্রগুলিই যজুঃ সংহিতা।

ঋত্বিকদেব মধ্যে সামবেদজ্ঞ এই দ্বিতীয ধবণেব 'উদ্গাতা' নামেব যে গাযকদেব কথা বলা হল, তাঁদেব মধ্যে আবাব শ্রেণী বিভাগ আছে। যখন যজমানবা প্রকৃত অর্থে যজমান ছিলেন অর্থাৎ নিজে যজ্ঞ কবতেন, বাহ্মণ আবণ্যক উপনিষদেব যুগে তাব থেকে অনেকদূব এগিযে এসেছি আমবা, ঋত্বিকদেব মোট শ্রেণী বিভাগ এখন ষোল। এই ষোড়শ ঋত্বিকদেব মধ্যে যাঁবা উদ্গাতা ছিলেন অর্থাৎ যাঁবা সামগান কবতেন, তাঁদেব মধ্যে ছিল পাঁচ ভাগ। সামেব প্রথম ভাগ বা প্রস্তাব যিনি গান কবতেন তিনি প্রস্তোতা, যিনি দ্বিতীয ভাগ বা উদ্গীথ গাইতেন তিনি উদ্গাতা, আব যিনি তৃতীয ভাগ বা প্রতিহাব মন্ত্র গান কবতেন তিনি প্রতিহর্তা। এবাবে এস, উষস্তি আখ্যানে ফিবে যাই।

' উষস্তি উদ্গাতৃগণেব সম্মুখে উপবেশন কবিযা প্রস্তোতাকে বলিলেন, " হে প্রস্তোতঃ! যে দেবতা প্রস্তাবেব অনুগমন কবেন, তাঁহাকে না জানিযা যদি প্রস্তাব গান কব তবে তোমাব মস্তক নিপতিত হইবে।" এই প্রকাবে উদ্গাতাকে বলিলেন, " যে দেবতা উদ্গীথেব অনুগমন কবেন, সেই দেবতাকে না জানিযা যদি উদগান কব তা হইলে তোমাব মস্তক নিপাতিত হইবে"। এই রূপে প্রতিহর্তাকেও বলিলেন, "হে প্রতিহর্তা! যে দেবতা প্রতিহাবেব অনুগমন কবেন, সেই দেবতাকে না জানিযা যদি প্রতিহাব কর্ম কব, তোমাব মস্তক নিপাতিত হইবে।" অনন্তব তাহাবা সকলেই স্বকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইযা নীববে অবস্থান কবিল।

'অনন্তব যজমান তাঁহাকে বলিলেন, "আমি আপনাব পবিচয জানিতে ইচ্ছুক।" উষস্তি বলিলেন, "আমি চক্রেব পুত্র উষস্তি"।

'যজমান বলিলেন, " আমি এই সমস্ত ঋত্বিককর্মেব জন্য আপনাকে সর্বত্র অন্বেষণ কবিযাছিলাম, আপনাব সন্ধান পাই নাই বলিযা অন্য সকল লোককে ববণ কবিযাছি। আপনিই আমা'ব সমুদয ঋত্বিককার্যেব ভাব গ্রহণ করুন।" উষস্তি বলিলেন, " তাহাই হউক। এখন ইহাবাই আমাব অনুমতিতে স্তুতি গান করুক। আপনি ইহাদিগকে যে পবিমাণ অর্থ দিবেন আমাকেও সে পবিমাণ অর্থ দিবেন।" যজমান বলিলেন, " তাহাই হইবে।"'

এবপব যজ্ঞ তো ভালয ভালয হল। যজ্ঞ শেষে সেই তিন ঋত্বিক — প্রস্তোতা, উদ্গাতা ও প্রতিহর্তা–একে একে এসে উষস্তিকে প্রশ্ন কবলেন যে, যে দেবতাকে না জেনে ঋত্বিক–কর্ম কবলে তাদেব ষমস্তক নিপাতিত হবে বলে তিনি বলেছিলেন, সেই দেবতাবা কাবা।

উষস্তি প্রস্তাব, উদ্গীথ ও প্রতিহাবেব অনুগামী দেবতাদেব নাম যথাক্রমে বললেন, প্রাণ, আদিত্য এবং অন্ন।

উষস্তি চাক্রাযণেব আখ্যাযিকা এখানেই শেষ। লক্ষ্য কবে দেখ, এই কাহিনীতে আধ্যাত্মিকতাব নামগন্ধ নেই। এই উপাখ্যানে এবং উপনিষদেব অন্যত্র বহুস্থলে বিশ্বশক্তিব মূল উপাদান হিসেবে দেহ, প্রাণ, ক্ষিতি অপ প্রভৃতি পঞ্চভূত, আদিত্য অর্থাৎ সূর্য এবং অন্নেব জযগান গাওযা হযেছে। বস্তুত অন্নেব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই ছান্দোগ্য উপনিষদেব এই উষস্তি আখ্যাযিকাব লক্ষ্য। নীচ জাতীয ইভ্যেব কাছ থেকে প্রাণ বক্ষার্থ ক্ষুধাতুব ব্রাহ্মণেব উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ, পবদিন পুনবায সেই অন্ন খেযেই বাজসভায যজ্ঞার্থ গমন এবং উদ্গাতৃ গণেব কাছে অন্নেব মাহাত্ম্য কীর্তন–কাহিনীব এই ঘটনাগুলি এই সাদা কথাটাই স্পষ্ট কবে তুলতে চাইছে যে না খেযে ধর্মাচবণ সম্ভব নয। পবে আমবা দেখব, উপনিষদে এ কথা বাববাব উচ্চাবিত হযেছে যে অন্নই ব্রহ্ম। আমবা এও দেখব যে এইভাবে তৎকালীন নানা বস্তুবাদী ও ভাববাদী চিন্তাব মধ্যে উপনিষদে এক সমন্বয সাধনেব চেষ্টা হযেছে। আমাদেব দেশেব সে যুগেব দার্শনিক চিন্তাব পবিমণ্ডলে হিন্দু ষড়দর্শনেব 'আধ্যাত্মবাদী' বেদান্ত ছাড়া অন্য পাঁচটি দর্শন, বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি নিবীশ্ববাদী ভাবনা, বস্তুবাদী 'চার্বাক দর্শন' প্রভৃতিব যে আধিপত্য ছিল এবং সমগ্র উপনিষদ গীতা পুবাণে তাব যে এক ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীন আত্মীকবণেব প্রযাস দেখা যায, এ ব্যাপাবে তখন বিচাব কবা যাবে। তাব আগে এই উষস্তি আখ্যাযিকায প্রতিফলিত সমাজেব ছবিটি একটু তলিযে দেখা যাক।

প্রথমেই পাচ্ছ শিলাবৃষ্টিব ফলে দুর্ভিক্ষ, তণ্ডুল জাতীয খাদ্যেব অভাবে সাধাবণ গ্রামবাসীদেব মাষকলায ইত্যাদি খেযে প্রাণ ধাবণেব ছবি। অপব দিকে সমাজেব উচ্চতম স্থানে বযেছেন বাজা, যাঁব অর্থেব অভাব নেই, বৈদিক যজ্ঞেব বিশাল এবং ব্যযবহুল অনুষ্ঠানে তিনি অর্থ নিযোগ কবছেন এবং তাব মধ্য দিযে সমাজেব পবগাছা শ্রেণী পুবোহিতবা অর্থাগমও কবে নিচ্ছেন, যদিও তাঁবা তাঁদেব উচ্চাবিত মন্ত্রেব অর্থ বা তাৎপর্য কিছুই জানেন না। যাগযজ্ঞেব এই সব অর্থহীন ও তাৎপর্যহীন আচাবেব বিরুদ্ধেই বৌদ্ধধর্ম ছিল এক প্রতিবাদ স্বরূপ, তা আমবা জানি। এখানে দেখা যাচ্ছে উষস্তিও এক ধবণেব প্রতিবাদ কবছেন, যদিও যজ্ঞ বর্জন কবছেন না এবং এই প্রতিবাদ কবছেন বুদ্ধেব মত যুক্তি ও করুণা দিযে নয, জ্ঞানেব মদগর্ব দিযে। বোঝা যাচ্ছে এই বিশেষ ব্রাহ্মণ ব্যক্তিটিব কিঞ্চিৎ নাম ডাক ছিল, বাজা তাঁকে খুঁজেও ছিলেন এবং সেই নাম ডাকেব জোবেই তিনি অন্যান্য অক্ষম, বুলি সর্বস্ব, নির্বোধ ঋত্বিকদেব মুখ বন্ধ করে দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য কুরুপাঞ্চালেব ব্রাহ্মণদেব মধ্যে যা কবেছিলেন, উষস্তি তাবই এক ক্ষুদ্রতব সংস্কবণ অভিনয কবলেন। হাঁক দিলেন, না জেনে যিনি মন্ত্রপাঠ কববেন, তাঁব 'মস্তক খসিযা পড়িবে'। এভাবে উষস্তি দক্ষিণা ট্যাকস্থ কবলেন।অবশ্য অন্য ঋত্বিকদেবও দক্ষিণা থেকে বঞ্চিত কবলেন না, হযত ভাবলেন যে সহব্যবসাযীব পেটে হাত দেওযা উচিত হবেনা এবং হযত এদেব ওপব আধিপত্য বিস্তাবেব কৌশল হিসেবেই তা কবলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, উষস্তিই যে সব অর্থ জানেন, তাব স্থিবতা কী ? কাবণ আমবা ঐ একই উপনিষদে এবং অন্য সব উপনিষদেই দেখেছি যে, ঔপনিষদিক বিচাবে 'পবম ব্রহ্মে'ব জ্ঞানই সর্বোত্তম, অন্য সমস্ত জ্ঞান ও কর্মই নিম্নস্তবেব। অতএব বলা যায যে উপনিষদেব নিজস্ব নিবিখেই এই সব যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি ছিল অর্থহীন, কিন্তু উপনিষদে তা বন্ধ কবে

দেওযাব কথা বলা হযনি। কাবণ, তা হলে দক্ষিণা বন্ধ হযে যাবে যে! বাজা ও তাঁব যজ্ঞ টিকে থাকুক, ব্রাহ্মণ তা থেকে অর্থ উপার্জন করুন, আবাব তাবই অবসবে ব্রহ্ম জ্ঞানেব ও মোক্ষলাভেব আলোচনাও হোক —এই হল উপনিষদেব আপোস ফর্মুলা।

আজও যেমন আমবা পুবোহিতদেব দব কষাকষি কবতে এবং যজমানেব কাছ থেকে যথাসম্ভব আদায কবে নেওযাব জন্য তাদেব চোখগুলিকে লোভে চকচক কবে উঠতে দেখি, উপনিষদেও দেখছি সেই একই ছবি। এখানে 'উচ্চ চিন্তা' অর্থাগমেব উপায মাত্র। দেখতেই পাচ্ছ বুদ্ধ কবিব নানক বামকৃষ্ণ বা যীশুখ্রীস্টেব উচ্চ চিন্তাব সঙ্গে এব একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। বেদ বা উপনিষদেব শিক্ষা যে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধকে আকৃষ্ট কবতে পাবেনি, লোভপবাযণতা ও আচাবেব ছদ্মবেশে অর্থ গৃধ্নতা তাব একটা কাবণ। বুদ্ধ সুযোগ পেলেই তাঁব বলা গল্পগুলিতে লোভী, আধিপত্য পবাযণ, আচাব সর্বস্ব, যজ্ঞকাবী ব্রাহ্মণেব নিন্দা কবেছেন। সে কথায পবে আসব।

লক্ষ্য কবে দেখ, উপনিষদেব ব্রহ্মজ্ঞানীদেবও আজকেব শাস্ত্রকাবদেব মতই আচাব-বিচাবেব জ্ঞান ছিল কেমন টনটনে। উষস্তি সেই গ্রাম্য মানুষটিব উচ্ছিষ্ট মাষকলায খেতে পাবেন, কিন্তু তাব ছোঁযা জল খেতে তাঁব আপত্তি; কেননা প্রথমটি তাঁব জীবনধাবণেব জন্য জরুবি, কিন্তু দ্বিতীযটি তা নয। এই মতলববাজি, স্বীয স্বার্থেব জন্য নিযম তৈবি কবা, হিন্দু সমাজেব উপবতলাব এক 'প্রিভিলেজ' বিশেষ। আমাদেব উঁচু জাতেব ঘব অন্ত্যজদেব প্রবেশে অপবিত্র হযে যায, কিন্তু তাদেব হাতেব মমতা মাখানো ধান, তাদেব তাঁতে বোনা কাপড় আব জালে ধবা মাছ কিন্তু অশুচি নয। শূদ্রদেব বানানো ঘবে বাস কবতে কিংবা মুসলমানেব তৈবি মন্দিবে দেবাবতিতে কোনও আপত্তি নেই। যাবা অশুচি ও অস্পৃশ্য সে সমাজেব নাবীদেব ধর্ষণে শাস্ত্রানুসাবীবা অপবিত্র হয না! এই দুমুখো নীতি, প্রখব স্বার্থ পবাযণ 'বাস্তব বুদ্ধি' আমাদেব উঁচু তলাব মানুষদেব 'নীতিবোধ'কে এমনই কলুষিত কবেছে যে, হাজাব হাজাব বছব ধবে তা সমাজেব ছাড়পত্র পেযে এসেছে। আধ্যাত্মবাদেব মিথ্যা গবিমা ত্যাগ কবে এই হীনতাব মূলানুসন্ধান ও সমাজেব আমূল পবিবর্তনই কি আজ অত্যন্ত জরুবি বলে মনে হচ্ছে না?

॥ বাইশ ॥

আবাব হাং পার্লামেন্ট। বাংলা ভাষায একটা নতুন কথাই চালু হযে গেল, ত্রিশঙ্কু পার্লামেন্ট। এত কাণ্ডেব পবও ভোটাববা চোখ বুজে কাউকে একমাত্র ববণীয় বলে মেনে নিতে পাবল না। ভাবতবর্ষেব বাজনীতিতে এ জিনিসটা নূতন। ইতিপূর্বে একবাব জনতা পার্টি যখন পুবো সময টিকে থাকতে ব্যর্থ হল, তখন ইন্দিবা গান্ধী স্থাযী সবকাবেব স্লোগান তুলে বিপুল সংখ্যাধিক্য নিযে ক্ষমতায ফিবে এসেছিলেন। পবে আবাব যখন ইন্দিবা গান্ধী নিহত হলেন, তখন তাঁব যে দল হেবে ভূত হবাব কথা, সেই দলই পার্লামেন্টে অভূতপূর্ব সংখ্যাগবিষ্ঠতা পেযে গেল। বাজনীতিব পবিভাষায একে বলা হল 'সিমপ্যাথি ওযেভ' বা 'সহানুভূতিব ঢেউ'। এবাবে তো এই দুটি 'যোগ'ই একসাথে ছিল। বিবোধীবা এক বছবও সবকাব চালাতে ব্যর্থ হযেছে এবং তদুপবি তরুণ বাজীব গান্ধী নৃশংস ভাবে নিহত হযেছেন যা ইন্দিবা গান্ধীব মৃত্যুব চেযেও আকস্মিক ও শোকাবহ।

অথচ এই দুই ঘটনা মিলেও কোনও কটাল দূবেব কথা ঢেউও সৃষ্টি হল না, 'স্থায়ী শাসনে'ব দাবিদাব দলটি টেনেটুনেও নিবঙ্কুশ সংখ্যাগবিষ্ঠতা অর্জন কবতে পাবল না। বিবোধী বাম গণতান্ত্রিক জোটেব ওপবেই তাব স্থাযিত্ব নির্ভবশীল হযে বইল। এই ঘটনাব তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা কববে? মানুষ স্বভাবতই স্থাযিত্ব চায, শান্তি চায, সুখ না হলেও অন্তত সোযাস্তি পছন্দ কবে। তাহলে এই সমস্ত স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছুঁড়ে ফেলে দিযে দেশবাসীব এমন মবিযা হযে ওঠাব কাবণ কী ? তাবা কেন আব এমনকি স্থাযিত্বেব ও সোযাস্তিব জন্যও পুবনো শাসক দলকে ফিবিযে আনতে চাইছে না ? সুখ নেই, তবু সোযাস্তিব মোহ নেই,- এ তো বীতিমত এক বিদ্রোহ। বাজনীতিক ভাষ্যকাববা অঙ্কেব খেলায মেতে আছেন, দেশবাসীব অন্তবাত্মাব এই অন্তর্লীন বিদ্রোহকে বুঝতে চাইছেন না।

আমাদেব দেশে আজ শাসকশ্রেণী দেউলিযা হযে পড়েছে এবং দেশেব জনসাধাবণ আব পুবনো ধাবায শাসিত হতে চাইছে না, এমন কি অনিশ্চয ভবিষ্যতেব বিপদ দেখেও না। অতএব, একে বৈপ্লবিক অবস্থা বলা যায বৈ কী। কিন্তু, বিপ্লব স্বতঃসিদ্ধ নয, বিপ্লবেব জন্য প্রস্তুত এবং বিপ্লব এগিযে নিযে যেঁতে সক্ষম একটি দলেব অস্তিত্ব প্রযোজন। সেটি কোথায ?

আমাদেব দেশে বামপন্থী শক্তি নানা কাবণে বিপ্লবী শক্তি হবাব মত ক্ষমতা অর্জন কবেনি। কমিউনিস্টদেব এ ব্যাপাবে আত্মসমালোচনাব ও আত্মানুসন্ধানেব প্রযোজন আছে। দীর্ঘ দিনেব পার্লামেন্টমগ্নতা শ্রমিকশ্রেণীব জঙ্গি প্রতিনিধি হিসেবে কমিউনিস্টদেব কতটা চবিত্র স্খলন ঘটিযেছে সেটাও বিচাবেব প্রযোজন। যদিও সে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ভ্রান্তিব হিসেব নিকেশ কবাব কাজ আমাদেব নয, তাহলেও আমাদেব যা ভাবিযে তুলছে তা হল এই সর্বব্যাপক হতাশা, উদ্দেশ্যহীনতা ও মবিযা মনোভাব, যা বারুদেব স্তূপেব মত যে কোনও দিন ফ্যাসিস্টদেব আগুন নিযে খেলায প্রলযংকব বহ্ন্যুৎসব ঘটাতে পাবে।

এবাবেব নির্বাচনে যে সাম্প্রদাযিক দলটি যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি কবে নিযেছে, তাব বিপদ সম্পর্কে যে কোনও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই বিচলিত বোধ না কবে পাবেন না। কিন্তু আমি বলব তাদেব এই প্রসাব যতটা তাদেব নিজেব জোবে, তাব চেযে বেশি তা হল সাধাবণ মানুষেব বিক্ষোভেব বহিঃপ্রকাশ–শুধু দেশেব শাসক দলেব বিরুদ্ধে নয, বামপন্থীদেব ব্যর্থতাব বিরুদ্ধেও । না হলে কল্পনা কবতে পাব, পশ্চিমবঙ্গেব মত বাজ্যে যে দল অধিকাংশ বুথে কোনও এজেন্ট পাঠাতে পাবেনি, ভোটাব স্লিপ দিতে পাবে নি, স্রেফ হাওযায তাবা হাজাবে হাজাবে ভোট কেড়ে নিল? যাবা হেবে গেলেই শুধু 'বিগিং বিগিং' কবে চিল্লায তাবা মানুষেব মনেব খবব কিছুই বাখেনা। এই হাজাব হাজাব মানুষ কি বাতাবাতি 'সাম্প্রদাযিক' হযে গেছে? তাদেব ধর্মচেতনায মিথ্যে কথা বলে আঘাত দেওযা হযেছে, হিন্দুত্বেব অভিমানকে জাগিযে দেওযা হযেছে ঠিকই, কিন্তু মিথ্যা অভিমান আসে হতাশা ও ব্যর্থতা বোধ থেকে। দেশেব স্বাধীনতাব পঁযতাল্লিশ বছব পবেও দেশেব বিপুল সংখ্যাগবিষ্ঠ হিন্দু যখন আমাদেব দেশেব অন্ধকাবে পড়ে থাকা হতদবিদ্র ক্ষীণজীবী ধর্মীয সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদেব ভয পাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে, তাবা কঠিন অবলম্বন হাবিযেছে। এতদিনকাব শাসক দল আজ দুর্বল, বিগতযৌবন, অন্য প্রগতিশীল বিকল্পও আদৌ সবল হযে ওঠেনি। এই অবস্থাব নিবসন খুবই জরুবি। তবে, তাব বাজনৈতিক

স্ট্র্যাটেজি, সংগ্রামের কৌশল বা বিপ্লবের তত্ত্ব আমাদের আলোচ্য নয়, সেটা ভাববেন বিপ্লবীরা। আমাদের কাছে আজ যে বিষয়টির তাত্ত্বিক বিচার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে, তা হল আমাদের ইতিহাস, ধর্ম এবং ঐতিহ্য। প্রতিপক্ষের মিথ্যাচারকে ঠেকাতে তা একান্ত জরুরি। এ কাজে একটা সুবিধার বিষয় এই যে হিন্দুধর্মে মৌলবাদের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং এই দুর্বল স্থানেই তাকে আঘাত করতে হবে।

আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর। মৌলবাদ কথাটা আজকাল বেশ চালু হলেও বাংলা ভাষায় শব্দটি নবাগত। কথাটি এসেছে ইংরেজি 'ফাণ্ডামেন্টালিজম' থেকে। যে মতবাদ সংস্কার বিরোধী, শাস্ত্রের কোনও শব্দই পরিবর্তন করতে চায়না, সর্বপ্রযত্নে মূলকেই আঁকড়ে থাকতে চায়, ইংরেজিতে তাই ফাণ্ডামেন্টালিজম, যার বাংলা মৌলবাদ। এখন হিন্দুধর্মের মূল কী? অন্য ধর্মের মত হিন্দুধর্মে কোনও বাঁধাধরা শাস্ত্র নেই। আগে আমি তোমায় দেখিয়েছি, হিন্দুর কাছে প্রকৃত পক্ষে সনাতন ধর্ম বলে কিছু নেই, যুগে যুগে তা পালটেছে এবং তদনুযায়ী শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুর দেবতা শুধু রাম নয়, দেবতা তেত্রিশ কোটি। ব্রহ্মই শুধু উপাস্য নয়, অন্যও উপাস্য হতে পারে। কোনও দেবতাকে না মেনেও হিন্দু হওয়া যায়। হিন্দু চিন্তাধারার এই বহুমত মৌলবাদের দৃঢ় ভিত্তি রচনার পক্ষে এক বাধা স্বরূপ।

এই প্রসঙ্গেই আমরা যে কথা আলোচনা করছিলাম সেটায় ফিরে আসছি। উপনিষদ বা বেদান্ত সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। প্রথমটি নিয়ে কিছু তর্ক বিতর্ক হল, এবার দ্বিতীয় যে ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা বলেছিলাম তা হল এই যে অনেকেই মনে করেন বেদান্তই বুঝি হিন্দুদের একমাত্র বা প্রধান দর্শন। ঘটনাটা আদৌ তা নয়, এমনকি যে উপনিষদের ওপর বেদান্তসূত্র দাঁড়িয়ে, তাও একটি সমরূপ দার্শনিক মতের দর্পণ নয়, বহু বিপরীত মতের এক অদ্ভুত সমাহার। ব্যাপারটা একটু বিশদ করেই বলি। তাতে যদি কিছু কচকচি এসে যায়, ক্ষমা করো।

হিন্দু শাস্ত্রের প্রস্থান ত্রয়ের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই প্রস্তান ত্রয় বা ত্রিধারা হল ঃ শ্রুতি প্রস্থান, ন্যায় প্রস্থান, স্মৃতি প্রস্থান। শ্রুতি প্রস্থানের মধ্যে রয়েছে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য। এই শ্রুতিকে সাধারণভাবে বলা যায় ঐশ্বরিক বাণী, অন্যান্য ধর্মে যাকে বলে 'রিভিলেশন' বা প্রত্যাদেশ। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় এক বক্তৃতায় গর্ব করেই বলেছেন যে অন্য ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের পার্থক্য হল এই যে বেদ কোনও 'ব্যক্তি ঈশ্বর'– কোনও ঈশ্বর বা আল্লা বা গডের–কোনও প্রত্যাদেশ নয়। এই সত্যগুলি চিরন্তন। মুনি ঋষিরা হলেন 'মন্ত্রদ্রষ্টা', তাঁরা তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি বলে এই সত্যগুলিকে 'দর্শন' করেছিলেন, কোনও ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করেন নি। বিবেকানন্দ বলছেন এই ঋষিরা ছিলেন নিষ্কলঙ্ক ত্রুটিশূন্য পূর্ণ মানুষ এবং তাঁদের 'দৃষ্ট' এই মন্ত্রগুলি তাই প্রামাণ্য। হিন্দু ধর্মে এই 'শ্রুতি প্রস্থান' সমস্ত জিজ্ঞাসার অতীত, এর মধ্যে রয়েছে বেদসংহিতা বা চতুর্বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। প্রথম দুটি অর্থাৎ সংহিতা আর ব্রাহ্মণ নিয়ে কর্মকাণ্ড, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি তার অঙ্গীভূত। অপর পক্ষে উপনিষদ জ্ঞান কাণ্ড, ব্রহ্মবিদ্যাই এর অন্বিষ্ট। আরণ্যকের অবস্থান এই দুয়ের মাঝামাঝি।

এর মধ্যে আবার ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিদ্যা হল 'পরা বিদ্যা'–সর্বোত্তম জ্ঞান, আর অন্যগুলি 'অপরা বিদ্যা' বা তুলনায় নিকৃষ্ট। এইভাবে গোড়াতেই একদিকে 'শ্রুতি প্রস্থান'কে

প্রামাণ্য বলা হচ্ছে, আবাব অন্যদিকে তাব মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টেব ভাগ মেনে নিয়ে তথাকথিত প্রামাণ্যেব মধ্যেও বিবোধ সৃষ্টি কবা হচ্ছে। তাই এই প্রামাণ্য নিযেও হিন্দুধর্মে বিতর্কেব শেষ নেই। এই বিতর্কেব কিছু নমুনা আমবা পবে দেখব। আপাতত এটা বলা যেতে পাবে, হিন্দুধর্মেব এটা এক দুর্বলতা এবং সবলতাব দিক যে এতে প্রকৃতপক্ষে 'ঐশ্ববিক' ও চূড়ান্ত প্রামাণ্য বলে কিছু নেই। আব যেখানে চূড়ান্ত প্রামাণ্য বা নিঃসংশয মূল অনুপস্থিত সেখানে মৌলবাদ দাঁড়াবে কিসেব ওপবে ?

'ন্যায প্রস্থান'ও স্বভাবতই এই বিবোধে আকীর্ণ। ষড়দর্শন বা তিন জোড়া দর্শন নিযে ন্যায প্রস্থান। এই তিন জোড়া দর্শনেব নাম তুমি জান। সাংখ্য ও যোগ, ন্যায ও বৈশেষিক এবং পূর্ব মীমাংসা ও উত্তব মীমাংসা বা বেদান্ত—এই হল হিন্দু ষড়দর্শন। এই প্রতিটি দর্শনেব সঙ্গে একজন কবে মুনিব নাম যুক্ত বযেছে, যদিও এই মুনিদেব জীবনকাল বা তাঁবাই এই বিশেষ দর্শনেব স্রষ্টা কিনা তা সঠিক নির্ণয কবা যায না। সূত্রাকাবে গ্রথিত বিভিন্ন মুনিব নামে বচিত গ্রন্থসমূহ ও সেইগুলিব টীকা ও ভাষ্য থেকে কপিলেব সাংখ্য, পাতঞ্জলিব যোগ, গৌতমেব ন্যায, কণাদেব বৈশেষিক, জৈমিনীব পূর্বমীমাংসা ও বাদবাযণেব বেদান্তসূত্রেব কথা আমবা জানি। ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায তাঁব What is Living and What is Dead in Indian Philosophy গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা কবে দেখিযেছেন যে এই দর্শনগুলি কিভাবে পবস্পবেব সঙ্গে তীব্র বাগবিতণ্ডা কবে ভাবতীয দর্শনশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ কবেছে। ঐ অসাধাবণ গ্রন্থটি অবশ্যই একবাব পড়ে দেখ। বলা বাহুল্য সে সব আলোচনায আমবা এখানে প্রবেশ কবছিনা। আমি শুধু দেখাতে চাইছি যে বেদান্তই একমাত্র বা প্রধানতম হিন্দু দর্শন নয, তাব বিরুদ্ধে বহু মতবাদ আছে এবং সেইসব মতবাদ ভাবতীয ঐতিহ্যে শ্রদ্ধেয মুনি ঋষিদেবই সৃষ্টি। কপিলেব সাংখ্যেব কথাই ধব। অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দেব সম্পূর্ণ বচনাবলীব তৃতীয খণ্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশেব ইংবেজিব অনুবাদ আমি এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

'ভাবতবর্ষেব প্রতিটি দর্শন ও প্রতিটি তন্ত্র কপিলেব নিকট প্রভূত পবিমাণে ঋণী। ভাবতেব ইতিহাসে মনীষা ও দর্শনেব ক্ষেত্রে কপিলই সম্ভবত মহত্তম পুরুষ,...হাজাব হাজাব বছব ধবে তিনি উজ্জ্বল বিস্ময়কব মহিমায দণ্ডাযমান বযেছেন।' অথচ এই কপিলই হলেন শঙ্কব বচিত বেদান্ত ভাষ্যে প্রধান প্রতিপক্ষ, কাবণ, কপিলেব মতে প্রকৃতিই আদি কাবণ, ঈশ্বব নয। এই সাংখ্য ও অন্যান্য দর্শনগুলি নিযে আগামী দিনে আবও কিছু আলোচনা কবা যাবে। আজ শুধু পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত বিষযে একটি মজাব কথা বলেই শেষ কবছি।

ষড়দর্শন হিন্দুধর্মে স্বীকৃত হবাব কাবণ তাবা প্রত্যেকেই ঈশ্ববকে স্বীকাব করুক বা নাই করুক, বেদকে প্রামাণ্য বলে মানে, ডঃ দেবীপ্রসাদ দেখিযেছেন অন্তত 'মুখেব কথায মানে'। আব এই দর্শনগুলিব মধ্যে সবচেযে বেশি বেদ-নষ্ঠ হল পূর্বমীমাংসা ও উত্তব মীমাংসা বা বেদান্ত। অথচ এই দুটি দর্শন মতবাদেব দিক থেকে একটি অপবটিব সম্পূর্ণ বিপবীত। এদেব বিবোধ সেই কর্ম ও জ্ঞান নিযে। পূর্বমীমাংসা কর্মে, ইহলৌকিক সুখে বিশ্বাসী, মোক্ষ নিযে তাব মাথা ব্যথা নেই। অপবপক্ষে বেদান্তেব অভিষ্টই মোক্ষ, কর্মেব বন্ধন থেকে মুক্তি। তাব চোখে পূর্বমীমাংসাব ক্রিযাকর্মেব জ্ঞান হল অপবা বিদ্যামাত্র, অর্থাৎ পাঠশালাব জ্ঞান, উচ্চচিন্তা নয।। বেদান্তে ব্রহ্মই সর্বোত্তম, পূর্বমীমাংসায কোথাও ব্রহ্ম নেই, দেবতাবা আছেন। কিন্তু সেই দেবতাবাও বযেছেন পার্শ্ব চবিত্রে, তাঁবা নিযন্তা

নন। মীমাংসা সূত্রেব দ্বিতীয় অধ্যাযেব নবমসূত্র অনুযায়ী এক 'অপূর্ব' শক্তি কর্মফলেব স্রষ্টা এবং নবম অধ্যাযেব নবম সূত্রে জৈমিনী পবিষ্কাব বলছেন এক্ষেত্রে দেবতাব স্থান 'গুণীভূত' অর্থাৎ গৌণ। বেদেব একনিষ্ঠ অনুসাবী দুটি দর্শনে যখন এত আকাশ পাতাল প্রভেদ, তখন অন্যগুলিব হাল বুঝতেই পাবছ।

॥ তেইশ ॥

জুন শেষ হতে চলল। ছমাস আগে জানুযাবিব শুরুতে তোমাব সাথে এই পত্র বিবাদ শুরু হযেছিল। কোনও এক মোক্ষপিপাসু গেরুযাধাবী সন্ন্যাসীব ধাক্কায হাত পা ভেঙে শয্যাশাযী হযে সেই তোমাকে প্রথম একখানা চিঠি লিখেছিলাম। তাবপব আমাদেব উত্তব প্রত্যুত্তবে এই তর্কেব আসব বেশ জমে উঠেছে। বিছানায শুযে থাকাব অখণ্ড অবসবেব ফলে যে পত্র বিনিমযেব সূত্রপাত, সেই অবসব এখন নেই, কিন্তু পত্রালাপ চলছে। কিবকম জান? সাংখ্যদর্শনেব একটা উপমাব কথা বলি। সাংখ্যে এবং ভাবতীয অন্যান্য দর্শনেও জীবন্মুক্ত পুরুষেব কথা বলা হযেছে। প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন কবে মানুষ যখন জীবিতকালেই পৃথিবীব বন্ধন থেকে মুক্ত হযে যায, তখন সে জীবন্মুক্ত। সাংখ্য বলছে, জীবন্মুক্ত পুরুষও কিন্তু কর্ম কবে যায, যদিও তাব আব কোনও লাভালাভেব আসক্তি থাকে না, তাব কর্ম হয বাসনাশূন্য। সেটা কেমন? না, কুমোবেব চাকায মাটিব বাসন তৈবি শেষ হযে যাওযাব পবও যেমন সেই চাকাটি ঘুবতে থাকে, তেমনি। আমাদেব তর্কেব চাকাটিও আমাব শুযে থাকাব অবসব বিনোদনেব প্রযোজন শেষ হযে যাওযাব পবেও ঘুবছে।

সাংখ্যদর্শনেব এই আসক্তিশূন্য কর্মেব কথাই পবে উপনিষদেব ধাবা বেযে গীতায কৃষ্ণেব মুখ দিযে নিষ্কাম কর্মেব ঐশ্ববিক বাণী হযে বেবিযেছিল। সাংখ্যে কিন্তু কোনও ঈশ্বব নেই। প্রকৃতি নিজেই সেখানে সৃষ্টিব আদি কাবণ। সৃষ্টি কী? যা নেই, তাব সৃষ্টি হতে পাবে না। যা ছিল তাব রূপান্তব ঘটে মাত্র। তাই কোনও স্রষ্টা নেই। প্রকৃতিব বস্তু নিচযে সত্ত্বঃ, বজঃ, তমঃ,—এই তিনগুণেব মধ্যে যখন 'সাম্য' থাকে তখন তা 'অব্যক্ত' আকাবে থাকে। এই সাম্যেব অভাব ঘটলেই হয সৃষ্টি। ঐ ত্রিগুণ বস্তুব অতিবিক্ত কিছু নয, বস্তুবই ধর্ম। সুখ দুঃখ মোহ, কর্ম বৈবাগ্য প্রজ্ঞা কিংবা উল্লাস ক্রিযা নিষ্ক্রিযা সবই বস্তুব এই তিনগুণেব প্রকাশ। প্রকৃতি থেকেই মন কর্ম ভূতাদিব বিবর্তন, প্রকৃতিতেই রূপ বস শব্দ গন্ধ স্পর্শেব শক্তি থেকে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেব বিকাশ। এই দার্শনিক তত্ত্বেব নাম 'সৎকার্যবাদ,' কার্য প্রকৃতিতেই কাবণ রূপে 'সৎ' অর্থাৎ আছে,–এই হল এই দর্শনেব মূল কথা। প্রকৃতিতে কার্যেব নিবন্তব অস্তিত্বেব ফলেই বিশ্ব নিত্য চলমান।

মহাভাবতেব শান্তিপর্বে ২১৮তম অধ্যাযে সাংখ্যকাব মহর্ষি কপিলেব শিষ্য আসুবিব প্রধান শিষ্য পঞ্চশিখ কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশেব মধ্যে সৎকার্যবাদেব যে যুক্তি প্রণালীব উদাহবণ পাই, তা হল এই বকম ঃ 'যেমন একমাত্র বীজ মধ্যেই পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক ও রূপবসাদিব উৎপাদিকা শক্তি অন্তর্হিত বহিয়াছে, গাভীভুক্ত তৃণ ও উদক হইতে যেমন পৃথক স্বভাব সম্পন্ন দুগ্ধ ও ঘৃতেব আবির্ভাব হইতেছে, দ্রব্য নিচয দুই তিন বাত্রি সলিল মধ্যে নিহিত থাকিলেই যেমন তাহা হইতে মাদকতা শক্তি সমুৎপন্ন হয, তদ্রূপ একমাত্র

শুক্র হইতে বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত শরীর ও গুণাদি সমুদয় আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং সূর্যকান্ত মণি যেমন সূর্যরশ্মির সংযোগে অগ্নি উৎপাদন করে, তদ্রূপ জড়পদার্থ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই জ্ঞান জন্মে। তখন অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহকে পরিচালনা করে সেইরূপ ঐ জ্ঞান প্রভাবে ইন্দ্রিয় সমুদয় পরিচালিত হইতে থাকে। অতএব আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে'।

বেদান্তবাদী ব্যাসদেব রচিত মহাভারতে অবশ্য সাংখ্যদর্শন সম্মত এই স্বচ্ছ বস্তুবাদী ব্যাখ্যা পঞ্চশিখেরই অন্য নানা জটিল তর্ক বিতর্কে হারিয়ে যায়, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু প্রাসঙ্গিক যে কথা সেটা হল এই যে সেই সুদূর অতীতে ভারতীয় দর্শন চিন্তায় জড়বাদী বিচার পদ্ধতি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং তা বিবেকানন্দ কথিত এক 'মহত্তম ঋষি'র দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছিল। ঐ শান্তিপর্বেরই ৩০১ তম অধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে জানাচ্ছেন যে 'সাংখ্য মতাবলম্বীরা কহেন যে ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোনও প্রয়োজন নাই', আর তা সত্ত্বেও তাঁর মতে সাংখ্যমত 'শাস্ত্র প্রমাণ' এবং তা 'যথার্থ ও সাধু সম্মত' বটে। উদ্ধৃতিচিহ্নের ভিতরে মহাভারতের কথাগুলি কোনওটাই আমার কল্পনা নয়, আমার বাংলাও নয়, কারণ, সংস্কৃতে আমার বিদ্যার দৌড় বেশি নেই। নিশ্চয়ই বুঝেছ, এ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, অতএব প্রামাণ্য।

অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত' কাব্যের 'অরাড়-দর্শন' নামক দ্বাদশ সর্গে সাংখ্য মতাবলম্বী অরাড় মুনির সঙ্গে গৃহত্যাগী সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির আগে এক সাক্ষাৎকারের বর্ণনা রয়েছে। অশ্বঘোষ সম্ভবত খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন, তাঁর বর্ণনায় সাংখ্যমতের যথাযথ রূপটি নেই, কিন্তু এর দ্বারা সাংখ্যমতের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়, এটুকু বোঝা যায় যে কপিলমুনি বুদ্ধের অনেক আগেই জন্মেছিলেন। ধর্মানন্দ কোশাম্বি তাঁর 'ভগবান বুদ্ধ' গ্রন্থে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে বুদ্ধের ধর্মমত ও সংঘ তাঁর স্বকপোল কল্পিত নয়। সে সময়ে দেশে যে নানা চিন্তা, সামাজিক ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ধরণের যোগী বা ভিক্ষুদের অস্তিত্ব ছিল, তা থেকেই বুদ্ধের এক সমন্বিত ধর্মমতের উদ্ভব। কোশাম্বি ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সব নানা ধারার বর্ণনা দিয়েছেন এবং তার মধ্যে সাংখ্যমতেরও উল্লেখ আছে। তৎকালীন নানা চিন্তাধারার মধ্যে একটি ব্রাহ্মণ্য বৈদিক ধারাও ছিল, যদিও সেটি তখন এক অবরুদ্ধ জলার আকার ধারণ করেছে। অন্য অবৈদিক মতগুলি আর্য সংস্কৃতি থেকে ছিল ভিন্ন। বুদ্ধদেব এই শেষোক্ত ধারার অনেক কিছুই গ্রহণ না করলেও তার দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে কপিলের মতের উল্লেখ করা যেতে পারে। কপিলকে অনেকে বুদ্ধের পূর্বসূরী বলে বর্ণনা করেছেন। বুদ্ধের যা বৈশিষ্ট্য, কপিলের মধ্যে সেই অহিংসা ও বেদ বিরোধিতার ইঙ্গিত মহাভারত শান্তি পর্বের ২৬৮ তম অধ্যায়ের আখ্যায়িকায় তুমি পাবে। সেখানে আছে ঃ 'একদা মহর্ষি ত্বষ্টা নরপতি নহুষের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে, তিনি শাশ্বত বেদবিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদানার্থ গোবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় জ্ঞানবান্ সং"মী মহাত্মা কপিল যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া নহুষকে গোবধে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় শুভকারী নৈষ্ঠিকী বুদ্ধি প্রভাবে "হা বেদ" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন।' তখন স্যূমরশ্মি নামে এক মহর্ষি যোগ বলে সেই গো মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে কপিলকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনি বেদ বিহিত হিংসা অবলোকন করিয়া বেদে

অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু আপনি যে হিংসাশূন্য ধর্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, উহা কি বেদ বিহিত নহে"? কপিল উত্তরে বললেন, 'আমি বেদের নিন্দা করিতেছিনা.....। বেদে কার্য আরম্ভ করা ও না করা উভয়েরই বিধি আছে। ঐ বিধি দ্বারা কার্যের আরম্ভ ও অনারম্ভ উভয়ই দোষাবহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং বেদানুসারে কার্যের বলাবল বিবেচনা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব যদি তুমি বেদশাস্ত্র ভিন্ন যুক্তি বা অনুমান দ্বারা অহিংসা অপেক্ষা কোনও উৎকৃষ্ট ধর্ম স্থির করিয়া থাক, তাহা কীর্তন কর।'

কী বুঝলে ? 'আমি বেদের নিন্দা করিতেছি না' বলে নিয়ম রক্ষা করলেও কপিল স্পষ্টই বেদের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করলেন। যুক্তি ও অনুমান অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রসম্মত বিচারকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলছেন। তিনি সূম্যরশ্মির যুক্তিটাই ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বেদে এ-ও হয়, ও-ও হয়, অর্থাৎ তা পরস্পর বিরোধী, তাই অপ্রামাণ্য। তোমার অন্য যুক্তি থাকলে বল'। এই যুক্তি ও অনুমান সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলে রাখি। পরে বৈশেষিক ও ন্যায় সম্পর্কে আলোচনার সময় ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে একটু বিস্তারিত বলা যাবে। ভারতীয় ন্যায়ে জ্ঞানের চার রকম উৎসের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষের অর্থ বুঝতেই পারছ। অনুমানকে ইউরোপীয় 'লজিক'এ বলে 'ইনফারেন্স' অর্থাৎ যুক্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ জ্ঞান। উপমান অর্থ তুলনার সাহায্যে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ, অর্থাৎ তা অনুমানেরই প্রকার ভেদ। আর 'শব্দ' হল প্রামাণ্য সাক্ষ্য। বেদান্তে 'অনুমান'কে মানা হয়, কিন্তু তার স্থান নিচু তলায়। বেদান্তে গুরুত্বপূর্ণ হল 'শব্দ' আর 'প্রত্যক্ষ'—শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি বা বেদ, আর প্রত্যক্ষের পরাকাষ্ঠা ঋষির ধ্যানলব্ধ উপলব্ধি বা স্বজ্ঞা। অর্থাৎ বেদান্তে যুক্তির চেয়ে উপলব্ধি বড় আর সাংখ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল 'অনুমান' বা যুক্তি। কপিল তো স্পষ্টই বললেন, বেদ প্রমাণের চেয়ে যুক্তিই শ্রেষ্ঠ।

বুঝতেই পারছ, সাংখ্য মতটি আসলে অবৈদিক এবং বৌদ্ধধর্মের মতই তার মূল উৎস অনার্য। সাংখ্যদর্শনের অনার্য উৎস সম্বন্ধে আমাদের পুরাণাদিতে পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে। বায়ুপুরাণ ও পদ্ম পুরাণে বৈশেষিক, ন্যায় ও সাংখ্যের প্রবক্তাদের 'পাশুপত' অর্থাৎ পশুপতি শিবের শিষ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পদ্ম পুরাণ উত্তরখণ্ড ২৩৪তম অধ্যায়ে পাবে যে পশুপতি শিবই এইসব শাস্ত্রের প্রণেতা এবং কপিল, কণাদ ও গৌতমের সাংখ্য, বৈশেষিক ও ন্যায় শিবের অনুপ্রেরণায়ই রচিত। পশুপতি শিব বৈদিক দেবতা নন, মহেঞ্জোদারো হরপ্পায় ররং তাঁর মূর্তি পাওয়া গেছে। শেষ বেদ অথর্বে পশুপতির বন্দনা এসে ঢুকেছে, তার সঙ্গে ঢুকেছে ভূতপ্রেতাদি, ঝাড়ফুঁক, অপদেবতা, পিশাচ ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে পরে তোমায় বলব। অপাতত এটা আমরা মেনে নিতে পারি যে যেহেতু পশুপতি শিব বৈদিক দেবতা নন, অতএব 'পাশুপত' শাস্ত্র সাংখ্য ইত্যাদিও অবৈদিক ও তার উৎসটি হল অনার্য সভ্যতা।

অনার্য সভ্যতার প্রবল অভিঘাত উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে ও উপনিষদে যে কত ছড়িয়ে রয়েছে, সে সম্বন্ধে পরে তোমায় বিস্তারিত বলব। আপাতত দুএকটি কথা বলি। আদি বৈদিক সাহিত্য অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল। তোমাকে ঋগ্বেদের কথা আগে অনেক বলেছি, তাতে যাগযজ্ঞ আছে, ইহলৌকিক সুখ সম্ভোগের বাসনা আছে, বিশ্ব প্রকৃতি নিয়ে বিস্ময় ও উল্লাস আছে, কোথাও কোথাও আছে জগৎ সৃষ্টির রহস্য নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা। কিন্তু, আত্মা, ব্রহ্ম, ইহলোক,পরলোক, মোক্ষ, পুনর্জন্ম ইত্যাদি নিয়ে তাতে মাথা ব্যথা নেই,

দুঃখময় জীবন সম্বন্ধেও বিলাপ খুবই সামান্য। যোগী, সন্ন্যাসী, প্রব্রজ্যার ছবি সেখানে পাই না। ঋষি সেখানে সন্ন্যাসী নয়, কবি কিংবা পুরোহিত কিম্বা দুইই। মহেঞ্জোদারো হরপ্পায় প্রাপ্ত মূর্তিতে যোগীর ছবি আছে। আত্মা ও পুনর্জন্ম অর্থাৎ আত্মার এক দেহ হতে অন্যদেহে প্রবেশের ধারণাটিও অনার্য আদিম জনগোষ্ঠী সম্ভূত।

সাংখ্যের বেদ বিরোধিতা ও তার সুস্পষ্ট জড়বাদী বিচার পদ্ধতিকে ভারতবর্ষের অনার্য অতীতে বিচরণশীল যোগী পুরুষদের শত শত বৎসরের চিন্তা-ভাবনার পরিণতি বলে আমার মনে হচ্ছে। ওপরে তার কিছু কিছু প্রমাণও আমি উল্লেখ করলাম। অতএব তোমরা যে শুধু 'বেদ-বেদান্ত' আর 'আর্য আর্য' বলে চিৎকার কর, .আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য অতো সরল নয়, অনেক বিচিত্র চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়া কলাপের টানাপোড়েনে হাজার হাজার বছরে তৈরি এ এক বহুবর্ণ পশ্চাৎপট।

॥ চব্বিশ ॥

তোমার এবারের চিঠিতে বুঝলাম এতদিন সুমিতার সাড়া শব্দ নেই কেন। লোকে বিরহে কবি হয়, তুমি তো ভায়া, দেখছি, দার্শনিক হয়ে উঠেছ। খাসা লিখেছ কথাগুলি ঃ 'আমাদের দৈনন্দিন ব্যর্থতা, ছোটবড় নানা অভিযোগগুলি এমন বুকে বাসা বেঁধে থাকে যে তারা কখনও ক্রোধ কখনও কান্না হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ক্রোধ ও কান্নার উপলক্ষ যখন দূরে সরে যায় তখন জমাট বাধে দুঃখ। এই অবিরত ক্রোধ, কান্না ও দুঃখ থেকে নিস্তার নেই।' তুমি স্পষ্টভাবে না লিখলেও বুঝতে পারছি সুমিতা রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। মনে হয় তোমার ক্রোধ ও সুমিতার কান্না কিছু বেশি পরিমাণে হয়ে গিয়েছিল। এখন সুমিতার অবর্তমানে দুঃখ তোমার বুকে চেপে বসেছে। এই সবই তোমার মিটে যাবে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে তুমি যে বলেছ, আমাদের দৈনন্দিন ব্যর্থতা, ছোটবড় নানা অভিযোগগুলিই আমাদের ক্রোধে বা দুঃখে রূপান্তরিত হয়, এ কথার জবাব নেই।

আমাদের প্রায় সবগুলি দর্শনেরই গোড়ার কথা দুঃখ। হিন্দু ষড়দর্শন বল, বৌদ্ধ দর্শন বল, সবারই সাধনা দুঃখ থেকে মুক্তি। মানব জন্ম মাত্রই দুঃখময়, তদুপরি জন্ম একবার নয় বারবার। এই দুঃখের আবর্ত থেকে পরিত্রাণের জন্যই ঋষিরা তপস্যা করেছেন, পুনর্জন্ম এবং ইহলোকের দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ বাৎলেছেন। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বৌদ্ধ জৈন বা সাংখ্য কিংবা ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ বেদান্ত—সকলেরই এইখানটায় মিল।

কিন্তু এত দুঃখ কিসের? দুঃখের কারণ তো তুমি যা বলেছ তাই,—অভাব অভিযোগ, দৈনন্দিন ব্যর্থতা। অভিযোগ ও ব্যর্থতা কেন? ঋগ্বেদের আদি যুগে তো এসব ব্যাধি ছিল না। নিশ্চয়ই তখনও রোগ ও মৃত্যু ছিল —অনেক বেশি করেই ছিল, এবং ধরে নেওয়া যায় এ সবের কাছে পরবর্তী কালের চেয়ে মানুষ অনেক বেশি অসহায়ও ছিল। কিন্তু মানুষের জীবনের এইসব অমোঘ পরিণতিতে কোনও ব্যর্থতাবোধ ছিল না, কারণ এই বোধ ছিল যে আমরা সকলেই একত্রে বাঁচি এবং একদিন অনিবার্যভাবেই মরি। যখন এই যৌথ জীবনের সমাপ্তি ঘটল, ব্যক্তিমানুষ গোষ্ঠীর বন্ধন থেকে মুক্ত হল, তখন সে একই সঙ্গে অর্জন করল স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক অসাম্য। প্রতি মানুষের ভাগ্য আলাদা

আলাদা হয়ে অসংখ্য মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে লাগল ব্যর্থতাবোধ। শোষণ, প্রতারণা, স্বার্থপরতা, হিংসা ইত্যাদি নূতন অভিজ্ঞতাগুলি এই বেদনাকে বাঁড়িয়ে তুলল।

তোমাকে আগেই বলেছি উত্তর—বৈদিক চিন্তা ভাবনায় এমন কতকগুলি নূতন উপাদানের সাক্ষাৎ মেলে, যেগুলি ঋগ্বেদের যুগে প্রায় অনুপস্থিত। এই সব নূতনত্বের একটা কারণ আর্য সমাজের মধ্যে পৃথকীভবন ও শ্রেণী বিভাজন এবং তজ্জনিত দুঃখবোধ। এতদিন সাম্যময় সমাজে সকলে একত্রে কর্ম করত–কর্ম অর্থাৎ শিকার, পশুপালন, যুদ্ধ, যৌথ পরিবারগুলির দেখাশোনা, যজ্ঞ। এখন কাজের ভাগ হয়ে গেছে, অতএব কেউ রাজা, কেউ পুরোহিত, কেউ বা খেতে খামারে খেটে খাওয়া মানুষ, তাই কেউ অবসরভোগী আবার কেউ দিনান্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত। এই অবসর ভোগীর দলই সমাজের মাথা, তারা জ্ঞান ও ধর্ম চর্চা করেন। এতদিন জ্ঞান ও কর্ম একসাথে ছিল, এখন এই দুই ধারা হয়ে গেল আলাদা।

আর্য সমাজের এই যুগ সন্ধিক্ষণে আর একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াও ঘটছিল, তা হল অনার্য ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলন। ঋগ্বেদে যোগী ঋষি নেই, পরলোকের চিন্তা বড় একটা নেই, পুনর্জন্মবাদের তত্ত্ব ঋগ্বেদের ঋষিদের জানা ছিল না। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার আগে এইসব জিনিসগুলি ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জোদারো হরপ্পার যুগ থেকে এদেশে যোগী সন্ন্যাসীদের চলাফেরা চলছে। তুমি তো জান, সিন্ধু সভ্যতার খুঁড়ে পাওয়া নিদর্শনগুলির মধ্যে যোগী ও যোগীদের ঈশ্বর পশুপতি মহাদেবের ছবি পাওয়া গেছে। আজও ভারতবর্ষে জটাজুটধারী অরণ্যপর্বতচারী নগ্ন অর্ধনগ্ন সাধু বাবারা একটি শ্রেণী,এমন কি আজ তারা পলিটিক্সকেও নিয়ন্ত্রিত করছে। এ জিনিস পৃথিবীতে আর কোথাও তুমি খুঁজে পাবে না। এখন, এই যোগী বা সন্ন্যাসীর দল আর্য চিন্তাকেও যে প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদে কোথাও যোগী ও সন্ন্যাসী খুঁজে পাইনি, অথর্ববেদে ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য কীর্তন রয়েছে। উপনিষদের যুগে যাজ্ঞবল্ক্যকে দেখছি শেষ জীবনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে অর্থাৎ সন্ন্যাসী হতে। মহাভারতের আমলে এসে তো জীবনে চতুরাশ্রমের মধ্যে বাণপ্রস্থ আর সন্ন্যাস অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, নিয়ম হয়ে গেছে পঞ্চাশ হয়ে গেলেই বনে চলে যেতে হবে। এইভাবে যোগী ও সন্ন্যাসী শ্রেণী সৃষ্টির একটা নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক কারণ ছিল, সে প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা করতে গেলে কথা অন্য দিকে ঘুরে যাবে। তাই সেটা বারান্তরে করা যাবে।

কী ভারতবর্ষে, কী গ্রীসে সর্বত্রই দেখা গেছে আর্যদের কল্পনা শক্তি ছিল আকাশচারী। নিখিল বিশ্ব নিয়ে ছিল তাদের ভাবনা। সম্ভবত যেসব অঞ্চল থেকে তারা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সব এলাকার উন্মুক্ত প্রান্তর ও উদার আকাশই তার কারণ। ভারতবর্ষের গহণ অরণ্য পর্বত কন্দরের আলো আঁধারে বসবাসকারী অনার্যদের চিন্তাভাবনা ছিল মৃত্তিকাশ্রয়ী ও খানিকটা রহস্য সঙ্কুল। তারা গাছ পাথর ইত্যাদিতে দেবত্ব আরোপ করত, জন্তু জানোয়ার সাপখোপ ছিল তাদের উপাস্য। ফসলের জন্মমৃত্যু ও প্রকৃতিতে নিয়মিত বিবর্তন দেখেই হোক কিংবা পুরুষানুক্রমে মানুষের চেহারার মিল লক্ষ্য করেই হোক, তারা আত্মার এক দেহে হতে অন্য দেহে গমনাগমনে অর্থাৎ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করত। এই সব বিশ্বাসের আনুষঙ্গিক ছিল ভূত প্রেত পিশাচাদির কল্পনা। ক্রমে আর্য চিন্তায় আত্মা জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি এই সবকিছুরই অনুপ্রবেশ ঘটছিল। নিশ্চয়ই একদিনে নয়। ধীরে ধীরে।

এতদিন তোমাকে ঋগ্বেদ থেকেই সমস্ত উদাহরণ দিয়েছি, কারণ ঋক্ই আদি বেদ। সাম ও যজুঃ ঋকেরই প্রকার ভেদ মাত্র। গোড়ায় এই তিন বেদই ছিল, তাদের একত্রে বলা হত 'ত্রয়ী'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বেদের 'ত্রয়ী' বলে উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের বিখ্যাত 'পুরুষ সূক্তে' যে বেদ সমূহের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, তাতে ঋক, সাম ও যজুঃর উল্লেখ আছে, অথর্ববেদের নেই। এসব থেকে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে অথর্ববেদ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। তাদের এই ধারণা যে সঠিক, তার সমাজতাত্ত্বিক প্রমাণ বেদে অনার্য ধারণার অনুপ্রবেশ। অথর্ববেদে প্রায় সবটা জুড়েই রয়েছে ঝাড়ফুঁক মারণ উচাটন বশীকরণ। রোগ নিরাময়ের জন্য ভূত ঝাড়ানোর সঙ্গে অবশ্য নানা লতাগুল্ম ব্যবহারেরও নির্দেশ আছে—পরবর্তীকালে এ থেকেই গড়ে উঠেছিল আয়ুর্বেদ। অথর্ব বেদের নৃসূক্তে পাই, ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের বন্দনা, মহীসূক্তে আছে স্বর্গ নয়, পৃথিবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম। এই পৃথিবী ঋগ্বেদের দ্যাবাপৃথিবী নয়, দ্যুলোককে বাদ দিয়ে আপন মহিমায়ই এখানে পৃথিবী ভাস্বর। আবার দেখ অথর্ব বেদে এমন কি রয়েছে ব্রাত্যের মহিমা কীর্তন, যে ব্রাত্য বেদরহিত অনার্য বলে ঋগ্বেদে ধিকৃত হয়ে ছিল। এই ব্রাত্যমহিমার চাপটারটি বেদের মধ্যে জুড়ে দিয়ে বৈদিক পুরোহিতেরা যে ব্রাত্য অর্থাৎ অনার্যদের আর্যীকরণ করতে শুরু করেছিলেন সেটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

ঋগ্বেদের 'পুরুষসূক্তে'র কথা মনে আছে তো? কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দুম করে এই সূক্তে ঘোষণা করা হল যে বিরাট পুরুষ যিনি ঈশ্বর তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য আর দুই পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছিল। আমরা আলোচনা করেছি যে ঋগ্বেদে আর কোথাও এই চতুর্বর্ণের কথা নেই। বোঝাই যাচ্ছে পরবর্তী কোনও সময়ে এই পুরুষ সূক্তটি ঢোকানো হয়েছিল সমাজকে শাসক ও শোষিতে সুশৃঙ্খলভাবে ভাগ করার জন্য। অন্য দিকে অথর্ব বেদে দেখছ আবার উল্টো প্রক্রিয়া। অনার্যদের আর্য আচার আচরণের চৌহদ্দির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, বেদ উপনিষদকে এমনভাবে গড়ে পিটে নিতে হবে যাতে অনার্যরা তাতে আকৃষ্ট হতে পারে। এইসব ব্রাত্য মহিমা কীর্তন এবং অনার্যদের নানা আচার আচরণকে বেদের অন্তর্ভুক্তিকরণ সেই প্রয়াসেরই ফল। অর্থাৎ বেদ শুধু 'সত্যদ্রষ্টা' ঋষিদের গভীর উপলব্ধিই নয়, তাতে অনেক কূট কৌশলও রয়েছে। তার উদ্দেশ্য সবটাই যে মহান তা নয়, তার মধ্যে সামাজিক স্বার্থ পূরণের তাগিদও ছিল, যাকে আধুনিক ভাষায় বলা যায় 'রিয়্যাল পলিটিক'।

সে যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। আর্য সমাজে জ্ঞান ও কর্মের বিভাজন, দুঃখ বোধ, জন্ম জন্মান্তরের ধারণা এবং এই সংসার চক্র থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের বিভিন্ন দর্শনগুলির জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু আর্য চিন্তাধারার মধ্যেই নানা সংঘাত এবং অনার্য চিন্তাধারার অভিঘাতে এইসব দার্শনিক চিন্তার চেহারা এক প্রকারের হয়নি। এক প্রকারই যদি হত, তবে আর ষড়্দর্শনের জন্ম হবে কেন? আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি সাংখ্যের মধ্যে একটি প্রখর বস্তুবাদী চিন্তার ঝোঁক রয়েছে। কোনও ঈশ্বর নয়, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিধিকেই জগৎ সৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে। সাংখ্যে শুধু প্রকৃতি নয়, 'পুরুষ'–এর কথাও আছে, কিন্তু এই 'পুরুষ' বেদান্তের পরম ব্রহ্ম নয়। এখানে 'পুরুষ' অসংখ্য জীবের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা 'চৈতন্য'।

কপিলমুনি ‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষে’, জড়ে ও চৈতন্যে মেশাতে পাবেননি। বিজ্ঞানেব বিকাশেব সেই শৈশবকালে তা মেলানো সম্ভবও ছিল না। জড় থেকেই যে চেতনাব উদ্ভব, আধুনিক বিজ্ঞান তা প্রমাণ কবেছে, কিন্তু সে যুগে তা প্রতিষ্ঠা কবা ছিল দুঃসাধ্য। তাই বেদান্তবাদীবা সাংখ্য মতাবলম্বীদেব চেপে ধবলেন এই বলে যে প্রকৃতিই যদি আদি কাবণ হয, তবে চৈতন্যেব উদ্ভব হল কী কবে? জড় থেকে কি কখনও চেতনা জন্মাতে পাবে? নিকৃষ্ট থেকে কি সম্ভব উৎকৃষ্টেব সৃষ্টি? আব ‘পুরুষ’ যদি ‘প্রকৃতি’ থেকে সম্পূর্ণ আলাদাই হয, তবে পুরুষ এল কোথা থেকে? সে যুগে প্রকৃতি সম্বন্ধে যতটুকু প্রত্যক্ষ এবং অনুমান নির্ভব জ্ঞান ছিল, তাতে এসব কূটতর্কেব জুতসই জবাব দেওযা মুশকিল ছিল। তাব ওপবে আবাব এঁবা নিজেবাই আত্মা, মুক্তি, জন্মান্তববাদ প্রভৃতি ধোঁযাটে কথায বিশ্বাস কবতেন। সুতবাং ক্রমে বেদান্ত সাংখ্যকে গ্রাস কবল। কপিলেব তত্ত্বেব প্রায সব কিছুকেই বেখে দিযে বেদান্তবাদীবা ‘পুরুষ’ ও ‘প্রকৃতি’কে মিলিযে দিল। বেদান্ত বলল ‘পুরুষ’ বা পবম ব্রহ্মই আদি কাবণ, প্রকৃতি তাব ‘মাযা’ মাত্র। শ্বেতাশ্বতব উপনিষদ চতুর্থ অধ্যায দশম মন্ত্রটি এই বকম ঃ ‘মাযাকে প্রকৃতি বলিযা জানিবে, মাযাব অধিষ্ঠাতাবে [illegible] জানিবে। তাঁহাব অবযবভূত বস্তু সমূহেব দ্বাবা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত।’ এইভাবে ‘প্রকৃতি’ বইল, জগতে ব্যাপ্ত বস্তুসমূহ বইল, এবং কপিলও মহর্ষিব সম্মান পেলেন। কিন্তু সাংখ্যেব মূল কথাটিকেই বেদান্ত ‘মাযা’ব ছলনায পালটে দিল।

আজ এই পর্যন্ত। সাংখ্য ছাড়া আব যে দুটি ‘পাশুপত’ শাস্ত্র ঈশ্ববকে উপেক্ষা কবে জড়বাদী মত প্রচাব কবেছিল, সেই ন্যায ও বৈশেষিকেব কথা পবেব বাবে বলা যাবে।

॥ পঁচিশ ॥

সুমিতা পিত্রালযে চলে যাবাব পব থেকে তুমি যেবকম দর্শনে আসক্ত হযে পড়েছ, তাতে আমাদেব এই তত্ত্বটাই আবাব প্রমাণিত হচ্ছে যে দর্শন জিনিসটা অবসবভোগী ছাড়া কারুব মাথায আসে না। এখন তুমি বাজাব হাট, সুমিতাব ফাইফবমাযেস খাটা ও মেজাজ সামলানোব ডিউটি থেকে মুক্ত। সে কাবণেই এত দর্শন চিন্তাবও অবসব পাচ্ছ। আমাদেব আদি যুগেও সেই বকম। যতদিন কারু অবসব ছিল না, অবসবভোগী কাযিককর্মহীন শ্রেণী ছিল না, ততদিন দর্শনও জন্মাযনি। কাব্য ছিল, সঙ্গীত ছিল, বেদেব এক একটা ঋকে কল্পনা কখনও কখনও এত ঊর্ধ্ববিহাবী যে তা দার্শনিকতাব কান ঘেঁসে যাচ্ছিল, কিন্তু তা দর্শন নয, জিজ্ঞাসা বা উপলব্ধি মাত্র। এ সবেব দুএকটা উদাহবণ তোমায আগে দিযেছি, আবও অনেক আছে। চিত্রাঙ্কনও ছিল। তাব প্রমাণ তো বিদেশেব নানা গুহাযই নয, আমাদেব দেশেও মীবজাপুবেব মোবানা পাহাড়ে ও অন্যান্য নানা জাযগায, ইদানীংকালে ভীমভেটকায যা পাওযা গেছে, তা বীতিমত মুগ্ধ হওযাব মত। আদিম মানুষ তাব যৌথ ক্রিযা কলাপেব মধ্য দিযে প্রকৃতিব সঙ্গে যে পবিচয লাভ কবছিল, তাতে এক বকম বিজ্ঞানও যে বিকশিত হচ্ছিল, তা তো বোঝাই যায এবং এই বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা পববর্তীকালে নানাভাবে তাদেব দার্শনিক চিন্তাকেও যে প্রভাবিত কবছিল, তাব প্রমাণ আছে।

অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিযাব বানানো, ফসল ফলানো, আকাশেব গ্রহ নক্ষত্র চেনা, যজ্ঞটজ্ঞ কবাব জন্য নিযম মাফিক বেদী তৈবি কবা, আবাব বোগ নিবাময়েব জন্য মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁকেব

সঙ্গে দ্রব্যগুণের প্রয়োগ,—এই সব নিয়েই আদিম পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি গড়ে উঠছিল। আগুন জ্বালানো, চাকার ব্যবহার শেখা, কাপড় বোনা বা মাটির পাত্র তৈরি করা ইত্যাদি ঘিরে যে নবলব্ধ 'টেকনলজি'র বিকাশ হচ্ছিল, তা এ যুগের কমপিউটারের মতই সেকালে নিশ্চয়ই যুগান্তকারী ছিল। সুতরাং বলতে পারি সাহিত্য কলা বিজ্ঞান, সব কিছুই বিকশিত হচ্ছিল, কিন্তু দর্শন নয়।

ক্রমে দিন বদল হল। যে যজ্ঞ এতদিন গোষ্ঠীভুক্ত সকল মানুষের যৌথ ক্রিয়া ছিল, তা 'ব্রহ্মজ্ঞানে'র নামে, এক দল বিশেষ 'অকর্মা' মানুষের অধিকারে চলে গেল। দর্শনের সূত্রপাত তারপর থেকেই। এই সম্বন্ধে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একটি কৌতূহলোদ্দীপক সূক্ত আছে। ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেই ৭১ নং সূক্তটি থেকে কিছু কিছু পড়ছি, শোন ঃ

'যেমন চালনীর দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে সেরূপ বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করেছেন। সে ভাষাতে বন্ধুগণ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হন।...... কেউ কেউ কথা দেখেও কথার ভাবার্থ গ্রহণ করতে পারে না, কেউ শুনেও শোনে না।......যখন অনেক স্তোতা একত্র হয়ে মনের ভাব সমস্ত হৃদয়ে আলোচনা পূর্বক অবধারিত করতে প্রবৃত্ত হন তখন কোনও কোনও ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মেনা। কেউ কেউ স্তোত্রজ্ঞ বলে পরিচিত হয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। যে সকল ব্যক্তি ইহকাল বা পরকাল কিছুই পর্যালোচনা করেনা, যারা স্তুতি প্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করেনা তারা পাপযুক্ত অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করে নির্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা অথবা তন্তুবায়ের কার্য করার উপযুক্ত হয়। (পক্ষান্তরে স্তোত্রজ্ঞের) যশ মিত্রের ন্যায় কার্য করে, সভাতে প্রাধান্য প্রদান করে,....যশের দ্বারা দুর্নাম দূর হয়, অন্ন লাভ হয়, বল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নানা প্রকারে উপকৃত হওয়া যায়।'

দেখছ তো, 'ব্রহ্মজ্ঞানে'র স্তুতিতে রচিত এই সূক্তটিতে ভাষা শিক্ষা, স্তোত্র রচনা ও স্তোত্রজ্ঞ হওয়ার কেমন বাহবা, আর অন্যদিকে লাঙ্গল চালনার বা তাঁত বোনার কাজের প্রতি কী অবজ্ঞা। ওরা নির্বোধ, ওরা পরিষ্কৃত অর্থাৎ সংস্কৃত (সংস্কৃত শব্দটার মানেই তো পরিষ্কৃত) ভাষায় কথা কইতে পারেনা, ওদের যশোলাভ হয় না, অন্নলাভও হয় না ইত্যাদি। বোঝা গেল চাষী তাঁতির দল ভাল খেতে পায় না। অন্যদিকে স্তোত্রজ্ঞ জ্ঞানীদের কত যশ, এবং সেই যশ থেকেই অন্ন ধন সব কিছু। ভাব খানা এই যেন যশ থেকেই অন্ন ইত্যাদি পয়দা হয়, যে বেচারা লাঙ্গল ঠেলে সে অন্ন তৈরি করে না। অন্য আর একটি কথা অর্থবহ,—তা হল 'যশ থেকেই দুর্নাম দূর হয়,' অর্থাৎ এরা যত অপকর্মই করুক দুর্নাম এদের স্পর্শ করতে পারে না!

'ব্রহ্মজ্ঞান' স্তুতি অর্থাৎ দর্শন চর্চার গোড়াতেই এইভাবে জ্ঞান ও কর্ম সুস্পষ্ট ভাগ হয়ে গেল। কেবলই 'বিশুদ্ধ' জ্ঞান ও কেবলই কর্ম নিয়ে ব্যস্ত দুটি দলের উৎপত্তি হল। প্রথম দলটি অকর্মা কিন্তু শক্তিশালী, দ্বিতীয় দলটি সম্পদের স্রষ্টা হয়েও দুর্বল, কারণ তাদের 'জ্ঞান' নেই। কিছুকাল আগেও কিন্তু অবস্থা এরকম ছিলনা। এই সূক্তেরই কয়েক পাতা আগে অষ্টম মণ্ডলের ৭৮নং সূক্তটি পড়। তাতে লেখা আছে ঃ'হে ইন্দ্র! আমার মন যবাভিলাষী, গবাভিলাষী, হিরন্যাভিলাষী ও অশ্বাভিলাষী হয়ে তোমারই নিকট যাচ্ছে। আমি তোমার আশাতেই হস্তে দাত্র ধারণ করেছি। হে মঘবন! যবের মুষ্টি পূর্ণ কর।'

এই সূক্তেব স্তোত্রকাব স্পষ্টতই একজন কৃষক, কাবণ তিনি হস্তে 'দাত্র' অর্থাৎ কাস্তে নিযে যব কেটে চলেছেন এবং যব থেকেই গো, হিবণ্য ইত্যাদি লাভ হযে থাকে বলে তিনি জানেন। জ্ঞান ও কর্মে, স্তোত্রকাব ও কৃষকে এখানে কোনও প্রভেদ নেই। তাই দেবতাও এখানে সেই আদিম ইন্দ্র, 'ব্রহ্মজ্ঞানে'ব সূচনা এখনও হযনি।

সকলেব দ্বাবা উচ্চাবিত, সকলেব দ্বাবা বচিত ও পুষ্ট বেদেব মন্ত্রগুলি কেমন কবে ক্রমে একদল 'সুবিধাভোগী'ব এবং তাবও পবে ব্যক্তি বিশেষেব একচেটিযা অধিকাবে এল তাব জাজ্বল্যমান প্রমাণ বিখ্যাত 'গাযত্রী মন্ত্র'। গাযত্রী মন্ত্র, জান তো, কানে কানে উচ্চাবণ কবা হয, অব্রাহ্মণেব তা শুনে ফেলাও পাপ। অথচ এই মন্ত্র একদা যৌথভাবে সকলে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি কবত। ঋগ্বেদেব তৃতীয মন্ডলেব ৬২ নং সূক্তেব ১০নং ঋকে সবিতা অর্থাৎ সূর্যেব উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্ত্রই গাযত্রী মন্ত্র। এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে 'তৎ সবিতুর্ববেণ্যম ভর্গো দেবস্য ধীমহি' ইত্যাদি। এই 'ধীমহি' কথাব অর্থ হল 'আমবা ধ্যান কবি', 'আমি ধ্যান কবি' নয। অথচ, আজ এই মন্ত্রটিই উচ্চাবণ কবতে হয সম্পূর্ণ একা। যৌথ জীবন থেকে একাকিত্বে পতনেব ছবিটা বুঝতে পাবছ?

তুমি বলছ, সমাজে ধনেব মেরুকবণেব ফলে যে একদল অবসবভোগীব সৃষ্টি হল, দার্শনিকবা যদি সেই শ্রেণীভূক্তই হযে থাকেন, তবে তাঁদেব এত দুঃখ কিসেব? প্রশ্নটা খুবই প্রাসঙ্গিক। এব জবাব এক কথায হবে না। অনেকগুলি কাবণ এব পেছনে বযেছে। প্রথমত ধন দৌলত বিলাস আব সুখ এক কথা নয, ববং এ সব থেকে 'বিচ্ছিন্নতাবোধ' এবং তা থেকে দুঃখ জন্মাতে পাবে। দ্বিতীযত শোষক শ্রেণীব মানুষ মাত্রই তো আব শোষক নয। বুদ্ধ তো বাজ পবিবাবে জন্মেছিলেন। কিন্তু শোষক শ্রেণীতে জন্মাবাব ফলে চিন্তাভাবনাব যে অবসব ও সুযোগ তাঁব মিলেছিল, তাতেই অসংখ্য মানুষেব দুঃখেব কথা তাঁব হৃদযে বেজে ওঠাব অবকাশ পেযেছিল। অর্থাৎ (এবং এটা তৃতীয পযেন্ট) শোষক শ্রেণীব চিন্তা ভাবনাব পাশাপাশি সমাজে বিপুল সংখ্যাগবিষ্ঠ শোষিতেব ভাবনা চিন্তাও প্রচলিত থাকে এবং দার্শনিকেব চিন্তায এই সব কিছুই প্রতিফলিত হয। আবাব কখনও সখনও চাষাভুষোব ঘব থেকেই দার্শনিকও যে না জন্মেছেন, তা নয। চতুর্থত শোষক শ্রেণীব মধ্যেও বিভাজন ও দ্বন্দ্ব বযেছে। ববীন্দ্রনাথ তাঁব অসাধাবণ প্রবন্ধ 'ভাবতবর্ষে ইতিহাসেব ধাবা'য প্রাচীন ভাবতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিযেব দ্বন্দ্বেব কথা বলেছেন এবং দেখিযেছেন যে 'বামাযণ' 'মহাভাবত' দুই মহাকাব্যই এই দ্বন্দ্ব ও তাব সমন্বযেব মধ্য দিযে ক্ষত্রিযেব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাব কাহিনী। উপনিষদে আমবা দেখেছি বাববাব বেদজ্ঞানী ব্রাহ্মণেবা উচ্চতব জ্ঞানেব জন্য ক্ষত্রিযেব কাছে যাচ্ছে। যমবাজ, সনৎকুমাব, জনক প্রভৃতি মুখ্য ব্রহ্মিষ্ঠবা কেউই ব্রাহ্মণ নন। তবে, সে যুগে, মনে হয, যদিও ব্রাহ্মণেবাই গুরুমাবা বিদ্যায জযী হযেছিল, কিন্তু শেষ বক্ষা কবতে পাবেনি। পুবাণ মহাকাব্যেব যুগে এসে দেখি, ব্রাহ্মণ সর্বজনপূজ্য কিন্তু বাজসভায তাব আসন বাজাব নিচে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ আব বৈশ্যেব মধ্যে সম্পর্কটা কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে মহাভাবতেব শান্তিপর্ব ১৮০নং অধ্যায থেকে ভীষ্ম কথিত একটা গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি।

একবাব কাশ্যপ বংশীয এক ঋষি একজন বৈশ্যেব বথেব চাকাব ঘাযে প্রচণ্ড আহত হযেছিলেন। এই নবীন বযস্ক ঋষিব বাস্তব জ্ঞান কম ছিল, অভিমান ছিল বেশি। তিনি ভাবলেন, 'নির্ধন ব্যক্তিব জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব আমি প্রাণ ত্যাগ কবিব।'

ইন্দ্র দেখলেন যে এই কাশ্যপ প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প। তখন তিনি এক শৃগালেব বেশে এসে তাকে যে জ্ঞান দান কবলেন, তা বাস্তব বুদ্ধিব পবাকাষ্ঠা। ইন্দ্র বললেন, 'দেখ, তুমি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয। তোমাব প্রাণত্যাগেব বাসনা কেন? ধনলাভ কেবল অহঙ্কাবেব হেতু।.....দেখ, ইহলোকে মনুষ্য জন্মই শ্রেষ্ঠ, কাবণ যাহাদিগেব হস্ত আছে তাহাবাই কৃতার্থ। তোমাব যেমন ধনলাভেব বাসনা হইতেছে, আমবাও তদ্রূপ হস্তলাভেব নিমিত্ত নিযত অভিলাষ কবিযা থাকি।'

সেই শৃগালরূপী ইন্দ্র এবপব দুটি হাত থাকাব গুণকীর্তন কবলেন। বসিকতা কবে বললেন, দেখ, হাত নেই বলে আমবা মশা মাবতে বা সুখে গা চুলকোতেও পাবিনা। হাত আছে বলেই মানুষ গবাদি পশুকে বশীভূত কবেছে, ধন সঞ্চয কবেছে, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান তৈবিতে সমর্থ হযেছে। হস্তদ্বযেব এই গুণকীর্তন শুনে সেই শৃগালকে এঙ্গেলস এব গুরু মশাই বলে মনে হয। বাস্তবিক ঋষিবা যে যুগে কাস্তে হাতে যব কাটতেন,তখন এইসব বাস্তববাদী চিন্তা তো ছিলই। মানুষেব হাতই যে সম্পদেব উৎস এই স্বাভাবিক বোধ পবেব যুগে ক্রমে 'ব্রহ্মজ্ঞানে'ব মাযায যে আচ্ছন্ন হযে গিযেছিল, তাব উদাহবণ তোমায দিযেছি। এই গল্পেও শেষ পর্যন্ত শৃগাল তাব 'লাইন' পাল্টে ফেলল। বলতে লাগল যে ধনেব বাসনা কোনও কাজেব কথা নয। তাতে পিপাসা বাড়ে, লোভেব শেষ হয না। আব লোভ অপূর্ণ বেখে যদি তুমি মৃত্যুববণ কব, তবে পবজন্মে হযত আমাব মত শৃগাল হযে জন্মাবে। তাহলে উপায? উপায হল জ্ঞান, আত্মোপলব্ধি। লোভ বর্জন কব, নিজেব ভাগ্যে সুখী হও, যতটুকু পেযেছ, তাতে শ্রদ্ধাবান হও।

তাহলে মোদ্দা কী দাঁড়াল? সব ব্রাহ্মণ কিছু যাজ্ঞবল্ক্য নয। বৈশ্যেব ধন ও ক্ষত্রিযেব বাহুবল তাব নেই। অতএব দুঃখ এবং শেষ পর্যন্ত 'সম্পদ অসাব' অর্থাৎ 'আঙুব ফল টক' এই উপলব্ধিই সাব। দর্শনে এই সব অভিজ্ঞতাব প্রতিফলনই ঘটছিল।

এই প্রসঙ্গে শৃগালেব একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত কবছি ঃ 'আমি পূর্বজন্মে বেদনিন্দুক, আন্বীক্ষিকী বিদ্যায অনুবক্ত, কুতর্কপবাযণ, নাস্তিক, পাণ্ডিত্যাভিমানী, মূর্খ ছিলাম। সেই নিমিত্ত এক্ষণে আমাকে শৃগাল জন্ম প্রাপ্ত হইতে হইযাছে।' আন্বীক্ষিকী বিদ্যা জিনিসটা কী ? আন্বীক্ষিকী হল ন্যাযশাস্ত্র। ন্যাযে অনুবাগী হলে পবজন্মে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হতে হয, ন্যায শাস্ত্রেব নামে এই বটনা কেন ? শুধু এখানেই নয, ন্যাযশাস্ত্রেব দুর্নাম সুযোগ পেলেই ঈশ্ববভক্তবা কবতে ছাড়তেন না। তাব কাবণ, ন্যাযশাস্ত্র তর্ক পবাযণ, সত্যানুসন্ধিৎসু, প্রমাণ ভিন্ন কোনও আপ্তবাক্যই বিশ্বাস কবে না। এই ন্যায ও তাব দোসব বৈশেষিক সম্বন্ধে আজ কিছু আলোচনা কবব। তাব আগে প্রাসঙ্গিক দুএকটি খুচবো কথা সেবে নিই।

পুবাণেব যুগেব স্ট্রাটেজিটা দেখছ তো? বৈশ্য অর্থাৎ বণিকশ্রেণীব ধনমদমত্ততা এত বেশি যে ঋষিকুমাবকে তাদেব বথচক্রেব ঘাযে পথে পড়ে থাকতে হয, কেউ তাতে ভ্রূক্ষেপও কবে না। ইন্দ্র এসে সেই কাশ্যপকে অতো ভাল ভাল কথা বললেন কিন্তু বৈশ্যেব আচবণেব নিন্দা বা তাব বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনেব কথাই তুললেন না। বললেনঃ আত্মাব উন্নতি কব, তুচ্ছ ধনেব ব্যাপাব স্যাপাব নিযে মাথা ঘামিও না, প্রশ্ন কবো না, তর্ক কবো না, শাস্ত্রেব বিরুদ্ধাচবণ কবোনা, তাহলে কিন্তু পবজন্মে শেযাল হতে হবে।

এই ভযংকব তত্ত্বেব মূল কথা হল সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায বাখা, এবং এই তত্ত্ব শুধু শূদ্রদেব জন্য নয অগণিত ব্রাহ্মণেব জন্যও। কাবণ একালেব পাতি–বুর্জোযাদেব মত

সেকালের পাতি ব্রাহ্মণেরাও ছিল শোষিত, বৃহৎ ব্রাহ্মণ-রাজন্য-বণিকের শোষণের শিকার। এদের বলা হতে লাগল, 'তুমি দরিদ্র হলেও ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও, কারণ তুমি ব্রাহ্মণ, নরশ্রেষ্ঠ।' শৃগালরূপী ইন্দ্র কাশ্যপকে এ কথাই বলেছিলেন। ইন্দ্র, জনক,—সনৎকুমার, যমরাজ, যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদের সমস্ত ধনশালীরাই বলছেন, 'ধনে লোভ করো না, ধন দুঃখের আকর।' ধন যে দুঃখের আকর, পাতি-ব্রাহ্মণেরা তা হাড়ে হাড়ে টের পেতেন। ইচ্ছেমত ধন না থাকা এবং অপরের ধনের আঘাত—এই দুই জাতের দুঃখই তাদের সইতে হত। একালের পাতি বুর্জোয়ার মতই তাঁরাও ভাবতেন, 'শূদ্র বেটারা সুখে আছে, কারণ ওরা আহার নিদ্রা মৈথুনেই সুখী। দুঃখ যত আমাদের।'

বারবার একালের পাতি বুর্জোয়াদের কথা বলছি কেন জান তো? বলছি, কারণ তেমনই এক মহাত্মার নরম বিছানায় বুকে বালিশ চেপে তোমায় এই পত্র লিখছি। তিনি আমার পরমাত্মীয়, গৃহিনীর সাক্ষাৎ ভ্রাতা। তাঁরই সাথে এসব নিয়ে কাল বেশ তর্ক জমে উঠেছিল। কদিনের জন্য এঁর বাড়িতে সস্ত্রীক দুর্গাপুরে এসেছি অতিথি হয়ে। তুমি তো জান আমার এই শ্যালকটি ইঞ্জিনিয়ার, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হবার শখ হয়েছিল। কারখানাটি প্রথম দিকে রমরমার পর সারা দেশে ইণ্ডাস্ট্রির যে মড়ক চলছে, তাতে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। রাঘব বোয়ালদের কমপিটিশন এবং শ্রমিক অসন্তোষ, দুয়ের ধাক্কায় কুপোকাৎ হয়েছে। বছর পাঁচেক ধরে কারখানা বন্ধ পড়ে আছে। রাগটা কিন্তু শুধু লেবারের ওপর। আমাকে বলল, 'আপনাদের জন্যই এদের এইসব দুর্মতি। আর সে জন্যই পশ্চিম বাংলার এত দুর্দশা।' আমি বললাম, 'শুধু পশ্চিমবাংলা কেন, সারা দেশেই তো হাজারে হাজারে কারখানা "সীক" হয়ে পড়ে আছে। পরিসংখ্যান বলছে গত এক দশক জুড়ে কারখানায় স্ট্রাইক তো নামমাত্র, লকআউট, লে অফ, ক্লোজারেরই তো ছড়াছড়ি।' কিন্তু শ্যালক বুঝতে চায়না। ও এখন 'দুর্দশাগ্রস্থ' ওর ও আমার উভয়ের স্ত্রীরই সহানুভূতি ওর দিকে। অতএব, আমি লড়াইয়ে একা হয়ে গেলাম। ওর কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা যে কী ভয়ানক, সে কথা ওকে কে বোঝাবে? ও প্রাণপণে আমাকে বরং বোঝাতে চাইল যে দেশে মারা যাচ্ছি শুধু আমরা মধ্যবিত্তরাই। বলল, দেখুন গিয়ে যাদের আপনারা সর্বহারা বলেন, মুটে মজুর রিক্সাওয়ালা ঠেলাওয়ালা, এরা সবাই এখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এদের সবার গায়ে এখন টেরেলিন, বাড়িতে মোটর সাইকেল, টিভি। বোম্বের ঝোপড়িতেও আপনি টিভি এন্টেনা দেখতে পাবেন'। দেশের 'ছোটলোকে'রা যে খুব সুখে আছে, এরকম একটা অদ্ভুত বিশ্বাস মধ্যবিত্তদের মধ্যে খুব প্রবল, যদিও দেশের প্রকৃত উচ্চবিত্তেরা জানে যে কথাটা মিথ্যে, কারণ ওরা বাস্তববাদী, ওদের সারা দেশের বাজারের আর মানুষের ক্রয় ক্ষমতার হিসেব রাখতে হয়। সে হিসেব ডঃ মনমোহন সিং-এরও জানা আছে, তাই বাজেটে সর্বস্বান্ত গরিব মানুষের ব্যবহার্য জিনিসে আপাতত তাঁর থাবা বিশেস পড়েনি। টিভি ফ্রিজ চিনি ইত্যাদির ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা গেছে। আমার শ্যালকের অভিযোগটাও তো ঐখানে। আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, দেশের বড়লোকেরা তবে এই বাজেটে কেন দুহাত তুলে নাচছে এবং নাচছে বিদেশের বড়লোকেরাও, বোঝাতে চাইলাম এতে গরিব মানুষের কোনও সুরাহা নেই। কারণ শেষ পর্যন্ত ঘাটতি বাজেটের কোপ, সারের দাম বৃদ্ধি, ব্যবসার ওপর ট্যাক্স সবই আদায় হবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই। তদুপরি দেশ ও বিদেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের জন্য যেভাবে দরজা খুলে দেওয়া হল, তাতে আপাতত ছোটখাট শিল্পোদ্যোগীদের জন্য একটা মরীচিকা সৃষ্টি করা হলেও

এদের জন্য শেষ পর্যন্ত আছে মরুভূমি। কারণ 'নিয়ন্ত্রণমুক্ত' অর্থনীতিতে বড়র সাথে ছোট কখনওই পেরে উঠবেনা। আমার শ্যালকের মত মধ্যবর্গের জন্য আখেরে কোনও সুখ নেই, যেমন সুখ ছিলনা ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বও মহাভারতের কাহিনীর সেই কাশ্যপের।

এই সুখের অভাব থেকে যে দুঃখবোধ, তার একটা বিপদের দিক সম্বন্ধে সমাজের মাথারা সচেতন ছিলেন। তাঁরা এই যে বলছিলেন, 'ধনে লোভ করো না, ধন বড় মন্দ', তাতে অশিক্ষিত শূদ্রদের মধ্যে না হলেও পাতিব্রাহ্মণ বা শোষক শ্রেণীভুক্ত সৎ চিন্তাবিদের মনে এ প্রশ্নটা জাগা খুব স্বাভাবিক যে ধন যদি এতই মন্দ, তবে বড়লোকেরা সেই ধন সকলের মধ্যে ভাগ করে দেয় না কেন? প্রশ্ন হতে পারে, সুখের জন্য ধোঁয়াটে আত্মার কথা বাদ দিয়ে শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তাই কি শ্রেয় নয়? এবং শরীরকে কষ্টমুক্ত রাখতে গেলে সকলের জন্য ন্যূনতম সুখ সম্পদের ব্যবস্থা করাটা হয়ে পড়ে জরুরি। বুঝতেই পারছ, এই সব যুক্তির কথা সম্পদভোগীদের পক্ষে ছিল বড়ই বিপজ্জনক। সুতরাং, যে কথাটায় তাঁরা জোর দিতেন তা হল ঃ তর্ক করো না। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলেছিলেন, 'তর্ক করিও না, তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে।' আর ইন্দ্র কাশ্যপকে বলেছিলেন, 'তর্ক শাস্ত্রের অনুগত হইও না, পরজন্মে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইবে।' একই কথা, উপনিষদের যুগে যা ছিল প্রত্যক্ষ হুমকি, মহাকাব্যের যুগে তাই হয়ে দাঁড়াল চতুর প্রতারণা।

স্বভাবতই, বেদান্তবাদীরা ছিল 'আন্বীক্ষিকী' অর্থাৎ ন্যায় বা তর্ক শাস্ত্রের বিরুদ্ধে। তাই বলে বেদান্ত যে তর্ক বর্জন করেছিল, তা নয়। তোমাকে আগেই বলেছি, হিন্দু ষড়দর্শনের সবটাকেই বলা হয় 'ন্যায় প্রস্থান', কারণ এই দর্শনসমূহের ভিত্তি 'শ্রুতি' বা 'স্মৃতি' নয়, ন্যায় অর্থাৎ তর্কবিদ্যা। আধুনিক পরিভাষায় এদের পছন্দ ছিল 'ফর্ম্যাল লজিক' অর্থাৎ নেহাৎ 'কথার লড়াই'। কিন্তু ন্যায় শাস্ত্র ও তার দোসর বৈশেষিক দর্শনের অন্বিষ্ট ছিল বস্তুজগৎ ও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তি প্রণালী। এই দুই দর্শনের বক্তব্য খুব সংক্ষেপে আজ তোমায় বলছি, তা হলেই বেদান্তের সাথে তার বিরোধটি বোঝা যাবে।

প্রথমে বৈশেষিকের কথা বলি। কণাদের নামে প্রচলিত এই দর্শন চেতনা নিরপেক্ষ বস্তুজগতের অস্তিত্বকে মানে। আমাদের চিন্তা বা চেতনা জগতে থাক বা না থাক দ্রব্য, গুণ, কর্ম আদি ছ প্রকারের পদার্থ বিশ্বে রয়েছে, এই হল বৈশেষিক মত। পদার্থ কী? পদার্থ মানে পদের অর্থ। পদ হল 'লজিকে' যাকে আমরা বলি 'টার্ম' অর্থাৎ আমাদের জ্ঞেয় যে কোনও বস্তু বা ধারণার দ্যোতক শব্দ। তার মানে, শব্দ বস্তুর অর্থ নয়, বস্তুই শব্দের অর্থ। এখন এই সব পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ দ্রব্য আবার নয় প্রকার। সেগুলি হল ঃ মাটি জল আলো বাতাস আকাশ কাল স্থান আত্মা এবং মন। এই পদার্থ সমূহের গুণ ও কর্মের নানা প্রকার ভেদই জগতে সকল কার্যের কারণ।

স্থান কাল আত্মা এবং মনকে 'দ্রব্য' বলে অভিহিত করে কণাদ যে বস্তুবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ছিল তার বৈশিষ্ট্য। একটি তত্ত্ব 'বানিয়ে তোলা'র পরিবর্তে বিশ্ব জগতের সমস্ত অস্তিত্বকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বৈশেষিক মতে নয়টি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম চারটি অর্থাৎ জল মাটি আলো ও বাতাস অসংখ্য অণুর সমষ্টি। এই আণবিক তত্ত্ব এবং এই মত অনুযায়ী এমনকি আলোকেও অণুর সমষ্টিরূপে কল্পনা একেবারে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অতএব, বিজ্ঞান চিন্তার ক্ষেত্রে এই ভারতীয় প্রাচীন দর্শনের একটা

সম্মানজনক স্থান বযেছে। তোমাব বেদান্তবাদীবা কিন্তু চিবকাল এই বৈশেষিকেব নিন্দাবাদ কবে গেছেন, বাদবাযন থেকে শংকব পর্যন্ত কেউই তাব ব্যতিক্রম নন।

বৈশেষিক পন্থীদেব বিজ্ঞাননিষ্ঠ চিন্তাধাবাব আবও দুএকটি প্রমাণ দেব। তাঁবা বলছেন গুণ দ্রব্যেবই বিশেষ লক্ষণ। দ্রব্যহীন গুণ বলে কিছু হতে পাবে না এবং গুণেব নিজস্ব কোনও কার্যকবী শক্তি নেই। রূপ বস গন্ধ সুখ দুঃখ ইচ্ছা ইত্যাদি সতেব বকমেব দ্রব্যাশ্রযী গুণেব তালিকা তাঁবা প্রস্তুত কবেছিলেন। দ্রব্যেব মধ্যে ওতপ্রোত আব একটি 'পদার্থে'ব কথা তাঁবা বলতেন, তা হল 'কর্ম'। এই কর্ম পাঁচ প্রকাব ঃ উৎক্ষেপন (উর্ধ্বগতি), অপক্ষেপণ (নিম্নগতি), আকুঞ্চন, প্রসাবণ এবং গমন। এই সব কর্মেব ফলেই জগতেব কাবণ থেকে কার্যেব উৎপত্তি হচ্ছে। নিশ্চয বুঝতে পাবছ এই 'কর্ম' কোনও ঈশ্বব বা মানুষেব ক্রিযাকর্ম নয, নির্ভেজাল ভৌতজগতেব কর্ম অর্থাৎ গতি বা 'মোশান'। এই ভৌত গতি ও তাব শক্তি থেকেই সমস্ত কিছুব সৃষ্টি। বৈশেষিক যেহেতু স্পষ্ট বলেছে যে 'কর্ম' কখনও দ্রব্যাতীত হতে পাবে না এবং 'গুণ' নিজে কখনও হতে পাবেনা কোনও কার্যেব কাবণ, সুতবাং এই দর্শনেব শেষ বিচাবে দ্রব্যই জগতেব স্রষ্টা। ঈশ্বব এই দর্শন থেকে নির্বাসিত।

অক্ষপাদ গৌতমেব ন্যাযশাস্ত্র বা আন্বীক্ষিকী এই বৈশেষিক অবস্থানকে পুবোপুবি মেনে নেয এবং মূলত বস্তুবাদী দর্শনকে ভিত্তি কবে এক বিশদ যুক্তিতর্ক বিচাব প্রণালী গড়ে তোলে। ফলত শুধু আকাবগত বা ফর্মাল সত্য নয, বস্তুগত সত্য অনুসন্ধানও তাব অন্বিষ্ট। ঈশ্ববাদী ও ব্রহ্মবাদীবা আন্বীক্ষিকীব ওপব এত খড়্গহস্ত কেন বুঝতে পাবছ তো ? ন্যাযসূত্রেব প্রথম অধ্যাযেব প্রথম আহ্নিকেই যে ষোলটি পদার্থেব তত্ত্বজ্ঞান থেকে 'নিঃশ্রেযস' অর্থাৎ পবম মঙ্গল লাভ হয বলে ঘোষণা কবা হযেছে, সেই পদার্থেব তালিকায কোথাও ঈশ্ববেব নামগন্ধ নেই। তাই আমাদেব ঐতিহ্যবাদীবা কেবল বেদান্তেব কথা বলেন, কিন্তু ঐশ্বর্যশালী ন্যায–বৈশেষিকেব ঐতিহ্যটাকে বেমালুম চেপে যান।

॥ ছাব্বিশ ॥

গত চিঠিতে তুমি যে ডাযেলেকটিকস ও মেটাফিজিক্সেব তর্ক তুলেছ এবং অভিযোগ কবেছ যে ন্যায প্রভৃতি শাস্ত্রকে জড়বাদী আখ্যা দিযে আমি বাড়াবাড়ি কবে ফেলেছি, তাতে তর্কেব ঝাঁজ আছে কিন্তু প্রাণ নেই। আমাব মনে পড়ে গেল সেই কলেজেব দিনগুলিব তর্কযুদ্ধেব কথা। তোমাব নিশ্চযই মনে আছে, প্রথম দু'এক বছব আমাদেব আর্টস সাযেন্সে খুব লড়াই হত। সাধাবণত 'খাবাপ' ছেলেবা আর্টস পড়তে আসত বলে আমাদেব একটা হীনমন্যতা ছিল। মধুসূদন নাকি বলেছিলেন যে সেক্সপীযব ইচ্ছে কবলে নিউটন হতে পাবতেন কিন্তু নিউটন ইচ্ছে কবলে সেক্সপীযব হতে পাবতেন না। এটা ছিল আমাদেব পক্ষে একটা বড় যুক্তি' বেচাবা নিউটন ও সেক্সপীযবেব 'ইচ্ছে' নিযে এইসব টানাটানিতে আমাদেব ভাবখানা ছিল এই যে আমবা 'আর্টস' মানেই যেন এক একজন মাইকেল। তোমাদেব ফিজিক্স কেমিষ্ট্রিব বড় বড় টার্মেব বিরুদ্ধে আমাদেব সংগ্রহে ছিল লজিকেব নানা টার্ম। আমাদেব সিলোজিজমেব 'সমস্ত মানুষ হয মবণশীল/বাম হয মানুষ/, বাম হয মবণশীল', নযে তোমবা ঠাট্টা মস্কবা কবলেও আমবা 'মেজব টার্ম',

'মাইনব টার্ম' 'আনডিসট্রিবিউটেড মিডল টার্ম'—ইত্যাদিব ভেল্কি দেখিযে তোমাদেব ঠেকিযে দিতাম। হাজাব হোক লজিক মানে তর্কবিদ্যা, তর্ক আমবা বেশ শিখেছিলাম। তাছাড়া লজিক হল সমস্ত বিজ্ঞানেব বিজ্ঞান এবং সমস্ত কলা বিদ্যাব কলা বিদ্যা—এই উক্তি ছিল আমাদেব শ্রেষ্ঠত্ব জাহিব কবাব জন্য বাঁধা বুলি।

আমাদেব সেই সব শূন্যগর্ভ আস্ফালন বন্ধ হওযাব অনেক পবে লজিকেব সত্যিকাবেব মূল্য খানিকটা বুঝতে পেবেছি। গ্রীক মহা মনীষী অ্যাবিস্টটলেব লাজক ও মেটাফিজিক্স অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যাব প্রকৃত গৌবব বোঝাব সঙ্গে সঙ্গে অন্য আবও একটা কথাও বুঝতে শিখেছি, তাহল ডাযেলেকটিকস বা দ্বান্দ্বিকতা ও দ্বান্দ্বিক বিচাব পদ্ধতি। এই শেষেব পবিভাষাটিও অ্যাবিস্টটল ব্যবহাব কবেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপবীত অর্থে। ডাযেলেকটিকস এব বিবোধী গোষ্ঠীকেই তিনি যে 'ডাযেলেকটিকস পন্থী' আখ্যা দিযেছিলেন, এই মজাদাব কাহিনীটি তুমি যে কোনও পাশ্চাত্য দর্শনেব ইতিহাসে পেযে যাবে। এমন কি লজিক এবং মেটাফিজিকস এব তাৎপর্যও যুগে যুগে পালটেছে। অ্যাবিস্টটল ছিলেন বাস্তববাদী, বস্তুজগৎকে খুঁটিযে দেখতেন। এই বিশ্বজগতেব ও সমাজ সংসাবে‌ হেন দিক বোধ হয ছিল না, যা নিযে তিনি মহামহা গ্রন্থ বচনা কবেন নি। পদার্থ বিদ্যা, ?ব বিদ্যা, সমাজ বিদ্যা, বাজনীতি সব বিষযেই ত ব ছিল ক্ষুবধাব বিশ্লেষণী প্রতিভা। সেই পদাথবিদ্যা বা ফিজিক্স বচনা কবে তাঁব তৃপ্তি হল না, তিনি নিজেকে নিজে আমাদেব 'চৈতন্য চবিতামৃতে'ব গৌবাঙ্গ মহাপ্রভুব মত বুঝি প্রশ্ন কবলেন,'এহ বাহ্য, আগে কহ আব', বুঝতে চাইলেন 'ফিজিক্সে'ব পব কী আছে, অর্থাৎ নিখিল বিশ্বেব যা কিছু আমবা দেখছি তাব নিযামক কী ? তাইতেই জন্ম নিল 'ফিজিক্সেব পব'—After Physics —গ্রীক ভাষায 'মেটাফিজিক্স' কথাটি। অ্যাবিস্টটল এই জগতেব বস্তুসত্তা মেনে নিযেও শেষ প্রশ্নেব জবাবে এসে বলেছেন, বিশ্ব নিখিলেব নিযামক হলেন ঈশ্বব। ক্রমে ধর্মধ্বজীবা কযেক শতাব্দীব চেষ্টায অ্যাবিস্টটলকে তাঁদেব লোক বানিযে ফেললেন, তাঁব বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বাদ দিযে, তাঁব জিজ্ঞাসু যুক্তিবীতিকে বর্জন কবে তাঁব মেটাফিজিক্সকে লাগিযে দিলেন খ্রীস্টান ধর্মমতেব সেবায, তাঁব লজিক নিযোজিত হল শুধু মাত্র কথাব লড়াইযে, বাস্তব সত্য নিরূপণেব কাজে নয। কাবণ এই সব ধর্মধ্বজীদেব মতে অ্যাবিস্টটলেব বইযে যা লেখা আছে তাই ফিজিক্স এবং বাইবেলে যা যা লেখা আছে তাই সত্য। অতএব, সত্য নিরূপণেব আব কাজ কি ?

মধ্যযুগীয ধর্মান্ধতাব অবসানে পাশ্চাত্যে যখন আবাব বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসা ফিবে এল, তখন শুধু আকাবগত সত্যতা নয, বস্তুগত সত্যতা নিরূপণেব জন্য অ্যাবিস্টটলেব 'ডিডাকটিভ লজিক' এব পাশাপাশি 'ইনডাকটিভ লজিক' গড়ে উঠল। এই লজিকেব কাজ হল পর্যবেক্ষণ ও পবীক্ষণেব মাধ্যমে 'বিশেষ সত্য' থেকে 'সামান্য সত্যে' আবোহণ। বাম, শ্যাম, যদু, মধু সকলেই মবণশীল—অতএব মানুষমাত্রই মবণশীল—এই হল এই 'আবোহী যুক্তি পদ্ধতি'ব বীতি। এই পদ্ধতি যে একেবাবে নূতন, তা নয। সক্রেটিস এই পদ্ধতি প্রযোগ কবতেন সক্রেটিসকে বিষ প্রযোগে হত্যা কবা হযেছিল, তুমি জান। কুসংস্কাববাদীবা সক্রেটিস, অ্যাবিস্টটল, গ্যালিলিও, ব্রুণো, কপিল, গৌতম, কণাদ, চার্বাক, বুদ্ধ, কাউকে বেহাই দেযনি। কাউকে জানে মেবেছে, কাউকে খতম কবেছে কালিমালিপ্ত বা বিকৃত কবে। সত্যেব সাথে ধর্মধ্বজী কুসংস্কাববাদীদেব লড়াই চিবকাল ধবে চলছে।

এই লড়াইযের পবিপ্রেক্ষিতে আমাদেব দেশেবও ঐতিহ্য, দর্শন, চিন্তাধাবা,—সব কিছুকে দেখতে হবে। আমাদেব তর্ক কতগুলি স্থিব 'টার্ম' বা পবিভাষিক শব্দ নিযে চালালে তা আমাদেব সেই কলেজেব ছেলেমানুষি ঝগড়ায পর্যবসিত হবে। অ্যাবিস্টটলেব মেটাফিজিক্স ধর্মধ্বজীদেব কুক্ষিগত হওযায অনেক আধুনিক দার্শনিক তা বর্জন কবে ডাযেলেকটিকস্ বা 'দ্বান্দ্বিক যুক্তি প্রণালীকে' পদ্ধতি হিসাবে নির্বাচন কবেছেন। কিন্তু অ্যাবিস্টটলেব বিজ্ঞান মনস্কতা, প্রবল যুক্তি নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসাকে বর্জন কবাব প্রশ্নই ওঠে না।

আমাদেব দেশেব দর্শন ও ন্যাযশাস্ত্রেব ইতিহাসেব সঙ্গেও এব মিল বযেছে। ন্যাযশাস্ত্র আদিতে ছিল বস্তুনিষ্ঠ, ক্রমে তা ঈশ্বব চিন্তায ব্যবহৃত হয। আমাদেব দেশেব দর্শনও দুই পদ্ধতিতে চিন্তা কবেছে, কেউ কবেছে জগৎটাকে খণ্ডখণ্ড ভাবে বিশ্লেষণ কবে, কেউ কবেছে তাকে এক নিবন্তব চলমান প্রক্রিযারূপে অনুধাবন কবে। এই শেষোক্ত প্রক্রিযায সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক। ভালো এবং মন্দ, উত্থান ও পতন, অস্তি এবং নাস্তি এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযাযী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই দৃষ্টিভঙ্গিব আধুনিক নাম ডাযেলেকটিকস। পুবাতন দ্বান্দ্বিকতাবাদীবা কিন্তু এই নামটি জানতেন না। ভাবতে তো নযই, গ্রীস দেশেও নয। তা, নামে কী আসে যায ? বিশেষত তোমাব আমাব মত আনাড়ি যখন দর্শন আলোচনায মত্ত ? অতএব এস, নাম পবিভাষা ছেড়ে সোজা কথায ফেবা যাক।

ন্যায শাস্ত্র যে নিবীশ্ববাদী, এ কথা তুমি অস্বীকাব কবেছ। বৌদ্ধ নিবীশ্ববাদেব বিরুদ্ধে 'ন্যায'ই যে ছিল প্রবল প্রতিপক্ষ, এই ঘটনাকে তুমি তোমাব সপক্ষে হাজিব কবেছ। এ প্রসঙ্গে তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈযাযিক উদযনাচার্যেব পবম ঈশ্বব ভক্তি আপ্লুত 'ন্যায কুসুমাঞ্জলি'ব উল্লেখও কবেছ।

মজাব ব্যাপাব হল এই যে বুদ্ধ প্রবর্তিত নিবীশ্বব বৌদ্ধ ধর্মমতেব সঙ্গে আদিতে ন্যাযেব কোনও বিবোধ ছিল না। পবে যখন বৌদ্ধ মতবাদ হীনযান অর্থাৎ সংখ্যালঘুদেব মত এবং মহাযান অর্থাৎ সংখ্যাগুরুদেব মতে দুভাগে ভাগ হযে যায এবং নাগার্জুন দিঙনাগ প্রমুখেব প্রভাবে মহাযান বৌদ্ধ মত দার্শনিকভাবে প্রবল হযে ওঠে, তখন তাব সাথে ন্যায শাস্ত্রেব বিবোধ দেখা যায। এই বিবোধেব মূলগত কাবণ ছিল এই যে মহাযানী বৌদ্ধমত বুদ্ধেব বস্তুবাদী অবস্থান থেকে সবে এসে চবম ভাববাদী অবস্থান গ্রহণ কবেছিল। এই দার্শনিকদেব ঈশ্ববহীন শূন্যবাদেবই ওপিঠ হল শঙ্কবেব প্রবল ঈশ্ববপন্থী 'মাযাবাদ'। মহাযানী বৌদ্ধদেব শূন্যবাদ খণ্ডন কবে বস্তু জগতেব সত্যতা প্রতিষ্ঠাব জন্য ন্যাযবাদীদেব সুদীর্ঘ লড়াই কবতে হযেছিল। বাৎসাযন, উদ্যোতকাব, বাচস্পতি মিশ্র, উদযনাচার্য প্রমুখবা এই লড়াইযেব এক এক জন প্রখ্যাত সেনাপতি, বীতিমত দিকপাল। এই সব নব্য নৈযাযিকেবা বস্তুজগতেব সত্যতা প্রমাণ কবাব সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধদেব নিবীশ্ববাদেবও খণ্ডন কবাব চেষ্টা কবেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই লড়াইযেব ভাববাদ বিবোধিতাব কথাটি চাপা পড়ে গেছে, নিবীশ্ববাদ বিবোধিতাব প্রচাবটাই হযেছে বেশি কবে।

তুমি যে 'ন্যায কুসুমাঞ্জলি' বচযিতা উদযনেব কথা বলেছ, তাঁব সম্বন্ধে একটা মজাব কিংবদন্তী আছে, তা বোধ হয জান। এক বৌদ্ধ শ্রমণেব সঙ্গে ঈশ্ববেব অস্তিত্ব নিযে উদযনেব তর্কযুদ্ধ হয। যখন তর্কে কোনও মীমাংসা হল না, তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণেব জন্য উদযন একজন ব্রাহ্মণ ও ঐ বৌদ্ধ শ্রমণকে নিযে এক পাহাড়ে উঠলেন এবং দুজনকে ধাক্কা

মেরে ফেলে দিলেন। ব্রাহ্মণ ঈশ্বরকে ডেকে বেঁচে গেল, আর বৌদ্ধ শ্রমণ 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হল, কিন্তু উদয়নে অর্সাল নরহত্যার পাপ। উদয়ন পুরী গেলেন, কিন্তু পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের দরজা তাঁর জন্য খুললনা। উদয়নকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুষানলে দগ্ধ হয়ে মরতে হল।

ঈশ্বরের নামই কর আর ঈশ্বরের বাপের নামই নাও, পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে গিয়ে কেউ যে নামের জোরে বাঁচে না, এ কথা সবাই জানে। কিন্তু, গল্পের পিছনের কূট কৌশলটি লক্ষ্য কর—এক ঢিলে দু'টি পাখি মারা গেল—নৈয়ায়িক এবং বৌদ্ধ, অথচ ঢিলটিও হাতে রয়ে গেল। ঢিলটি হল ঈশ্বরের নৈয়ায়িক 'প্রমাণ'। বলে দেওয়া হল, কখনও এ ঢিল ছুঁড়ো না অর্থাৎ এই প্রমাণ প্রয়োগ করো না, মারা যাবে। পুরাণে গৌতমকে পরজন্মে শৃগাল বানান হল, আর আধুনিককালে এসে (উদয়নাচার্য ছিলেন দশম শতাব্দীর লোক) নৈয়ায়িকের জন্য বিধান হল তুষানলে প্রাণত্যাগ। ঈশ্বর ভক্ত হয়েও নৈয়ায়িক নিস্তার পেলেন না।

তুমি নব্য ন্যায়বাদীদের এই ঈশ্বর ভক্তির উল্লেখ করে আমাকে অপবাদ দিয়েছ যে আমার অভ্যাসই নাকি সর্বত্র জড়বাদ আবিষ্কার।* 'জহুরি জহর চেনে, শোরে চেনে কচু' বলে তুমি আধ্যাত্মবাদকে জহর, নিজেকে জহুরি, জড়বাদকে কচু এবং আমাকে শুয়োর বলতে চেয়েছ। তাতে ক্ষতি নেই। জহরের চেয়ে কচুরই ব্যবহার মূল্য বেশি, আর শুয়োর যদিও কখনও হীরের মূল্য বোঝেনা, জহুরিকে প্রয়োজনে কচু খেতেই হয়, তোমার উপনিষদের উষস্তি চাক্রায়ণকে যেমন খেতে হয়েছিল অস্পৃশ্যের উচ্ছিষ্ট মাষকলায়। সে জন্যই বোধ হয় আমার মত শুয়োরের দলে অনেক বড় বড় জহুরিও আছেন। তাঁদের কিছু সাক্ষ্য তোমায় দেব।

রামকৃষ্ণ মিশনকে তুমি জড়বাদী বলবে না নিশ্চয়ই। তাঁদের 'ইনস্টিটিউট অব কালচারে'র প্রকাশিত বিপুলাকৃতি The Cultural Heritage of India' ভারতীয় সংস্কৃতির এক মহাকোষগ্রন্থ। এই কোষগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৫ সালের পুনর্মুদ্রিত তৃতীয় খণ্ডের ১১০-১১২ পৃষ্ঠা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেব। তুমি সমস্ত আলোচনাটিই পড়ে দেখ, চমৎকৃত হবে। ন্যায় বৈশেষিক বিষয়ক এই আলোচনার উপ-শিরোনাম No mention of God in the Sutras.—এখানে সূত্র বলতে ন্যায় সূত্র ও বৈশেষিক সূত্রের কথা বলা হচ্ছে। লেখা হয়েছে ঃ 'এটা বিস্ময়কর যে (ন্যায়সূত্রে) যে সকল বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ কোথাও নেই। তাছাড়া মানসিক প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন যে একক আত্মার অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, তার জন্য প্রদত্ত প্রমাণ সমূহেও কোথাও পরমাত্মা রূপে কিংবা জীবাত্মা থেকে আলাদাভাবে ঈশ্বরের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই....ন্যায় ও বৈশেষিক মতাবলম্বীরা ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে যদিও বেদপ্রামাণ্যতার উৎসাহী সমর্থক,এবং যদিও তাঁরা মীমাংসকদের মত বেদকে অনাদি ও জন্মরহিত বলে মনে করেন না, তবুও সূত্র সমূহের মধ্যে কোথাও বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বা রচনা বলেও কোনও উল্লেখ নেই।... এমন কি প্রবল ঈশ্বর বিশ্বাসী বাৎস্যায়নের ভাষ্যেও বেদকে ঐশ্বরিক আখ্যা দেওয়া হয়নি। বৈশেষিক সূত্রে (২.১.১৮) বেদকে মহাজ্ঞানীদের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ গ্রন্থেই আবার (৪.৫.১-৪) বেদকে বাস্তব ঘটনাসমূহ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধীমান ব্যক্তিদের রচনা বলে

বর্ণনা কবা হযেছে। বৈশেষিক–সূত্রেব দর্শন চিন্তায কোনও সূত্রে ঈশ্ববেব কোনও প্রসঙ্গ নেই। ন্যায সূত্রেব ক্ষেত্রেও.... একমাত্র ৪র্থ অধ্যাযেব প্রথম আহ্নিকেব ১৯ থেকে ২১ এই তিনটি সূত্রে আমবা বিশ্বেব স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্ববেব উল্লেখ পাই।' এই তিনটি সূত্র সম্পর্কে অতঃপব একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা বযেছে। প্রথম সূত্রে জগতেব স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্ববেব উল্লেখ এবং দ্বিতীয সূত্রে তাব খণ্ডন বযেছে। তৃতীয সূত্র 'তৎকাবিত বাদহেতুঃ'কে বাৎসাযন ঈশ্ববেব অস্তিত্বেব প্রমাণ বলে মনে কবেন, কিন্তু অন্য সকলে তাঁব সঙ্গে একমত নন। এই আলোচনাব পব বলা হযেছে ঃ 'ন্যায বৈশেষিক দর্শন চিন্তায ঈশ্ববেব কোনও যুক্তি সঙ্গত স্থান আছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহেব সঙ্গত কাবণ বযেছে। সূত্রেব নানা অর্থসূচক বহস্যপূর্ণ ভাষা ছাড়াও লক্ষণীয যে ঈশ্ববেব কথাটি এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হযেছে মাত্র, ঈশ্ববেব অস্তিত্ব প্রমাণ কবাব জন্য উত্থাপিত হযনি। মহাবিশ্বেব নৈতিক ভিত্তিকে যাবা অস্বীকাব কবে, এই সূত্রটি তাদেব বিরুদ্ধাচবণেব জন্যই বচিত হযেছিল বলে বোধ হয।'

তাহলেই দেখছ ন্যায বৈশেষিক দর্শনেব প্রবক্তাবা যে বৌদ্ধদেব মতই নিবীশ্ববাদী [illegible] স্বকপোলকল্পিত কোনও ধাবণা নয, বামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত মহাগ্রন্থেবও তাই মত। এ বিষযে আবও কিছু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ঐ গ্রন্থ থেকে পবেও কবব। তাব আগে, ন্যায বৈশেষিক সম্পর্কে আবও দুএকটি কথা সেবে নিই।

গৌতমেব ন্যাযশাস্ত্র ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষযে অ্যাবিস্টটলেব লজিকেব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। অ্যাবিস্টটলেব লজিক, তোমায বলেছি, 'ডিডাকটিভ' বা অববোহী, সামান্য সত্য থেকে তা বিশেষ সত্যে আসে। সমস্ত মানুষেব মবনশীলতা যদি সত্য হয তবে বাম মবণশীল কিনা, এই লজিক তা প্রতিষ্ঠা কবতে পাবে। বাম শ্যাম যদু মধুব মবনশীলতা থেকে সমস্ত মানুষেব মবনশীলতাব সত্যে তা উপনীত হতে পাবে না। অতএব এই লজিকেব অন্বিষ্ট হল আকাবগত সত্যতা, বস্তুগত সত্যতা নয। ভাবতীয ন্যায শাস্ত্রেব বিচাব পদ্ধতি ভিন্ন। দুটি যুক্তিবাক্য ও একটি সিদ্ধান্ত নিযে অ্যাবিস্টটলেব তিন অঙ্গেব 'সিলজিজমে'ব পবিবর্তে পঞ্চাবযব অর্থাৎ পাঁচটি বাক্য বিশিষ্ট ন্যাযেব একটি প্রচলিত উদাহবণ তোমায দিচ্ছি। পাহাড়ে ধোঁযা দেখে অনুমান কবা হল যে 'পর্বতো বহ্নিমান' অর্থাৎ পর্বতে আগুন লেগেছে। কাবণ, অভিজ্ঞতায দেখা গেছে যে 'যত্র যত্র ধূম, তত্র তত্র বহ্নি'—যেখানেই ধোঁযা সেখানেই আগুন, যেমন ধব, বন্ধন শালা। আবাব উল্টো উদাহবণও কেউ যোগ কবেন যে, যেখানে ধোঁযা নেই, সেখানে আগুনও নেই, যথা পুষ্কবিণী বা হ্রদ। অতএব বিচাবে সিদ্ধান্ত হল যে পাহাড়ে আগুনই লেগেছে।

এই যুক্তি পদ্ধতিতে তর্ক বাক্যেব আকাবগত সত্যতাই শুধু নয বস্তুগত সত্যতাও পবখ কবে নেওযা হচ্ছে। একবাব ধোঁযাব সঙ্গে আগুনেব ব্যতিক্রম বিহীন সহ অবস্থানেব উদাহবণ মালা থেকে একটি সামান্য সত্যে 'আবোহণ' কবা হল, আবাব সেই 'সামান্য' সত্য থেকে পর্বতে আগুন লাগাব 'বিশেষ' সত্যে 'অববোহন' কবা হল। এই পদ্ধতিতে বিচাব কেবল বীতিনিষ্ঠ বা আকাবগত হল না, তা বস্তুনিষ্ঠও হল। ভাবতীয ন্যায শাস্ত্রেব এই বৈশিষ্ট্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—আমাদেব দেশেব বস্তুবাদী চিন্তা পদ্ধতিব এও একটা বিশেষ দিক।

তোমাকে আগেই বলেছিলাম, ন্যাযশাস্ত্রে নিঃশ্রেযস অর্থাৎ পবম মঙ্গল প্রাপ্তিব জন্য যে [illegible]টি পদার্থেব তত্ত্বজ্ঞান লাভেব কথা বলা হযেছে, তাব মধ্যে কোথাও ঈশ্ববেব নাম গন্ধ

নেই। সেই ষোলটি পদার্থ হল প্রমাণ, প্রমেয এবং সমস্যা, দৃষ্টান্ত, বাদ, বিতণ্ডা ইত্যাদি যুক্তি ও বিচাবেব চৌদ্দ বকম কলা। অক্ষপাদ গৌতম জোব দিযেছিলেন প্রমেযব ওপব। তাঁব উল্লেখিত বাবটি প্রমেয হল আত্মা, শবীব, ইন্দ্রিয, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব অর্থাৎ পুনর্জন্ম, কর্মফল, দুঃখ এবং অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি। এই বাবটিব মধ্যে প্রথমটিব অন্বিষ্ট হল শেষেবটি, অর্থাৎ আত্মাব লক্ষ্য মুক্তি। সেই লক্ষ্য পূবণেব জন্য মাঝখানে দশটিব বাধাকে অতিক্রম কবতে হবে। এবং সেজন্য চাই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। জ্ঞান লাভ হলে প্রবৃত্তিব লোপ হবে, প্রবৃত্তিব অবসানে পুনর্জন্মেব অবসান ঘটবে, এবং তাব ফলে দুঃখ অপসৃত হযে মোক্ষ লাভ ঘটবে। তোমাকে আগেই বলেছি দুঃখ ও জন্মচক্র থেকে মুক্তি বা মোক্ষলাভেব ব্যাপাবে হিন্দু ষড়দর্শন কিংবা বৌদ্ধ বা জৈন চিন্তাব কোনও ভেদ নেই। এই দুঃখ কোথা থেকে এল, তাবও কিছু আঁচ দিযেছিলাম। বাবান্তবে এ ব্যাপাবে আবও বিশদ বলা যাবে।

আমাব সমস্ত আলোচনায কোথাও আমি ন্যায বৈশেষিক আদিকে আধুনিক জড়বাদেব সগোত্র বলে বর্ণনা কবিনি। আমি যেটা দেখাতে চাইছিলাম তা হল এই যে বেদান্তেব আধ্যাত্মবাদই একমাত্র ভাবতীয দার্শনিক চিন্তা নয। আমাদেব যে মহান দার্শনিক ঐতিহ্যগুলি বযেছে, তাব মধ্যে বেদান্ত ছাড়া সর্বত্রই বস্তুবাদ স্বীকৃত। বস্তুই যে এই জগতেব আদি কাবণ, কোনও ঈশ্বব বা ব্রহ্ম নয, সাংখ্য মীমাংসা ন্যায বৈশেষিক এই সব কটি দর্শনেব মহিমান্বিত প্রবক্তাবাই এ কথা বলে গেছেন। এই আদি-বস্তুবাদীদেব সীমাবদ্ধতাব কথাও আমি উল্লেখ কবতে ভুলিনি। সাংখ্যেব বক্তব্য আলোচনা কবতে গিযে তোমাকে বলেছিলাম যে সে যুগেব দার্শনিকদেব পক্ষে মস্ত অসুবিধা ছিল এই যে বিজ্ঞানেব বিকাশেব সেই অতি প্রাথমিক অবস্থায বিশ্ব জগৎ সম্বন্ধে তাঁদেব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল সীমাবদ্ধ এবং সে জন্যই ভাববাদেব অনেক প্রশ্নেব সামনে তাঁবা অসহায বোধ কবতেন। একেবাবে আদিতে এসব অসুবিধে ছিল না [illegible] তখন ঋষিবা দেখতেন কর্মই জগৎকে রূপান্তবিত কবছে, দাত্র-ধাবী কৃষকেব হাত দুটিই ছিল তখন সম্পদেব স্রষ্টা। কিন্তু পবে অভিজ্ঞতাব পবিবর্তন হল। উৎপাদন পদ্ধতি হল জটিলতব। দেখা যেতে লাগল, সমাজেব সমস্ত ক্রিয়া কর্মেব পিছনে একটি সচেতন পবিকল্পনাব অস্তিত্ব বযেছে। তখন প্রশ্ন হল জগ[illegible] ও পবিবর্তনেব পিছনে সেই চেতনাময পবিকল্পনাকাবটি কে? আদি বৈদিক [illegible] এসব তর্কে যাযনি। অনায পবম্পবাগত সাংখ্য-ন্যায-বৈশেষিক দ[illegible] চেতনাব উৎস' একথা বলেও শেষ পর্যন্ত থমকে গেছে। উপবোক্ত প্রশ্নেব [illegible] জবাব দিযেছে, নিঃসংশয মীমাংসা কবতে পাবেনি এবং [illegible] জুটেছে কম, কর্মফল, পুনর্জন্ম, মুক্তি, আত্মা ইত্যাদি জঞ্জাল।

এ [illegible] আমি তোমাকে যে সব কথা বললাম, তাব সমর্থনে বামকৃষ্ণ মিশনেব যে কোষ গ্রন্থটিব তৃতীযখণ্ডেব কথা বলছিলাম, তাব মুখবন্ধ থেকে দুএক কথা তুলে দিযে আজকেব চিঠি বন্ধ কবব।

উক্ত মুখবন্ধেব XIX নং পৃষ্ঠায বলা হযেছে যে 'ন্যায বৈশেষিকে ভৌতবস্তু সম্বন্ধেই বিশদ আলোচনা কবা হযেছে, আত্মাব সেখানে মন বা বস্তু নিচয থেকে উচ্চতব কোনও অস্তিত্ব নেই। অপব পক্ষে সাংখ্য ও যোগে প্রকৃতি থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব সৃষ্টিব কথা বলা হলেও তাতে পুরুষকে বিশ্ব প্রক্রিযাব এক প্রধান ভূমিকায স্থাপন কবা হযেছে। এই

পুরুষের চৈতন্য প্রকৃতি জাত চেতনা থেকে উচ্চতর। কিন্তু সাংখ্যের এই পুরুষ সসীম ও বহু এবং যোগশাস্ত্রে যদিও ঈশ্বরের অবতারণা করা হয়েছে, কিন্তু তা হলেও তাতে তাঁর নিয়ামক ভূমিকা নেই। পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা ঈশ্বর মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী। তবে পূর্ব মীমাংসায় দেবতারা সংখ্যায় বহু এবং ক্রিয়াকাণ্ড ও যাগযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত এবং এই দেবতাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারিত হলেও তাঁরা বরদানকারী নন।'

আজ এই পর্যন্ত। উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ বেদান্তে এসে আত্মা জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণাসমূহে কী পরিবর্তন ঘটল, অন্য দর্শনগুলির তার ওপর কী প্রভাব পড়ল এবং এই সময় প্রক্রিয়ায় ভারতীয় ঐতিহ্যের নানা বিপরীতের সমন্বয়কারী শক্তি কতটা সক্রিয় ছিল, সে সম্বন্ধে আগামী দিনে আলোচনা করা যাবে।

পঞ্চম পর্ব

॥ সাতাশ ॥

আব একটা স্বাধীনতা দিবসও চলে গেল। কাল সাবা দিনে পতাকা উত্তোলন, বক্তৃতা, অনুষ্ঠান অনেক কিছুই হল। সাবাটা দিন মত্তও থাকলাম। কিন্তু ঘবে ফিবে একাকী অবসবেব মুহূর্তে মনে হল, এব অনেক কিছুই শূন্যগর্ভ। চুযাল্লিশ বছব আগেকাব কথা মনে আছে? সেই সদ্য স্বাধীন ভাবতবর্ষেব মাটিতে আমবা যাবা পদচাবণা কবছিলাম, তাদেব অধিকাংশেব কাছেই সেদিনেব দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, ক্ষমতাব জন্য জনগণেব প্রতি নেতাদেব বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলি ছিল যেন অলীক। এক সুখী সমৃদ্ধ ভাবতবর্ষেব স্বপ্ন সেই ক্লেদাক্ত বাস্তবকে সেদিন আচ্ছন্ন কবে বেখেছিল। সংশযীদেব প্রতি তীব্র বিবাগে আমবা বুকে এই আশাকে সবল কবেছিলাম, 'তিনি দিয়েছেন তিনি মিলাবেন/ ঝোড়ো হাওয়া আব পোড়ো বাড়িটায় মিলাবেন'। এবং সমাজতন্ত্রী বিধানেব স্বপ্ন নিয়ে আমবা গান গেয়েছিলাম, 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পবিধান, বিবিধেব মাঝে দেখ মিলন মহান'। সেই সব গান এখনও গীত হয, কিন্তু তাতে সেই ছন্দ, সেই সুব, সেই স্বপ্ন যেন নেই। সমস্ত পবিপ্রেক্ষিতটা পালটে গেছে।

অথচ ভাবতবর্ষেব সম্পদ ও শক্তি বাড়েনি এমন নয। গত চল্লিশ বছবে আমবা অর্থনীতি, শিল্প ও কাবিগবি নানা ক্ষেত্রে এই বছবগুলিতে পোড়ো বাড়িব ভিতে অনেক বহুতল অট্টালিকা গড়েছি। কিন্তু এই অট্টালিকাগুলিব অন্দব মহলে আম জনতা কোনও প্রবেশাধিকাব পাযনি। তাদেব ভাঙা পোড়ো বাড়িগুলি যেমনি ঝড়েব মুখে উড়ে যাচ্ছে, তেমনি বোগ বুভুক্ষা দাবিদ্র্য অশিক্ষা আব হতাশাব পাঁকে তাবা ডুবে থাকছে। ফল যা হবাব তাই হযেছে। দিকে দিকে স্বার্থবুদ্ধি, বিভেদ আব অনৈক্য প্রবল হযে উঠেছে। দেশেব অধিকাংশ মানুষ যখন দেশকে স্বদেশ বলে না জানে, ততই তো বিভেদপন্থীদেব পোযাবাবো। সে কাবণেই আজ দিকে দিকে ভাষা নিযে, ধর্ম নিযে, নদীব জল নিযে, জাত পাত নিযে এত হানাহানি, এত লড়াই। এই সঙ্কীর্ণতাবাদী বিভেদপন্থী প্রবণতাব বিরুদ্ধেই আমি তোমাকে লিখে চলেছি। কোনও বিশেষ ধর্ম ভাষা বা ঐতিহ্যেব বিরুদ্ধে আমাব কোনও জেহাদ নয।

কিন্তু তুমি আমাকে মাঝে মাঝে ভুল বুঝছ। আমি যে অনেক সময 'তোমাব উপনিষদ' 'তোমাব বেদান্ত' বলে থাকি, তাইতে তুমি বাগ কবে লিখেছ : 'তোমাব বোধশক্তি কখনও কখনও এত আচ্ছন্ন হযে থাকে যে উপনিষদকে তুমি বাববাবই 'আমাব' বলে বিশেষিত কব, কিন্তু তাইতে কী উপনিষদকে ছোট কবা যাবে? উপনিষদ কি কেবল হিন্দুব? তাজমহল কি শুধু মুসলমানেব? থিওবি অফ বিলেটিভিটি কি কেবল ইহুদীব? মানুষেব মহান সৃষ্টিগুলি সার্বজনীন, কোনও সম্প্রদায বা ব্যক্তিব এক্তিযাব ভুক্ত নয।'

তোমাব এই বক্তৃতাটির জন্য আমি হাততালি দিচ্ছি এবং তোমাব বক্তব্যেব সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। এবাবে আমি আমাব জবাবটা বলি। আমাব বাবা, তুমি জান, খুব কড়া মেজাজেব ছিলেন। আমাব নানান অপকর্ম তাই মা আড়াল কবতেন এবং বাবা তা টেবও পেতেন। তাই আমাব যে কোনও কুকীর্তি ধবা পড়লেই বাবা মাকে বলতেন 'তোমাব ছেলেব কাণ্ড শুনেছ?' বাবা যে আমাকে ত্যজ্যপুত্র কবেছিলেন তা তো আব নয়। তোমাদেব বাড়িতে আবাব অন্য বকম বীতি ছিল। তোমাব বাবাব একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল তোমাব সেজদাব ওপবে। তাই তোমাব মা যখন তোমাব বাবাকে বলতেন 'তোমাব ছেলে' তখন বোঝা যেত সেই ছেলেটি অন্য ভাযেবা নয, সে তোমাব সেজদা। তাতে যে তোমাদেব পাঁচ ভাইযেব পিতাব পিতৃত্ব নিযে কোনও সংশয উঠত, তা নয। তোমাকে যখন আমি 'তোমাব উপনিষদ' বলি তখন আমি এই দুটি অর্থেই বলি। তুমি উপনিষদেব দোষকে আড়াল কবতে চাও, তাকে দেখতে চাও অভ্রান্ত বলে, এবং অন্যদিকে হিন্দুদেব ছ—ছটি দর্শন থাকা সত্ত্বেও, তোমাব পক্ষপাতিত্ব কেবল বেদান্তেব দিকে, অন্য দর্শনগুলিকে তুমি উপেক্ষা কবে থাক। নতুবা, উপনিষদ যে আমাদেব সকলেব উত্তবাধিকাব, তা আমি জানি এবং তাব ঐশ্বর্য আমি একাধিকবাব বর্ণনাও কবেছি–সে কথা ভুলে গেলে কী কবে ?

হিন্দুধর্মে বেদান্তকে শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয, কাবণ শাস্ত্রানুসাবে তাব তিন ধবনেব প্রামাণ্যতা বযেছে। যে প্রস্থান ত্রযেব কথা আগে বলেছিলাম, সেই শ্রুতি প্রস্থান, ন্যায প্রস্থান ও স্মৃতি প্রস্থান,–বেদান্তে এই ত্রযীব মিলন ঘটেছে। উপনিষদ হল শ্রুতি প্রস্থান, কাবণ তা বেদেব অন্তর্ভূক্ত। বাদবাযণেব 'বেদান্তসূত্র' বা 'ব্রহ্মসূত্র' হল ন্যায প্রস্থান। আব পুবাণেব যুগেব মহাভাবতেব অন্তর্ভূক্ত গীতা হল স্মৃতি প্রস্থান। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে, যাব অর্থ ঃ 'বহু উপনিষদ রূপ গাভীব দুগ্ধ দোহন কবিযা গোপাল শ্রীকৃষ্ণ তাহাব সাবাংশ দ্বাবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রূপ ক্ষীব প্রস্তুত কবিযাছেন।' 'ক্ষীবে'ব আলোচনায এখন আমি যাব না, সেটা পবেব যুগেব ব্যাপাব। আপাতত উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র নিযেই কিঞ্চিৎ আলোচনা কবব।

বেদান্তেব আধুনিক ব্যাখ্যাকাবকদেব মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ এক বিবাট মনীষা। তিনি যে ভাবে বেদান্তকে ব্যাখ্যা কবেছেন এবং বিশেষত পাশ্চাত্যেব শ্রোতাদেব কাছে তাকে বিজ্ঞান সম্মত প্রতিপন্ন কবাব জন্য যা বলেছেন, সেটা সংক্ষেপে বলে নিই। তোমাকে আগেই বলেছি, মহামনীষী বম্যাঁ বলাঁ এই ব্যাখ্যাব দ্বাবা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হযেছিলেন। বিবেকানন্দ বলছেন যে বেদান্ত কোনও ব্যক্তি ঈশ্বর কে বিশ্বেব স্রষ্টা বলে মনে কবে না। বেদ অনুসাবে সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। আধুনিক বিজ্ঞানেবও তাই মত। বিবেকানন্দ বলছেন, ঈশ্বব সৃষ্টিকর্তা নন। সৃষ্টি ও ঈশ্বব, উভযেই অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞান বলছে বিশ্বেব শক্তিব ক্ষযও নেই, বৃদ্ধিও নেই, রূপান্তব আছে। বেদান্ত বলে বিশ্বেব বস্তু নিচয এই মহাশক্তিব [illegible] ঈশ্ব[illegible] বা ব্রহ্মেবই রূপান্তব। এই যে 'আমি,' এই 'অহং'–এ [illegible]ক শবীর[illegible] না, তা ন[illegible] [illegible] শক্তি, 'আত্মা,' যা অজ, অমব ও অক্ষয। দেহেব জন্ম মৃত্যু ক্ষয আছে, কিন্তু আত্মাব তা নেই। এই আত্মা নিখিল বিশ্ব–আত্মাব বা পবমাত্মাবই অংশ। দেহ মববে, কিন্তু 'আমি' মববনা। 'আমি' পূর্বেও ছিলাম, পরেও থাকব। আমিই ঈশ্বব, আমিই ব্রহ্ম।

বলাঁ আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেব দ্বাবা এই মতকে সমর্থন কবেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান বহু

দিন থেকে বলে আসছে যে মোট বস্তু ও শক্তিব কোনও ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই; আইনস্টাইন আবও এগিযে প্রমাণ কবেছেন যে শক্তি ও বস্তু অভেদ,–একে অপবেব রূপান্তব। বলা বলতে চান ১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দ শিকাগোতে যা বলেছিলেন, ১৯০৫ এ আইনস্টাইনেব 'আপেক্ষিকতাব তত্ত্ব' তাকেই সমর্থন কবে।

আলোচনা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ কযেকটি প্রশ্ন উত্থাপন কবে তাব বৈদান্তিক মীমাংসা কবেছেন। যেমন, এক, জগতে কেউ সুখী কেউ দুঃখী, কেউ সবল, স্বাস্থ্যবান কেউ বিকলাঙ্গ, কেউ জ্ঞানী, কেউ মূর্খ। এই ভেদাভেদ কেন? পবম করুণাময ঈশ্ববই যদি সব কিছুব নিযন্তা হবেন, তবে তাঁব বাজ্যে এই বৈষম্য কেন? আব ঈশ্বব যদি পাপ পুণ্যেব বিচাবকর্তা হন, তবে এই বৈষম্য তো এক সর্বশক্তিমান স্বেচ্ছাচাবী পুরুষেব নিষ্ঠুবতাকেই প্রমাণ কবে। কিন্তু তাতো স্বীকাব কবা যায না আব তাহলেই মানতে হয যে মানুষেব সুখ দুঃখেব কাবণ ঈশ্বব নন, কাবণ অন্য কিছু। এবং বিবেকানন্দ বলছেন বেদান্ত অনুসাবে তা হল পূর্বজন্মেব কর্মফল।

দ্বিতীয প্রশ্ন, শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত আত্মা দেহরূপ জড়ত্বেব বন্ধনে কেন আবদ্ধ হয? পবিপূর্ণ হযেও পবমাত্মা এই অপূর্ণতাব অধীনতা স্বীকাব কবে কেন? বিবেকানন্দ বলেছেন 'হিন্দুবা সাহসেব সঙ্গে এই প্রশ্নেব সম্মুখীন হন এবং উত্তবে বলেন, "জানি না"। .... কেন এবকম হয, এ তত্ত্ব তাঁবা ব্যাখ্যা কবাব চেষ্টা কবেন না। এটা ঈশ্ববেব ইচ্ছে, এবকম বললে কিছুই ব্যাখ্যা হয না। তাই "আমি জানি না" বলাব চেযে ভাল উত্তব কিছু নেই।'

এবাবে তৃতীয যে প্রশ্নেব উত্তব ও মীমাংসা তিনি কবেছেন, সেটি তাঁব নিজেব ভাষায (অবশ্য ইংবেজি থেকে বঙ্গানুবাদে) শোনাই ভাল। শিকাগো সম্মেলনেব নবম দিনে পঠিত এই প্রবন্ধটিতে আছে ঃ'প্রচণ্ড হাওযাব তোড়ে ছোট্ট নৌকাব মত আত্মাও কী সদসৎ কর্মেব একান্ত অনুগত হযে ক্রমাগত উঠছে ও পড়ছে?... আত্মা কি একটি ছোট পোকাব মত কার্যকাবণ চক্রেব নিচে অবস্থিত? আব ওই চক্র সামনে যা পাচ্ছে তাই ভেঙেচুবে গুঁড়ো কবে ক্রমাগত ঘুবছে? বিধবাব চোখেব জলেব দিকে তাকাচ্ছে না? পিতৃমাতৃহীন অসহায শিশুব কান্নাও শুনছে না? এসব ভাবলে মন খাবাপ হযে যায, কিন্তু প্রাকৃতিক নিযমই এই। তাহলে কি কোনও আশা নেই? ...এক বৈদিক ঋষি জগতেব সামনে দাঁড়িযে তাবস্ববে এই আনন্দ সংবাদ ঘোষণা কবলেন, "শোন, শোন, অমৃতেব পুত্রগণ, আমি সেই প্রাচীন মহান পুরুষকে জানিযাছি, যিনি সকল অন্ধকাবেব ওপাবে, যাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম কবা যায। ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই।"

'অমৃতেব পুত্র,–কী সুমিষ্ট ও কী আশাব্যঞ্জক এই অভিধা! হে ভ্রাতৃগণ! তোমবা অমৃতেব অধিকাবী। হিন্দুবা তোমাদেব পাপী বলতে চান না।.....মানুষকে পাপী বলাই এক মহা পাপ।.... কাজেই ওঠ, সিংহেব মত হযেও তোমবা নিজেদেব মেষ বলে মনে ক'হ, এই ভ্রান্তি দূব কব। মনে বেখ তোমবা অমব ও মুক্ত আত্মাব অধিকাবী। তোমবা জড় নও। জড় হল তোমাদেব দাস।'

আমি তোমাকে অনেকবাব লিখেছি যে ঋগ্বেদেব ঋষিদেব চিন্তায এই বিশ্বসংসাবেব সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসা, সংশয ও কল্পনাব উদয ঘটেছে বহুবাব বলা যায উপনিষদেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসাব বীজ ঋগ্বেদেব ঋষিদেব মনেই প্রোথিত হযেছিল। তবে তাব অঙ্কুবোদগমেব জন্য ভাবতবর্ষেব অনার্য জলবাযুব ভূমিকাও কম নয। প্রথমে ঋগ্বেদেব চিন্তাভাবনাগুলিব কথা ধবা যাক। তোমাকে বিখ্যাত নাসদীয সূক্ত অর্থাৎ দশম মণ্ডলেব ১২৯ নং সূক্ত থেকে

উদ্ধৃতি দিয়ে ইতিপূর্বে দেখিয়েছিলাম যে বৈদিক ঋষি সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে সন্দিহান। খানিকটা পুনরুদ্ধৃত করি ঃ 'এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হল, কার থেকে হল, কেউ সৃষ্টি করেছেন কি করেন নি, তা তিনিই জানেন যিনি এর অধ্যক্ষ, যিনি মহাব্যোমে রয়েছেন। অথবা, তিনিও তা না জানতে পারেন।' লক্ষ্য করছ এখানে জন্ম-মৃত্যু রহিত সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। একজন অধ্যক্ষের কথা আছে বটে কিন্তু তিনি ইন্দ্র বরুণাদির মতই একজন দেবতামাত্র। এই সূক্তেই আছে যে এই দেবতারা মানুষের মতই সৃষ্ট জীব।

আবার ঐ দশম মণ্ডলেরই ১৪৯ নং সূক্তে দেখ ঃ 'সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন। তিনি বিনা অবলম্বনে দ্যুলোককে দৃঢ়রূপে বেঁধে রেখেছেন। ... তিনি হতেই পৃথিবী, তিনি হতেই আকাশ উদয় হয়েছে, তিনি হতেই দ্যুলোক ও ভূলোক বিস্তীর্ণ হয়েছে। যে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হয়ে থাকে, যাঁরা অমর্ত্য ভুবনের উৎপন্ন জীব স্বরূপ, তাঁরা শেষে জন্মেছেন।' এই সূক্তে সবিতা অর্থাৎ সূর্যকেই জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে কোনও স্রষ্টা নেই, অধ্যক্ষ বা নিয়ামকও নেই। দেবতারা জন্মেছেন অনেক পরে।

ঐ একই মণ্ডলের ৮২নং সক্ত আবার অন্যরকম। সেখানে আছে ঃ 'সে সুধীর পিতা উত্তম রূপে দৃষ্টি করে, মনে মনে আলোচনা করে জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। যখন এর চতুঃসীমা ক্রমশ দূর হয়ে উঠল, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক হয়ে গেল।.... যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, ...যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন,... সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হয়েছিল তাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে।....তাঁকে তোমরা বুঝতে পার না,.....কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হয়ে লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে, তারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তবস্তুতি উচ্চারণ করে বিচরণ করে।' এই সূক্তে স্পষ্টতই একজন স্রষ্টা ব্যক্তি বিধাতার কথাই বলা হচ্ছে অর্থাৎ বেদের ঈশ্বর সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দাবিকে সঠিক বলা যায় না। তবে লক্ষণীয় যে এই সূক্তে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, যজ্ঞ, প্রসাদ ভক্ষণ, পূজা অর্চনাকে অজ্ঞের অন্ধ আচরণ বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। আজকের দিনের ধর্মধ্বজীরা এই ঋষি বাক্যটি মন দিয়ে অনুধাবন করতে পারেন।

সে যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। হিন্দু ধর্মে যে গ্রন্থ প্রামাণ্য বলে কথিত সেই বেদে সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে নানা মুনির যে নানা মত, তার কিছু কিছু বিবরণ ওপরে দিলাম। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কেউ আছেন কিনা, কোনও কোনও বৈদিক ঋষি সে সম্বন্ধে সন্দিহান, কেউ বা মনে করেন যে বস্তুজগতেই সৃষ্টির কারণ রয়েছে, যেমন সবিতা অর্থাৎ সূর্য, আবার অন্য কেউ মনে করেন কোনও এক ব্যক্তি ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ামক। এর পাশাপাশি অন্য একটি ধারণাও গড়ে উঠছিল,-তা হল এই বিপুল বিশ্বের সর্বত্র একটি একক সর্বব্যাপী সর্বনিয়ন্তা শক্তির অস্তিত্বের কল্পনা। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ নং সূক্তের বক্তব্যটি শোন এই সূক্তে বলা হচ্ছে যে দেবতাদের যত বিভিন্ন নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, তাঁদের কার্য ও শক্তির মধ্যে এক মহৎ ঐক্য বিদ্যমান। 'অগ্নি বেদিতে বিরাজ করেন, বনে প্রজ্বলিত হন, আকাশে জন্মলাভ করেন, পৃথিবীতে বিকশিত হন; তিনি উত্তাপ রূপে শস্য উৎপাদন করেন, সূর্যরূপে পশ্চিমদিকে অস্ত গিয়ে পূর্বদিকে উদিত হন; তিনি আকাশে বিচরণ করেন, ভূমিতে বাস করেন। দিবা ও রাত্রি পরস্পর সঙ্গত হয়ে আসছে ও যাচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্প

রূপে বস পান কবাচ্ছে। যে নিযমে একদিকে বজ্রপাত হচ্ছে, সেই নিযমে অন্যদিকে হচ্ছে বৃষ্টি। যিনি মনুষ্য ও পশুপক্ষীকে সৃষ্টি কবেন, তিনিই শস্য উৎপাদন কবেন, বৃষ্টি দান কবেন, পৃথিবীকে ধনধান্যে পূর্ণ কবেন।' ইত্যাদি.....

বিশ্বসংসাব সম্বন্ধে বিচিত্র ভাবনাব এই ঐশ্বর্য বেদেব মত উপনিষদেও বর্তমান। উপনিষদ পড়লেই তুমি পাবে তাতে নানা বিতর্ক, জল্পনা-কল্পনা, অজ্ঞেযকে জানাব অফুবন্ত আকুতি, সংশয, সমাধান ও পুনবপি সংশয। তবে এই সমস্ত আলোচনাকে আমি দর্শন না বলে কাব্য বলে আখ্যা দেওযাব বেশি পক্ষপাতী, কাবণ সমগ্র উপনিষদ সাহিত্যে যুক্তি তর্কেব মীমাংসাব পবিবর্তে যা বযেছে তা হল গভীব অনুভূতি। বাদবাযণেব ব্রহ্মসূত্রে এই অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানকেই ন্যাযশাস্ত্র সম্মতভাবে সূত্রাযিত কবাব প্রচেষ্টা দেখা যায। ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্তসূত্রে মোট চাবটি অধ্যায। তাব প্রথম অধ্যাযেব নাম 'সমন্বয'। এই নামেই প্রকাশ যে উপনিষদেব নানা বিবোধী মতকে এই অধ্যাযে একটা সামঞ্জস্য দেবাব চেষ্টা কবা হযেছে। কিন্তু সেই সমন্বয কি সাধিত হযেছে? তা যে হযনি, তাব প্রমাণ—এক বেদান্তেবই দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টদ্বৈত,-নানা ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা কাবকবা কেউ জ্ঞানপন্থী, কেউ ভক্তিবাদী। কেউ ব্রহ্ম ছাড়া কোনও ব্যক্তি ঈশ্ববকে মানতে চান না, আবাব কেউ শাক্ত, কেউ বা বৈষ্ণব। তুমি তো জান অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই এক, অদ্বিতীয ও একমাত্র সত্য এবং জগৎ হল মাযা মাত্র, এমনকি ঈশ্ববও মাযাময। শঙ্কব এই মতেব প্রবক্তা। বামানুজ ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। এই মতে ব্রহ্ম ও জগৎকে যদিও এক বলে মানা হয, আবাব ঈশ্ববরূপী ব্রহ্মকে সৃষ্টি, পালন ও সংহাবেব প্রকৃত নাযক বলেও বর্ণনা কবা হয। এই দুই প্রকাব মতেব আবাব নানা বকম পার্মুটেশান কম্বিনেশান আছে। বল্লভাচার্য এই সব মতেব প্রচাবকদেব একজন। অপবদিকে আছেন দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য ও নিম্বার্ক। এঁদেব মতে ব্রহ্ম জীব ও জড সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রহ্মই ঈশ্বব, তিনিই স্রষ্টা ও কর্তা এবং জগৎ হল কার্য। শঙ্কব জ্ঞান ও উপলব্ধিব মাধ্যমে ব্রহ্মে লীন হওযাব কথা বলেন, অন্যবা জ্ঞান ভক্তি কর্মেব মাধ্যমে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কবাব কথা বলেন। এবা সবাই বেদান্তবাদী, কিন্তু একজন অপব জনেব চেযে অনেক দূব। অতএব, বিবেকানন্দ যে হিন্দুদেব বেদান্তেব কথা বলেছেন, এবকম কোনও সর্বজনগ্রাহ্য বেদান্ত ভাষ্য হিন্দুদেব নেই। তিনি যেটা বলেছেন, সেটা একান্তভাবে তাঁবই। অন্য অসংখ্য হিন্দু এই ভাষ্যকে যে অস্বীকাব কবে, তা অপ্রিয হলেও সত্য।

উদাহবণস্বরূপ শঙ্কবাচার্য সম্বন্ধে ভক্তিবাদী শ্রীচৈতন্য কী মতপ্রকাশ কবেছিলেন সে সম্বন্ধে তোমায একটু বলছি। কৃষ্ণদাস কবিবাজ বিবচিত অসাধাবণ গ্রন্থ 'শ্রী শ্রী চৈতন্য চবিতামৃতে'ব 'আদি লীলা,' সপ্তম পবিচ্ছেদে এই কাহিনী আছে। বৃন্দাবন যাবাব পথে শ্রী চৈতন্য কিছু দিন কাশীতে ছিলেন। সেখানে চণ্ডাল, শূদ্র, ম্লেচ্ছ সকলেই তাঁব অনুগত হওযাতে কাশীব সন্ন্যাসীকুল ব[illegible] ক্রুদ্ধ হলেন। কৃষ্ণদাস কবিবাজ লিখছেন ঃ

[illegible]

মাযাবাদীগণ তাঁবে লাগিলা নিন্দিতে
সন্ন্যাসী হইযা কবেন গাযন নাচন।
না কবে বেদান্তপাঠ কবে সঙ্কীর্তন।।
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে।
ভ[illegible]কেব সনে।

শ্রীচৈতন্য এসব উপেক্ষা কবছিলেন। তিনি শূদ্র চন্দ্রশেখবেব ঘবে বাস কবতেন ও তপন মিশ্রেব ঘবে ভিক্ষান্ন নিতেন। শ্রীচৈতন্যেব নিন্দা সহ্য কবতে না পেবে তাঁবা প্রাযই আক্ষেপ কবতেন। শেষ পর্যন্ত একজন ব্রাহ্মণ ভক্ত অনেক বলে কযে সন্ন্যাসীদেব সঙ্গে শ্রীচৈতন্যেব এক আলোচনাব ব্যবস্থা কবলেন। তিনি নিজে সন্ন্যাসী হযেও কখনও সন্ন্যাসী সঙ্গ কবতেন না। ভক্তেব অনুবোধে বাজি হলেন। এই সাক্ষাৎকাবে সন্ন্যাসীবা তাঁব বিনয়ে মুগ্ধ হযে গেলেন। শ্রীচৈতন্য বললেন,' আমি মূর্খ বলে গুরু আমাকে বলে দিযেছেন যে আমাব বেদান্তে অধিকাব নেই। তাই আমি কৃষ্ণমন্ত্র জপ কবি। গুরু আমাকে বলে দিযেছেন কলিকালে হবিনাম ভিন্ন আব গতি নেই। হবের্নাম হবের্নাম হবের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিবন্যথা।' তখন সন্ন্যাসীবা তাঁব বাগ্‌ভঙ্গীতে খুশি হযে বললেন, 'বেশ তো'

কৃষ্ণ [illegible] ইহায সবাব [illegible]
বেদান্ত ন [illegible] দোষ ।।

শ্রীচৈতন্য বললেন 'তোম [illegible] দোষ না [illegible], তবে সত্য কথা বলি। সন্ন্যাসীবা সমস্ববে বললেন, বল ' [illegible] ' তখন পবম বিনযী, অসাধাবণ তার্কিক কিন্তু তর্কে পবাঙ্মুখ শ্রীচৈতন্য যা জ [illegible] দিলেন, তা খবই কৌতহলপ্রদ। [illegible]দাস [illegible]বাজ লিখছে ঃ

প্রভু [illegible] বেদান্ত-সূত্র ঈশ্ব [illegible]
[illegible]সরূপে কৈল যাহা শ্রীনাবাযন ।।
উপনিষৎ সহিত সূত্র
.... কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থে পবম মহত্ত্ব ।।
গৌণবৃত্তে যেবা ভাষ্য কবিল আচার্য্য।
তাহাব শ্রবণে নাশ যায সর্ব্বকার্য্য ।।
তাঁহাব নাহিক দোষ ঈশ্ববাজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ কবিল অর্থ মুখ্য আচ্ছাদিযা ।।
তাঁব দোষ নাহি তিঁহো আজ্ঞাকাবী দাস।
আব যেহ শুনে তাব হয সর্বনাশ ।।

[illegible] শতাব্দীব বাংলা ভাষা বু [illegible] পাবছ তো? শ্রীচৈতন্য বেদান্তেব কোনও নিন্দা কবলেন না। বিনযেব সঙ্গে বললেন যে ব্যাসদেবরূপী সাক্ষাৎ নাবাযণ এব স্রষ্টা। এব ব্যাখ্যাতা আচার্য অর্থাৎ শঙ্কবাচার্যেব নিন্দাও তিনি কবলেন না. বললেন যে তিনি ঈশ্ববেব দাস এবং ঈশ্ববেব আজ্ঞা পেযেই বেদান্ত ভাষ্য বচনা কবেছেন। কিন্তু সেই ভাষ্যে তিনি মুখ্য অর্থ আচ্ছাদন কবে গৌণ অর্থকে বড় কবে তুলেছেন, এবং তা শুনলে সর্বকার্য নাশই শুধু হয না, যে শোনে তাবও সর্বনাশ হয। শ্রীচৈতন্য সর্বজীবে ঈশ্বব দেখেন, তাই তিনি কাবও সাক্ষাৎ নিন্দা না কবে যা বললেন, তাতে বোঝা গেল বেদান্ত কোনও তর্কাতীত পবম সত্য নয, তাব মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ আছে,-অর্থাৎ তাতে বিতর্কেব অবকাশ বযেছে এবং শঙ্কবাচার্য যে ব্যাখ্যা কবেছেন, তা একেবাবেই মিথ্যা, অকল্যাণকব, সর্বনাশী। সে কাবণেই তিনি বেদান্ত পাঠ কবেননণা, শোনেনও না। মতবিবোধ কতদূব তীব্র, তা দেখতে পাচ্ছ তো?

শ্রীচৈতন্য যদিও প্রথমে নিজকে মূর্খ অ্যাখ্যা দিযে বেদান্তে তাঁব অনধিকাবেব কথা বলেছিলেন, কিন্তু এবপব তিনি সন্ন্যাসীদেব অনুবোধে বেদান্তেব তত্ত্ব আলোচনা কবলেন। সন্ন্যসীবা তাঁব বিচাবে মুগ্ধ হযে তাঁকে 'বেদময সাক্ষাৎ নাবাযণ' বলে স্তুতি কবলেন এবং তাঁবাও কৃষ্ণপ্রেমে মাতোযাবা হযে গেলেন বলে কৃষ্ণদাস কবিবাজ লিখে গেছেন। সেই সব আলোচনাব পুনরুল্লেখ আব কবছিনা, শুধু তা থেকে আমাব বক্তব্যেব পক্ষে প্রাসঙ্গিক [illegible] উদ্ধৃত [illegible]

[illegible]

[illegible]াস ভ্রান্ত বলি তাঁহা উঠাইল বিবাদ।।
প[illegible]ণামবাদে ঈশ্বব হযেন বিকাবী।
এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপনা যে কবি।।
ব[illegible]তঃ পবিণামবাদ সেইত প্রমাণ।
দে[illegible]হ আত্মবুদ্ধি হয বিবর্তেব স্থান।।

আমি এব আগে তোমাকে যে সব কথা লিখেছি, তা মনে থাকলে ওপবেব এই কথাগুলি বুঝতে খুব অসুবিধে হবে না ব্যাসেব সূত্র বলতে বোঝাচ্ছে বাদবাযণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্র। পবিণামবাদ হল প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যমত। এই দর্শনেব 'সৎকার্য বাদ' তত্ত্ব অনুযাযী প্রকৃতিব ক্রমাগত 'কাবণ' থেকে 'কার্যে' রূপান্তব হচ্ছে, কিন্তু তাব ফলে কোনও নূতন কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না। কার্য ও কাবণ প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন, একে অন্যেব রূপান্তব মাত্র। তোমাকে মহাভাবত থেকে পঞ্চশিখেব উপাখ্যান শুনিযেছিলাম, তাতে পঞ্চশিখ বলেছিলেন গরু ঘাস ও জল খায, কিন্তু তা থেকে যেমন দুধ ও ঘি জন্মে, দুটি কাষ্ঠেব ঘর্ষণে যেমন আগুন উৎপন্ন হয, বা জলে কোনও দ্রব্য কযেকদিন ভিজিযে বাখলেই যেমন মাদকতাব সৃষ্টি হয,–তেমনি দেহ থেকে জ্ঞান ও আত্মাব উদ্ভব। জড় থেকে তা ভিন্ন কিছু নয। এই হল 'সৎকার্যবাদ' বা 'পবিণামবাদ'। অপব পক্ষে বিবর্তবাদ হল শঙ্কবেব মাযাবাদ। এই তত্ত্ব অনুযাযী ব্রহ্ম এক ও অপবিবর্তনীয। জগৎময তাব যে নানারূপ আমবা দেখি তা হল 'বিবর্ত' বা মাযা মাত্র। শ্রীচৈতন্য বলতে চাইছেন যে ব্রহ্মসূত্রে পবিণামবাদই স্বীকৃত। ঐ তত্ত্ব অনুযাযীই দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মে, শ্রীচৈতন্য তুলনা দিযে বলেছেন সমুদ্রে যেমন জন্মে বত্নবাজি, ঠিক তেমনি। তাই শঙ্কবাচার্য যে বিবর্তবাদ স্থাপন কবছেন, তা হল ভ্রান্ত। বস্তুত ঃ পবিণামবাদ অর্থাৎ সাংখ্য মতই সঠিক। ব্রহ্মসূত্রকে এভাবে পবিণামবাদ বলে বর্ণনা কবাকে বৈদান্তিকবা, বলা বাহুল্য, মেনে নিতে পাবেন না। কৃষ্ণদাস কবিবাজেব এই কাহিনীতে অবশ্য বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীবা শ্রীচৈতন্যেব যুক্তি অনাযাসেই মেনে নেন, তাতে গ্রন্থকাবেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয, কিন্তু স্বভাবতই বিতর্কেব কোনও মীমাংসা এতে হযনা। এই বিতর্কে প্রবেশ কবাব ইচ্ছে, প্রযোজন বা যোগ্যতা কোনওটাই আমাব নেই। শঙ্কবাচার্য ও শ্রীচৈতন্য উভযেই আমাদেব দেশেব ধর্মান্দোলনেব দুই দিকপাল নেতা। এঁদেব বৈদগ্ধ্যেব কাছে তো 'মুই অতি ছাড়'। এখানে আমি শুধু তোমাকে লক্ষ্য কবতে বলব যে এই সব নানামত ও মতবিবোধ থেকে প্রমাণ হয যে, এক অখণ্ড হিন্দু দর্শন বলে কোনও কিছু নেই, এমন কি বেদান্তও এক ঐক্যবদ্ধ চিন্তা নয। ভাবতীয চিন্তা ভাবনা দর্শনেব ক্ষেত্রে যেটা আছে, তা হল নানা বিভিন্ন মতেব সমন্বয সাধনা। সেই সাধনা প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত চলছে। এই মূল কথাটি যে না বোঝে, সেই নিজ নিজ সম্প্রদাযেব মত নিযে কলহ, বিতর্ক, হানাহানি কবে; সত্য [illegible]য

যায় অবহেলিত, উপেক্ষিত ও বিড়ম্বিত। এই কলহকাবীদেব সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথেব কথা দিযে আজকেব চিঠি শেষ কবি। গত ববিবাব দূবদর্শনে দেবব্রত বিশ্বাসেব গলা শুনে ছুটে গিযে শুনতে বসে গেলাম। পবপব ববীন্দ্রনাথেব কযেকটি ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁব কণ্ঠে শুনলাম। নিখিল বিশ্বেব এক পবম ঐক্যেব উপনিষদীয বোধে সম্পৃক্ত এই গানগুলিতে ঈশ্ববানুভূতি আছে, কিন্তু কোনও বৈদান্তিক, বৈষ্ণব, শাক্ত বা হিন্দু সাম্প্রদাযিকতা নেই। দেবব্রত যখন তাঁব দবদি উচ্চাবণে গাইছিলেন–

তোমাব কথা হেথা কেহ তো বলেনা।

কবে শুধু মিছে কোলাহল ।

সুধা সাগবেব তীবেতে বসিযা পান কবে শুধু হলাহল।

তখন ঐ 'উপনিষদেব কবি'ব মত আমিও নিখিল বিশ্বময অমৃত সাগবেব তীবে উপনিষদেব ধর্ম ও দর্শন নিযে কলহকাবীদেব কোলাহল ও গবল মন্থনেব নিবর্থকতাকে যেন স্পষ্ট উপলব্ধি কবতে পাবছিলাম।

॥ আটাশ ॥

তুমি আবাব ক্ষেপে গেছ' দার্শনিক নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে নেমে এসে এবাব তুমি আমাকে এক হাত নিযেছ। তুমি লিখেছ ঃ 'হিন্দু ধর্ম ও দর্শনকে ছোট কবাব জন্য তুমি এক ধূর্ত চতুবতাব আশ্রয নিযেছ। তুমি দেখাতে চাইছ যে হিন্দু ধর্মে যেহেতু বিভিন্ন বিবোধী দৃষ্টিভঙ্গি বযেছে এবং যেহেতু একটি মত অন্য মতেব বিবোধী,–অতএব সব মত কাটাকুটি হযে সব কিছুই মিথ্যে ' এত ভাবি অদ্ভুত কথা' মতবিবোধ তো সব কিছুতেই থাকতে পাবে। খ্রীস্টানদেব মধ্যে ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, অর্থোডক্স নেই? মুসলমানদেব সিযা, সুন্নি, বৌদ্ধদেব হীনযান, মহাযান, এসব কেন? হিন্দুধর্মেব মূলগত ঐক্যকে তুমি দেখতে পাওনা? ওহে তর্কবীব, তোমাব মার্ক্সবাদেব কী দশা? তাব মধ্যে নানা মুনিব নানা মত নেই? তোমাদেব মনোলিথিক কমিউনিস্ট পার্টিতে তো মড়ক লেগেছে। পূর্ব–ইউবোপ গেছে, এখন বাশিযাযও কমিউনিজমেব হবিধ্বনি উঠেছে। মাত্র সত্তব বছবেই এই? অথচ হিন্দু ধর্ম হাজাব হাজাব বছব টিকে আছে এবং থাকবে। তোমবা যতই ঘেউ ঘেউ কব, হাতি তাতে ভ্রুক্ষেপ কববে না।'

এ তো বীতিমত 'হিটিং বিলো দ্য বেল্ট'।

প্রথমত ঃ তোমাকে মনে কবিযে দিচ্ছি আমাদেব বিতর্কেব বিষয আদৌ 'হিন্দুধর্ম বনাম মার্ক্সবাদ' নয। সুতবাং তোমাব মন্তব্যগুলি একেবাবেই অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তব। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাধাবণভাবে ধর্মকে আমি অস্বীকাব কবি বটে, কিন্তু সে ধর্ম কোনও বিশেষ ধর্ম নয। হিন্দুধর্মকে 'ছোট কবাব' প্রশ্ন তখনই উঠতে পাবে, যখন অন্য কোনও ধর্মকে 'বড় কবাব' ইচ্ছে থাকে। এক্ষেত্রে আমাব অবস্থান যেহেতু সাধাবণভাবে ধর্মেব বিরুদ্ধে সুতবাং সে প্রশ্ন উঠছে না। দ্বিতীযত অন্যান্য ধর্মেব মতবিবোধেব সঙ্গে হিন্দুধর্মেব 'বহুমত্য' তুলনীয নয। হিন্দুধর্মেব কোনও যীশু, মহম্মদ বা বুদ্ধ নেই, এমন কি নেই আল্লা, গড বা বুদ্ধেব মত সর্বসম্মত উপাস্য। সহস্র বছবেব ভাবনা, চিন্তা, জীবন ধাবা মিলিত হযে গড়ে উঠেছে হিন্দুধর্ম' তাব মধ্যে আর্য অনার্য, বৈদিক অবৈদিক, ব্রাহ্মণ্য

অব্রাহ্মণ্য, আস্তিক নাস্তিক, ব্রহ্মবাদী ভূতবাদী, যুক্তিবাদী বিশ্বাসবাদী–সব বকমেব স্রোত আছে। আমি এই কথাটাই বলতে চেযেছি। আমি বলতে চেযেছি হিন্দুধর্মেব কোনও 'এক ও অদ্বিতীয' মূলমন্ত্র নেই, এবং তাই মৌলবাদেব পক্ষে হিন্দুধর্ম থেকে কোনও যুক্তি খাড়া কবা মুশকিল, হিন্দুধর্ম থেকেই অন্য যুক্তি দিযে তা খণ্ডন কবা যাবে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব 'আত্মজীবনী' থেকে দুএকটি অনুচ্ছেদ শোন। তাতে হিন্দুধর্মেব একটা ছবি পাবে। তিনি লিখেছেন ঃ

'আমাব কাশী পঁহুছিবাব তৃতীয দিবসে প্রাতঃকালে মানমন্দিবেব প্রশস্ত গৃহ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে পূর্ণ হইযা গেল। তাঁহা;দে সকলকে চাবি পংক্তিতে বসাইলাম; ঋগ্বেদেব এক পংক্তি। সামবেদী দুইটি মাত্র বালক, তাহাদিগকে আমাব পার্শ্বে বসাইলাম। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেবা সকলে মিলিযা অতি উচ্চৈঃস্ববে উৎসাহ সহকাবে "অগ্নিনীড়ে পুবোহিত্যং" পাঠ কবিলেন। তাহাব পবে যজুর্বেদীবা যজুর্বেদ আবম্ভ কবিলেন। যেই তাঁহাবা "ঈষে ত্বা উর্জ্জে ত্বা" পাঠ ধবিলেন অমনি একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যজমান হম্‌কো অপমান কিযা।" আমি বলিলাম, "কিসেব অপমান?" তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ যজু প্রচীন যজু হ্যায, উসকা সম্মান আগে নঁহী হুযা, উসকা পাঠ আগে নঁহী হুযা, হম লোগোঁকা অপমান হুযা।" আমি বলিলাম " তোমবা আপসে এ বিষযে মিটমাট কবিযা লও।" এখন এই দুই দলে বিবাদ বাধিযা গেল, কে আগে পড়িবে। আমি যখন দেখিলাম তাঁহাদেব বিবাদ আব কোন মতে মিটে না, তখন তাঁহাদেব দুই দলকেই একত্রে পড়িতে বলিলাম। এই কথায তাঁহাবা সন্তুষ্ট হইযা দুই দলেই উচ্চৈঃস্ববে গোলমালে পড়িতে লাগিলেন, কিছুই বুঝা যায না।' এবপব দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন, যজ্ঞেব প্রসঙ্গ উঠতে একজন ব্রাহ্মণ ' বলিলেন, "হমলোগোকে যজ্ঞমে পশুবধ নঁহী হোতা হ্যায।" আব এক দিক হইতে কতগুলি ব্রাহ্মণ উঠিলেন, "জিস যজ্ঞমেঁ পশুবধ নঁহী ওহ যজ্ঞ ক্যা যজ্ঞ হ্যায? বেদ মেঁ হ্যায শ্বেতমালভেত, শ্বেত ছাগল কো বধ কবেগা।" আমি দেখিলাম যজ্ঞেতেও দলাদলি।' আশা কবি তুমি বলবেনা যে দেবেন্দ্রনাথেব মুখে এসব কথা বসিযে দিযে আমি হিন্দুধর্মকে ছোট কবাব চেষ্টা কবছি। 'আত্মজীবনী' খানা একবাব পড়ে দেখ।

হিন্দুধর্মেব যে মূলগত ঐক্যেব কথা বলছ–আত্মা, আত্মাব অবিনশ্ববতা, পুনর্জন্ম, মোক্ষ ইত্যাদি বিষযগুলি শুধু হিন্দুব নয, প্রাচীন ভাবতবর্ষেব আর্য অনার্য জনগোষ্ঠীব, বৈদিক অবৈদিক, প্রাক–ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন সকলেবই উত্তবাধিকাব, সে কথা তোমায ইতিপূর্বে বলেছি। আবও একটু এগিযে, যদি ঈশ্বব চিন্তাব কথা বল, তবে এ বিষযে যে 'মূলগত ঐক্য' নেই, বহু প্রমাণ দিযে তোমাকে তা বুঝিযেছি। আব যাঁবা পবমেশ্ববে বিশ্বাস কবেন, তাদেব মূলগত ঐক্য তো শুধু কোনও বিশেষ ধর্মে সীমাবদ্ধ নয। একথা তো বামকৃষ্ণদেবই বুঝিযে দিযেছেন জলেব উদাহবণ দিযে। ঈশ্ববকে কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ আল্লা, কেউ গড, যেমন জলকে কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওযাটাব–এ কথাতো তিনিই বলেছেন। অতএব, মূলগত ঐক্য যদি কোথাও থাকে তবে সে তো সর্বধর্মেব মানুষেব মধ্যেই আছে। শুধু সঙ্কীর্ণ গন্ডিতে তাকে খোঁজা কেন? এই কথাগুলিই আমি বলতে চেযেছি। অন্য কিছু নয।

তৃতীযত তুমি যে মার্ক্সবাদেব কথা বলেছ, অপ্রাসঙ্গিক হলেও, কথাটা যখন উঠেছে, জবাব দিযে বাখা ভালো। দীর্ঘকাল টিকে থাকা দিযে শ্রেষ্ঠত্বেব বিচাব কবো না, ভুল সিদ্ধান্তে আসবে। ধবো, অ্যামিবা কতকাল ধবে টিকে আছে, সে তুলনায মানুষেব ইতিহাস কতটুকু, সভ্যতাব ইতিহাস তো আবও হ্রস্ব। কখনও কখনও মনে হযেছে, ঐ জী ? ন ই

টিকে যাবে, মানুষের অস্তিত্ব বুঝি যায় যায়। প্লেগ, বসন্ত, ক্যান্সার, এখনকার এইডস্ মারাত্মকভাবে মানুষের অস্তিত্বকে বার বার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছে, কিন্তু নবীন মানুষ তার নবীনতর সভ্যতা নিয়ে সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, প্রাচীন ভয়াল দৈত্যের কাছে হার স্বীকার সে করেনি। মানুষ নিজেও কতবার আত্মঘাতী হতে চেয়েছে–হিটলারের ফ্যাসিবাদ, হিরোসিমা নাগাসাকিতে আণবিক বোমা, ভিয়েৎনামে আমেরিকার দস্যুবৃত্তি–ইতিহাসে কোনওটাই শেষ কথা হয়নি। অতএব, আজকের রাশিয়ার বিপর্যয়ই যে শেষ কথা, কে তা বলল? প্যারি কমিউন মাত্র ৭২ দিন স্থায়ী হয়েছিল, এবং তা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল মার্ক্সবাদী তত্ত্ব পরীক্ষার ল্যাবরেটরি। সেই কমিউনের সাফল্য ও ব্যর্থতার শিক্ষা নিয়ে মানব সভ্যতা অনেক এগিয়েছে। সে ছিল মাত্র ৭২ দিনের অভিজ্ঞতা। রাশিয়ার ৭২ বছরের অভিজ্ঞতার পর যদি তা ব্যর্থও হয়ে যায়, তবে তা যে কী বিপুল পরিমাণ শিক্ষা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাবে, তা কি ভেবে দেখেছ? মার্ক্সবাদ তো অলস আলোচনা, উপাসনা বা কেবল পাঠের বিষয় নয়, তা একটা বিজ্ঞান–প্রয়োগেই তার সাফল্য ও ব্যর্থতা। আজ পর্যন্ত কোনও মহাশয় যখন মার্ক্সবাদের বৈজ্ঞানিক মর্মবস্তুর ভ্রান্তি প্রমাণ করতে পারেননি, তখন তার সফলতর প্রয়োগের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। চতুষ্পার্শ্বের বৈরিতার মধ্যে যে পরীক্ষা ৭২ দিনে ব্যর্থ হয়েছিল এবারে তা ৭২ বছর টিকে রইল। আগামী শতাব্দীতে বৃহত্তর সাফল্য নিয়ে সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। এ কোনও দৈববাণী নয়। যুক্তি শাস্ত্র। সেই যে বলেছিলাম, ন্যায়শাস্ত্রের 'যত্র যত্র ধূমঃ, তত্র তত্র বহ্নিঃ'। সারা পৃথিবী ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। অশিক্ষা, মৃত্যু, হাহাকার, রোগ, যুদ্ধে অসংখ্য মানুষ বেপমান। বুঝতে পারছ না প্রতি মানুষের হৃদয় কী বহ্নিমান? দেখতে পাচ্ছনা, তাই। যুক্তি দিয়ে বোঝ। তাহলেই জানতে পারবে, সর্বত্র কী আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। একদিন এই আগুন লেলিহান শিখা মেলবেই, তখন আর পর্বতে 'ধূম'নয়, দেখবে 'পর্বতো বহ্নিমান'। সেই বিপ্লবের আগুনে আর একবার সব পুরনো জঞ্জাল ছাই হয়ে যাবে।

এসব কথা থাক। তুমি তুলেছ বলেই কথাগুলি বললাম। বিপ্লব ছেড়ে চল, বেদান্তে ফিরে যাই। 'বেদান্ত সূত্র' বা 'ব্রহ্মসূত্রে'র প্রথম অধ্যায়ের নাম যে 'সমন্বয়' একথা তোমায় আগে লিখেছি। উপনিষদের এই যে সব নানা চিন্তার সমন্বয় প্রয়াস, লক্ষ্য করলে দেখবে তার অধিকাংশের বিষয়বস্তু জড় জগৎ। ভূলোক, দ্যুলোক, এই দেহ, প্রাণ, অন্ন, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, জল, বায়ু ইত্যাদি নিয়ে উপনিষদের ঋষিগণ নিরন্তর চর্চা করে গেছেন। তাহলে দেখতে পাচ্ছ সাংখ্যের চিন্তার সঙ্গে উপনিষদের চিন্তার কতকগুলি ক্ষেত্রে অভিন্নতা রয়েছে। বিবেকানন্দ যে বৈজ্ঞানিক চিন্তার কথা বলছেন, বলছেন যে হিন্দু মতে সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত, ঈশ্বর শূন্য থেকে বিশ্ব সৃষ্টি করেন নি–এই চিন্তাও সাংখ্যের। গত চিঠিতে তোমাকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের বিতর্কের যে কথা বলেছিলাম, তাতে দেখেছ যে তাঁর মতে 'ব্রহ্মসূত্র' আসলে 'পরিণামবাদ'কেই স্বীকার করে, আর 'পরিণামবাদ' যে সাংখ্যেরই মতবাদ, তাতো তোমায় বলেইছি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখিয়েছেন যে সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্যের যুক্তি মেনে নিয়েছেন। বৈদান্তিকরা বলবেন সেই সন্ন্যাসীরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। 'ব্রহ্মসূত্রে'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'অবিরোধ'। এই অধ্যায়ে বেদান্তের বিরোধী সমস্ত মতকে খণ্ডন করা হয়েছে, এবং তাতে প্রধান প্রতিপক্ষই হচ্ছে সাংখ্য। যুক্তি দেওয়া হয়েছে, যেহেতু বিরোধী অন্য সমস্ত

মতের মধ্যে সাংখ্যই সবচেয়ে ত্রুটীমুক্ত, তাই সাংখ্যের খন্ডন করলেই অন্য প্রতিপক্ষের খণ্ডন করা হয়ে যাবে।

সাংখ্যের বিরুদ্ধে বেদান্তের যুক্তি কী? বেদান্ত বলছে, প্রকৃতি যেহেতু অচেতন, তাই তা 'উপাদান কারণ' কম হতে পারে, কিন্তু 'নিমিত্ত কারণ' হতে পারে না। কুম্ভকার কুম্ভ তৈরী করছে,–অচেতন মাটি এখানে 'উপাদান কারণ' 'নিমিত্ত কারণ' হতে হচ্ছে সচেতন কুম্ভকারকেই। কিন্তু কুম্ভকারের মত কোনও সচেতন ঈশ্বর যদি বিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন, তবে প্রশ্ন উঠবে সেই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে কে? এভাবে প্রশ্নের শেষ উত্তর যে পাওয়া যাবে না, বেদান্ত এ বিষয়ে সচেতন। তাই তার অভিনব মীমাংসা হল এই যে 'সচেতন পুরুষ' বা 'ব্রহ্মই' বিশ্বের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ দুইই। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি, তিনিও কিছু সৃষ্টি করেননি। তিনি অনাদি অনন্ত, তিনি ছিলেন, তিনিই নানা রূপ হয়েছেন। সমস্ত বিশ্ব তাঁরই বহিঃপ্রকাশ।

সাংখ্য ও অন্যান্য নিরীশ্বরবাদী মতগুলির বিরুদ্ধে বেদান্তের প্রধান যুক্তিই হল এই যে অচেতন থেকে চেতন জন্মাতে পারে না। বিবেকানন্দও সে যুক্তি দিচ্ছেন। তাঁর যে বক্তৃতা থেকে আমি ইতিপূর্বে অনেকগুলি উদ্ধৃতি দিয়েছি শিকাগো ধর্মসভায় তাঁর সেই নবম দিনের ভাষণেই তিনি বলেছেন, 'দুটো সত্তা সমান্তরাল রেখায় বর্তমান,– একটি মন, অন্যটি স্থূল পদার্থ। যদি জড় ও জড়ের বিকার থেকেই আমাদের ভিতরের সমস্ত ভাব যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যা হয়, তবে আর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করার কোনও দরকার থাকতে পারে না। কিন্তু জড় থেকে যে চিন্তার উৎপত্তি, এটাও প্রমাণ করা যায় না।'

বিবেকানন্দের এই যুক্তি থেকে অন্তত একটি আশার আলো পাওয়া যাচ্ছে এই যে যদি জড় থেকে চিন্তার উৎপত্তি প্রমাণ করা যায়, তা হলে অন্তত তাঁর মতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করার আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। জড় থেকে চিন্তার উৎপত্তির নানা প্রমাণ বিজ্ঞান দিয়েছে। আমরা তা নিয়ে পরে আলোচনা করব। কিন্তু যারা জড়বাদীদের কাছে জড় থেকে চিন্তার উৎপত্তির প্রমাণ চাইছেন, তাদের কি আমরা প্রশ্ন করতে পারিনা যে, 'মহাশয়, চিন্তা থেকে যে জড়ের উৎপত্তি, তার কি কিছু প্রমাণ আছে?' না, তা নেই। এ প্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা ভারি চমকপ্রদ। তার দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম পাদ, ২৪নং সূত্রে বলা হয়েছে–বিশ্বের অবিকশিত ও বিকশিত অবস্থা হল এক টুকরো কাপড়ের ভাঁজ করা ও ছড়ানো অবস্থার মত, একই বস্তুর দুই রূপ। ১৯নং সূত্রে বলা হয়েছে, দুগ্ধ যেমন বাইরের সহায়ক কোনও বস্তু ছাড়াই দধিতে রূপান্তরিত হয়, ব্রহ্মও সেরূপ আপনা আপনি বিশ্বে রূপান্তরিত হন। প্রথম কথা, দুগ্ধ বাইরের সহায়ক কিছু ছাড়া যে দধিতে রূপান্তরিত হয় না, এ কথা একালে স্কুলের বালকও জানে। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা হল, বস্ত্র বল, দুগ্ধ বল, এ কোনও কিছুই চেতনের উদাহরণ নয়। এ সবই এক বস্তু থেকে ভিন্ন বস্তুর রূপান্তরের সাংখ্য প্রদত্ত প্রমাণ। চেতনা থেকে বস্তুতে রূপান্তরের প্রমাণ কই? সাংখ্যের বিরুদ্ধে বেদান্তের ঝুলিতে মৌলিক যুক্তি কোথায়?

জড় ও চেতনের এই দ্বন্দ্ব তো শুধু আমাদের দেশের নয়, এ সর্বদেশে যুগ যুগ ধরে চলছে। কেউ বলছেন জড়ই সৃষ্টি ও বিশ্ব সংসারের যাবতীয় প্রক্রিয়ার আদি কারণ; মন, চিন্তা, চেতনার স্থান তার পরে। এঁদের আমরা বলি বস্তুবাদী। এর বিপরীতে ভাববাদীরা বলেন যে চিন্তা চেতনা মনই আদি কারণ, বস্তুর স্থান তার পরে। আমাদের দেশের শঙ্করাচার্য কিংবা ইংরেজ পাদ্রী জর্জ বার্কলের মত দার্শনিকেরা ছিলেন কট্টর ভাববাদী। তাঁরা বলতে

চেয়েছেন, ভাবনা বা চেতনাই সত্য,বিশ্ব সংসার মায়া মাত্র। বস্তুবাদীদের প্রবল যুক্তির সামনে শঙ্করাচার্যের আধুনিক সমর্থকরা অবশ্য এক নূতন যুক্তি খাড়া করেন। তাঁরা বলেন যে তিনি মায়া বলতে মিথ্যা বোঝাতে চান নি। উদাহরণ দিয়ে তাঁরা বলছেন যে আকাশ কুসুম হল মিথ্যে, কিন্তু রজ্জুতে সর্পভ্রম বা সর্পে রজ্জুভ্রম হল মায়া। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রজ্জু বা সর্প সত্য, কিন্তু তার সম্পর্কে যেটা ভাবা হচ্ছে তা সত্য নয়। এই মিথ্যা ভাবনাই মায়া। আবার জার্মান ধ্রুপদী ভাববাদী দর্শনের স্রষ্টা ইম্যানুয়েল কান্ট বলেছেন যে বস্তু সত্য বটে, কিন্তু তাকে জানা যায় না। অভ্রান্ত সত্য রূপে যেটা প্রতিভাত হয়, তা হল একমাত্র চিন্তা। তাঁর এই মতকে বলা হয় 'অজ্ঞেয়বাদ'। এই সব বিভিন্ন দার্শনিক মতগুলি অতি উচ্চ স্তরের যুক্তি তর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাই আদৌ হেলা ফেলার বস্তু নয়। আমাদের এই তর্কের আসরে সে সব প্রসঙ্গ একবার উঠলে সহজে শেষ হবে না। তবে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে ভাববাদ, তা সে যে কোনও পন্থীই হোক না কেন. চেতনা বা চিন্তাকেই প্রাধান্য দেয়, বস্তুর স্থান সেখানে গৌণ। উপনিষদ কট্টর ভাববাদী নয়, যদিও বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের কোনও কোনও উক্তিই শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের প্রধান ভিত্তি। যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্যকে শঙ্করাচার্য সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন কিনা তা নিয়েও বৈদান্তিকদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক আছে। তবে, সাধারণভাবে বলা যায় যে উপনিষদে বস্তুজগৎকে অস্বীকার তো করা হয়ই নি, তাকে উপেক্ষাও করা হয়নি। তার কিছু প্রমাণ ইতিপূর্বে দিয়েছি, আরও বেশ কিছু উদ্ধৃতি আমি পরে তোমাকে দেব। তার আগে বেদান্তের ভাববাদী অবস্থানটিকে একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।

প্রথমেই একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে দার্শনিক চিন্তা হিসেবে আমাদের দেশে বেদান্তের প্রবল প্রতিপত্তির একটা কারণ ছিল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে তার আপোসহীন অবস্থান। অন্যান্য দর্শনগুলি তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার ওপর দ্বিধাহীনভাবে না দাঁড়িয়ে নানাভাবে আপোস করেছে। ঐ দর্শনগুলির দোদুল্যমানতা তাদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। সাংখ্য প্রকৃতিকে 'প্রধান' বলেছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে আমদানি করেছে চেতনা সম্পন্ন 'পুরুষে'র তত্ত্ব। সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী সৃষ্টির উপাদান কারণ আর নিমিত্ত কারণ, দুইই প্রধান বা প্রকৃতি, ব্রহ্ম নয়। কিন্তু তার উদ্দেশ্য কারণ হল পুরুষ। কুম্ভকার কুম্ভ তৈরি করছে কুম্ভ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। তেমনি বিশ্বের এই যে বৈচিত্র এবং এই বৈচিত্রের মধ্যেই আবার এই যে সব সমরূপতা, তার নিশ্চয়ই কোনও ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আছে? পুরুষ হল সেই ব্যবহারিক কারণের মূলাধার। পুরুষের আস্বাদনের জন্যই এই বিশ্ব–এই বিশ্ব নিরর্থক নয়–সাংখ্য এ কথাই বলতে চেয়েছে। অর্থাৎ সাংখ্য মতে সৃষ্টির আদি থেকেই প্রকৃতি ও পুরুষের অর্থাৎ জড় ও চেতনের এক সমান্তরাল রেখা চলেছে। এই চেতন কি করে কোথা থেকে এল, তার ব্যাখ্যা সাংখ্য দিতে পারে নি। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে আদিতে ছিল কেবল জড়, মন চিন্তা চেতনা অতি সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি, এবং তার উৎপত্তি হয়েছে জড় থেকেই। এই প্রসঙ্গে পরে তোমায় বলব বলেছি।

সাংখ্যে যেমন 'পুরুষ' ও সৃষ্টির আদিতে 'অব্যক্ত' প্রকৃতি, তেমনি বৈশেষিকে পাই 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ সেই সব বিষয় যার ব্যাখ্যা কণাদের তত্ত্বে নেই। এই অদৃষ্ট অবশ্য ভাগ্য নয়, অ-দৃষ্ট অর্থাৎ যা দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে। পূর্ব মীমাংসায় আবার পাই 'অপূর্ব' অর্থাৎ সেই শক্তি যা থেকে কর্মফল সৃষ্টি হয়। তোমাকে আগেই বলেছি পূর্ব মীমাংসার মতে কর্মফল প্রদানকারী শক্তি ঈশ্বর নয়, 'অপূর্ব'। এই সব 'অব্যক্ত' 'অদৃষ্ট' বা 'অপূর্ব' সমস্ত ব্যাখ্যাকেই ধোঁয়াটে করে তোলে। এই দর্শনগুলির আর এক দুর্বলতা মোক্ষের প্রতি

আসক্তি। তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে পুনর্জন্মবাদ এদের সবাইকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আর প্রতিটি জন্মই এদের সবার মতে দুঃখের। দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় কী? সত্যকে জানা। হিন্দু ষড়দর্শনের প্রতিটিই বলছে, 'সত্যকে জান, বিশ্ব সংসার সম্বন্ধে যে অলীক ধারণা আছে, তা থেকে মুক্ত হও, তা হলেই তোমার আত্মা মিথ্যার নির্মোক থেকে মুক্তি পাবে, তোমার চরম অভীষ্ট, মোক্ষ লাভ ঘটবে।'

পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করার নাম বিজ্ঞান, আর কোনও একটা পূর্বধারণাকে আঁকড়ে ধরে রেখে তার ওপর তত্ত্ব গড়ে তোলাই হল অন্ধ বিশ্বাস। সাংখ্য, বৈশেষিক, ন্যায়ে বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসার পাশাপাশি রয়েছে এমনি নানা বিশ্বাস, যার কোনও ভিত্তি বা প্রমাণ নেই। আত্মা, পুনর্জন্মবাদ, আত্মার মুক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলিকে ভারতীয় দর্শনগুলি নির্বিচারে মেনে নিয়েছে। বলাই বাহুল্য এই সব বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে বস্তুবাদ অগ্রসর হতে পারে না।

ষড়দর্শন আরেকটা জিনিস মেনে নিয়েছে, তা হল বেদের প্রামাণ্যতা। নির্বিচারে কোনও কিছুর প্রামাণ্যতা মেনে নিলে বস্তুবাদ তো দূরের কথা, যে কোনও যুক্তিই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। অন্য দর্শনগুলির সঙ্গে মল্লযুদ্ধে 'বেদান্ত' শেষ পর্যন্ত যে জয়ী হয়েছে, তার একটা কারণ হল এই যে, এই সব দুর্বলতাগুলির বালাই তার নেই। বস্তুবাদের বা বিষয়গত সত্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। জড় নয়, চেতন, বিষয় নয়, বিষয়ীই তার কাছে চরম সত্য। সে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে, দেখ, সাংখ্য বৈশেষিকরা কি পেরেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে বিশ্লেষণ করে সত্যে পৌঁছতে? তাদের 'পুরুষ', 'অব্যক্ত', 'অদৃষ্ট'র ব্যাখ্যা কী? ব্যাখ্যা ওভাবে পাওয়া যাবে না। অতএব ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিই সত্য। বহির্বিশ্বে নয়, চরম সত্যকে নিজের মধ্যে খোঁজ। উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরম চৈতন্যকে লাভ কর। এই হল বেদান্তের বাণী। যুক্তি নয়, উপলব্ধিই তার শেষ কথা।

তুমি ভাবতে পার, বেদান্ত ন্যায়যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। কিন্তু ঘটনা ঠিক তাও নয়। চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে যে জোর জবরদস্তি ছিল, তার প্রমাণ আমি তোমাকে উপনিষদ মহাভারত থেকে ইতিপূর্বে দিয়েছি। যুক্তি তর্কের একটা সীমারেখা শাসক ও পুরোহিত কুল বেঁধে দিয়েছিলেন। কাব্য দর্শন সাহিত্যকে টিকে থাকতে গেলে, শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে গেলে এই সীমারেখাকে মেনে নিতেই হত। গ্যালিলিওকে যেমন তাঁর তত্ত্ব প্রচারের স্বার্থে মেনে নিতে হয়েছিল গির্জার অনুশাসন। সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনের প্রবক্তারা তাই বেদ-প্রামান্যতা মেনে নিয়েছিলেন, মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, যদিও ঈশ্বরকে মানেন নি।

শাসক শ্রেণীর দর্শনের সঙ্গে আপোস না করা হলে কী দশা হত, তার প্রমাণ লোকায়ত দর্শন। লোকায়ত দর্শনের আদি প্রবক্তা যে সে ব্যক্তি নন, স্বয়ং বৃহস্পতি। বৃহস্পতি যে প্রচণ্ড প্রভাবশালী ঋষি ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁকে দেবগুরু বলা হয়ে থাকে। অথচ বৃহস্পতি দেবতাদের তীব্র সমালোচনায় পরাঙ্মুখ হন নি। দিলীপ কুমার বিশ্বাসের লেখা 'রামমোহন সমীক্ষা' বইটি পড়ছি। তাতে আছে রামমোহন বৃহস্পতির নামে প্রচলিত একটি বচন নিজমত সমর্থনে একাধিকবার উদ্ধৃত করেছেন। বচনটি হল ঃ

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।।

এই সংস্কৃতের অর্থ সহজ। 'কেবলমাত্র শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে কোনও কিছু সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। বিচার যুক্তিহীন হলে ধর্মহানি ঘটে।' এই যুক্তিবাদী মতের পূর্ণ

প্রতিফলন দেখা যায় লোকয়ত দর্শনে, চার্বাকের নাম যে দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই দর্শনে কোনও আপোস নেই–আত্মা, মোক্ষ, কর্মফল, শাস্ত্র মাহাত্ম্য কোনও কিছুতে তার আস্থা নেই। কিন্তু এই দর্শনের কী দশা ঘটেছে? অন্যের কথা তো তুমি সহজে মানবে না, রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত সেই কোষগ্রন্থ খানাই আবার খুলে দেখা যাক। এঁরা 'বেদান্তবাদী', নিশ্চয়ই মিথ্যা প্রচার করবেন না। ঐ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৮ম প্রবন্ধের শুরুতেই লেখা আছে, 'ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী, অবিশ্বাসী ও অজ্ঞেয়বাদীদের মূল সূত্রগুলি একেবারেই হারিয়ে গেছে। আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে এঁদের বিরুদ্ধবাদীদের লেখায়, তাঁদের বক্তব্যের টুকরো টাকরার ওপরে। এইভাবে নির্ভর করাটা নিরাপদ নয়, কারণ শঙ্করাচার্য প্রমুখের আলোচনায় দেখা গেছে যে প্রায়শই তাঁদের লেখায় বিরুদ্ধবাদীদের মত বিকৃত হয়ে থাকে।'

আচ্ছা, তোমার কি আশ্চর্য মনে হয় না যে, যে দেশে বিশালাকৃতি বেদ শুধু মুখে মুখে শতশত বৎসর টিকে ছিল, যে দেশে শাস্ত্র ও তার ভাষ্যের ছড়াছড়ি, সে দেশে দেবগুরু বৃহস্পতি প্রবর্তিত দর্শনের প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বেদ বিরোধী প্রাচীন শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি কেন ঘটল। এই মতগুলিকে বেদান্তবাদীরা যে উপেক্ষা করতে পারেন নি, তার প্রমাণ—তাঁরা ঐ মতগুলিকে প্রথমে বিকৃত করেছেন, তারপর 'খণ্ডন' করেছেন মহা উৎসাহে। আমার কথা নয়, রামকৃষ্ণ মিশনের মহাগ্রন্থের লেখা থেকেই তোমায় শোনালাম। বেদান্তবাদী ঐ সব বীরপুঙ্গবদের কৃতিত্ব অনেকটা আমাদের সেইসব মদগর্বী 'সাহেব'দের মত, যারা দলবদ্ধ শিকারে মৃত বাঘের দেহের ওপর পা রেখে ছবি তোলাতেন।

লোকাযত দর্শনের মূল সূত্রগুলি অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পিছনে যে দীর্ঘদিনের দমনের ইতিহাস রয়েছে,তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত গ্রন্থের উপরোক্ত খণ্ডের মুখবন্ধে পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে, 'চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের প্রভাব এত স্থায়ী হয়েছিল যে পরবর্তী সমস্ত দার্শনিক মতকেই এ সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করতে হয়েছে। কিন্তু এই দর্শনের গ্রন্থগুলিকে চেপে দেওয়া হয়েছিল (were suppressed) এবং ফলে তা কেবল একটা লৌকিক ঐতিহ্য হিসেবেই বেঁচে রয়েছে, যদিও বিকশিত দর্শনের সমস্ত লক্ষণই তার মধ্যে ছিল'। এই 'চেপে দেওয়া হয়েছিল' বলতে তুমি কী বোঝ? গ্রন্থগুলি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল? সরিয়ে ফেলা হয়েছিল? লিখিত আকারে প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়েছিল? যাই করা হয়ে থাকুক, প্রবল জোর জবরদস্তি যে চলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তা না হলে একটি সুপরিণত প্রভাবশালী দর্শনের সূত্রগুলি কি উবে যেতে পারে? যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলেছিলেন, 'তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে।' তার মধ্যে আমি জোর জবরদস্তি দেখেছিলাম বলে, তুমি তাতে উষ্মা প্রকাশ করেছিলে। কিন্তু, 'লোকায়ত দর্শন'কে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে যে 'পরমত সহিষ্ণুতা'র উদাহরণ তোমার বেদান্তবাদীরা দেখিয়েছেন, আশা করি তার কোনও সাফাই তুমি গাইবে না। এ স্রেফ দস্যুবৃত্তি–রাজা ও পুরোহিতের একচ্ছত্র ক্ষমতার স্বেচ্ছাচার ভিন্ন আর কিছু নয়।

আমি এ কথাও স্বীকার করব যে সেই প্রাচীনকালে একটি সুসংহত বস্তুবাদী দর্শন গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কারণ, বস্তুজগতের অধিকাংশ তখনও অজানা। নানা অন্ধ বিশ্বাসেরই তখন প্রাবল্য। ইতিপূর্বে মহাভারতের শান্তি পর্ব থেকে তোমাকে যে পঞ্চশিখ—সংবাদ শুনিয়েছিলাম, সেই অধ্যায়েই লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি

শোন। বলছেন ঃ 'লোকায়তিকেরা পরলোকগমনক্ষম সূক্ষ্ম শরীরের স্বীকার করে না। কিন্তু তাহারা শীত–জ্বর নিবৃত্তির জন্য যে দেবতাদির প্রার্থনা করে, সেই দেবতাদিগকে অবশ্যই তাহাদের সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঐ দেবতাদি পঞ্চভূত নির্মিত স্থূল হইতেন, তা হইলে অনায়াসে তাঁহারা ঘটাদির ন্যায় দৃষ্টি গোচর হইতেন।' এই যুক্তির বিরুদ্ধে লোকায়তিকদের কী উত্তর তা জানার উপায় নেই, তা ছাড়া ওপরের এই যুক্তিকে খুব পোক্তও বলা যায় না, কারণ যা কিছু 'পঞ্চভূত নির্মিত' তাই যে ঘটাদির মত দৃষ্টি গোচর তা তো নয়। বাতাস বা সূর্যের তেজ দেখা যায় না, উপলব্ধি করা যায়। 'জ্বরের দেবতা' তেমন কিছু হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু, কথাটা হল এই যে সেকালের অসংস্কৃত বস্তুবাদীরা প্রায়শই ঝাড়ফুঁক, ভূতপ্রেতাদিতে যে বিশ্বাস করতেন, তা আমরা ধরেই নিতে পারি। বিপক্ষের এই দুর্বলতা ছিল বেদান্তের পক্ষে এক বড় সুযোগ। মোট কথা, সেকালের রাজনীতি ও অর্থনীতি, প্রাচীন বিজ্ঞানের অপরিণত বিকাশ–সবই ছিল একটি সুসংহত বস্তুবাদী দর্শন গড়ে তোলার পক্ষে প্রতিকূল এবং সেটাই ছিল বেদান্তের মত ভাববাদী দর্শনের সুসংহত বিকাশের সপক্ষে। এ হেন বেদান্তকে 'আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত' ভাবার কোনও কারণ নেই। আগামী চিঠিতে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। আলোচনার একটা শিরোনাম দিয়ে রাখা যাক ঃ 'বেদান্ত ও বিজ্ঞান'।

॥ উনত্রিশ ॥

গত চিঠিতে তোমাকে লিখেছিলাম জড় থেকেই যে চিন্তার উৎপত্তি, বিজ্ঞান এ বিষয়ে এখন নিঃসন্দেহ। জড় জগতেব বিবর্তনে পৃথিবীর উৎপত্তি। পৃথিবীর শৈশবে যে প্রবল উত্তাপ ছিল তাতে প্রাণের অসম্ভাব্যতা, ক্রমে একটা বিশেষ পর্যায়ে আদি প্রাণের উৎপত্তি, তার ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শেষে 'চিন্তাশীল প্রাণী' মানুষের জন্ম–এসব নিয়ে তুমি নিশ্চযই সন্দেহ প্রকাশ করবে না। মানুষের চিন্তা—ভাবনার কেন্দ্র যে মস্তিষ্ক এবং যাদের মস্তিষ্ক আছে সেই প্রাণীমাত্রই যে অল্প বিস্তর 'চিন্তা—ভাবনা' করে, সে সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই তোমাকে বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে হবে না? চিন্তা বা চেতনা যদি বস্তু নির্ভর না হবে, তা কোনও এক সর্বব্যাপী 'পরম চেতনা'রই অংশ হবে, তবে তো মানুষের মস্তিকে আঘাত লাগলে বা এমন কি তার মস্তিষ্কটি বাদ দিয়ে দিলেও তার চেতনা প্রবাহের কোনও পরিবর্তন হবার কথা নয়। কিন্তু, তা কি হয়? মস্তিষ্ক বিহীন চিন্তা কি সম্ভব? চিন্তা কেউ করে, কোনও বিষয়ে করে। অর্থাৎ চিন্তা একটি ক্রিয়া,–তার কর্তা এবং কর্ম–দুই-ই কোনও না কোনও বস্তুগত অস্তিত্ব। অতএব জড়কে আশ্রয় করে, জড়কে নিয়ে মস্তিষ্করূপী জড়ই চিন্তা করে, বিজ্ঞানের কাছে এ নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তুমি রহস্যবাদীর মত প্রশ্ন করতে পার, এই দেহ একদিন চিন্তা—ভাবনা করত, মৃত্যুর পর সেটা কোথায় চলে গেল? তার পঞ্চভূত পঞ্চভূতে বিলীন হল কিন্তু তার চেতনা? সেটি কোথায় মেলাল? ছেলেবেলায় আমি ভাবতাম ঘড়িটা টিক টিক করে, চলে, তারপর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, কোথায় এই টিক টিক 'চলে যায়'? এই রহস্যবাদ ঠিক সেই রকম। কোনও কিছুই 'চলে যায়'না। তার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের দৈহিক ক্রিয়া তার চলাফেরা, মানসিক ক্রিয়া, তার চিন্তা— মৃত্যুতে এইসবই বন্ধ হয়ে যায়। চিন্তাকে জড়ের এক জটিলতম 'ক্রিয়া' বলে মেনে নিলে সব কিছুই ব্যাখ্যা হয়ে যায়, রহস্য বলে মনে হয় না।

আধুনিক বিজ্ঞান চাঁদ, মঙ্গল, শুক্র, মহাকাশ সমস্ত জায়গা থেকে ঈশ্বরকে নির্বাসিত করে এখন তা জীবন ও চিন্তার রাজ্যেও প্রবেশ করতে শুরু করেছে। মানুষ 'জীবন' এবং 'চিন্তা'—দুটিই সৃষ্টিতে ক্রমে সক্ষম হচ্ছে এবং তার ফলে এ সবের রহস্যময়তাও ক্রমে হটে যাচ্ছে। মানুষের যে নবতম আবিষ্কার কমপিউটার—তা প্রথম থেকেই মনের সরল ক্রিয়াগুলি করতে পারছিল। তার জানার শক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং তার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি কমপিউটারের প্রথমাবধি ছিল। এখন তার এই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিকে জটিল থেকে জটিলতর করে গবেষকরা তার মধ্যে কল্পনা শক্তি, ইচ্ছা শক্তির উন্মে ঘটাচ্ছেন। কম্পিউটার এখন 'ইচ্ছে মত' বই পড়ে, 'প্রেম করে', বিতর্ক করে। এস সংবাদ তুমি বিদেশী পত্র পত্রিকায় বা 'স্টেটসম্যানের' শনিবারের 'মিসল্যানী'তে দে থাকতে পার। মোট কথা, মনের রহস্যময় জটিলতাগুলি এভাবে ক্রমে ক্রমে দূর হচ্ছে।

অতএব, যেহেতু পৃথিবীর জন্মকথা, বিবর্তনবাদ, আধুনিক দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান এবং মানুষের আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যা—সব কিছুই জড় থেকে চিন্তা বা চেতনার সৃষ্টি তত্ত্বকে সমর্থন করে,—তাই বিবেকানন্দের বক্তব্য অনুযায়ীই আমরা বলতে পারি যে 'আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করার আর কোনও দরকার নেই।' আর আত্মা যদি না থাকে, তবে পরমাত্মাও থাকে না—বেদান্তের সমস্ত যুক্তি শৃঙ্খলই তাহলে ভেঙে যায়।

বিষয়টিকে এবারে অন্য দিক থেকে দেখা যাক। বৈদান্তিক তথা যে কোনও ভাববাদী বস্তুবাদীকে বার বার চ্যালেঞ্জ করে বলছেন, 'তুমি নিতান্ত এম্পিরিসিস্ট অভিজ্ঞতাবাদী, তাই বলছ, বস্তু আছে তাই চিন্তা আছে। কিন্তু বাপুহে, বল তো, 'জড়' থেকে তার বিপরীত 'চেতন' জন্মায় কি করে?' জড় থেকে কিভাবে চেতনার উদ্ভব হল—এই জটিল প্রশ্নের সমাধান যে হয়ে গেছে বলা যায় না, তবে জড় থেকে চেতনার উদ্ভবের প্রমাণ আমরা যে অভিজ্ঞতা থেকে পাই, তা তোমায় বললাম। কিন্তু উল্টে যদি ভাববাদীর কাছে প্রশ্ন রাখা যায় যে 'চেতনা' থেকে কিভাবে 'জড়ের' উদ্ভব হল, তা কি তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন, তা হলে তার একটাই উত্তর, 'না'। এ সম্বন্ধেও যে বিবেকানন্দের স্বীকারোক্তি আছে, তা তোমায় ইতিপূর্বে ঐ অভিভাষণ থেকে উদ্ধৃত করে শুনিয়েছি। তিনি তাঁর নিজের মত করে বলছেন, এই 'শুদ্ধ,পূর্ণ, মুক্ত আত্মা জড়ের দাসত্বে কেন বদ্ধ হল?'—হিন্দুরা এই প্রশ্নের উত্তরে বলে 'জানি না, কিন্তু তা সত্য।' বিবেকানন্দ ভণ্ড নন, তাই এই চূড়ান্ত প্রশ্নের উত্তর দানে ভাববাদী অবস্থানের ব্যর্থতার কথা অকপটে স্বীকার করেন। এবং একই কারণে বস্তুবাদীদের জন্য এই আশ্বাসও শুনিয়ে দেন যে 'যদি জড় থেকে চিন্তার উদ্ভব প্রমাণ করা যায়,তা হলে আত্মায় বিশ্বাসের আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না।'

কিন্তু কট্টর ভাববাদী এসব মানতে চান না। তিনি ভুলে যান যে তিনিও 'নিতান্তই অভিজ্ঞতাবাদী'। যেহেতু তিনি অভিজ্ঞতায় দেখেন যে কুম্ভকার কুম্ভ তৈরি করে, বাস্তুকার রচনা করে বাস্তু, অতএব তিনি ধরে নেন যে এই বিশ্ব সংসারের কোনও না কোনও একজন সচেতন রচয়িতা রয়েছে। দার্শনিক যত বাগাড়ম্বরই হোক না কেন, বস্তুতপক্ষে এর চেয়ে প্রামান্য কোনও যুক্তি চৈতন্যবাদীরা দিতে পারেন নি। চেতনা থেকে জড়ে রূপান্তরের যে সব 'প্রমাণ' বেদান্তসূত্রে রয়েছে, তোমাকে আগেই আমি দেখিয়েছি, সে সব সাংখ্য ও লোকায়তিকদের জড় থেকে চেতনে রূপান্তরের প্রমাণেরই হেরফের মাত্র।

রঁম্যা রলাঁ তাঁর বিবেকানন্দ জীবনীতে বৈদান্তিক তত্ত্বের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার

চেষ্টা করেছিলেন। আইনস্টাইন প্রমাণ করেছেন শক্তি ও বস্তু একে অন্যের রূপান্তর অতএব উপনিষদ যে বলছে এই নিখিল বিশ্ব এক মহা শক্তিরই প্রকাশ, তা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য। কিন্তু কথা হল বেদান্তের ব্রহ্ম 'মহাশক্তি'ই শুধু নয়, 'মহা চেতনা'। শক্তি আর চেতনা এক জিনিস নয়। নিখিল বিশ্ব যে এক মহাশক্তির প্রকাশ, তা তো সাংখ্য দার্শনিকভাবে ও বৈশেষিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা নানাভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। বেদান্ত সেখানে যোগ করেছে পরমাত্মার তত্ত্ব। সুতরাং হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গিতে যে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের স্বীকৃতি আছে, তার জন্য আমরা কেবল বেদান্তের কাছে ঋণী নই। অপর পক্ষে বেদান্তে যে 'চেতনা' থেকে জড়ের উন্মেষের কথা বলা হয়েছে, তা আদৌ বৈজ্ঞানিক নয়। আইনস্টাইন তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে যে শক্তির কথা বলেছেন, তা কখনওই 'সচেতন' নয়, তাও জড়ই। জড় ও শক্তিতে সেখানে কোনও ভেদ নেই। জড় ও শক্তির অভেদসূত্র ($E=mc^2$) আইনস্টাইনেরই যুগান্তকারী আবিষ্কার।

তুমি বলবে, বিবেকানন্দ–রবীন্দ্রমত মনীষীরা কী ভুল? আমি বলব, কপিল, আইনস্টাইন, মার্ক্স কী ভুল? এভাবে মীমাংসা হবেনা। এটা দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবন লাভ করেন নি, করলে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও কতটা পালটাত, বলা যায়না। রবীন্দ্র দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় ভাববাদ থেকে বস্তুবাদে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এই সব মহান আন্তর্জাতিকতাবাদীরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় খুঁজছিলেন। বেদান্তই প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে পরাক্রমশালী ও সুসংহত চিন্তা। এই সব চিন্তা তাই এঁদের আলোড়িত করেছিল। বিবেকানন্দের মত স্বদেশপ্রেমীর কাছে বেদান্ত ছিল ভারতের গৌরবের প্রতীক। রবীন্দ্র পরবর্তী সময় তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের কাব্যে যতটা, বেদান্তের দর্শনে তত আকৃষ্ট ছিলেন না, গীতার ধর্ম কখনওই তাঁকে আবিষ্ট করেনি। প্রকৃতপক্ষে শেষ জীবনে তিনি সব ধর্মমতকেই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং আপ্ত বাক্য ছেড়ে এস, আমরা নিজেরা অন্বেষণ করে দেখি।

চেতন থেকে জড়ের উদ্ভব যে প্রমাণ করা যায় না, একথা কট্টর ভাববাদীরা টের পেয়েছিলেন। শুধু যুক্তিকে চোখ রাঙিয়েই যে চলে না, সেটাও তাঁরা বুঝেছিলেন, আর তাই ভারতীয় কট্টর ভাববাদীরা এক অভিনব যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তা হল স্বপ্ন তত্ত্ব। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন যে জীবিত মানুষের তিনটি অবস্থা–জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। স্বপ্নাবস্থায় মানুষ ঘুমন্ত থাকে, তবু সে নানা 'বাস্তব' ক্রিয়াকাণ্ড করে বেড়ায়। কোথা থেকে এসব আসে? তাঁর ব্যাখ্যা হল আত্মাই তার সৃজন কর্মে তখন লিপ্ত থাকে। আর সুষুপ্তিতে জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থার মত কোনও আত্মবোধই থাকে না, তখন আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে সাময়িকভাবে লীন হয়ে যায়। এই তত্ত্বের নানা রকমফের আছে। কট্টর বৈদান্তিকরা পরে বাস্তব জগৎ আর স্বপ্ন–এর মধ্যে কোনটা সত্য তা নিয়ে বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন। বলেছেন, স্বপ্নে মনে হয়, সেই জগৎই সত্য, আবার জাগ্রত অবস্থায় মনে হয় ওটা মিথ্যা–এই যা দেখছি তাই সত্য। তাহলে, কোনটা সত্য–সেটা সংশয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সব বৈদান্তিকেরা আধুনিককালেও রয়েছেন এবং তাঁরা বলতে চান স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার জগৎ—দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও সমান 'সত্য' বলে প্রতিভাত, অথচ দুটিতেই দ্রষ্টা হচ্ছে একই চেতনাশক্তি। অতএব, চেতনাশক্তিই সত্য, অন্য সবই ম[illegible] মাত্র–চেতনার বিভিন্ন অনুভূতির তারা ফসল।

এইভাবে স্বপ্ন ও বাস্তব জগৎকে যারা সমান সত্য বা সমান মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে চান, তাঁরা তাঁদের সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি স্বপ্নাবস্থায়ই কেন রচনা করার চেষ্টা করেন না, অহেতুক এই বাস্তব জগতের কাগজ কালি কলম ছাপাখানা আর বক্তৃতাগৃহকে তাঁদের তত্ত্ব প্রচারের মাধ্যম করে তোলেন, তা আমি বুঝি না। স্বপ্ন যে আমাদের চিন্তা ভাবনারই একটি রূপ, তা আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেছে, এ বিষয়ে ফ্রয়েডের অবদান অসামান্য। আমরা অনেক সময় জেগেও স্বপ্ন দেখি—অতি গভীর চিন্তা কল্পনায় 'মূর্ত' আকারে দেখা দেয়। চিন্তার যে একটি ছবি আছে, তা গভীর চিন্তক মাত্রই জানেন। স্বপ্ন সেই চিন্তারই চলচ্ছবি। ঘুমের সময় আমরা যে নিষ্ক্রিয় থাকি, তা নয়। আমাদের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি যে ক্রিয়া করে, তা সাদা চোখেই দেখা যায়। আর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র—যার কাজ চিন্তা করা, সেও যে ক্রিয়া করে, তার প্রমাণ ঐ সব চিত্রময় চিন্তা, অর্থাৎ স্বপ্ন। শঙ্করাচার্যের কালে এসব ব্যাখ্যা করা চলত না। তাই বলে, আজও এসব ব্যাখ্যার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকাটাকে আর যাই হোক, বিজ্ঞান বলা চলে না।

আত্মা—তত্ত্ব, ব্রহ্ম—বাদ ইত্যাদি যে কি ধরনের 'বিজ্ঞানের' ওপর নির্ভরশীল, তার আরও কিছু উদাহরণ তোমাকে 'ছান্দোগ্য' উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয়–ষষ্ঠ খণ্ড থেকে দিচ্ছি। এই অধ্যায় সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে, হৃদয়স্থিত আত্মা কিভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করে। হৃদয়ে 'পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত বর্ণের সূক্ষ্মরস দ্বারা পূর্ণ নাড়ীসমূহ' রয়েছে। এমনি নাড়ি আছে একশত একটি। 'তাহাদের একটি মূর্ধা পর্যন্ত গিয়াছে। যিনি এই নাড়ি দ্বারা উর্ধ্বদিকে যান, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্য নাড়ীসমূহ বিভিন্ন দিকে যাইবার ফলে অর্থাৎ তির্যকগামী হওয়ার জন্য তাহাতে অমৃতত্ব লাভ হয় না।' আজ এসব পড়ে বালকেও হাসবে।

তাই বলে উপনিষদ এ জাতীয় ছাই পাঁশেই যে পূর্ণ, তা নয়। তার ইতিবাচক অর্জনগুলি সম্বন্ধে কিছু বলেছি, আরও যথাসময়ে আলোচনা করব।

॥ ত্রিশ ॥

অনেকদিন বাদে গত রবিবারে ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। ছুটিয়ে আড্ডা হল। আড্ডা অর্থ মাঝে মধ্যেই ডাক্তারবাবুর হুঙ্কার এবং আমার দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই। সোভিয়েত ইউনিয়নে 'ক্যু'র ব্যর্থতার বদলা নিতে প্রবল যুদ্ধ করছিলেন তিনি। অবশেষে তিনি যখন বললেন, 'এই গোরবাচভদের গুলি করে মারা উচিত' এবং আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমিই গোরবাচভ, তখন আমি মিনতি করে বললাম, 'ডাক্তারবাবু, এত পরিশ্রমে আমাকে সারিয়ে তুললেন কি আমাকে মারবেন বলে? সত্যি বলছি, আমি গোরবাচভদের কেউ নই।' ডাক্তারবাবু হাসলেন বটে, কিন্তু বললেন, এটা সিরিয়াস হাসি ঠাট্টার কথা নয়। সোভিয়েত দেশে লেনিনের অবমাননা! এটা ভাবতে পার? রুশ দেশ জাহান্নামে যাচ্ছে দেখে আজ জর্জ বুশ হাসছে। আর হাসছ তুমি।' 'তুমি' কথাটাকে তিনি এত জোর দিয়ে বললেন যে আমি মুহূর্তে গোরবাচভ থেকে বুশে পরিণত হলাম। 'হ–য–ব–র–ল'র গল্পের মত, ছিলাম রুমাল, হয়ে গেলাম বিড়াল।

'হ–য–ব–র–ল'র কাহিনীতে আমাদের চিন্তাভাবনার নানা অসঙ্গতি নিয়ে যে অন্তর্লীন স্যাটায়ার আছে, ডাক্তারবাবু ও আমাদের কথাবার্তার মধ্যে তেমনি অসঙ্গতিতে সুকুমার

রায়ের মত কেউ হয়তো বা সেই রকম হাস্যরস খুঁজে পেতে পারতেন। কিন্তু আমাদের সেই প্রভাতী দ্বৈরথের তেমন কোনও সাক্ষী ছিল না। তাই আমার সাদা মাটা পাথুরে গদ্যেই এ সম্বন্ধে দুএকটি মন্তব্য পরিবেশন করি।

প্রথম অসঙ্গতি হল এই যে আমরা মার্ক্সবাদীরা যদিও বস্তুবাদী, কিন্তু কথায় আচরণে যুক্তিতে প্রায়শই ভাববাদীদের মত চলি বা বলি। দ্বিতীয়ত দ্বন্দ্ববাদ বা দ্বান্দ্বিকতাবাদই আমাদের যুক্তি পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও অনেক বিষয়েই আমরা সনাতনপন্থী। মার্ক্স লেনিন স্ট্যালিন মাওকে আমরা বিভিন্ন দেশের মার্ক্সপন্থীরা দেবতার স্তরে উন্নীত করেছি। বুদ্ধ মৃত্যুর সময় তাঁর রোরুদ্যমান শিষ্যদের বলেছিলেন, 'ক্রন্দন করো না। পৃথিবীতে যারই উৎপত্তি আছে, তারই বিনাশ আছে। এই মৃত্যুই তাই স্বাভাবিক।' কিন্তু বৌদ্ধ ভক্তরা বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করে সেই তাঁকেই চিরস্থায়ী করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। আমরা চাই কাল এক জায়গায় এসে থমকে যাক, অথবা আমাদের পছন্দ মাফিক চলুক। ম্যমির ওপর রচিত মিশরের বিশাল পিরামিডগুলি কালকে বন্দী করার জন্য মানুষের ব্যর্থ প্রয়াসের মহিমাময় অথচ ট্র্যাজিক নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে সহস্র সহস্র বছর ধরে। আমরা ভেবেছিলাম স্ট্যালিন ও লেনিনের ম্যমির ওপর রচিত মানুষের এক মহত্তম কীর্তি সোভিয়েত ব্যবস্থাও নিশ্চয় অনন্তকাল টিকে যাবে। টিকল না এবং এটাই যখন বাস্তব সত্য, তখন 'ক্রন্দন করে' লাভ নেই। বুদ্ধ মরে গেছেন, কিন্তু তাঁর মহত্তম অবদানগুলি টিকে আছে, তার মূর্তিতে নয়, ইতিহাসে। মার্ক্স–এঙ্গেলস–লেনিন–স্ট্যালিন–মাওয়ের মহত্তম অবদানগুলিও ইতিহাসে টিকে আছে, টিকে থাকবে। তাদের মূর্তি ভেঙেও তা ধ্বংস করা যাবে না।

যা ঘটছে তাকে বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যক্ষ করতে হবে, ভাবালুতা দিয়ে নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে একবার হাওয়া উঠল, সব কিছুর জন্য দায়ী ব্যাটা স্ট্যালিন, তাকে নির্বাসন দাও। আমরা বিমূঢ় হলাম, বেদনা বোধ করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, ওরা যখন বলছে, কথাটা নিশ্চয়ই ঠিক। আমরাও অনেকে স্ট্যালিনের ছবি হটিয়ে দিলাম। এরপর যে লেনিনের টার্ন আসতে পারে, কথাটা তখন ভেবে দেখিনি।

এখন বলা হচ্ছে গোরবাচভই দায়ী। রাশিয়ার লোকেরা নয়, বিভিন্ন দেশের অনেক কমিউনিস্ট এ রকম ভাবছেন। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন ইতিহাস লেনিন, স্ট্যালিন, গোরবাচভের মাথা থেকে সৃষ্টি হয়নি। ইতিহাসকে কেউ খুশি মত তৈরি করে নিতে পারে না। ইতিহাসের নিজস্ব গতিপথকে বুঝতে পেরে যাঁরা তাকে পরিচালনা করেন, তাঁরাই সার্থক হন, তাকে বিপরীত মুখে চালাবার প্রচেষ্টা কখনও জয়ী হয় না। আমাদের দেশের ধীমান কমিউনিস্টরা তাহলে বারবার ব্যর্থ হতেন না। কিম্বা ব্যর্থ হত না মহা পরাক্রান্ত হিটলারও। বস্তুবাদী বাস্তব ইতিহাসকে প্রধান গুরুত্ব দেয়, চিন্তাকে তার পরে। চিন্তা অনুযায়ী বাস্তব ইতিহাস যদি না এগিয়ে থাকে, তাহলে ভেবে দেখতে হবে চিন্তায় কোনও ভুল আছে কিনা। বাস্তব ঘটনাব নির্মোহ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই কেবল তা সম্ভব।

ডাক্তারবাবু বলছেন, 'তাহলে কি বাস্তবকে মেনে নেওয়াই বস্তুবাদ? এরকম বস্তুবাদের মধ্যে আমি নেই।' 'মেনে নেওয়া' বলতে যদি দাসত্ব বোঝায়, তবে তা বস্তুবাদ নয়। কারণ, বস্তুবাদ বলে যে বস্তুর নিরন্তর পরিবর্তন ঘটছে তাই বস্তুবাদ স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে এবং তাই তা চিরদিন বিপ্লবী। শুধু রাশিয়ায় পরিবর্তন হবে, ভারতে হবে না, আমেরিকায় হবে না, ব্রিটেনে হবে না –তা কি হতে পারে? সর্বত্র অত্যাচারীর বিরুদ্ধে,

শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। এই লড়াইটা বাস্তব। লড়াইয়ের হার জিতটাও বাস্তব। এবং শেষ পর্যন্ত পুরাতন ব্যবস্থার ধ্বংস হয়ে অধিকতর কল্যাণময়ের জন্মও বাস্তব। আমরা যারা লড়াই করি, তারা যে এই নিয়মের ঊর্ধ্বে, তা তো নয়। অথচ আমরা সেই রকম ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। মনে করি যে আমাদের ভাবনা মতই জগৎটা চলবে। বস্তুবাদী হয়েও ভুলে যাই যে এটাই হল ভাববাদ।

রুশ দেশের ঘটনাবলিতে মূহ্যমান আমাদের একজন বড় মাপের কমিউনিস্ট কবি যা লিখেছেন তা গদ্য করলে কী দাঁড়ায়, শোন ঃ হে রুশ জনগণ! সব দোষই শাসকদের? তোমাদের কোন দোষ নেই? সামান্য ভোগসর্বস্বতার জন্য তোমরা আত্মাকে জলাঞ্জলি দিলে? কিন্তু জেনো, ইতিহাসে জুডাস নয়, যীশুই টিকে থাকবে।

ভববাদ আর কাকে বলে? জুডাস হল জনগণ। যীশু হলেন লেনিন। ভাবতে পারা যায় একজন বিপ্লবী কবি বলছেন ঃ 'শাসকদেরই দোষ? তোমাদের দোষ নেই?' শাসকের পক্ষে, স্থিতবস্থার পক্ষে এই ওকালতি কখনওই বিপ্লবী বস্তুবাদ হতে পারে না। মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ অনুযায়ী যে কোনও দেশের রাজনৈতিক ঘটনার পিছনে সে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রেণী সম্পর্ক সক্রিয় থাকে। রুশ দেশে যেখানে সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ আজও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, সেদেশে কোনও 'পুঁজিপতি শ্রেণী' দেশের সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবাব মত শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। তা হলে সেখানে কি ঘটবে?

আমি যা ভেবে দেখেছি, সংক্ষেপে তা নিবেদন করছি। তোমার হয়তো মনে আছে, গত এক চিঠিতে আমি লিখেছিলাম যে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ঠিক মার্ক্স এঙ্গেলস্‌-এর ছক অনুযায়ী আসেনি। সে জন্যই লেনিন একবার বলেছিলেন যে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র নিয়ে আসা সহজ, কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে হবে ঠিক তার বিপরীত। সেখানে সমাজতন্ত্র নিয়ে আসা হবে কঠিন, কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠা করা হবে সহজ। কথাটা সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। রাশিয়ায় পুঁজিবাদ কখনও বিকশিত হয়নি, তাই সেখানে সামন্ততন্ত্র এমনকি প্রাক্—সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ধ্যান ধারণা বহাল তবিয়তে থেকে গিয়েছিল। পুঁজিবাদেরই দুই মহত্তম অবদান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং গণতন্ত্র, দুয়েরই বিকাশের দায়িত্ব বর্তাল সমাজতন্ত্রের কাঁধে। বৈরী পরিমণ্ডলের মাঝখানে এ কাজে যে বিপুল সাফল্য সে অর্জন করেছে, পশ্চাৎপদ নানা জাতিগোষ্ঠীকে একত্রিত করে বিশ্বসভার যে উচ্চ আসনে তাদের বসিয়েছে, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। এই বিপুল সাফল্য, ইতিহাসের এই চমকপ্রদ, মহত্তম ও মানবিকতা বোধে উদ্দীপ্ত অনুপম সৃষ্টি রলাঁ থেকে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী থেকে আইনস্টাইন, বার্নার্ড শ থেকে চ্যাপলিন, পাবলো পিকাসো থেকে পাবলো নেরুদা, নেহরু থেকে ইন্দিরা গান্ধী কাকে মুগ্ধ করেনি? বলদর্পী বুশ যার প্রতিনিধিত্ব করে, দুনিয়ায় কোথায় তা বন্দিত হয়েছে?

কিন্তু তবু ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করতে পারি না। সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান মূর্তির অন্তরের অন্তর্লীন বেদনার ছবিটুকু আমরা জানতাম না। পুঁজিবাদী বিকাশের অভিজ্ঞতাহীন রাশিয়া ডবল প্রমোশন পাওয়া ছাত্রের মত দু একটা মূল বিষয়ে কাঁচা থেকে গিয়েছিল। সে তার বাজার ব্যবস্থা, তার গণতন্ত্র। কিছুদিন আগে একটি সোভিয়েত মৈত্রী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগে তাঁদের বলতে শুনেছিলাম, 'দুঃখের বিষয়ে আমাদের কোনও গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা নেই। ন্যায় এবং অন্যায়—উভয়েই আমাদের

দেশে চিরকাল গায়ের জোরে কাজ হাসিল করেছে।' গায়ের জোরে বা 'ওপর থেকে' চাপিয়ে দেওয়া ন্যায়ও কখনও শেষ পর্যন্ত সফল হয় না, চাই গণতন্ত্র। তাই বলে সমাজতন্ত্রের আওতায় সোভিয়েত দেশে গণতন্ত্রের কোনই বিকাশ ঘটেনি, একথা সত্য বলে মানা যায় না। সে দেশে শাসক দল তথাকথিত গণতন্ত্রের জন্য আজ স্বেচ্ছায় যে পরিমাণ ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে, তা এক কথায় নজির বিহীন। যে রকম প্রায় অনায়াসে সে দেশের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র স্বাধীন হল এবং সোভিয়েত দেশ তা স্বীকার করে নিল, তাও অভূতপূর্ব। অবশ্য, এর ফলে সোভিয়েত দেশ দুর্বল হল, না শক্তিশালী হল, ইতিহাসই তার বিচার করবে।

অন্যদিকে আবার সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি উৎপাদনের উপকরণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা এতই বিপুল ও শক্তিশালী যে তাকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রের এই অর্জন এক বাস্তব সত্য। কিন্তু আজ যে অধিকতর গণতন্ত্রের লড়াই হচ্ছে, সেটাও সত্য। লড়াই মাত্রেই কিছু জবরদস্তি, অন্যায়, অতিচারিতাও ঘটে থাকে, তবে সেগুলি ইতিহাসের নিয়ামক নয়। লেনিনের মূর্তি বা তাঁর দেহ নিয়ে আমার আবেগ যতই থাকুক, লেনিনের জীবনময় ধ্রুবতারা সত্যের চেয়ে তাকে বড় বলে মানি না। তাঁর মূর্তির চেয়ে, তাঁর কীর্তির চেয়ে, লেনিন অনেক বড়। তাঁর নশ্বর দেহ, মূর্তি কিংবা সৃষ্টির অনেক ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন লেনিন। সেই লেনিনের ভুলও যেদিন আমরা অকপটে আলোচনা করতে পারব, অথবা পদে পদে লেনিন উদ্ধৃতি করা থেকে বিরত হব, সেদিন বুঝব আমাদের বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিকতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে, আমরা সাবালক হয়েছি।

এবারের চিঠি রাশিয়া প্রসঙ্গেই শেষ হল। ডাক্তারবাবুর সাথে আলোচনার বিষয়গুলি তোমাকে বিস্তারিত লেখার একটা কারণ, তুমিও এ প্রসঙ্গ তুলেছিলে। তবে তাঁর থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে। আমার বক্তব্যে তোমার যুক্তির কিছু উত্তর হয়তো তুমি পাবে। দ্বিতীয় কারণ, তোমাকে দেখানো যে ভাববাদ ও বস্তুবাদ পরস্পর বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের চিন্তায় তা ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। এও এক ডায়েলেকটিক্স্! ভাববাদীও বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ, নেহরু, বিবেকানন্দ, গান্ধী—, এঁরা সকলেই ভাববাদী। কিন্তু তাঁদের মুখে এমন বহু কথা শুনেছি, যা বস্তুবাদীর অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। আবার বস্তুবাদীও হাজার হাজার বছরের সভ্যতার ভাববাদী চিন্তার প্রভাবকে সর্বদা বর্জন করতে পারেন না–চিন্তা, চেতনা ও আইডিয়ার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে বসেন –চিন্তা নিরপেক্ষ বা অবজেকটিভ সত্যকে মানতে চান না।

আমাদের দেশের দর্শনের ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে আমি এ কথাটাই তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। একদিকে এদেশের ঈশ্বরে অবিশ্বাসী দর্শনগুলি যেমন ভাববাদী চিন্তা ও আত্মার সার্বভৌমত্বের দ্বারা খর্বিত হয়েছে, আবার অন্য দিকে ভাববাদী বেদান্ত ও উপনিষদ আর্য ও অনার্য নানা বস্তুবাদী চিন্তার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। আজকের চিঠিতে সে কথাটাই প্রকারান্তরে বলা গেল।

॥ একত্রিশ ॥

আমাদের ছেলেবেলায় দেশের বাড়িতে সব বাউল বৈরাগিরা আসত, গান গাইত, ভিক্ষা নিয়ে যেত, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে? এমনি একজন বৈরাগি...

তাব মিষ্টি গলাব জন্য আমাদেব সবাবই খুব প্রিয় ছিল। তাব গাওয়া শ্রীকৃষ্ণেব বাল্যলীলাব অনেক পদ আমাব এখনও মনে আছে। কৃষ্ণ ননী চুবি কবেছে, মাব কাছে উত্তম মধ্যম লাভ হযেছে, তাবপব তাকে গরুব দড়ি দিযে বেঁধে বাখা হযেছে –এই বর্ণনা দিযে বৈবাগি যখন কৃষ্ণেব জবানিতে গাইত, 'এমন বান্ধন বান্ধলি মাগো, বান্ধনেবই জ্বালা,/চেযে দেখ তোব সোনাব ববণ হযে গেছে কালা।' তখন আমবা সেই মধুব লীলাবসে আপ্লুত হযে যেতাম। এই গানেব মধ্যে যে সহজ সবল কবিত্ব ছিল, তা অনাযাসে হৃদয স্পর্শ কবত। কিন্তু আমাব পিসিমাব কাছে এই গানেব প্রতিটি কথাই ছিল কাব্য নয, আক্ষবিকভাবে সত্য। ফর্সা বঙেব প্রতি আমাদেব পক্ষপাতিত্ব আব কৃষ্ণেব কালো বঙেব মধ্যে যে একটা অসঙ্গতি বযেছে, এই গানেব মধ্যে পিসিমা তাব একটা সমাধান খুজে পেযে স্বস্তি লাভ কবতেন। ভাবতেন, যাক কৃষ্ণেব কালো বঙেব একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল' কালো ববণ কৃষ্ণ যে আসলে অনার্যসম্ভূত, অন্তত তিনি যে খাঁটি আর্য নন, এই সত্যটা গ্রাম্য কবিব গানেব কৈফিযতে এভাবে চাপা পড়ে যেত।

গানেব এই ননি চুবিব প্রসঙ্গটি ছিল পিসিমাব বিশেষ প্রিয। তাব একটা কাবণও ছিল। সেটা বলছি। বৈবাগিব বর্ণনা একটু একটু কবে এগোত। ননি চুবি, নালিশ শুনে নন্দবানিব ছুটে আসা, কৃষ্ণেব লাফ দিযে গাছে চড়া–এসব আমাদেব কাছে স্পষ্ট ছবিব মত লাগত। অতঃপব 'ডালে ডালে ফিবেন কৃষ্ণ, পত্রে না দেন পা,/নিচে থেকে নন্দবানি শিবে মাবেন ঘা। /নামোবে নামোবে বাছা পেড়ে দেব ফুল,/ডাল ভাঙিযা পড় যদি কান্দিবে গোকুল।' গান এইখানে এলে এই নাটকীয মুহূর্তে গাযক কৃষ্ণ—যশোদাব যে কথোপকথনটি জুড়ে দিত সেটি ছিল গ্রাম্য হাস্যবস। বৈবাগি কৃষ্ণেব হযে গাইত, 'এই সত্য কব মাগো, এই সত্য কব, / নন্দ ঘোষ হয তোমাব পিতা আমায যদি মাবো।' এবং একটু দুলে দুলে নন্দবানিব জবানিতে জবাব দিত, 'এতেক ছাওযালেব মাঝে তুমি হাবামজাদ,/ কে কোনখানে ডাকিযাছে সোযামিবে বাপ। ' গানেব ধুযা 'ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে'ব মাঝখানেই বড়বা হেসে উঠত, দেখাদেখি আমবাও হাসতাম। পিসিমা ঠাকুব ঘবেব দবজায মালা হাতে বসে ফবমাযেস জুড়তেন, 'ঐখানটা ফিবাইযা আবাব গাও তো ঠাকুব, গাও' । বৈবাগি আবাব একটু বঙ চড়িযে গাইতেন। হাসিব হববা তাতে আবও বাড়ত। বৈবাগি ঠাকুব চাল ডাল ইত্যাদি নিযে চলে গেলেই পিসিমা বলতে থাকতেন, 'ঐ টুক থাইক্যাই কী কুচক্কইবা (কুচক্রী) বুদ্ধি। আমাবে মাবলে সোযামীবে বাপ ডাকবা কও, তবে নামুম।' আব হাসতেন।

বলা বাহুল্য আমাদেব এই গ্রাম্য কবিব এই কৃষ্ণ উপাখ্যানেব মধ্যে অনেকটাই ছিল তাব নিজস্ব সংযোজন, কোনও গ্রন্থে এসবেব উল্লেখ নেই। কিন্তু, তা সত্ত্বেও আমাব পিসিমাদেব কাছে তাব বিশ্বাসযোগ্যতা কিছুমাত্র কম ছিল না।

আমাদেব পুবাণ কাব্য উপকথা এমনি কবেই কত হাজাব হাজাব মানুষেব মুখে মুখে পল্লবিত হযেছে এবং দেশেব ধর্মপ্রাণ মানুষেবা এসবেব প্রতিটি কথাকেই সত্য বলে মেনেছে। সাধাবণ মানুষ তা মানতেই পাবে। কিন্তু তোমাব আমাব মত 'শিক্ষিত' মানুষেবাও যদি তাই মানতে থাকে, তবেই বিপদ। কাবণ, 'শিক্ষিত'দেব কথাতেই তো দেশটা চলছে। আমাদেব এটা বুঝতে হবে যে আমাদেব পুবাণকাহিনী চিন্তা ভাবনা আচাব–আচবণ–এক কথায যাকে আমাদেব 'জাতীয সংস্কৃতি' বলা হয তাব অনেক কিছুই স্থানু নয,–যুগে যুগে তাব নানা সংযোজন বর্জন চলেছে। একদিনে এসব কোনও কিছুই তৈবি হযনি।

আমাদের নানা আচার অনুষ্ঠানের কথাই ধর। যেমন, নানা উৎসবে উলুধ্বনি, এয়োতির মাথায় সিঁদুর কিংবা ঐ শালগ্রাম শিলা। এই সবগুলিই অনার্য আচার অনুষ্ঠান থেকে আমদানি। প্রমাণ? প্রমাণ পাবে তুমি আফ্রিকায় অস্ট্রেলিয়ায় কিংবা আরব দেশের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ঐ একই রকম উলুধ্বনির মধ্যে। আসলে অরণ্যচারী মানুষদের মধ্যে দূর দূরান্তে সংযোগ স্থাপনের জন্য মৌখিক ধ্বনি একটি প্রধান উপায়। এবং ছন্দময় ধ্বনি তাদের জীবনযাত্রার এক মঙ্গলময় অঙ্গ। সিঁদুরও সেই রকম। সিঁদুর আদিম মানুষের কাছে রক্তের পরিবর্ত। নারীর রজস্বলা হওয়া ও তার মা হওয়া আদিম মানুষের মনে যে বিস্ময়কর যোগসূত্রের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তা হল রক্তের সঙ্গে উর্বরতার সংযোগ। সে কারণেই শস্য কামনায় মাটিকে পশু বা নরবলিতে রক্তাক্ত করা, সে কারণেই দেবতার থানে রক্ত উপহার। আমাদের দেশে বৌদ্ধ অভিঘাতে বলিপ্রথার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়াতেই সম্ভবত সিঁদুরই হয়ে দাঁড়াল রক্তের প্রতীক, যেমন চালকুমড়ো অনেক পুজোয়ই পাঁঠার প্রতীকরূপে বলি হয়ে থাকে। আর সীমন্তিনীর সিঁথির সিঁদুর হল তার উর্বরতার কামনা চিহ্ন। আবার অন্যদিকে, ঐ দেবতার থানের পাথরগুলি তো প্রস্তর যুগের স্মৃতি। মানুষ প্রথমে পাথরকেই দেবতা বলে জেনেছে। কারণ পাথরেই হাতিয়ার হয়, পাথরের অস্ত্র দিয়েই শিকার বল, কৃষি বল, সবই। আবার পাথর থেকেই আগুন, যা আদিম মানুষের সব চেয়ে বিস্ময়কর ও সব চেয়ে জরুরি আবিষ্কার। সেই পাথরই অবশেষে আর্য সমাজে শালগ্রাম শিলা হয়ে ঢুকল। বিবাহে অগ্নিসাক্ষী হয় বৈদিক মন্ত্র অনুসারে, কিন্তু, ঐ শালগ্রাম শিলার কোনও বৈদিক স্ট্যাটাস নেই। এ জিনিস স্রেফ অনার্য সংস্কৃতি থেকে আহৃত।

আবার এই যে বিশ্বময় প্রাণের অস্তিত্বের ধারণা আমরা বেদে উপনিষদে দেখতে পাচ্ছি, অনার্যদের মধ্যেও এ জিনিস ছিল। এখনও আদিবাসীদের মধ্যে গাছপালা, পাথর, পশুপাখি ইত্যাদি পুজোর মধ্যে তা প্রকাশ পায়। এইসব উপাস্যদের মধ্য থেকে একজন রামের পাশাপাশি আর্য ধর্মাচরণে উচ্চাসন করে নিয়েছে, সে হল হনুমান। ইঁদুর, হাঁস, পেঁচা, সিংহ, ময়ুর ইত্যাদিরাও 'কুলীন' দেবতাদের সঙ্গে পুজোর অধিকারী হয়েছে, অবশ্য বাহন রূপে। অরণ্যচারীর এই সর্বপ্রাণবাদের এক অসাধারণ উদাহরণ আমি সম্প্রতি একটি ভিনদেশী চরিত্র, বিখ্যাত রুশ গ্রন্থ 'Dersu Uzala'র ('দের্জু উজালা') ঐ নামের নায়কের মধ্যে পেয়েছি।

বিপ্লবপূর্ব একজন রুশ অভিযাত্রীর তুলিতে আঁকা তাঁর পরিচিত এক বাস্তব চরিত্রের আদলে রচিত এই দের্জুর মধ্যে বেদ উপনিষদের সর্বপ্রাণবাদের লক্ষণগুলি দেখা যায়। আমাদের দেশের আদিম জনজাতির মানুষদের অনুভূতিগুলিও ওর মধ্যে বর্তমান। এই দের্জু তেমনি উদার, তেমনি দুঃসাহসী, তেমনি সরল মানুষ, শুয়োর, জল, কাঠ, আগুন, সূর্য, পৃথিবী—সব কিছুর মধ্যে একই ক্রিয়াশীল শক্তির সহজ উপলব্ধিতে সে মগ্ন। পার্থক্য হল, ওর কোন দেবতা নেই। সবাই 'লোক'। বেদের আলোচনায় আমরা দেখেছি এই 'লোকে'রাই একদিন দেবলোকের বাসিন্দা হয়ে যায়। নরলোক এবং দেবলোক—দুইই 'লোক'—পরস্পরের আত্মীয়।

অতএব, আমাদের উপনিষদের সর্বপ্রাণবাদ ও নিখিল বিশ্বে ঐক্যানুভূতির সঙ্গে অহেতুক আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক না খুঁজে যে সমাজের গর্ভে তার জন্ম তারই অন্তর্গত আমাদের বিভিন্ন জনজাতির আদিম বিশ্বাসের মধ্যে বরং তাঁর মূল খোঁজা সঙ্গত। তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে উপনিষদের চিন্তাভাবনাগুলি কেবল আর্য নয়, অনার্য গোষ্ঠীরও আদিম

প্রকৃতিমগ্ন ধ্যান ধারনার পরিশীলিত রূপ। এখানে 'অনার্য' বলতে অ-ভারতীয় জনগোষ্ঠীকেও আমরা অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারি। রাশিয়ার সুদূর তাইগা অঞ্চলের 'গোন্ড' উপজাতিভুক্ত এক অতি সরল পাপবিদ্ধ আদিম অরণ্যচারীর যে বিস্ময়কর গভীরতাসম্পন্ন উপলব্ধির কথা ঐ গ্রন্থের লেখক বলেছেন, তা তো কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কোনও সংস্কৃতিই কোনও গোষ্ঠীর একচেটিয়া নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতির মধ্যে আদান প্রদান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় শুরু হয়েছে ইতিহাসের উদয়ের অনেক আগে থেকেই। সুমের, মহেঞ্জোদারো, মিশর, গ্রীস এমন কি সেই সুদুর অতীতেও যে বিচ্ছিন্ন ছিলনা, প্রত্নতত্ত্ব তার প্রমাণ দিয়েছে।

যে আত্মা উপনিষদের চর্চার মূল বিষয়, আমি তোমাকে ইতিপূর্বে বলেছি, সেটাও অনার্য বিশ্বাসের অবদান! আমার এ রকম মনে হবার কারণ, ঋগ্বেদে আত্মার প্রসঙ্গ প্রায় নেই বললেই চলে। সেখানে ঐহিক সুখ সম্ভোগের এবং বিশ্ব প্রকৃতির কথাই বেশি, পরলোক কিংবা আত্মার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কদাচিৎ। সে তুলনায় ভূত প্রেত পুনর্জন্মের ধারণা জড়িয়ে আছে অনার্য আদিবাসীদের বিশ্বাসের মধ্যে।

গত রবিবার দূরদর্শনে একজন মহিলা পরিচালকের একটি অসামান্য ডকুমেন্টারি ছবি দেখলাম একটু বেশি রাতের দিকে। ছবির নাম Eyes of stone (পাথরের চোখ)। সামাজিক অন্যায়, নারী নির্যাতন ও ধর্মবিশ্বাসের গাঁটবন্ধনই এ ছবির উপজীব্য। সমাজ কর্তৃক নির্যাতিতা নারীর হিষ্টিরিয়াকে 'ভর করা' বলে ব্যাখ্যা করা হয়। যে 'দেবী' ভর করেন, সেই দেবীকে দূরে সরাবার জন্য মেয়েদের নানা অবর্ণনীয় কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। 'তুমি এত কষ্ট সহ্য কর কি করে?'– এই প্রশ্নের উত্তরে একটি বৌ বলে,' আমার শরীরের ওপর এই সব ঝড়ঝাপটা যে যায়, তা কিছুই আমাকে লাগে না। আমার মধ্যে যে ঢুকে পড়েছে তার গায়ে লাগে।' এই যে এ সূক্ষ্ম অস্তিত্ব যা দেহের মধ্যে 'ঢুকে পড়ে', যা রোগ শান্তির পর কিংবা মৃত্যুর পর দেহ ছেড়ে চলে যায়, এবং অন্য দেহকে আশ্রয় করে, তার ব্যাধি হয়, জীবন যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়,— এই সূক্ষ্ম অস্তিত্বই ক্রমে পরিশীলিত রূপে আত্মা নাম ধারণ করে ভারতীয়দের চিন্তাকে অধিকার করেছিল। এই চিন্তায় কল্পনা ও কবিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু তাকে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া চলে না।

আমাদের গাঁয়ের বৈরাগি থেকে দের্জু, অনার্য অতীত থেকে আধুনিক ফিল্ম–এই সব নানা বিষয় নিয়ে ওপরে এই যে এলোমেলো বকে গেলাম, তার উদ্দেশ্য প্রবহমান চলমান সংস্কৃতির এক অতি সংক্ষিপ্ত বিশ্বরূপ তোমার কাছে তুলে ধরা। দেশে এবং কালে সব কিছুর সমন্বয় ঘটছে, আবার পালটাচ্ছে, জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই কোনও কিছুই। কোনও কিছুই নয় চিরন্তন বা সনাতন। এবারে এস, গত কিছুদিন ধরে বেদ উপনিষদ নিয়ে যে সব চিন্তাভাবনা আমরা করেছি, তার একটা সংক্ষিপ্ত সার লিখে নেওয়া যাক।

প্রথমত, বেদ উপনিষদের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য নিয়ে কোনও মতভেদ নেই। কিন্তু তা যে একটি বিশেষ যুগের সৃষ্টি তা মানতে হবে। আর্য সমাজের আদিম সাম্যবাদী গোষ্ঠীজীবন থেকে শ্রেণী ও বর্ণবিভক্ত সমাজে উত্তরণের সময়কার চিন্তা চেতনা এই সব গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। বেদ উপনিষদের সাহিত্য মূল্য কালজয়ী, কিন্তু তার চিন্তাভাবনাগুলি গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে আত্মীকরণের যোগ্য, আঁকড়ে ধরবার জিনিস কখনওই নয়। শৈশবের কত কিছুই আমাদের সুন্দর লাগে, আমরা তার স্মৃতি রক্ষা করি, ছবি তুলে রাখি, চি· ·বন তাকে অনন্য সম্পদ বলে মানি। কিন্তু বুড়ো বয়সে যদি শৈশবকে নকল

করতে লেগে যাই, হামা দিই, কোলে চড়ি, দিগম্বর হয়ে নৃত্য করি তবে তা শুধু হাস্যকরই হবেনা, হবে রীতিমত সামাজিক উৎপাত। এ কথা না বুঝে যারা আজ বেদ উপনিষদ পুরাণের যুগকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় মত্ত হয়েছে তারা যে সমাজের পক্ষে এক অতি বড় অসহনীয় উৎপাত তা জোরের সঙ্গে বলার প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বেদ উপনিষদ হিন্দু-ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের কতগুলি বদ্ধমূল ভুল ধারণা রয়েছে, যেগুলি থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এক নম্বর এবং সব চেয়ে বড় ভুল হল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে আধ্যাত্মবাদী বলে বর্ণনা করে তাকে 'জড়বাদী' ইউরোপের প্রতিতুলনায় স্থাপন করা। ইউরোপ চিরকাল ভোগবাদী এবং ভারতবর্ষে সর্বদাই উচ্চ চিন্তা ও ভোগ বিমুখতার সাধনা করা হয়েছে-এ রকম একটা যে রটনা রয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। ভারতীয় অতীত যে ভোগবিমুখ নয় তা তোমাকে বেদ উপনিষদ থেকে প্রচুর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি। বস্তুত বেদে খোলাখুলি ভোগেরই জয়গান করা হয়েছে, আর উপনিষদে 'ভোগ সর্বস্বতা'র নিন্দা করা হয়েছে বটে, কিন্তু ভোগের নয়, এবং উপনিষদ রচয়িতা ক্ষত্রিয় ও ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুল রীতিমত ভোগের পাহাড়ের ওপরে বসেই তা করেছেন।

দুই নম্বর ভুল ধারণা হল বেদান্ত বা উপনিষদকেই প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার একমাত্র বা উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে গণ্য করা। আমি তোমাকে দেখিয়েছি যে হিন্দু ষড়দর্শনের মধ্যে বেদান্ত ছাড়া আর সবকটিই অল্পবিস্তর বস্তুনিষ্ঠ-বেদান্তের 'অধ্যাত্মিকতা' তাদের কাউকে স্পর্শ করেনি। বেদান্ত ছাড়া হিন্দুদের পাঁচটি দর্শন, বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তাধারা, আমাদের 'লোকায়ত' দর্শন, যাকে গায়ের জোরে দাবিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে এখন সকল সত্যনিষ্ঠ দার্শনিকই স্বীকার করেন-এরা সকলেই 'পরম পিতা ঈশ্বরের' অস্তিত্ব সম্পর্কে হয় অবিশ্বাসী, নয়তো সন্দিগ্ধ অথবা নিস্পৃহ। অর্থাৎ অতীত ভারতীয় চিন্তার এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই 'অধ্যাত্মবাদ' 'ব্রহ্মবাদ' বা এমন কি 'ঈশ্বর চিন্তার' কোনও ধার ধারে নি।

তিন নম্বর, খোদ উপনিষদও বস্তু জগৎকে অস্বীকার করে না, সাংখ্যের বস্তুবাদী সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রকারান্তরে মানে-একথা স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের মত বলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে লিখে গেছেন, তা তোমায় লিখেছি। আজ তোমায় উপনিষদের বস্তুনিষ্ঠতার বা 'অবজেক্টিভিটির' অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে দুএকটি কিছু পরেই দেব।

আমার তৃতীয় বক্তব্য ছিল এই যে কোনও নিরিখেই বেদ-উপনিষদকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার আসনে বসানো সমীচীন নয়,-সেটা হবে নিতান্তই অতি কথন। আমি তোমকে দুএকটি উদাহরণ দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে উপনিষদে কি পরিমাণ অবৈজ্ঞানিক চিন্তা সরল বিশ্বাসে প্রকাশ করা হয়েছে। এবং এটাই ছিল স্বাভাবিক। আমরা যদি প্রমাণ করতে পারতাম যে প্রাচীন ভারতীয়রা বিজ্ঞানে উন্নত ছিলেন, তাঁরা উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেছিলেন কিংবা তাঁরা অ্যাটমবোমা বানাতেও শিখেছিলেন, তাতে আমাদের আত্মশ্লাঘা হত ঠিকই, কিন্তু আকাশ কুসুম কল্পনা করে লাভ কী? দেখা যায়, অনেক শিক্ষিত মানুষও এসব অলীক চিন্তা করে থাকেন। আমাদের স্কুলের বাংলার মাষ্টারমশাই তো বলতেন যে পুষ্পক রথ আর ব্রহ্মাস্ত্র-পাশুপতঅস্ত্র-অগ্নিবান ইত্যাদি আসলে উড়োজাহাজ আর অ্যাটমবোমা-হাইড্রোজেন বোমা। এসবই নাকি প্রমাণ করে যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের কী উন্নতিই না হয়েছিল। তখন এসব সত্যি বলে

ভেবেছিলাম। চিন্তা করে দেখা তখন সম্ভব ছিল না যে এই সব অলৌকিক কথা যদি বিজ্ঞানের উন্নতির প্রমাণ হয়, তবে তো ইলিয়াড ওডিসি, আরব্য রজনী, বাইবেলের অনুরূপ সব কাহিনী থেকে প্রমাণ হয় যে প্রাচীন গ্রীসে, আরব দেশে কিংবা ইজরায়েলেও বিজ্ঞানের এরকম উন্নতি ঘটেছিল। অথচ সেকালের লেখায় পত্রে প্রকৃতি বিষয়ক রচনায় তার কোনও প্রমাণ নেই। তারা ঢাল তলোয়ার তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত, কুম্ভকার বা তন্তুবায়ের চেয়ে উন্নত কোনও উৎপাদন পদ্ধতির কথা তাদের জানা ছিলনা। যারা অ্যাটমবোমা বানাতে শিখেছিল আর উড়োজাহাজে উড়তে পারত, তারা এত দিন ধরে কুরুক্ষেত্রের বা লঙ্কাপুরীর এক একটা মাঠে হাতিঘোড়া রথে চেপে বা স্রেফ পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ধস্তাধস্তি করত, রাত্রিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন মাঠের মধ্যে তাদের সৈনিকদের তাঁবুতে মশালের আলো জ্বলত আর তাদের সেনাপতি আহত হলে হাতের কাছে ডাক্তার থাকত না, নিয়ে আসতে হত একটা গোটা পাহাড়, তা থেকে বিশল্যকরণী চিনে নেবার জন্য,- এসব কখনও হতে পারে? কিন্তু মতান্ধরা যুক্তির ধার ধারেনা, তাদের চিন্তায়ও কোনও লাগাম নেই। অতএব, এইসব চিন্তা আজও চলছে, তা নিয়ে বইও লেখা হয় এবং পরিতাপের কথা সে সব বই কাটেও।

বিবেকানন্দের মত মানুষেরা এই রকম মতান্ধতার বিরোধী ছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান যে ইউরোপীয় সভ্যতারই অবদান সে কথা বলতে বিবেকানন্দের কোনও কুণ্ঠা ছিল না। কিন্তু তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে ভারতীয় মনীষা বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, আধুনিক বিজ্ঞান ভিন্নপথে সে সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছে। রলাঁও এক সময় সে কথা সমর্থন করেছিলেন। আমি তোমাকে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে প্রথমত এই যুক্তিনিষ্ঠ সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যাত্মবাদী বেদান্ত নয় বস্তুবাদী সাংখ্যের অবদান। দ্বিতীয়ত বেদান্তের ব্রহ্ম আধুনিক বিজ্ঞানেব 'শক্তি' বা 'এনার্জি' থেকে মূলগত ভাবেই পৃথক, কারণ এই শক্তিও জড়ই, চেতন নয়।

গ্যালিলিও, নিউটন হয়ে আইনস্টাইনের কাল পর্যন্ত আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞান বিপুল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে এক জ্ঞানের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে, ভারতীয় মুনি ঋষিরা স্রেফ ধ্যানের জোরে তা আয়ত্ত করেছিলেন, এটা কল্পনা করা যায় না। লাঙল দিয়ে চাষ, কুমোরের চাকায় বাসনপত্র তৈরি করা আর তাঁত দিয়ে কাপড় বোনাই যে সমাজের প্রযুক্তির অর্জন, তার পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের জটিল সিদ্ধান্তগুলিতে আসা অসম্ভব। আমাদের একটি প্রাচীন উক্তি উদ্ধার করে বলা যায়, 'মূলো নাস্তি কুতোঃ শাখা'। উন্নত প্রযুক্তিতে যার মূল নেই, উন্নত বিজ্ঞান তার শাখা হতে পারে না। শুধু মাত্র চিন্তার জোরে বেশি দূর এগোন সম্ভব নয়। এ কথা ঠিকই যে প্রতিভা সর্বদাই নিজের কাল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে থাকে। পঞ্চাশ একশ' হাজার বছরের পরের চিন্তা তাঁদের মাথায় আসে, কিন্তু তারও একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। জুলে ভার্নের প্রতিভা 'বৈজ্ঞানিক কল্পকথা'র জন্ম দিতে পারে, বিজ্ঞানের নয়। কণাদের অনু পরমাণুর তত্ত্ব কিংবা কপিলের পরিণামবাদকে অতি উচ্চস্তরের দূরকল্পনা বলা যেতে পারে, কিন্তু তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের সমগোত্রীয় ভাবা ভুল। এই ভ্রান্তি নজরে আসে যখন দেখা যায় প্রকৃতি, শরীর সংস্থান, অগ্নি বায়ু আদি পঞ্চভূত সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ছিল কত অকিঞ্চিৎকর; একালে যা হাস্যকর মনে হয় সে সব কথা সেকালে ছিল অত্যন্ত সিরিয়াস আলোচনার বিষয়বস্তু। হৃদয়ের একশ একটি নাড়ি কিংবা দুধের আপনা আপনি দই হওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে তৎকালীন জ্ঞানের উদাহরণ তোমাকে কিছু কিছু দিয়েছি। তবে এসব নিয়ে হাসা আমাদের উচিত নয়, আমাদের শুধু

বিস্ময়াপন্ন হয়ে ভাবতে হয় যে সেই সামান্য বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন মহামনীষীরা কল্পনা ও বোধি বলে আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ সত্যের কতটা কাছাকাছিই না আসতে পেরেছিলেন।

চতুর্থত, বেদান্তে যে নিখিল বিশ্বে একাত্মতা বোধ আছে, তা বিজ্ঞান মনস্কতা ততটা নয়, যতটা তা আদিম সর্বপ্রাণবাদের বিকাশ, যা শুধু আর্য বা ভারতীয় অনার্য নয়, বিশ্বের বিভিন্ন আদিম জনজাতির অনুভবেরই অঙ্গ। বেদ উপনিষদ বিষয়ে আমাদের আলোচনার একটি সংক্ষিপ্তসার তোমাকে লিখে দিলাম। এবারে একটু আগে দেওয়া কথা মত উপনিষদের বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা ভাবনার দুএকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আজকের চিঠি শেষ করব।

'ছান্দোগ্য' উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে অষ্টম পর্যন্ত পাঁচখণ্ডে যে প্রবাহণ-কথিত 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যার' প্রসঙ্গ রয়েছে, সেখানে যজ্ঞের উপমা দিয়ে বিশ্ব প্রক্রিয়ার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে। যজ্ঞের পঞ্চাগ্নি বা পাঁচ প্রকার আগুনের উদাহরণ দিতে গিয়ে পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলি ব্রাহ্মণপুত্র শ্বেতকেতুকে এভাবে উপদেশ দিচ্ছিলেন ঃ

'হে গৌতম, দ্যুলোকই যজ্ঞের অগ্নি, আদিত্য তাহার কাষ্ঠ, রশ্মিসমূহ তাহার ধূম, দিনই শিখা, চন্দ্রই অঙ্গার এবং নক্ষত্রগণই স্ফুলিঙ্গ। দেবগণ সেই অগ্নিতে জলকে আহুতি রূপে অর্পণ করেন। সেই আহুতি হইতে সোমরাজ উৎপন্ন হয়।

'হে গৌতম পর্জন্যই অগ্নি, বায়ুই তাহার কাষ্ঠ, মেঘই ধূম, বিদ্যুৎই শিখা, বজ্রই অঙ্গার, মেঘগর্জনই স্ফুলিঙ্গ। সেই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজকে আহুতি রূপে অর্পণ করেন। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়।'

পাঞ্চাল রাজের সমস্ত উপদেশটির মধ্যে যে রূপকালঙ্কারের প্রাচুর্য রয়েছে, তা উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করছি, নচেৎ পত্র দীর্ঘ হয়ে যাবে। উপদেশটির মূল বিষয়বস্তু হল এই যে দ্যুলোকে যে জল আহুতি দেওয়া হয়, তা থেকে সোমরাজ, পর্জণ্যে সোম আহুতি থেকে বৃষ্টি, পৃথিবীতে বৃষ্টি আহুতি থেকে অন্ন, পুরুষে অন্ন আহুতি থেকে শুক্র এবং স্ত্রীতে শুক্র আহুতি থেকে মানবের উৎপত্তি হয়।

সৃষ্টিযজ্ঞে মানুষের এই উৎপত্তি কথা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যতই অতি সরলীকৃত বলে মনে হোক, এই ব্যাখ্যার মধ্যে দ্যুলোক ভূলোকব্যাপী কার্যকারণ সম্পর্কের যে এক অতিবিস্তারী বা প্যানারমিক ছবি আঁকা হয়েছে, তা যে কবিত্বপূর্ণ এবং অবশ্যই সর্বপ্রকার অধ্যাত্মিকতার ধোঁয়াশা মুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ তাতে সন্দেহ নেই। এই ব্যাখ্যাকে আমি বিজ্ঞান বলব না, কিন্তু তাকে আদিম সরল বস্তুবাদী চিন্তার উদাহরণ বলে গ্রহণ করব। এই ব্যাখ্যার মধ্যে কোনও সৃষ্টি কর্তার কথা নেই, সমস্তটাই বস্তুতে বস্তুতে বিক্রিয়া থেকে সৃষ্টির ক্রম বিবর্তন।

এই উপনিষদেরই সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে আর এক ক্ষত্রিয় সনৎকুমারের উপদেশ। খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ নারদের কাছে ভূমাতত্ত্বের ব্যাখ্যানের জন্য এই অধ্যায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। নারদ চতুর্বেদ, ইতিহাস পুরাণ, ব্যাকরণ ইত্যাদি বহু শাস্ত্র জানতেন। কিন্তু সনৎকুমারের কাছে এসে তিনি বললেন, 'বিদ্বান হইয়াও আমি কেবল মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ নহি।...আমি শোকমগ্ন; আপনি আমাকে শোকের পরপারে লইয়া যান।' সনৎকুমার বললেন, 'তুমি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা নাম মাত্র।'......নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ভগবান! নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?'.....সনৎকুমার বললেন, 'বাক্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ..স্বর্গলোক, পৃথিবী, বায়ু, ...ধর্ম

অধর্ম, সত্য অসত্য.... এই সমুদয়ই বাক বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে....বাক্‌ই ব্রহ্ম, বাক্‌কে উপাসনা কর'। নারদ এইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন, সনৎকুমার উত্তর দিতে থাকলেন। তিনি একের পর এক ব্যাখ্যা করে বললেন যে, মন বাক্‌কে ধারণ করে, তাই মন বাকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; সঙ্কল্প চিন্তার প্রভু, তাই মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; চিত্ত যেহেতু সঙ্কল্প, মন ইত্যাদির গতি তাই চিত্ত সঙ্কল্পের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ধ্যান চিত্তের চেয়ে, বিজ্ঞান ধ্যানের চেয়ে, বল বিজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বলহীনের কোনও মূল্য নেই, 'বলবশতই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, বলবশতই অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, পর্বতসমূহ, দেব ও মনুষ্যগণ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পিপীলিকা সকলেই অবস্থান করিতেছে।' কিন্তু বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? 'অন্ন।' কারণ অন্ন ব্যাতীত চিন্তা বল, বুদ্ধি বল, শক্তি বল, কিছুই থাকবে না। তাই, 'অন্নই ব্রহ্ম, অন্নের উপাসনা কর।' জল থেকে অন্নের, তেজ থেকে জলের, আকাশ থেকে তেজের উৎপত্তি হয়। তাই অন্ন থেকে জল, জল থেকে তেজ এবং তেজ থেকে আকাশ শ্রেষ্ঠ। এই আকাশকে আবার ধারণ করে স্মৃতি, কারণ স্মৃতি ছাড়া আকাশ আদি সমস্ত কিছু বিলুপ্ত হয়। স্মৃতির চেয়ে আশা এবং এবং আশার চেয়ে প্রাণ শ্রেষ্ঠ। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য, ব্রাহ্মণ,–দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণই শ্রদ্ধেয়। প্রাণ বিগত হলে তারা দেহমাত্র। অতএব প্রাণই সমস্ত কিছু। জ্ঞানীর প্রাণই ব্রহ্ম। যিনি তা জানেন তিনিই জ্ঞানী।

এ পর্যন্ত শুনে নারদ প্রশ্ন করা থেকে বিরত হলেন। কিন্তু সনৎকুমার থামলেন না, বলে যেতে লাগলেন। উপনিষদে প্রশ্নোত্তরেব মধ্য দিযে এগিযে যাওযার যে একটি শৈলী রয়েছে, এখানে হঠাৎ সেটিকে ভেঙ্গে দেওয়ার কারণ কী, স্বাভাবিকভাবেই এ সম্বন্ধে প্রশ্ন আসতে পারে। চলিত ভাষ্যে বলা হয় যে নারদ প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব জেনেই নিজেকে সর্ববিৎ ভাবলেন, এবং সে কারণেই তিনি প্রশ্ন করা থেকে বিরত হলেন। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন উঠবে, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব জেনেই নারদ নিজেকে সর্ববিৎ বলে ভাবতে গেলেন কেন? কারণ কি এই যে এটাই ছিল তৎকালীন চিন্তার সীমা? বিশ্বময় এক প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে,– সেই দের্জু উজালার মত এই সর্বপ্রাণবাদী ধারণা যা বেদে আমরা বিকশিতভাবে পাই,– এটাই কি ছিল, তৎকালীন চিন্তার উচ্চতম সীমা রেখা? এমনও হতে পারে, সনৎ কুমারের পরের কথাগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর বোঝার জন্য সনৎকুমারের উদ্ধৃত কথাগুলির এবং তার পরের বলা বক্তব্যগুলিকে একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

এতক্ষণ পর্যন্ত যতটুকু উদ্ধৃত করেছি, তাতে লক্ষ্য কর জড় জগতের প্রাধান্যকে অস্বীকার করা হয়নি। শারীরিক বল, অন্ন এবং অন্নের স্রষ্টা জল পৃথিবী আকাশ আদিকে নির্দ্বিধায় চতুর্বেদ, বাক, চিত্ত ও মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হযেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত এসেই আবাব স্মৃতিকে অর্থাৎ মনের একটি ক্রিয়ামাত্রকে আকাশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে, কারণ স্মৃতি বিলুপ্ত হলেই আকাশও নাকি বিলুপ্ত হয। আবার এই স্মৃতি ও আশার চেয়ে ঊর্ধ্বে স্থান পাচ্ছে প্রাণ। জড় না চেতন, –কে কার উর্ধে এই দোলাচলের মধ্য দিয়ে সনৎকুমার অগ্রসর হন। তাঁর এই বিশ্লেষণকে স্ববিরোধী না বলে উপায় নেই,–কিন্তু এর মধ্যে বিশ্বকে জানার একটা বস্তুনিষ্ঠ প্রয়াসকেও লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, নারদ প্রশ্ন থেকে নিবৃত্ত হবার পর সনৎকুমার কি বললেন?

বললেন যে প্রাণকে জানলেই হবে না, সত্যস্বরূপকে জানতে হবে। সেই সত্য স্বরূপকে জানবার জন্য চাই বিজ্ঞান বা বিশেষরূপে লব্ধ জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে জানার জন্য চাই

মনন। সেই মনন আবার শ্রদ্ধাসাপেক্ষ, শ্রদ্ধা নিষ্ঠা সাপেক্ষ এবং নিষ্ঠা কর্মসাপেক্ষ, 'কর্ম না করিলে কেহই নিষ্ঠাবান হয় না।' কিন্তু সুখ ছাড়া কর্ম নাই, এবং সুখ কিসে? না, ভূমায়। 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম।' অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের বড় প্রিয় ছিল। নিখিল বিশ্বকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করাই সুখ, ক্ষুদ্র স্বার্থমগ্নতা সুখ নয়,–এ ভাবেই তিনি তার ব্যাখ্যা করেছিলেন। সনৎকুমার যেভাবে 'ভূমা'র বর্ণনা করছেন, তাতে তাকে অনায়াসেই নিখিল বিশ্ব বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তিনি বলছেন, 'যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুহীন, আর যাহা অল্প তাহাই মরণশীল।.....এই ভূমা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, অথবা কোনও রূপ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নহে। লোকে এই জগতে গরু ও অশ্ব, হস্তী ও স্বর্ণ, দাস ও ভার্যা,ক্ষেত্র ও বাসগৃহসমূহকে মহিমা বলে।.... ইহাদের মধ্যে একে অপরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভূমা তা নয়। যা ক্ষুদ্র তা পরস্পর অবলম্বন যুক্ত, তাই নশ্বর। কিন্তু এই নিরালম্ব, অন্যাশ্রয়নিরপেক্ষ অনন্ত ভূমার কোনও মৃত্যু নাই। সনৎকুমারের ভাষায় ভূমা অধোভাগে, ভূমা ঊর্ধ্বভাগে, ভূমা পুরোভাগে, ভূমা দক্ষিণে, ভূমা বামে,–ভূমাই সমুদয়। এখানে একটা কথা বলা দরকার। আমি ওপরের বাক্যটিতে বারবার 'ভূমা' শব্দটি ব্যবহার করলাম, কোনও সর্বনাম নয়। মূল সংস্কৃতে আছে 'সঃ'। সংস্কৃতে 'সঃ' শব্দের অর্থ সে, সেই বা তিনি,–যে কোনটা হতে পারে। অনুবাদক এখানটায় 'সঃ' শব্দের অর্থ লেখেন তিনি, অর্থাৎ অনূদিত বাক্যে ' তিনি অধোভাগে, তিনি ঊর্ধ্বভাগে.....' ইত্যাদি থাকায় ভূমা আর নিখিল বিশ্ব বা জড়জগৎ থাকে না, হয়ে যায়, ঈশ্বর। অথচ সনৎকুমার যে ঈশ্বর বা পরম ব্রহ্ম অর্থে 'ভূমা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে তার কোনও প্রমাণ নেই। পরবর্তী ভাষ্যকাররা এইভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। সেটা 'বেদান্ত সূত্রে'র শঙ্করাদি মহা ভাষ্যকারদের রচনার পর থেকেই। সনৎকুমার যা বলেছেন তার সহজ সরল অর্থ হল এই যে বস্তু নিচয়ের মৃত্যু আছে, কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনও মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই। কারণ তা হল 'সমুদয়' অর্থাৎ সমগ্র। এই বোধিকে অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত বলে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। সনৎকুমার এই ভূমার কেন্দ্রে 'অহম' বা 'আমি'কে, 'আত্ম' অর্থাৎ 'স্বয়ং' কে স্থাপন করেছেন। উপনিষদের 'তৎত্বমসি'– 'তুমিই সে' বা 'সো অহম'–আমিই সে,–এই চিন্তা সনৎকুমারও ব্যাখ্যা করেছেন। 'ভূমা' কথাটির পরিবর্তে 'অহম্' বা আমি বসিয়ে অতঃপর তিনি বলছেন যে 'আমিই অধোভাগে, আমিই ঊর্ধ্বভাগে, আমিই পশ্চাৎভাগে, আমিই পুরোভাগে, আমিই দক্ষিণে, আমিই বামে,–আমিই এই সমুদয়।' রবীন্দ্রনাথের মত অনুসারে এই কথাগুলিকে আমরা নিজের সাথে নিখিল বিশ্বের একাত্মতার অর্থে অবশ্যই গ্রহণ করতে পারি। তবে মনে রাখতে হবে, সেটা হবে বৈদান্তিক ব্যাখ্যার থেকে ভিন্ন।

॥ বত্রিশ ॥

বিজয়ার কোলাকুলি মিষ্টিমুখ ইত্যাদি সেরে বাড়ি ফিরেই এই চিঠি লিখতে বসেছি। পুজো মণ্ডপে তেমন যাই না, কিন্তু বিজয়া দশমীর প্রীতিমিলনে আমি বরাবরই হাজির থাকি। এ বছরও ছিলাম। কেউ কেউ বলেন, 'তুমি বিজয়া টিজয়া মানো'? আমি বলি, 'আমার মানা না মানার ওপর তো পুজো বিজয়া ইত্যাদি নির্ভর করে না। বিজয়া

আমি মানলেও আছে, না মানলেও আছে।' অপব পক্ষ হয় তো বলেন, 'আছে এবং থাকবে।' আমি বলি, 'অতোটা হলফ কবে আমি কিছু বলতে পাবি না।'

ধর্মীয় আচাব আচবণ, লৌকিক বিশ্বাস, ক্রিযা কর্ম–এসবই যুগে যুগে পালটায। এই বিজযাই তো লোকে আগে বাড়ি বাড়ি গিযে কবত, বাস্তায ঘাটে দেখা হলেই স্থানে অস্থানে কোলাকুলি চলত। এখন সে সব প্রায উঠে গেছে। কাবণ, লোকেব সময পযসা সুযোগ ইত্যাদি হ্রাস পেযেছে, রুচিবও পবিবর্তন ঘটেছে। কিংবা ধব আমাদেব ছেলেবেলাব বিযে বাড়ি আব বর্তমানেব বিযে বাড়ি। আদপ কাযদা আচাব আচবণ কত পালটেছে। তখন যেসব অজস্র স্ত্রী আচাব ছিল সে সব শর্ট কাট হযে গেছে, মন্ত্র তন্ত্রেব ব্যাপাবেও পুরুত ঠাকুববা 'মেড ইজি' কবে নিযেছেন। এখনকাব বৌ–ঝিবা আগেকাব নিযম কানুনগুলি ক্রমশ ভুলে যাচ্ছেন। আগে কোমবে গামছা বেঁধে যে পবিবেশন আদব আপ্যাযন আব গণ্ডায গণ্ডায বসগোল্লা সাবাড় কবাব কমপিটিশান ছিল, মেযেদেব শাঁখ বাজানো আব উলুধ্বনিব হলুস্থুলু ছিল–তাব বদলে এখন প্রায সর্বত্রই ক্যাটাবাব তন্ত্র। বুড়োবা বলেন, 'ছিঃ ছিঃ বাম কহো, বিযেতে এখন বামপক্ষী ভক্ষণ চালু হযেছে, সাজা গোজা ছাড়া বিযে বাড়িব লোকেদেব আজকাল আব কাজ কী? শাঁখ বাজানো আব উলুধ্বনিও এবপব টেপে চালানো হবে'। যতই কেন ছিঃ ছিঃ কব, সব কিছুই এমনিভাবে পালটায। তাব জন্য শোক কবা আব নদীব জল কেন দাঁড়িযে না থেকে চলে যাচ্ছে, তাব জন্য অশ্রু বিসর্জন কবা একই কথা।

তাই একথা মেনে নেওযাই ভাল যে দুর্গাপূজা কিংবা বিজযা, এক সময ছিল না, আজ আছে, এক দিন নিশ্চযই থাকবে না। তবে সেটা এক আধ দিন বা হযতো এক আধ শতাব্দীবও ব্যাপাব নয। এব কোনও বাঁধা ধবা ছক নেই। অতএব বিজযা যখন আছে, পুজো পার্বন যখন চলছে, তখন আমি 'পবমহংসেব' মত বলব যে সব কিছু থেকেই নীব ছেড়ে দিযে ক্ষীবটুকু বাখতে হবে। দুর্গা প্রতিমাকে ঘিবে যে কল্প কাহিনী, যে উৎসব, যে শিল্প সাহিত্যেব আসব, যে পাবস্পবিক প্রীতি বিনিময, জাতিব পবম্পবায তা মূল্যহীন হতে পাবে না

আমাদেব কাব্যে পুবাণে ধর্মীয কল্পকথায যে সব কাহিনী ছড়িযে আছে, তা আমি বিশ্বাস কবি আব নাই কবি, তাকে ঘিবেই গড়ে উঠেছে আমাদেব লোক সংস্কৃতি, আমাদেব সঙ্গীত, আমাদেব ভাবত নাট্যম, কথাকলি–কথ ক–মণিপুবী–ওড়িশী, সংস্কৃত ও আঞ্চলিক সাহিত্য, অর্থাৎ বিপুলাযতন ভাবতীয সংস্কৃতিব এক বিবাট উত্তবাধিকাব। এই ঐতিহ্য ও ঈশ্বব চেতনাকে বাদ দিযে ববীন্দ্রনাথকেও বোঝা যাবে না। তাহলে এসব সম্পর্কে একজন বস্তুবাদীব দৃষ্টিভঙ্গি কী হওযা উচিত।

আমাদেব স্থানীয বিজ্ঞানবাদীবা একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীব আযোজন কবেছিলেন পুজোব কদিন। তাব মধ্যে একটি অংশ ছিল সাপেব বিষযে। সাপ সম্বন্ধে যে অসংখ্য কুসংস্কাব ও অন্ধ বিশ্বাস বযেছে, তাঁবা তা খণ্ডন কবেছেন। এক জাযগায তাঁবা দেখিযেছেন যে কালনাগিনী আসলে একটি নির্বিষ ও নিবীহ সাপ; সুতবাং তাব কামড়ে লখিন্দবেব মাবা যাওযাব ঘটনাটি স্রেফ 'মিথ্যে'। তাঁদেব মতে আসলে লখিন্দব লোহাব বাসব ঘবে অক্সিজেনেব অভাবে মাবা গিযেছিল। নাঃ, আমি মনসামঙ্গলেব এবকম 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যায বাজি নই। অক্সিজেনেব অভাবে প্রদীপটি জ্বলে বইল কি কবে? বেহুলা লখিন্দব দুজনেই ঘুমোচ্ছিল, বেহুলা অমন বহাল তবিযতে বেঁচে বইল কি ভাবে? এই কল্প

কাহিনীটিব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পদার্থবিজ্ঞানেব বইয়ে নয়, সমাজ তত্ত্বে। অনার্য ও 'নীচ'জাতেব মানুষেব মধ্যে প্রচলিত সাপ সম্পর্কে নানা কুসংস্কাবেব ওপব ভিত্তি কবে যে সর্পপূজা ও নানা অলৌকিক লোককথা গড়ে উঠেছিল, তাব সাথে 'উচ্চবর্ণেব' ধ্যান ধাবণাব বিবোধ এবং শেষ পর্যন্ত 'নিম্নবর্ণেব' দেবতা মনসাব জযেব ইতিহাস 'মনসামঙ্গল' কাব্যে প্রতিফলিত হযেছে।

'মনসামঙ্গলে'ব অক্সিজেনঘটিত ব্যাখ্যায লখিন্দব, বেহুলা সকলেই মবে,-এবং 'মনসামঙ্গল' কাব্যটিও মবে। আসলে ঐ কাহিনীব পূর্বাপব সমস্তটাই 'অবৈজ্ঞানিক', অথচ তা এমন এক অসাধাবণ সাহিত্যসৃষ্টি যা শত শত বছব ধবে জীবন্ত বযেছে। লোহা জলে সেদ্ধ হয না, কালনাগিনীব কামড়ে মানুষ মবে না, ভেলায ভেসে স্বর্গলোকে পৌঁছনো যায না, মবা মানুষ কখনও বাঁচে না-এ সবই সত্য। কিন্তু 'মনসামঙ্গল' কাহিনীও সত্য এই অর্থে যে তাতে একটি বিশেষ কালেব চিন্তাভাবনা কল্পনাগুলি প্রতিফলিত হযেছে। যা সত্য, তাই যে শুধু বাস্তব নয, মানুষেব অসংখ্য মিথ্যা ধাবণাগুলিও যে বাস্তব, এ কথা যাবা বুঝতে পাবে না, তাবা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী নয, মার্ক্স এঙ্গেলস এদেব বলেছেন Vulgar materialist —ইতব বস্তুবাদী।

বিজ্ঞানেব সত্য, ইতিহাসেব সত্য আব সাহিত্যেব সত্য নিযে কিছু কথা আমাদেব মহাকাব্য বিষযক আলোচনা কালে বলা যাবে। আপাতত মার্ক্স—এঙ্গেলস—এব কথা যখন উঠলই, তখন ধর্ম ও আনুসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা নিযে তাঁদেব মতামত একটুখানি বলি। ধর্ম বিষযে কযেকটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বযেছে। একটি হল মৌলবাদী, যা একটি বিশেষ ধর্ম মতেব প্রতিটি কথাকেই অচল অনড় সত্য বলে মানে এবং অপব ধর্মেব বিরুদ্ধাচবণ কবে। অপবপক্ষে সাধাবণ ধর্মবিশ্বাসী তাব ধর্মকে মানে কিন্তু সে অপবেব প্রতি বিদ্বিষ্ট নয। মার্ক্সসবাদী ধর্মকে মানে না, কিন্তু কোনও বিশেষ ধর্মেব বিরুদ্ধে তাব কোনও জেহাদ নেই। আব অ্যানার্কিষ্ট বা নৈবাজ্যবাদী সমস্ত ধর্মকে নির্বাসিত কবতে চায।

ধর্ম যে 'জনগণেব আফিম' —opium of the people-মার্ক্সেব এই কথাটি সকলেবই জানা। কিন্তু তাঁব সমগ্র উক্তিটি সবাব জানা নেই। আমি সাদা মাটা বাংলায সেই কথাগুলি সংক্ষেপে বাখছি ঃ

মানুষই ধর্মেব স্রষ্টা, ধর্ম মানুষকে তৈবি কবেনি। কিন্তু মানুষ তো আব সৃষ্টি ছাড়া কোনও জীব নয। তাব বাষ্ট্র আছে, সমাজ আছে। এই বাষ্ট্র, এই সমাজই এক বিপবীত বিশ্বচেতনা রূপে ধর্মকে সৃষ্টি কবে, ... ধর্মীয দুঃখবাদ প্রকৃত দুঃখেবই প্রতিফলন, প্রকৃত দুঃখেব বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। 'ধর্ম বঞ্চিত মানুষেব দীর্ঘশ্বাস, এক হৃদযহীন পৃথিবীব হৃদয, আত্মাবর্জিত পবিস্থিতিব আত্মা। ধর্ম হল জনসাধাবণেব আফিম'।

ধর্ম সম্বন্ধে এতগুলি কথা মার্ক্স বলেছেন, তাকে বলাই বাহুল্য,মার্ক্সবাদীবা এক কথায নস্যাৎ কবতে পাবে না, কাবণ তা তাঁব মতে মানুষেব সমাজে ঐতিহাসিক কাবণেই প্রোথিত। এ সম্পর্কে বিখ্যাত নৈবাজ্যবাদী ড্যুবিং-এব জবাবে এঙ্গেলস যা বলেছিলেন তা তাঁব 'অ্যান্টি ড্যুবিং' গ্রন্থে পড়ে দেখ। ঐ বইযেব ৪৩৬-৪৪০ পাতায যে আলোচনা আছে, তাব সংক্ষিপ্তসাবটি এই বকম ঃ

ড্যুবিং মশাই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাযেম কবতে চান, সেখানে সববকম ধর্মকে নিষিদ্ধ কবা হবে। অতিপ্রাকৃত কোনও শক্তিকে যে প্রার্থনা বা বলিদানে সন্তুষ্ট কবা যায, এই

আদিম কুসংস্কাবটিব সেখানে থাকা চলবে না। কিন্তু ধম তো কুশাযাব মত কোনও বস্তু নয় যে সূর্য উঠলেই তা উবে যাবে। ধর্ম মানুষেব বাস্তব জীবনেবই এক অবাস্তব প্রতিচ্ছবি। প্রতিচ্ছবিটি অবাস্তব, কিন্তু যে বহিঃশক্তিব প্রতিচ্ছবি, সেটি বাস্তব। এই বহিঃশক্তিটি কি? প্রথমে তা ছিল বিশ্ব প্রকৃতি, [illegible] তাব আযত্তাধীন নয। বেদে এবং পববর্তী নানা জাতিব ধর্মভাবনায এই অদম্য শক্তিটিবই এক অতিপ্রাকৃত প্রতিফলন ঘটেছে। ক্রমে প্রকৃতি মানুষেব আযত্তাধীন হতে [illegible] আব একটি শক্তি প্রকৃতিব মত অদম্য হযে উঠতে [illegible] এবং গড়া সমাজ। এই সমাজেব দাসত্ব তাব কাছে প্রকৃতিব দাসত্বেব [illegible] প্রতিভাত হ[illegible] অতএব, ধম টিকে বইল এবং আবও শক্তিশালী [illegible] পশ্চাত্যে বুর্জোযা সমাজ যুক্তিব জযগান [illegible] কুসংস্কাবকে [illegible]ত কবে দিতে চাইল। কিন্তু ধর্ম টিকে [illegible] নির্যাতিব [illegible] ছাড়া নিজেকে আব কিছুই ভাবতে [illegible] ক'বখানায লাল বাতি জ্বলবে কিনা, [illegible] হাতে বইল না। পুজিবাদী অর্থনীতিব 'অন্ধ নিযমেব' [illegible] অতএব, মানুষ যে নিজেই নিজেব ভাগ্যেব নিযন্তা, এই [illegible] আড়াল কবে বইল। সে একথা বুক ঠুকে বলতে [illegible] নযই কবে। তাকে সেই পুবনো কথাই মানতে হল ঃ [illegible] Man proposes God disposes সে কাবণেই [illegible] আছে। সে কাবণেই টিকে আছে মানত, কবজ, [illegible] সমাজব্যবস্থা তৈবি কববে যখন প্রতিটি মানুষ [illegible] সমাজ চলে, কোনও অদৃশ্য শক্তি, [illegible] কানও স্ট্যালিন বা ইন্দিবা গান্ধী, [illegible] নয, তখন আব ধম থাকবে না। ধর্মেব [illegible] শেষ কবছেন এই বলে যে ডুাবিং মশাই [illegible] তাব বাহিনী দিযে তাব আগেই ধর্মকে খতম [illegible] হবে, তাব আযু যাবে আবও বেড়ে। ধর্ম সম্বন্ধে এই [illegible] আশা কবি তুমি তাতে সায দেবে। মার্ক্স এক জাযগায বলেছেন ভগবানেব বিরুদ্ধে আমাদেব জেহাদ নয, কাবণ ভগবানেব কোনও অস্তিত্বই নেই। তাহলে জেহাদটা কিসেব বিরুদ্ধে? জেহাদ শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাব বিরুদ্ধে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেব ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলিকে, ধর্মেব মূল ভিত্তিকে, ধর্মেব মধ্যে প্রতিফলিত সমাজ সত্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কবতে হবেই। বেদ, উপনিষদ, বামাযণ মহাভাবতেব বিরুদ্ধে আমাব কোনও জেহাদ নেই – আমি এতগুলি চিঠিতে চেযেছি, সত্যেব আলোয তাদেব মূল্যাযন কবতে। তাতে যদি কোনও ত্রুটি হযে থাকে, তবে সে দায আমাব, মার্ক্সবাদেব বা বিজ্ঞানেব নয।

আজ প্রথম থেকেই আমাদেব আলোচনা কিঞ্চিৎ ভিন্ন পথে চলছে। এসো আমবা আমাদেব উপনিষদ প্রসঙ্গে ফিবে যাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমাবেব বিখ্যাত ভূমা— তত্ত্ব আলোচনা কবতে গিযে গত চিঠিতে আমি দেখিযেছিলাম যে তাঁব বক্তব্যেব সবলার্থটি লাভ কবাব জন্য ঈশ্বব, ব্রহ্ম ইত্যাদিব প্রযোজন নেই। সনৎ কুমাব যে ভূমাব কথা বলছেন তা এক অনন্ত নিবালম্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। উপনিষদ— পববর্তী সাহিত্যে আমবা মাঝে মাঝে [illegible] হাঁ কবা মুখেব মধ্যে যে বিশ্বরূপ দেখি, সনৎ কুমাবেব ভূমা বা বিশ্ব সেই

ম্যাজিক নয। এই ভূমা কোনও ঈশ্ববেব নাক, মুখ বা কানেব ফুটোয থাকে না, ব্রহ্মাব পাড়া অণ্ড বা ডিমও (ব্রহ্ম+অণ্ড= ব্রহ্মাণ্ড) এটি নয। এই ভূমা নিখিল 'সমুদয,'– এই ভূমা 'অপব কোনও মহিমায প্রতিষ্ঠিত নহে'–অর্থাৎ ভূমাকে বোঝাব জন্য কোনও ঐশ্ববিক মহিমাব দবকাব পড়ে না। এই চিন্তাব মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কিছু নেই। সৃষ্টি সম্পর্কে সাংখ্য ও বৈশেষিক মতবাদ সম্বন্ধে তোমাকে আগে যা লিখেছি মিলিযে দেখ, তাব সাথে এই ধাবণার বিশেষ বিবোধ খুঁজে পাবে না। এই বিশ্বচিন্তায দেহ, প্রাণ, অন্ন বা জড়জগৎ উপেক্ষিত নয।

কিন্তু একটি নতুন কথা এখানে আছে। তা হল 'অহম্'– 'আমি'। এই উপলব্ধিব বৈশিষ্ট্য হল 'আমি' এবং জগৎ একাত্ম। আমিই তো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, কাবণ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমি জানি, তা 'আমাব'ই চিন্তাভাবনা। আমি না থাকলে এই চিন্তা ভাবনাও থাকে না। এখানেই ভাববাদেব বীজ–পবে এই বীজ যখন অঙ্কুবিত হযে মহীরূহে পবিণত হল, তখন অনেক দার্শনিক বলতে থাকলেন, 'আমি না থাকলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই থাকে না'। সনৎ কুমাব এই 'অহম' বা 'আমি' অর্থেই 'আত্মা' কথাটিব ব্যবহাব কবেছেন, অন্য কোনও আধ্যাত্মিক অর্থে নয। প্রমাণ দিচ্ছি। তিনি বলেছেন, 'আত্মাই এই সমুদয। যিনি এই প্রকাব দর্শন কবেন, তিনি আত্মবতি, আত্মক্রীড়া, আত্মমিথুন, এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনিই স্ববাট হন।' এই কথাগুলিব মধ্যে কোনও ধোঁযাশা নেই। যিনি নিজেব মধ্যে ভূমাকে অনুভব কবে 'আত্মবতি' ও 'আত্মক্রীড়া' কবেন, তিনি 'স্ববাট' অর্থাৎ নিজেই নিজেব প্রভু হন। এই বক্তব্যে আত্মকেন্দ্রিকতা আছে, 'আত্মা' নেই; ভূমা আছে, কিন্তু কোনও ঈশ্বব নেই।

তোমাব মত 'বেদান্ত ভক্তে'ব হযতো কথাগুলি অস্বস্তিকব মনে হতে পাবে। কিন্তু 'আত্মবতি' বা 'আত্মমিথুন' অর্থ যে 'নিজেব সঙ্গে নিজেব বিহাব', কোনও 'আত্মা' বা 'পবমাত্মা' নামক আধ্যাত্মিকতা যে এখানে নেই, এটা বোঝাব জন্য তো বেশি সংস্কৃত জ্ঞানেব দবকাব হয না। আব ঐ সমস্ত শব্দগুলিই তো হুবহু উপনিষদে বযেছে।

বৃহদাবণ্যকে স্বযং যাজ্ঞবল্ক্য নিছক 'স্বযং' অর্থে আত্মাকে বুঝিযেছেন। মৈত্রেযী যখন বললেন 'আমি বিষয সম্পত্তি নিযে কী কবব, আমাকে অমৃত দিন', তখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন যে বিষয সম্পত্তি অমৃতেব হেতু নয, আবাব তা অমৃতেব অন্তবাযও নয। আসলে বিষয সম্পত্তিকে আমবা আত্মপ্রীতিব জন্যই ভালবাসি। সেই আত্মাকে বা স্বযংকে যদি সঠিক ভাবে জানা যায, তবেই অমৃত লাভ হবে। তিনি বললেন, 'অযি, পতিব প্রতি প্রীতি বশতঃ পতি প্রিয হয না, আত্মপ্রীতিব জন্যই পতি প্রিয হয। অযি' জাযাব প্রতি প্রীতি বশতঃ জাযা প্রিয হয না, আত্মপ্রীতিব জন্যই জাযা প্রিয হয। ... বিত্তেব প্রতি প্রীতি বশতঃ বিত্ত প্রিয হয না, আত্মপ্রীতিব জন্যই বিত্ত প্রিয হয।.... অযি! সমুদয বস্তুব প্রতি প্রীতি বশতঃ বস্তু সকল প্রিয হয না, আত্ম প্রীতিব জন্যই সকল বস্তু প্রিয হয।' এতো বীতিমত ফ্রযেডেব মনস্তত্ত্ব! এই আত্ম ও ফ্রযেডেব 'ইগো'তে কোনও তফাৎ দেখতে পাও কি? আত্মপ্রীতি না হলে বিশ্বপ্রীতি সম্ভব নয। যাজ্ঞবল্ক্যেব উপদেশ হল 'সুতবাং, অযি! এই আত্মাকেই দর্শন কবিতে হইবে, শ্রবণ কবিতে হইবে, মনন কবিতে হইবে ও নিদিধ্যাসন কবিতে হইবে। আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বাবা এই সমস্ত অবগত হওযা যায।' এখানে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে ধ্যান আব বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ রূপে জানা–একার্থক। অর্থাৎ আত্মাকেই জানতে হবে–'আত্মানং বিদ্ধি'–'Know thyself'—

'নিজেকে জানো'। প্রবোধ সান্যালেব 'মহাপ্রস্থানেব পথে'তে আত্মাব এক সাধুকৃত এই বকম একটা ব্যাখ্যা আছে। সবল ব্যাখ্যা, এবং সবল বলেই বুঝি সত্য।

যে 'আত্মা' পববর্তী কালে এত ধোঁযাটে হযে উঠেছে,—তুমি দেখতেই পাচ্ছ, আসলে তা 'স্বযং' বা 'অহম্' বা স্রেফ 'আমি' ছাড়া আদিতে আব কিছুই ছিল না। এবং উপনিষদেই সে কথা বহু ভাবে ছড়িযে বযেছে।

জগৎ সম্বন্ধে প্রভূত পবিমাণে বস্তুনিষ্ঠ চিন্তাব আব একটি উদাহবণ দিযে আজকেব উপনিষদ প্রসঙ্গ শেষ কবব। এটি ছান্দোগ্য উপনিষদেব 'আরুণি–শ্বেতকেতু সংবাদ'। সংবাদটি শোন ঃ

শ্বেতকেতু বাব বছব বযসে গুরু গৃহে গমন কবিযা চব্বিশ বছব বযস পর্যন্ত সমুদয বেদ অধ্যযন কবিল। বেদ অধ্যযনেব পব সে গম্ভীবচিত্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হইযা গৃহে প্রত্যাবর্তন কবিল। পিতা তাহাকে বলিলেন, 'শ্বেতকেতো, ...যাহা দ্বাবা অশ্রুত বিষয শোনা যায, অচিন্তিত বিষয চিন্তা কবা যায, এবং অজ্ঞাত বিষয জানা যায, তাহা কি তুমি জান?' শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'তাহা কি প্রকাব?'

পিতা বলিলেন, 'হে সৌম্য! একটি মৃৎপিণ্ড জানিলেই সমুদয মৃণ্ময বস্তু জানা যায, ... একটি সুবর্ণ পিণ্ড জানিলেই সমুদয সুবর্ণময বস্তু জানা যায, (তেমনি বিশেষকে জানিলেই সমগ্রকে জানা যায।)'

'হে সৌম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয সৎরূপে বর্তমান ছিল। কেহ কেহ বলেন, অগ্রে এই জগৎ 'অসৎ' রূপে বর্তমান ছিল' (অর্থাৎ ছিল না) 'কিন্তু অসৎ হইতে কিরূপে সৎ হইতে পাবে? এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয সৎরূপেই বর্তমান ছিল'।

'সেই সৎস্বরূপ হইতে তেজ, জল ও অন্নেব সৃষ্টি হইল। সেই ত্রযীব কাবণেই অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিদেব উৎপত্তি। অগ্নি সূর্যাদি বস্তুতে সেই তিনেবই অবস্থিতি। অন্ন ভুক্ত হইলে তিন ভাগে বিভক্ত হয। সেই অন্নেব যাহা স্থূলতম অংশ তাহা পুবীষ হয, যাহা মধ্যম ভাগ তাহা মাংস, যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহাই মন। জলও পীত হইযা ত্রিধা বিভক্ত হয। স্থূলতম অংশ মূত্র, মধ্যম অংশ বক্ত ও সূক্ষ্মতম অংশ প্রাণ হয। তেজ অর্থাৎ ঘৃতাদি তেজস্কব পদার্থও এইরূপে ত্রিধা বিভক্ত হইযা যথাক্রমে অস্থি মজ্জা ও বাক হয। দধি মন্থন কবিলে সূক্ষ্মতম অংশ উর্ধ্বে উত্থিত হইযা যেরূপ ঘৃত হয সেই রূপ অন্ন জল ও তেজস্কব বস্তু হইতে উর্ধ্বগামী অংশ মন, প্রাণ ও বাক্ রূপে পবিণত হয। অতএব, হে সৌম্য, মন অন্ন ময, প্রাণ জলময ও বাক্ তেজোময়ী।' শ্বেতকতু বলিলেন, 'আপনি আমাকে পুনবায বুঝাইযা দিন।' পিতা বলিলেন, 'তাহাই হউক।'

'হে সৌম্য, পুরুষ ষোলকলাযুক্ত। পনেব দিন ভোজন কবিও না; কিন্তু জল পান কবিও। কাবণ প্রাণ জলময। যে জলপান কবে, তাহাব প্রাণ বিযোগ হয না।'

শ্বেতকেতু পনেব দিন ভোজন কবিলেন না। অনন্তব পিতাব নিকট গমন কবিযা বলিলেন, 'পিতঃ, আমি কি বলিব?'

পিতা বলিলেন, 'হে সৌম্য, ঋক, যজু ও সাম মন্ত্র উচ্চাবণ কব।'

শ্বেতকেতু বলিলেন, 'এ সকল আমাব স্মবণে আসিতেছে না।'

পিতা বলিলেন, 'তোমাব ষোড়শ কলাব এক কলা মাত্র অবশিষ্ট আছে। তুমি আহার কব, পবে আমাব কথা বুঝিতে পাবিবে।'

শ্বেতকেতু ভোজন সমাধা কবিযা পিতাব নিকট গেল। পিতা তাহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা কবিলেন, সে সকলেই সে বুৎপত্তি দেখাইল।

পিতা বলিলেন, 'তোমাব ষোড়শ কলাব এক কলা অবশিষ্ট ছিল, তাহা অন্ন দ্বাবা বর্ধিত হইযা প্রজ্বলিত হইযাছে। তাহা দ্বাবাই তুমি বেদ বুঝিতে পাবিতেছ। হে শ্বেতকেতু, মন অন্নময, প্রাণ জলময, এবং বাক্ তেজোমযী।' তখন শ্বেতকেতু পিতাব উপদেশ বুঝিতে পাবিল......।

উদ্দালক আরুণি বলিলেন 'অন্ন ভিন্ন এই দেহেব মূল কোথায? জলে। জল ভিন্ন এই দেহেব মূল কোথায? তেজে। হে সৌম্য, এই ভূতসমূহেব কাবণ সৎস্বরূপকে অন্বেষণ কব। চবাচব এই সমস্তই সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত ও সতে বিলীন হয। হে সৌম্য, মুমূর্ষু পুরুষেব বাক্ মনেব সহিত, মন প্রাণেব সহিত, প্রাণ তেজেব সহিত ও তেজ সৎ স্বরূপে মিলিত হয। এই যে অণু, এই সূক্ষ্মতম বস্তু, ইহাই সমস্ত জগতেব আত্মা। তাহাই সৎ , তাহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই। তৎ ত্বম অসি।'

এখানে এই সৎস্বরূপই সনৎকুমাব কথিত ভূমা। 'তুমিই সেই' বলাব মধ্যে দিযে বোঝান গেল যে 'স্বযং'ই আত্মা। আবাব অন্যভাবে ব্যাখ্যা কবে দেখান হল যে নিখিল বিশ্ব যে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত, আমি— তুমিও সেই উপাদানে গঠিত। একই অণুসমূহ সর্বত্র বিবাজমান। সুতবাং বিশ্বই তুমি, তুমিই বিশ্ব, অণুসমূহই আত্মা। এই কথাগুলিতে একদিকে যেমন সাংখ্য ও বৈশেষিকেব মত ও পদ্ধতিব প্রভাব দেখা যাচ্ছে,- তেমনি এব মধ্যে বস্তুনিষ্ঠতাব প্রাবল্যও লক্ষ্য কবা যাচ্ছে। ওপবেব দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে তুমি নিশ্চযই লক্ষ্য কবেছ যে মন, প্রাণ, বাক্য –সবই যে বস্তু নির্ভব তা কী চমৎকাব উদাহবণ ও বাস্তব পবীক্ষা নিবীক্ষাব মধ্য দিযে উদ্দালক আরুণি প্রতিষ্ঠা কবলেন। না খেলে যে বেদজ্ঞানও চলে যায, এ কথা প্রমাণ কবে ঔপনিষদিক কবি বস্তুনিষ্ঠাব চূড়ান্ত কবে ছেড়েছেন।

আমি স্বীকাব কবছি দু জাযগায উদ্দালক আরুণি অন্ন জল ও তেজকে দেবতা এবং এই ভূতসমূহেব আশ্রয সৎস্বরূপকে পবম দেবতা বলেছেন। সেই কথাগুলি আমি উদ্ধৃত কবিনি। কাবণ স্পষ্টতই 'দেবতা' অর্থ এখানে কোনও আধ্যাত্মিক ঈশ্বব নয। ভূতসমূহই এখানে দেবতা। যে অর্থে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীকে দেবতা অর্থাৎ মানুষ ও জীবগণ থেকে ভিন্ন রূপে দেখা হয, সে অর্থেই 'দেবতা' কথাটি এখানে ব্যবহাব কবা হযেছে।

উপনিষদেব এই সব উদাহবণ থেকে কি মনে হয না যে 'বেদান্তসূত্র' ও আমাদেব প্রচলিত বৈদান্তিক ধাবণা উপনিষদেব অনেক মহৎ উক্তিকেই আড়াল কবে বেখেছে? 'বেদান্তে'ব দৃষ্টি দিযে আমাদেব প্রাচীন উপলব্ধিগুলিকে সত্যিই জানা যাবে না। এমন কি যে উপনিষদ বেদান্ত বলে পবিচিত, তাকেও না।

ষষ্ঠ পর্ব

॥ তেত্রিশ ॥

নভেম্বর এসে গেলেই 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিনের' কথা মনে পড়ে যায়। রাশিয়ার পুরনো 'জুলিয়ান' ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী সেটা ছিল অক্টোবর মাস, অথচ বাইরের বিশ্বে সেই ১৫৮২ সাল থেকে চালু 'আধুনিক' 'গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডার' অনুযায়ী সেটা নভেম্বর। বিপ্লবের শুরুতে তাই 'অক্টোবর বিপ্লব' বলে পরিচিত হলেও, সে দেশের নব্য ব্যবস্থা যখন ক্যালেণ্ডারকে সংশোধন করে নিল, তারপর থেকে তার পরিচয় 'নভেম্বর বিপ্লব' বলেই।

বিজ্ঞান, আধুনিকতা ও বিশ্বজনীনতার প্রেরণায় 'অক্টোবর বিপ্লব' তার সেই জন্ম লগ্নে যে নিজের নামটিকেই পালটে নিল, এর একটা প্রতীকী তাৎপর্য আছে বলে আমার মনে হয়। বাইরে থেকে রুশ বিপ্লব, সে দেশের সমাজতন্ত্র, তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে যতটা অচল অনড় বলে অনেক সময় মনে হয়েছে, আসলে কখনই সে তা নয়।সমাজতন্ত্র কখনওই সে দেশে একটা জগদ্দল পাথর ছিলনা। লেনিনের আমলেই 'ওয়ার কম্যুনিজম' থেকে 'নেপ', স্ট্যালিনের আমলে 'কালেকটিভ ফার্মিং' ইত্যাদি নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, পরবর্তীকালে মহা পরাক্রান্ত স্ট্যালিনকে তাঁর মৃত্যুর অতো বছর বাদে কররস্থ করা, এবং শেষ পর্যন্ত 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রোইকা', এবং এখন যায় তার রাষ্ট্রীয় নামেরই পরিবর্তন, –এই সব এত দিকসমাজতন্ত্র কখনওই সে দেশে জগদ্দল পাথর ছিলনা। বদলের পালা আর কোনও একটা দেশে এত অনায়াসে ঘটে গেছে বলে মনে পড়েনা। সে দেশে জনসাধারণ কি নির্বীর্য, সব কিছু বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়? অথচ সে দেশের মানুষের বীর্যবত্তা ও আত্মত্যাগও তো বিশ্বের ইতিহাসে তুলনা রহিত।

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ১৯১৭ এর নভেম্বরে, সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত লড়াই করেও সে মরে নি, প্রাণ চাঞ্চল্যের জোরে জিতে গিয়েছিল বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের মুখে। ইতিহাসের পরিহাস হল এই যে হিটলারের দানবীয় পরাক্রমে যখন আমেরিকা–ফ্রান্স–ব্রটেন কম্পমান, তখন তাদের মিত্র বলে মেনে নিতে হয়েছিল গরিব ছোটলোকদের রাষ্ট্র চিরশত্রু সেই সোভিয়েত ইউনিয়নকেই। সোভিয়েত প্রায় একা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সবটুকু গরল গলাধঃকরণ করে অমিত বিক্রমে বেঁচে রইল লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমীর জীবনের বিনিময়ে। সেই দেশপ্রেমীরা শুধু নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করেন নি, রক্ষা করেছেন সারা পৃথিবীকে। শুধু হিটলারের দানবীয় ত্রাস থেকে নয়, সাম্রাজ্যবাদের কব্জা থেকেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন সমাজতন্ত্র জিতে গেল, দুনিয়ার দিকে দিকে তখন মুক্তির জোয়ার বইল। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না, সে নিজেই অস্তমিত হল। সারা পৃথিবীতে আজ যে এতগুলি স্বাধীন দেশ, তাদের এই অস্তিত্বের মূলে সমাজতান্ত্রিক রুশ দেশের অবদান কম নয়। আজ যখন সমাজতন্ত্র কিঞ্চিৎ বিপন্ন, দেখতেই পাচ্ছ, তখন বুশেদের দাম্ভিকতা

কতটা বেড়ে গেছে— সমাজতন্ত্র কখনওই সে দেশে জগদ্দল পাথব ছিল না। আমবা ভাবতীযবাও যে এতে বিপন্ন বোধ কবছি, সে কথা এদেশেব পথে ঘাটেও কান পাতলে তুমি সাধাবণ মানুষেব মুখে শুনতে পাবে।

এটা ঠিকই যে এতদিনকাব হিসেবে কিছু গোলমাল হযেছে। গলিত নখদন্ত পুঁজিবাদ শীঘ্রই মবে যাবে বলে অনেকে ভেবেছিলাম, কিন্তু সে মবেনি। সে বেশ বহাল তবিযতেই বেঁচে আছে। আধুনিক প্রযুক্তিব যে বিস্মযকব উন্নতি হযেছে, তাবই জোবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি, সঙ্কটাপন্ন হওযা সত্ত্বেও, উৎপাদন বাড়িযে চলতে সক্ষম হচ্ছে। কমপিউটাব তথা ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানেব 'মৃত সঞ্জীবনা সুধা' বৃদ্ধ পুঁজিবাদকে আবও কিছুদিন, হযতো বা বেশ কিছুদিন, বাঁচিযে বাখবে। এই হিসেব আগে কবা ছিল না।

প্রশ্ন হতে পাবে, এই আধুনিক প্রযুক্তিব বমবমা, পুঁজিবাদী দেশেই কেন, সমাজতান্ত্রিক দেশে কেন নয। আমাব মনে হয, তাব একটা কাবণ হল এই যে, শ্রমিককে বাদ দিযে উৎপাদন তথা মুনাফা বাড়াবাব চেষ্টায মবিযা পুঁজিবাদ যেভাবে কমপিউটাবেব উন্নতি সাধন কবেছে, সমাজতন্ত্র স্বভাবতই সে তাগিদ অনুভব কবেনি, কিন্তু তাব ফলে বিশ্ব বাজাবে সে পিছিযে পড়েছে। এবং তখনই তাব নজবে এসেছে যে 'বাজাব'কে একেবাবে বাদ দিযে বিশ্বেব সাথে প্রতিযোগিতায তাব অসুবিধে হয। এটিই হল সমস্যা। সেই সমস্যাব সমাধান কবতে গিযে সোভিযেত ইউনিযন যা কবছে, তা একেবাবেই অকল্পনীয, আমাদেব এতদিনকাব চিন্তা ভাবনাব সাথে তা মেলে না, এবং মেলেনা বলেই তাব ব্যাখ্যা কবাটা এখনও ভাবি শক্ত। কেবল একটা কথা বলতে পাবি, 'জুলিযান' ক্যালেণ্ডাবকে বিশ্বব্যাপী 'গ্রেগবিযান' ক্যালেণ্ডাবেব সঙ্গে মেলানো যত সহজ ছিল, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বিশ্ব বাজাবেব সঙ্গে মেশানো অত সহজ নয। চীনে, ভিযেৎনামে, সোভিযেত ইউনিযনে সর্বত্র এই প্রযাস চলছে। তাতে অনেক টাল মাটাল হচ্ছে, অনেক অভাবিত উথান পতন আবও ঘটবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র তাব অমোঘ বিকাশেব নিযমেই জিতে যাবে বলে আমাব বিশ্বাস, তবে সেটা কতদিনে?

নভেম্ববেব শুরুতেই নভেম্বব বিপ্লবেব স্মৃতিচাবণ কবে যে আজকেব চিঠি শুরু কবলাম, তাতে তোমাদেব একটা চলতি অভিযোগ আবাব উঠতে পাবে। তোমবা প্রাযই বল যে মস্কোতে বৃষ্টি হলে এদেশে অনেকে নাকি ছাতা খুলি। কথাটা ঠাট্টা, হযত সম্পূর্ণ অমূলকও নয, তবে জবাবে আমিও বলতে পাবি, মস্কোতে মেঘ দেখা দিলে যে সব ব্যাঙেবা ন্মচন কুদন শুরু কবে, তাদেব মধ্যে কোলা ও সোনাগুলি বিদেশী হলেও, এ দেশেও বেশ কিছু পাতিব্যাঙ সর্বদাই কোবাস গেযে এসেছে। ববীন্দ্রনাথ থেকে জওহবলাল বাধাকৃষ্ণনেব কাল বা আবও হালেব ইন্দিবা গান্ধী ও তাঁব পববর্তী প্রজন্ম জুড়ে ভাবত-সোভিযেত মৈত্রী এত দৃঢ় হযেছে এবং এদেশেব সাধাবণ মানুষ বাশিযাকে এতই ভাল বাসতে শিখেছে যে ঐ সব পাতি ব্যাঙেবা ধীবে ধীবে তাদেব প্রগলভতা অনেক কমিযে এনেছিল। আজ আবাব সে দেশেব মেঘ গভীবতব হওযায ওদেব উল্লাস কিছু বেড়েছে।

বাড়ুক। সে কথা নয। আমাদেব নিজেদেব কথা হচ্ছিল। প্রথম কথা স্বদেশকে বাদ দিযে বিশ্বপ্রেম যে এক নিবালম্ব আকাশ কুসুম মাত্র সে কথা তো তর্কাতীত। আব ববীন্দ্রনাথেব নিখিলেশেব ভাষায স্বদেশ তো দেশেব মাটি বা প্রতিমা নয বা নয একটা আইডিযা মাত্র, স্বদেশ হল দেশেব মানুষ। এই মানুষকে ভালবাসা আব দেশেব মাটিতে যে 'বিশ্ব মাযেব আঁচল পাতা' আছে, সেটি উপলব্ধি কবাব পবেই কেবল দেশেব পাযে মাথা ঠেকানো অর্থবহ হয। ববীন্দ্রনাথেব ঐ গানটি মনে কব ঃ

বিশ্বসাথে যোগে যেথায বিহাবো/সেইখানে যোগ তোমাব সাথে আমাবও/নযকো বনে নয বিজনে/নযকো আমাব আপন মনে–/সবাব যেথায আপন তুমি হে প্রিয,/ সেথায আপন আমাবও ।

এই মানবপ্রেম, বিশ্ববোধ ও বিশ্বমৈত্রীকে বাদ দিযে স্বদেশ বল, ঈশ্বব বল– সমস্ত প্রেমই হবে কূপমণ্ডুকতা মাত্র।

আমি তোমাকে যে স্বদেশ প্রেমেব কথা বলে আসছি এই বিশ্বপ্রেক্ষাপটেই তাব বিকাশ। মস্কো, শিকাগো, পাবি কিংবা বেইজিং তা থেকে দূব হতে পাবে না। একথা ঠিকই যে ভাবতবর্ষেব মত একটি প্রাচীন সভ্যতাব দেশ, যাব অতি সুদীর্ঘ অতীত আজও অনেকটাই বহস্যে আবৃত, তাব অনেক কিছুই আধুনিক প্রগতিবাদীদেব কাছে উপেক্ষিত বযে গেছে। চীন, বাশিযা, ভিযেৎনাম বা কিউবাব আদলে আমাদেব দেশেব ইতিহাসকে ব্যাখ্যা কবা ভুল হবে– প্রত্যেক দেশেবই ঐতিহ্যেব এক একটি অনন্যতা আছে। তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং তাব মধ্যে যতটুকু আজকেব দিনে শ্রেয তাকে বক্ষা কবতে হবে। তোমাব সাথে সুদীর্ঘ পত্রালাপে আমবা সে সম্পর্কেই একটি সিদ্ধান্তে পৌছতে চাইছি।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানতে হবে যে, তিলক আব ফোঁটাধাবীবা ভাবতকে কিছু মাত্র জানে, এ দাবিও একেবাবেই সত্য নয। এবা শুধু কূপমণ্ডুক নয, এদেব ভাবতবর্ষও খণ্ডিত। ভাবতবর্ষেব কতটুকু ধমধ্বজী বর্ববেবা জানে? যাবা বাববি মসজিদকে ভাঙতে চায, মুখে তাবা বাম নাম নিলেও বামাযণ সম্বন্ধে কোনও কথাই যে তাদেব জানা নেই, এ সম্বন্ধে আগামী চিঠিতে আলোচনাব সূত্রপাত কবাব ইচ্ছে আছে। আজকে কিছু পূর্ববৃত্তান্ত সেবে বাখি।

এতদিন ধবে ভাবতবর্ষেব বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন ইত্যাদি নিযে যে আলোচনা আমবা কবলাম, তাতে কিন্তু অবতাববাদেব প্রসঙ্গমাত্র কোথাও নেই। এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পবমেশ্ববেব ধাবণাও অনুপস্থিত। সাংখ্য, বৈশেষিক ইত্যাদি দূবেব কথা, খোদ উপনিষদেও যে অন্ন, জল, আকাশ তথা জড়বিশ্বকে প্রধান স্থানে বাখাব প্রযাস আছে, তাব উদাহবণও তোমাকে দিযেছি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্ববানুভূতি বা আধ্যাত্মবাদ নয, নাস্তিকতা ও জড়বাদই প্রাচীন ভাবতবর্ষেব এত মজ্জাগত ছিল যে এদেশ থেকেই পৃথিবীব একমাত্র ঈশ্বববর্জিত ধর্মটিব সৃষ্টি হযেছিল, যে ধর্মেব প্রবক্তা ছিলেন বুদ্ধ। বুদ্ধ যে নিবীশ্ববাদী ছিলেন, এ সম্বন্ধে তো কোনও তর্কেব অবকাশ নেই এবং কযেক শতাব্দী ধবে এদেশে বৌদ্ধ ধর্মেব যে যথেষ্ট প্রসাব হযেছিল এবং বুদ্ধেব সুদীর্ঘ জীবনকালেই যে এই ধর্ম বাজকুল, শ্রেষ্ঠী ও সাধাবণ মানুষেব কাছে জনপ্রিযতা অর্জন কবেছিল, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। তাহলে ঈশ্বব-নিবপেক্ষ কর্ম, প্রেম ও করুণাব ঐতিহ্য যে আমাদেব অতি প্রাচীন উত্তবাধিকাব, তা মানতেই হয। আমাদেব অতীতেব স্মৃতি কি এই ঐতিহ্যকে বাদ দিযে হতে পাবে? কেন, কেমন কবে, কবে এই ঐতিহ্যেব রূপান্তব শুরু হল, তাব কিছু কিছু জবাব আমবা পেতে চেষ্টা কবব।

আমাদেব দেশে অবতাববাদ যে দুটি প্রধান ধর্মগ্রন্থকে অবলম্বন কবে গড়ে উঠেছে, আশ্চর্যেব বিষয সে দুটিই জগতেব দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। আশ্চর্যেব বিষয বলছি এ কাবণে যে পৃথিবীব অন্য কোনও মহাকাব্যেব ভাগ্যে এ জিনিস ঘটেনি। ইলিযাড ওডিসিকে কেউ ধর্মগ্রন্থ বানাযনি বলেই আমবা মহাকাব্য হিসেবে ঐ গ্রন্থগুলিব আলোচনা মুক্তমনে কবতে পাবি। যা হোক, আমাদেব দুই মহাকাব্যেই যে ধর্মেব বিষযগুলি পববর্তীকালে প্রচুব

পবিমাণে প্রক্ষিপ্ত হযেছিল, সে ব্যাপাবে পণ্ডিতেবা প্রায একমত। এবং বামাযণ মহাভাবত যে বুদ্ধ পববর্তীকালেব বচনা, সে সম্বন্ধেও কোনও মতভেদ নেই। কিন্তু, বুদ্ধেব ঐতিহাসিকতা নিরূপণ কবা গেলেও বাল্মীকি বা বেদব্যাসেব জন্ম মৃত্যুব কাল ও ঐতিহাসিক পবিচয নির্ণয কবা সম্ভব হযনি। আব স্বযং মহাকাব্য বচযিতাব কালই যখন সঠিক নির্ণীত হযনি, তখন তাঁদেব অঙ্কিত চবিত্র বাম বা কৃষ্ণেব জন্মকাল নিরূপণ কবা তো আবও অনেক দূবেব কথা। এসব প্রসঙ্গ পবে আবও কিছু বিস্তাবিত আলোচনা কবা যাবে, আজ এই প্রসঙ্গে বাম কাহিনীব কালানুক্রমিকতাব সমস্যাব একটি উদাহবণ তোমায দেব।

বামাযণেব অযোধ্যা কাণ্ডেব ১০৯তম সর্গে যে বাম-জাবালি প্রসঙ্গ আছে, তা নিশ্চযই তোমাব মনে আছে। ভবতেব হযে জাবালি বামকে বাজ্যে ফিবে যাবাব জন্য অনুবোধ করে যে সব যুক্তি প্রযোগ কবেছিলেন, তাব জবাবে বাম অনেকগুলি চোখা চোখা কথা বলেছিলেন। অনেক কথাব মধ্যে তিনি এক জাযগায বললেন, 'আপনাব বুদ্ধি বেদ-বিবোধিনী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক.....। বৌদ্ধ যেমন তস্কবেব ন্যায দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড কবিতে হইবে।' এখন সমস্যা হল, বাম জাবালিব এই বাক্যালাপ যদি সত্য হয, তবে বাম বুদ্ধেব বেশ পবেব যুগেব লোক, যখন বৌদ্ধদেব তস্কবেব মত ঠ্যাঙানো হচ্ছে। অথচ বিভিন্ন পুবাণে ও মহাভাবতে বিষ্ণুব নানা অবতাবেব সংখ্যায অমিল থাকলেও শেষ পর্যন্ত যে দশাবতাবেব তালিকা টিকে আছে, তাতে দেখতে পাচ্ছি বাম ষষ্ঠ এবং বুদ্ধ নবম অবতাব। বুদ্ধ যে বামেব অনেক পবেব অবতাব, এ ব্যাপাবে পুবাণে কোনও মতভেদ নেই। তাহলে তো শাস্ত্রবচন মেনে নিলে বলতে হয, অবতাব বাম অবতাব বুদ্ধেব আগে জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু বামাযণেব বাম বুদ্ধেব পবেব সৃষ্টি। আবাব দেখ, বাল্মীকি বামাযণেব শুরুতেই পাচ্ছি যে ব্রহ্মাব মতে বামেব শাসনকাল দশ সহস্র দশ শত বৎসব। তাহলে বুদ্ধেব পবে যদি তিনি জন্মে থাকেন, তবে তো ব্রহ্মাব বাক্য অনুযাযী এখনও অযোধ্যায বাম বাজত্বই চলছে। এবং তাহলে বাবব কখন এলেন, কল্যাণ সিংই বা কী কবে মুখ্যমন্ত্রী হলেন আব বজবঙ্গিবা বাববি মসজিদ কেন ভাঙতে চাইছে, শাস্ত্রেব বচন 'বিশ্বাস' কবে নিলে, তাব কোনও উত্তব পাওযা যাবে কি? না, তা যাবে না।

বামাযণ মহাভাবত পুবাণেব প্রতিটি কথাকে আন্তবিকভাবে বিশ্বাস কবে নিলে এমনি সব বহু হাস্যকব পবস্পব বিবোধী কথাব সৃষ্টি হতে থাকবে। বামেব কাল নিযে ঐ সব গ্রন্থে যে গোলক ধাঁধা, বামেব জন্মস্থান নিযেও তাব চেযে স্পষ্ট কিছু সেখানে তুমি পাবে না। আগেকাব একটা চিঠিতে তোমাকে মহাভাবতেব বনপর্ব থেকে উদাহবণ দিযে দেখিযেছিলাম যে, যে বামকে একজন ঐতিহাসিক আদর্শ বাজা বলে অনেকে মনে কবেন, তাঁব সম্বন্ধে সেকালেব যুধিষ্ঠিবেবও কিছুই জানা ছিল না; মার্কণ্ডেয মুনি নিতান্ত একজন হতভাগ্য নবপতিব কাহিনী হিসেবে তাঁকে বামেব কাহিনী শুনিযেছিলেন। মহাভাবতে এবকম কাহিনী আবও অনেক আছে, যেমন বিখ্যাত নল দমযন্তীব কাহিনী। বামেব কাহিনীও তেমনি এক কাহিনী মাত্র। বাম সেখানে কোনও 'জাতীয বীব' বা অবতাব নন।

বামকে তাঁব পবেব যুগেব যুধিষ্ঠিব তো দূবেব কথা, তাঁবই সমযে অযোধ্যাব পাশে বাস কবে বাল্মীকিও যে জানতেন না, এ কথা জযন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'মহাকাব্য ও মৌলবাদ' নামক চমৎকাব বইটি পড়ে খেযাল হল। মনে কবে দেখ, বাল্মীকি বামাযণে বাল্মীকি প্রথমে নাবদেব এবং পবে ব্রহ্মাব কাছ থেকে বামেব বৃত্তান্ত শোনেন। নিষাদ কর্তৃক ক্রৌঞ্চমিথুন বধেব পব যখন বাল্মীকি ছন্দোবদ্ধ শ্লোক বচনা কবলেন ও মহাকবি

হলেন, তখন তিনি সেই কাহিনীকেই কল্পনায পবিপুষ্ট কবে বামাযণ বচনা কবলেন। কিভাবে এই কাহিনী তিনি লিখলেন, সে কথাও খুব স্পষ্ট কবেই ঐ গ্রন্থে লেখা আছে। আমি হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যেব অনুবাদ কবা সংস্কৃত বামাযণ থেকে কিছু কিছু উদাহবণ তোমাকে দেব। ইতিপূর্বে তোমাকে যে সব উদাহবণ দিযেছি, তাও ঐ অনুবাদ থেকেই, অতএব প্রামাণ্য।

প্রথম কাণ্ড প্রথম সর্গেই আছে যে বাল্মীকি দেবর্ষি নাবদকে জিজ্ঞাসা কবছেন যে পৃথিবীতে সর্বগুণান্বিত কোনও মনুষ্য আছেন কি না। উত্তবে নাবদ যা বললেন, নানা কাবণে তা কৌতূহলপ্রদ। বামাযণেব ভাষায সেই উত্তবটা শোন ঃ

ত্রিকালদর্শী মহর্ষি নাবদ কহিলেন ঃ তাপস! তুমি যে সমস্ত গুণেব কথা উল্লেখ কবিলে তৎসমূদয সামান্য মনুষ্যে নিতান্ত সুলভ নহে। যাহাই হউক এইরূপ গুণবান মনুষ্য এই পৃথিবীতে কে আছেন, এক্ষণে আমি তাহা স্মবণ কবিযা কহিতেছি, শ্রবণ কব। বাম নামে ইক্ষাকুবংশীয সুবিখ্যাত এক নবপতি আছেন।....... তিনি বাজা দশবথেব সর্বজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ পুত্র। মহীপাল দশবথ এইরূপ প্রজাগণেব হিতার্থী সর্বগুণসম্পন্ন বামচন্দ্রকে প্রজাগণেবই প্রিযকার্য সাধনার্থ প্রীতমনে যৌববাজ্যে অভিষেক কবিতে অভিলাষী হইযাছিলেন।

এ ভাবে শুরু কবে নাবদ সংক্ষেপে বামেব সিংহাসন আবোহণ পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্তটি বললেন। লক্ষ্য কব যে এই বৃত্তান্তে প্রথমত বাম একজন 'সর্বগুণান্বিত মনুষ্য', কোনও অবতাব নন। নাবদেব মতে 'সামান্য মানুষ' যদিও এতগুলি গুণেব অধিকাবী হতে পাবেন না, তাহলেও 'সুবিখ্যাত নবপতি' বাম তেমন একজন মনুষ্য বটে । এই 'মনুষ্য' কথাটিব নিচে দাগ দাও। দ্বিতীযত উক্ত বৃত্তান্তে বামেব জন্ম প্রসঙ্গে কোনও কথাই নেই। নাবদ 'কৌশল্যাপুত্র বামে'ব কাহিনীটিব সূত্রপাত কবেছেন তাঁব যৌববাজ্যে অভিষেকেব সময থেকেই। অর্থাৎ বামেব জন্ম ও জন্মস্থান নিযে এত যে কোলাহল, মূল বামাযণে সেটি গৌণ কথা। বামেব জন্ম বৃত্তান্তটি এল কোথা থেকে? অনেক পণ্ডিতই মনে কবেন যে বামাযণে এই প্রসঙ্গটি প্রক্ষিপ্ত। যদি বাল্মীকি তা লিখেও থাকেন, তাহলেও তিনি যেহেতু কাহিনী অনুসাবে বাম সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গও জানতেন না, নিশ্চযই এ সব কথা তিনি কল্পনা দ্বাবাই বচনা কবেছিলেন। এবং সে কথা বামাযণে খুব স্পষ্ট কবেই লেখাও আছে। সে প্রসঙ্গে পবে আসছি, তাব আগে আবও দুএকটি খটকাব কথা বলে নিই।

বাল্মীকি আব বাম যদি সমসামযিক এবং বুদ্ধেব পবেব কালেব লোক হন, তাহলে সেখানে নাবদ কোথা থেকে এলেন? দেবর্ষি নাবদকে তো আমবা ছান্দোগ্য উপনিষদেব যুগে দেখেছি। আবাব নাবদ ও বাল্মীকিব কালেই যদি বাম এক সুবিখ্যাত নবপতি হন, তাহলে নাবদেব তা জানাব জন্য 'ত্রিকালদর্শী' হওযাব কোন দবকাব? আব তাঁকে তা 'স্মবণ কবিযা কহিতে'ই হয বা কেন? তাছাড়া আগে যা বলেছি, বাল্মীকি অযোধ্যাব অদূবে বসে এহেন নবপতিকে একেবাবে চেনেনই না, এটাই বা কেমন কথা? এতগুলি প্রশ্নেব জবাব দেওযা সম্ভব নয। আব এসব প্রশ্নেব জবাব যে দিতে হবে, এমন কথা বাল্মীকি স্বপ্নেও ভাবতে পাবেন নি। বাল্মীকিব শ্রোতাবা তো আব মূর্খ ছিলেন না। তাঁবা জানতেন যে 'বানিযে বলাই' কবিব ধর্ম, সুতবাং একটি প্রচলিত লৌকিক কাহিনীকে একেবাবে প্রত্যক্ষবৎ কবাব জন্য সুকৌশলে তিনি তাকে তাঁব স্বকালে নিযে আসছেন। এটা কবিব 'কৌশল'—এতে বচনাব সৌকর্য বাড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেন, 'পাঠক। এইবাব আইস

উদিপুবীব অন্দব মহলে প্রবেশ কবি', তখন যেমন কোনও বুদ্ধিমান মানুষ প্রশ্ন কবেন না, 'বাপু হে, তুমি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কাঁঠালপাড়ায জন্মে উদিপুবী বেগমেব অন্দব মহলে কেমন কবে ঢুকবে? এ কি ভোজবাজি নাকি?' তেমনি সেকালেও কোনও মানুষ এসব বেযাড়া প্রশ্ন তোলেন নি। প্রশ্নটা তুলতে হচ্ছে এ যুগে, যখন কিছু বুদ্ধিহীন মানুষ কাব্যেব সব কথাকেই আমাব সবলমনা পিসিমাব মত বাস্তব সত্য বলে ধবে নিযে বুদ্ধিমানেব মত ওকালতি কবতে চাইছে।

বামাযণেব প্রায সবটাই যে বাল্মীকিব কল্পনা সে কথা কবি নিজেই মহাকাব্যেব প্রাবম্ভে বলে নিচ্ছেন। বাল্মীকি ক্রৌঞ্চ মিথুন বধেব পব প্রথম সেই বিখ্যাত শ্লোক বচনা কবাব পব ব্রহ্মা এসে তাঁকে বললেন ঃ 'তুমি এক্ষণে সমগ্র বামচবিত বচনা কব। তুমি দেবর্ষি নাবদেব মুখে যেরূপ শুনিযাছ, তদনুসাবে সেই ধর্মশীল গম্ভীব স্বভাব বুদ্ধিমান বামেব এবং লক্ষ্মণ সীতা ও বাক্ষসদিগেব বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন কব। নাবদ যাহা কহেন নাই, বচনা কালে তাহাও তোমাব স্ফূর্তি পাইবে। তোমাব এই কাব্যেব কোন অংশই মিথ্যা হইবে না। এতএব, তুমি এই বমণীয বামচবিত শ্লোকবদ্ধ কব।' বিদিত যা ছিল, তাব চেযে অনেক অনেক বেশি অবিদিত বৃত্তান্ত কেমন কবে বাল্মীকি বচনা কবলেন? তাব অতি সুন্দব বণনা শোন। বাল্মীকি প্রথানুসাবে আচমন ইত্যাদি সেবে কৃতাঞ্জলি হযে উপবেশন কবে যখন মনে মনে পূর্ব বৃত্তান্ত অনুসন্ধান কবতে লাগলেন, তখন 'বাম লক্ষ্মণ ও সীতা এবং ভার্যা প্রজা ও আমাত্যাদি সহিত বাজা দশবথ, ইহাদিগেব হাস্য-পবিহাস, কথা-বার্তা ও ক্রিযাকলাপ-এই সমস্ত যেন তাঁহাব প্রত্যক্ষবৎ পবিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।' বাম লক্ষ্মণ সীতাব জীবনেব সমস্ত কিছু 'কবতলস্থ আমলকেব ন্যায তিনি দেখিতে পাইলেন।'

একটি কাব্যেব জন্মেব এব চেযে সবল ও সুন্দব বর্ণনা আব কি হতে পাবে। আব ঐ যে ব্রহ্মাব জবানিতে কবি বলছেন, 'এই কাব্যেব কোনও অংশই মিথ্যা হইবে না'-তাও সত্য, তবে স্থূল অর্থে নয। কাব্যেব 'মিথ্যা' বাস্তব সত্যেব চেযেও যে মহত্তব সত্য এ কথা একালে যেমন ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, তেমনি বলেছেন প্রাচীন গ্রীক মনীষী অ্যাবিস্টটলও। তাঁব 'পোযেটিকস' গ্রন্থে তিনি লিখছেন যে ইতিহাসে শুধু সেটাই লেখা থাকে যা ঘটেছে, কাব্যে লেখা হয যা ঘটতে পাবত বা ঘটা সম্ভব। সেকাবণেই কাব্যেব সত্য অনেক ব্যাপকতব ও কালজযী। বামাযণেব কোনও অংশই মিথ্যা হবে না বলে ব্রহ্মাব উক্তিটি এই অর্থেই সঠিক।

কাব্যেব সত্যেব সঙ্গে বাস্তব সত্যকে গুলিযে ফেলাটা ঠিক নয। ধব, প্রেযসীব মুখেব সঙ্গে চাঁদেব তুলনা তো একটা কবি প্রথা। কালিদাস আবও অতিবঞ্জিত কবে উমাব রূপ বর্ণনা কবে লিখলেন-এতদিন লক্ষ্মী 'বাত্রিতে চন্দ্রকে আশ্রয কবতেন কিন্তু পদ্মকে পেতেন'না এবং দিনে পদ্মে অধিষ্ঠিতা হতেন, কিন্তু চন্দ্রসুখে বঞ্চিত হতেন। এখন উমাব যৌবন প্রাপ্তিতে লক্ষ্মী উমাব মুখে একই সঙ্গে চাঁদ ও পদ্মেব শোভা ভোগ কবতে থাকলেন।' বাঙালী কবি ভাবত চন্দ্র আব এক কাঠি ওপবে। তিনি লিখলেন, 'কে বলে শাবদ শশী সে মুখেব তুলা, পদনখে পড়ে আছে তাব কতগুলা।' অর্থাৎ সুন্দবী নাবীব পাযেব নখেই চাঁদ গড়াগড়ি যাচ্ছে। তুমি যদি বলো, এসব 'অবাস্তব', 'বাবিশ', তাহলে তোমাকে বলব বেবসিক। আব যদি এসব কথাকে 'বাস্তব সত্য' ভেবে তুমি সুমিতাকে অন্ধকাব ঘরে বসিযে সেখানে মুখে ও পাযেব নখে মিলিযে মোট এগাব খানা চাঁদেব আলো প্রত্যাশা কব, তবে তুমি পাগল। বামাযণ মহাভাবতকে যাবা 'অবাস্তব' বলে খাবিজ কবে দিতে চায

তাবা বেবসিক, আব যাবা ঐ সব গ্রন্থ পড়ে বাম বা কৃষ্ণেব জন্মস্থান জবিপ কবে নিতে চায, তাবা উন্মাদ।

তুমি বলবে বামাযণ মহাভাবত তো শুধু মহাকাব্য নয, ধর্মগ্রন্থও । বাস্তবিক ঐখানটাতেই গোল। কিন্তু তোমাকে তো দেখালাম যে বামাযণেব প্রস্তাবনায বামকে অবতাব বলে বর্ণনা কবা হযনি, একজন সর্বগুণান্বিত মনুষ্য বলেই বর্ণনা কবা হযেছে। বর্ণনা প্রসঙ্গে নাবদ এ কথাও বলছেন যে বাম 'ধৈর্যে হিমাচলেব ন্যায, বলবীর্যে বিষ্ণুব ন্যায, বদান্যতায কুবেবেব ন্যায, সত্যনিষ্ঠায দ্বিতীয ধর্মেব ন্যায কীর্তিত হইযা থাকেন।' স্বযং বিষ্ণুই যদি হবেন, তবে 'বিষ্ণুব ন্যায' বলাব অর্থ হয না। অতএব তিনি বিষ্ণু নন, অর্থাৎ অবতাব প্রসঙ্গ এখানে আদৌ নেই। পণ্ডিতবা প্রায অবিসম্বাদিত ভাবে এখন প্রমাণ কবেছেন যে বিষ্ণুব অবতাবতত্ত্বেব ব্যাপাবটি বামাযণে প্রক্ষিপ্ত। বাম-কাহিনীব সঙ্গে বিষ্ণুব অবতাবত্বেব কোনও সম্পর্কই নেই,-অবতাবতত্ত্বকে জনপ্রিয কবাব জন্যই পববর্তীকালে বামাযণে তা জুড়ে দেওযা হযেছিল। বাস্তবিক বাল্মীকিব বামাযণে বামেব মধ্যে একজন মহাকাব্যিক নাযককেই আমবা খুঁজে পাই, দোষে গুণে বীবত্বে ও দুর্বলতায যিনি উজ্জ্বল, কোথাও 'সর্বগুণান্বিত ঈশ্বব' নন। এই প্রসঙ্গে আবও একটু বিষদ কবে তোমাকে পবে বলব। অপব দিকে মহাভাবতেব নাযক যে কৃষ্ণ নন, যুধিষ্ঠিব, বুদ্ধদেব বসুব অসাধাবণ গ্রন্থ 'মহাভাবতেব কথা' পড়ে থাকলে তুমি নিশ্চযই তা মানবে। কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ বাদ দিযে দিলেও যে মহাভাবত কাহিনীব বিশেষ কোনওই ক্ষতি হযনা, তাও তুমি একবাব ভেবে দেখলেই বুঝতে পাববে। যাই হোক, এসব কথাও আবাব বিস্তাবিত বলা যাবে, আজ বাম চবিত্র নিযে আবও দুএক কথা বলেই চিঠি শেষ কবব।

বামকে ভক্তি অথবা বামেব নিন্দা কোনওটিই আমি কবতে বাজি নই। বাম চবিত্রেব কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকা অসম্ভব বলেও আমি মনে কবি না। কিন্তু সেই বাম যে বাল্মীকিব কালেব কোনও বাজা ছিলেন না, এ কথা বাল্মীকিব বর্ণনা থেকেই বোঝা যায। বাল্মীকি যদিও বামকে দিযে বৌদ্ধ মত খণ্ডন কবিযেছেন, আসলে তিনি যে বুদ্ধ পববর্তী ছিলেন না, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। কাবণ লোকবিশ্বাস অনুযাযী বাম ত্রেতা, কৃষ্ণ দ্বাপব এবং বুদ্ধ ও কল্কি কলি যুগেব অবতাব। অতএব বামাযণ মহাকাব্য বুদ্ধেব পববর্তীকালে বচিত হযেছিল, এবং বাম ছিলেন তাব বহু পূর্বেকাব কোনও বীব, এই সিদ্ধান্ত কবাই ববং অনেক যুক্তিসিদ্ধ হবে। অর্থাৎ ধবে নিতে পাবি, বামাযণে বামেব নয, বাল্মীকিব কালেব চিন্তা ভাবনাই প্রতিফলিত হযেছে এবং সে কাবণেই সেখানে বৌদ্ধ প্রসঙ্গ এসেছে।

মহাকাব্যেব বামেব আচবণ ও চবিত্র সেই কালেব নিবিখে বিচাব কবাই ন্যাযসঙ্গত হবে, আমাদেব কালেব নয। বামাযণেব চবিত্রগুলিব কাজকর্ম আজকেব দিনে যে অনুকবণযোগ্য নয, এ কথায আশা কবি তুমি প্রতিবাদ কববে না। স্ত্রীব কথায পুত্রকে বঞ্চিত কবা, পিতাব অন্যায্য কথাকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওযা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব, পিতাব বা স্বামীব প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য-কোনওটাই এ যুগেব আদর্শ আব নেই। স্ত্রীকে সম্পত্তিব মত মনে কবা, তাকে আগুনে পোড়ানো বা গর্ভাবস্থায বনে পবিত্যাগ কবাকে যদি তুমি ধর্ম মনে কব, তা হলে অধর্ম আব কী? বামকে প্রজানুবঞ্জক বলা হযেছে, কিন্তু তাব বড় একটা প্রমাণ বামাযণে নেই। তিনি অনার্যদেব হত্যা কবে ব্রাহ্মণ ঋষিদেব জন্য বনগুলিকে নিষ্কন্টক কবেছিলেন, বর্ণাশ্রম ধর্মকে বাঁচাবাব জন্য শূদ্রককে হত্যা কবেছিলেন এবং মূর্খ মানুষদেব নিন্দাব ভযে জানকীকে পবিত্যাগ কবেছিলেন-তাঁব 'প্রজা হিতৈষণা'ব এব চেযে

কোনও বড় প্রমাণ মহাকাব্যে নেই। তাই বলে এসব কাজেব জন্য বাম বা বাল্মীকিকে দাযী কবে কাব্যবিচাবেব কাজ সমাধা হবে না। ম্যাকবেথ বা হ্যামলেট, জীবনানন্দ বা সতীশ, বোহিনী বা শৈবলিনী–ন্যায কবেছিলেন না অন্যায কবেছিলেন, সাহিত্য বিচাবে তাব চেযে বড় প্রশ্ন হল, স্রষ্টাব বচিত জগতে তাঁবা স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ আচবণ কবেছিলেন কিনা। গোবিন্দলাল বোহিনীকে খুন কবেছিলেন, ম্যাকবেথ উচ্চাশাব প্রেবণায খুন কবেছিলেন অনেককে। তবুও পাঠক এইসব চবিত্রেব জন্য অশ্রুপাত কবে, কাবণ এদেব কাহিনীব মধ্যে ধবা পড়েছে এক একটি বিশেষ কালেব আশা, আনন্দ, দ্বন্দ্ব, বেদনা এবং দীর্ঘশ্বাস। যিনি তাঁব সৃষ্ট চবিত্র সমূহেব মধ্যে একটি বিশেষ কালেব ও বিশেষ সমাজেব ব্যাপ্তি ও গভীবতাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত কবতে পাবেন তিনিই মহান সাহিত্যিক–মহাকবি, নাট্যকাব বা ঔপন্যাসিক। বাল্মীকি সেই মহত্ত্বই অর্জন কবেছিলেন। বামেব অবতাবতত্ত্বেব প্রবক্তাবা তাঁদেব বক্তব্যগুলিকে মহাকাব্যেব ভিতবে ভেজাল দিযে সেই মহত্ত্ব ও জনপ্রিযতাকে তছরুপ কবেছিলেন মাত্র।

॥ চৌত্রিশ ॥

তুমি তোমাব পুবনো প্রশ্নটা ফেব তুলেছ। বলেছ, যুক্তি অবশ্যই শক্তিশালী। কিন্তু ইতিহাসে বিশ্বাসেব অবদানও কি নগণ্য? মার্ক্স এঙ্গেলস্ লেনিন যুক্তি দিযে যে তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন, তা যেমন মূল্যবান, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঐ সব তত্ত্ব অত না বুঝে সমাজতন্ত্রেব প্রতি প্রবল বিশ্বাসে যে পৃথিবীব দিকে দিকে যুগান্তব ঘটিযেছিল, তাও তো মূল্যহীন নয।

তুমি আমাব দুর্বলস্থানে ঘা দিযেছ। আমি বেশ ভালই জানি যে আমাব যুক্তিগুলি পোক্ত হওযা সত্ত্বেও, সাবা বিশ্বে সমাজতন্ত্রেব প্রতি বিশ্বাসে যে ফাটল ধবেছে, তাতে আমি চিন্তিত। আমাব যুক্তি আজ আমাকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস যোগায না। সমাজতন্ত্রেব সপক্ষে আমাব উত্তপ্ত বক্তৃতাগুলি যখন আগেকাব মত তালি কুড়োযনা, তখন আমি বিপন্ন বোধ কবি বৈকি ! আমাদেব অস্তিত্ব একদিকে যেমন তাব ডালপালা মেলে জীবনেব আকাশ, বাতাস ও আলো থেকে বসদ সংগ্রহ কবে ফুল ফোটায, ফল দেয, সুন্দব হযে ওঠে, অপব দিকে তেমনি তাব শিকড় প্রোথিত থাকে তাব অতীতে, যেখানে তাব বিশ্বাসেব অনেক নিভৃত অন্ধকাব বযেছে, সেখানে কখনও আলো পৌছয না। আলোব কাববাবি সেখানে ব্যর্থ। যেখানে জলেব দবকাব সেখানে আলো অর্থাৎ 'জ্ঞান' দিতে গেলে কী হয, দুঃখেব সেই কথা তো সুকুমাব বাযেব নাটক 'অবাক জলপানে'ব হাসিব মধ্যেই বযেছে। অতএব, তেমন 'জ্ঞান দাতা' হওযাব মধ্যে আমি নেই। বিশ্বাসকে আমি বাতিল কবিনি, যুক্তিহীন বিশ্বাসকে মেনে নিতে অস্বীকাব কবেছি মাত্র। যুক্তি ও বিশ্বাস, অতীত ও বর্তমান, ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ, বাস্তব ও স্বপ্ন নিযেই মানুষ। একটিকে বাদ দিলে অন্যটি থাকেনা, আবাব একটিব আধিক্য অন্যটিকে খর্ব কবে। এইসব কিছুব সুষম মিশ্রণেই সুষম জীবন গড়ে উঠতে পাবে।

তুমি তোমাব পুরনো যুক্তির পুনরাবৃত্তি কবে বলেছ, 'জগতেব সব কিছু যুক্তি দিযে' স্পর্শ কবা যায না। কিছু "চরম সত্য" আছে তাকে মেনে নিতে হয। উপনিষদেব ঋষি "নেতি নেতি" কবে এমন এক জাযগায পৌছেছিলেন যেখানে সব যুক্তি অচল, সেখানে উপলব্ধিই

সব। সেই অবস্থাই "ব্রহ্ম"। বামকৃষ্ণ বলেছেন, কলসি যতক্ষণ ভবতে থাকে, ততক্ষণ শব্দ হয। ভবে গেলেই চুপ, সমস্ত যুক্তিতর্কেব ইতি।' মজাব কথা কি জান? যে জিনিসকে তোমবা বল 'যুক্তি দিযে বোঝা যায না', তাকে বোঝাবাব জন্য কিন্তু তোমাদেব যুক্তি তর্কেব শেষ নেই। তোমাব ওপবেব এই কথাগুলি যুক্তি ছাড়া কী? যদিও ভ্রান্ত যুক্তি। কাবণ, বামকৃষ্ণেব মত পূর্ণকুম্ভেব মুখে তবে এত কথা, গল্প, এত যুক্তিব ফুলঝুবি কেন?

'যুক্তি দিযে সব কিছু স্পর্শ কবা যাবে না'—এই কথাটি প্রমাণ কবাব জন্য তুমি যে যুক্তিই দাও তাই হবে স্ববিবোধী। তোমাকে একবাব লিখেছিলাম যে বেদান্তবাদীবা ন্যায বা যুক্তিশাস্ত্রেব বিরুদ্ধে যে সব যুক্তিতর্ক উপস্থিত কবেছিলেন, তা সবই ন্যায থকেই ধাব কবা, যে কাবণে বেদান্ত বা উত্তব মীমাংসা ষড়দর্শনেব অন্যান্য দর্শনেব মত 'ন্যায প্রস্থানে'ব অন্তর্ভূক্ত। এখানেই ন্যাযেব জিৎ। যুক্তিকে নস্যাৎ কবতে গেলেও যুক্তিবই দ্বাবস্থ হতে হবে।

তুমি বিজ্ঞান থেকেও কিছু উদাহবণ দিতে চেষ্টা কবেছ। বলেছ, বিজ্ঞানীকে দুটি সূত্রেব উপব 'বিশ্বাস' কবতে হয,—একটি হল 'প্রকৃতিব একরূপতা' বা Uniformity of nature, অন্যটি কার্যকাবণ সূত্র বা Law of Causation। এই চবম সূত্র দুটি প্রমাণ কবা যায না। প্রকৃতিতে কখনও কাবণ ভিন্ন কার্য হয না এবং-প্রকৃতি কখনও তাব নির্দিষ্ট নিযমকে লঙ্ঘন কবেনা, কবেনি এবং কববে না,—এই 'বিশ্বাস'কে ধ্রুব মেনেই বিজ্ঞানী অগ্রসব হন। অথচ এ দুটি সত্য উপনিষদেব ব্রহ্মেব মতই অপ্রমেয।

বিজ্ঞানেব মৌলিক সূত্র আব ব্রহ্ম, দুইই অপ্রমেয হলেও, এ দুটিতে তফাৎ কোথায জান? প্রথমটি প্রতিদিনেব প্রতিটি ঘটনায সমর্থিত এবং 'প্রমাণিত হচ্ছে, অপব পক্ষে মুষ্টিমেয মানুষেব 'উপলব্ধি ছাড়া দ্বিতীযটিব কোনও সমর্থন নেই। বিশ্বাসেব গুরুত্বকে বুঝতে গেলে,এই বিষযটিকে ভালভাবে চিন্তা কবতে হবে। বিশ্বাস ছাড়া মানুষ এক পাও চলতে পাবে না, কিন্তু বিশ্বাস ততক্ষণই শক্তিশালী, যতক্ষণ যুক্তি তাব বিরুদ্ধাচবণ কবেনা। সোভিযেত ইউনিযনেব প্রতি অসংখ্য মানুষেব বিশ্বাস ছিল, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি তা যে আজ টলেছে এ কথাও সত্য। এবং এই বিশ্বাসভঙ্গেব কাবণ হল এই যে, যুক্তি দিযে তাকে সমর্থন কবা যাচ্ছে না।

যে কোনও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, তাব জন্য যুক্তিব সমর্থন চাই-ই। 'অন্ধ বিশ্বাস' বলে একটা কথা আছে। তাতেই বুঝতে পাবছ যে বিশ্বাসও চক্ষুমান হয, হওযা উচিত। সেই চক্ষুই হল যুক্তি।

আমবা যে প্রসঙ্গে এই যুক্তি ও বিশ্বাসেব তর্কটা কবছি, সেই বামেব কথায ফেবা যাক। বাম যে বাল্মীকি বচিত এক অমব মহাকাব্যেব নাযক, সে সম্বন্ধে কোনও বিতর্ক নেই। কিন্তু বামেব কথা অন্য আবও বহু জাযগায আছে, শুধু আমাদেব দেশে নয, ভাবতেব বাইবে অন্যত্রও। সেই বাম কি সত্যিই কখনও জন্মেছিলেন? যদি জন্মে থাকেন, তবে কি তিনি অবতাব? এই প্রশ্নগুলিব প্রসঙ্গেই যুক্তি ও বিশ্বাসেব কথা এসে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, প্রথম প্রশ্নটিব মীমাংসা হলে তবেই দ্বিতীয প্রশ্নটি আসবে। অতএব, প্রথমটি নিযে শুরু কবা যাক।

আমি আগেই তোমাকে বলেছি যে আমাদেব কাব্যে ও পুবাণে বামেব যে সব প্রসঙ্গ আছে তা নানাভাবে এত পবস্পব বিবোধী যে তা থেকে বামেব জন্মেব কাল বা স্থান সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তেই আসা সম্ভব নয। বামাযণ প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব ব্যবহৃত একটি চমৎকাব

উপমাব কথা আমি বেদ–আলোচনাব সময উল্লেখ করেছিলাম। দূবেব আকাশে হাজাব হাজাব আলোকবর্ষ দূবে অবস্থিত তাবাদেব যেমন পাশাপাশি দেখা যায, তাদেব ব্যবধান বোঝা যায না, আমাদেব বামাযণ মহাভাবত বেদ পুবাণেও তেমনি নানা সমযেব নানা চবিত্র পাশাপাশি এসে গেছে, আজকে তাদেব ব্যবধান খুঁজে বেব কবা শক্ত। কিন্তু শক্ত হলেও এটাই ঐতিহাসিকেব কাজ। ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ খোঁজেন, না পেলে ঘাঁটেন সাহিত্য শিল্প চিত্রকলা। সেখানেও না পেলে নিঃসন্দেহ হবাব জন্য হাতে নেন গাঁইতি, খোঁড়েন মাটি, বেব কবে আনেন চাক্ষুষ প্রমাণ। শেষোক্তটিকে বলে প্রত্নতত্ত্ব। প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে এব গুরুত্ব অপবিসীম।

আমাদেব নানা পুবাণ কথাব মতই গ্রীস, মিশব, ব্যাবিলন, মাযা সাম্রাজেব ধূসব অতীত সম্পর্কে অজস্র কল্পকাহিনী নিযে যে সব প্রশ্ন আছে, পাশ্চাত্যেব প্রত্নতত্ত্ব তাব কিভাবে সমাধান কবেছে, তাব বহু শ্বাসরুদ্ধকব কাহিনী পড়েছিলাম সি. ডাব্লিউ. সেবামেব 'গডস্, গ্রেভ্স অ্যাণ্ড স্কলার্স' নামক এক চিত্তাকর্ষক গ্রন্থে। কল্পকাহিনীব সঙ্গে ইতিহাসেব, বিশ্বাসেব সঙ্গে যুক্তিব সম্পর্ক বোঝাবাব জন্য আমি সেই গ্রন্থ থেকে দুএকটি উদাহবণ দেব। আশা কবি তোমাব ধৈর্যচ্যুতি ঘটবেনা।

জার্মান বালক হাইনবিখ শ্লীম্যান অতি অল্প বযস থেকে হোমাবেব 'ইলিযাডে'ব প্রতিটি বর্ণনাকে বিশ্বাস কবতেন। সেই বিশ্বাসেব জোবে লক্ষপতি ব্যবসাযী শ্লীম্যান একদিন প্রৌঢ বযসে পাড়ি দিলেন ট্রযেব উদ্দেশে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেবোডোটাস ও থুসীডিডিস ট্রয যুদ্ধেব সত্যতা স্বীকাব কবলেও শ্লীম্যানেব সমসামযিক ঐতিহাসিকদেব কাছে হোমাব একজন প্রাগৈতিহাসিক চাবণ কবি ও ট্রযেব যুদ্ধ এক কল্পকাহিনী ছাড়া কিছুই ছিল না। অপব পক্ষে লোকবিশ্বাস এই সব কাহিনীকে সত্য বলে মানত।

সেই লোকবিশ্বাস অনুযাযী শ্লীম্যান প্রথমে গেলেন বুনাববাশি নামক এক ছোট্ট গ্রামে। এখানটাতেই ট্রযেব যুদ্ধ হযেছিল বলে লোকেব বিশ্বাস। কাবণ, হোমাবেব বর্ণনা অনুযাযী কিছু কিছু আপাত লক্ষণ এখানে ছিল অথবা ছিল বলে প্রচাব কবা হত। কিন্তু এই গ্রামেব অবস্থান, এব চড়াই উৎবাই, সমুদ্র থেকে দূবত্ব ইত্যাদি দেখে শ্লীম্যান স্থিব নিশ্চয হলেন যে এ সেই ট্রয যুদ্ধেব স্থান নয। তিনি ঘড়ি ধবে দেখলেন যে হোমাবেব বর্ণনা অনুযাযী গ্রীক সৈন্যদল বণতবী থেকে বেবিযে এসে সমুদ্র থেকে দূবে এই জাযগায যদি যুদ্ধ কবে থাকে তবে প্রথমদিনেব প্রথম ন ঘন্টায গ্রীক সৈন্যদেব বাহান্ন মাইল আনাগোনাই কবতে হযেছিল' ওবা যুদ্ধ কবল কখন' 'ইলিযাডে' যুদ্ধেব এবং হেলেন যেখানে বন্দিনী হযেছিল প্রিযামেব সেই চৌষট্টি মহল বাজপ্রাসাদেব যে বর্ণনা আছে তাও এই বুনাববাশিব আকাব প্রকাবেব সঙ্গে একেবাবেই মেলেনা। অবশেষে তিনি সমুদ্র থেকে কাছাকাছি হিসাবলিক নামক একটি জাযগাকে সম্ভাব্য যুদ্ধস্থল বলে সনাক্ত কবলেন এবং ১৮৬৯ থেকে দীর্ঘ চার বছবেব পবিশ্রমে ও খোঁড়াখুঁড়িতে খুঁজে বেব কবলেন একটি নয, দুটি নয, একেব ওপব এক গড়ে ওঠা ন নযটি ট্রযনগবীব স্তব। এব মধ্যে কোনটি হোমাবেব ট্রয? শ্লীম্যান ভাবলেন যে নিচ থেকে দ্বিতীয বা তৃতীয স্তবেই ছিল প্রিযামেব বাজপ্রাসাদ। সেখান থেকে তিনি বহুমূল্য সোনা মণিমানিক্য পেযেছিলেন এবং তাকে তিনি 'প্রিযামেব বত্নকোষ' বলেই বিশ্বাস কবেছিলেন। সেখান থেকে একটি বত্নহাব তুলে নিযে তিনি তাঁব নবোঢ়া গ্রীক সুন্দবী স্ত্রীব গলায পবিযে দিযে আবেগে সম্বোধন কবেছিলেন, 'হেলেন!' কিন্তু, তাঁব মৃত্যুব পব প্রমাণিত হয যে সেই বহুমূল্য সম্পদ ছিল প্রিযামেব চেযে হাজাব বছব আগেকাব,–

প্রিয়ামের রাজপ্রাসাদ আসলে রয়েছে অনেক ওপরে সপ্তম স্তরে যার ঐতিহাসিক কাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী।

যাই হোক শ্লীম্যান এখানেই ক্ষান্ত হন নি, এক আবেগ মথিত বিশ্বাসের তাড়নায় গিয়েছেন গ্রীক উপনিবেশ ছেড়ে মূল গ্রীক ভূখণ্ডে। সেখানে 'মাইসিনীয়' সভ্যতার নিদর্শন এবং ট্রয় অভিযানের নায়ক 'অ্যাগামেমনের সমাধি' খুঁজে বের করেছেন; এবারে তাঁর সহায়ক ছিল অপর গ্রীক ঐতিহাসিক তথা ভৌগোলিক পসানিয়াসের বিবরণ। দুঃখের কথা, পরে প্রমাণ হয়েছিল ঐ সমাধিও অ্যাগামেমননের নয়, অন্তত তাঁর চারশ বছর আগেকার কোনও নৃপতির।

শ্লীম্যানের ভ্রান্তিগুলি সত্ত্বেও তাঁর অদম্য বিশ্বাস নমস্য। কারণ, সেই বিশ্বাসকে তিনি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন। অনেক ভ্রান্ত লোকবিশ্বাসকে খণ্ডন করেই তাঁকে তা করতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রত্নতত্ত্বের এক অপরাজেয় দিশারী। 'গডস্, গ্রেভ্স্ অ্যাণ্ড স্কলার্স' থেকে আর একটি উদাহরণ দিয়ে আজকের চিঠি শেষ করব। যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ও জ্ঞানপিপাসু টাইগ্রীস ইউফ্রেটিসের ধারে মেসোপটেমীয়, ব্যাবিলনীয় ও সুমের সভ্যতার বিস্ময়কর নিদর্শনগুলি মাটির তলার অন্ধকার গহ্বর থেকে আলোয় নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন বটা, গ্রোটেফেণ্ড, রলিনসন, লেয়ার্ড, জর্জ স্মিথ, কল্ডিউই, উলি। তাঁরা কেউ ফরাসী, কেউ জার্মান, কেউ ইংরেজ। উনবিংশ শতাব্দীর এইসব মনীষীরা কেউ বাইবেলের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তাঁরা ঐ সব সভ্যতার যে প্রাগৈতিহাসিক নির্দশনগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন, তা বাইবেলের বহু বর্ণনাকে সত্য বলে প্রমাণ করেছিল, যদিও একই সঙ্গে বাইবেলের গরিমাও তাতে খর্ব হয়েছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বরের দ্বারা ধিক্কৃত ঐ সব সভ্যতা যখন সমস্ত অতিকথন ও অলৌকিকতার নির্মোক ত্যাগ করে জীবন্ত হয়ে উঠল, তখন সারা জগৎ বিস্মিত হয়ে গেল। সেইসব চমকপ্রদ কাহিনী তো আজ বলার সময় নেই। আমি শুধু একটি প্রসঙ্গের কথা বলব। বাইবেলে, তুমি জান, এক মহাপ্লাবনের কথা আছে, যাতে পৃথিবী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নোয়া নামে এক ব্যক্তির জাহাজে সেবার পৃথিবীর মানুষ, জীব, জন্তুদের একটি করে নমুনা রক্ষা পেয়েছিল। খ্রীস্টানরা বাইবেলের এই গল্পকে অভ্রান্ত সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। বলা বাহুল্য বিজ্ঞানীরা তা করতেন না। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের গাঁইতির ঘায়ে মাটির ভিতর থেকে এমন সব নিদর্শন বেরিয়ে এল, যাতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, উভয় পক্ষই অবাক হয়ে গেলেন। প্রথমে নিনেভেতে অসুরবানিপালের প্রাসাদে লেয়ার্ড খুঁজে পেলেন এক গ্রন্থাগার, কাগজে নয় মৃৎফলকে লেখা গ্রন্থের এক সুবিশাল সংগ্রহ। তা থেকে জর্জ স্মিথ পাঠোদ্ধার করলেন পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য 'গিলগামেশের উপাখ্যান', আর অবাক হয়ে দেখলেন, তাতেও রয়েছে এক মহাপ্লাবনের কাহিনী যা অবিকল নোয়ার জাহাজের গল্প। কাহিনী, বর্ণনা, বাগভঙ্গি—সব এক, শুধু চরিত্রগুলি আলাদা। এখানে উদ্ধারপ্রাপ্ত। মানুষটি নোয়া নয়, উত—নাপিশতিম, ত্রাণকর্তা ঈশ্বর এখানে 'গড' নন, 'ইয়া'। প্রমাণ হল যে ওল্ড টেস্টামেন্টের এই কাহিনী আসলে মৌলিক কাহিনী নয় এবং আদৌ নয় 'গড' অনুরক্তদের ইতিহাস। নোয়ার জাহাজের উপাখ্যান আসলে 'গড' দ্বারা ধিক্কৃত অভিশপ্ত 'গণিকা ব্যাবিলনের' এক পুরা কাহিনীরই প্রতিধ্বনি। নূতনত্ব হল, এতে যুক্ত করা হয়েছে 'গড' এর মহিমা! দূরতর কাহিনীরও যে বাস্তব ভিত্তি রয়েছে, তার প্রমাণস্বরূপ উলি পরে মাটি খুঁড়ে বের করলেন টাইগ্রীস—ইউফ্রেটিস—এর সেই দেশে

চল্লিশ ফুট কর্কশ মাটিব তলায ৮ ফুটেব বেশি গভীব এক পলিমাটিব স্তব, এক বিপুল বন্যাব জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

বিশ্বাস ও যুক্তিব এইসব কাহিনী অতি চিত্তাকর্ষক। গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিযাড' ও ইহুদী মহাকাব্যোপম পুবাণ তথা ধর্মগ্রন্থ 'টেষ্টামেন্ট' সম্পর্কে বিশ্বাসগুলি যেমন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বেব আলোয বিচাব কবা হযেছে, আমাদেব মহাকাব্য তথা ধর্মগ্রন্থ 'বামাযণ' এবং মহাকাব্য তথা পুবাণ তথা ধর্মগ্রন্থ 'মহাভাবত' সম্পর্কিত বিশ্বাসগুলিকেও তেমনি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বেব কষ্টিপাথবে যাচাই কবা গেলে আমবা ইতিহাসেব অনেক চিত্তাকর্ষক নূতন ব্যাখ্যা খুঁজে পাব। জোব জববদস্তি দিযে এ কাজ হযনা, চাই একনিষ্ঠ গবেষণা । এ দেশেব অনেক ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সে কাজে ব্যাপৃত আছেন। অন্যেব বিশ্বাসকে বল প্রযোগেব দ্বাবা আঘাত না কবে, নিজেব বিশ্বাসকে যুক্তিব ওপব প্রতিষ্ঠিত কবাই তো সভ্যতাব ধর্ম।

প্রত্নতত্ত্ব আমাদেব সামনে যে সব চাক্ষুষ প্রমাণ এনে হাজিব কবছে তা থেকে দুটো সিদ্ধান্ত আমবা টানতে পাবি। প্রথমত জনশ্রুতি, লোককথা, কল্পকাহিনী বা পুবাণ একেবাবে ভিত্তিহীন নয। লোককথা কিভাবে তৈবি হয, তা জানতে হলে আমাদেব ড্রইং রুমে বা লেখাব ঘবে বসে তাব খোঁজ তুমি পাবে না। যেতে হবে কোনও সাঁওতাল পল্লীতে, পুরুলিযাব টুসুব আসবে অথবা আফ্রিকাব কোনও অবণ্যপল্লীতে যেখানে শিল্পসৃষ্টি কোনও একক প্রযাস নয, এক যৌথ কর্ম। সাহিত্য সংগীত শিল্পেব সে এক বীতিমত ওযার্কশপ। সেখানে কল্পনা ও বাস্তব মিশে যায, নানা প্রকৃত ঘটনা শিল্পেব যাদুতে অপ্রাকৃত হযে ওঠে। আমাদেব বেদেব সৃষ্টি এ ভাবেই শুরু হযেছিল। মহেঞ্জোদাবো–হবপ্পায প্রত্নতত্ত্ব যে সভ্যতাব নিদর্শন পেযেছে, সেখানকাব মৃৎফলকে প্রাপ্ত লিপিগুলি যদি উদ্ধাব কবা যেত, তাহলে হযত বেদে বর্ণিত দাস, অসুব ও নগববাসী কৃষ্ণকায অনার্যদেব সম্পর্কে বৈদিক উক্তিব অনেক বহস্যেব সমাধানেব ইঙ্গিত পাওযা যেত, যেবকম মেসোপটেমিযায প্রাপ্ত মৃৎফলকেব ভাষা উদ্ধাব কবে বহস্য ভেদ কবা গেছে বাইবেলেব।

দ্বিতীয যে কথাটা লক্ষ্য কবা যায তা হল এই যে লোককথাব বা পুবাণ কাহিনীব বাস্তব ভিত্তি আব জনশ্রুতিব সত্যতা এক কথা নয। শ্লীম্যান জনশ্রুতিকে অগ্রাহ্য কবে পুবাণ ও ইতিহাসেব নানা অভ্যন্তবীন সাক্ষ্যকে যুক্তিব নিবিখে বিচাব কবে, তবেই ট্রয নগবী ও মাইসিনীয সভ্যতাব নিদশন খুঁজে পেযেছিলেন। জনশ্রুতি বর্তমান অযোধ্যাকে বামেব অযোধ্যা বলে মনে কবে, কিন্তু আমাদেব প্রত্নতত্ত্ব বলেছে, ওখানে আদৌ কোনও প্রাচীন নগবী ছিল না। তাহলে অন্যত্র অনুসন্ধান কবতে হবে। বামেব অযোধ্যা কোথায ছিল, লঙ্কায বাবণেব বাজপ্রাসাদই বা কোথায লুকিযে আছে কোদাল গাঁইতি দিযে যতদিন তা বেব কবা না যায, ততদিন এই প্রযাস প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিকদেব চালিযে যেতে হবে। একটি বিতর্কিত মন্দিব বা মসজিদকে বামেব জন্মস্থান বলে আঁকড়ে ধবে থাকলে বামেব প্রকৃত ইতিহাস খোঁজাব কাজই যে ব্যাহত হবে, সে কথা বোধ হয উদগ্র 'বামভক্ত'বা কখনও ভাবেনি। বামেব মন্দিব তো সেদিনেব কথা। কিন্তু বাম, জনক, বাবণেব প্রাচীন পুবীগুলি কোথায? গলায তিলক কেটে, গেরুযা পবে, অন্য ধর্মেব উপাসনাস্থানেব ওপব পতাকা ওড়ান বা একটি মন্দিব তৈবি কবা বড়ই সহজ। কিন্তু ইতিহাসেব সেই কঠিন অনুসন্ধানেব কাজ হাতে তুলে নিতে হবে তাঁকেই যিনি বামকে, লোক কাহিনীকে সত্যেব ওপব প্রতিষ্ঠিত কবতে চান। এইসব উগ্র ধর্মধ্বজীদেব সেই অনুসন্ধিৎসা, সেই নিষ্ঠা, সেই সত্যপ্রিযতা নেই।

সত্যপ্রিযতাই সবচেযে বড় কথা। ধর্মব্যবসাযীবা সত্যকে ভয পায। মাটি খুঁড়ে সত্য আবিষ্কাবে তাদেব কোনও গবজ নেই, পাছে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেবিযে পড়ে। কিভাবে প্রত্নতত্ত্বেব দৌলতে বাইবেলেব কাহিনীব সত্যতা প্রমাণিত হতে হতে তাব মহত্ত্বও খর্ব হযে গেল প্রমাণ হযে গেল—যে খ্রীস্টধর্ম যে বাইবেলকে মানুষেব আদি ও অকৃত্রিম ইতিহাস বলে দাবি কবে, তা সত্য নয সে সব কথা তো তুমি শুনলে।

বিশ্বপিতা গডেব 'একমাত্র' সৃষ্টি আদম আব ইভেব থেকে শুরু কবে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ছকে দেওযা মানুষেব 'প্রামাণ্য' বাইবেলীয ইতিবৃত্তটি যে আদতে একটি অন্য 'বিধর্মী' কাহিনীবই ভাষ্যমাত্র, প্রত্নতত্ত্বই একথা সন্দেহাতীত রূপে ফাঁস কবে দিযেছে। বামকাহিনীও যে ব্রহ্মাব মুখ নিসৃত 'প্রামাণ্য' ইতিবৃত্ত নয, তাবও যে এমনি অনেক ভাষ্য আছে, সুনীতি চাটুজ্যে ও সুকুমাব সেন এ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিববণ দিযেছেন। বাইবেলেব নোযা যেমন আসলে ছিল বাইবেল নিন্দিত বিধর্মীদেব কাহিনীব নাযক, তেমনি, আমাব খুব বিশ্বাস যে বাম ও কৃষ্ণ উভযেই ছিলেন আর্যনিন্দিত অনার্যদেব প্রিয কোনও বীবগাথাব নাযক, কাবণ, তাঁদেব দুজনেবই গাযেব বং কালো। বেদে কৃষ্ণ নামে এক অনার্য যোদ্ধাব উল্লেখ আছে, ইন্দ্র যাকে তাব গর্ভবতী পত্নীদেব সঙ্গে নৃশংসভাবে হত্যা কবেছিলেন। এই কৃষ্ণেব দশ সহস্র অনুচব ছিল বলে শোনা যায। বেদেব পববর্তীকালে দেবতা হিসেবে ইন্দ্রেব প্রাধান্য একেবাবে কমে যায, তাবই পাশাপাশি কৃষ্ণ প্রধান হযে উঠতে থাকেন। বেদেব সেই অনার্য যোদ্ধাব কাহিনী তাব মূল হওযা অসম্ভব নয। পবাজিত বীবদেব ঘিবে জনসাধাবণেব মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয কাহিনী গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে একটা মজাব বিষয লক্ষ্য কবা যায এই যে পুবাণেও ইন্দ্র ও কৃষ্ণেব বিবাদেব কাহিনী বযেছে। সিন্ধু সভ্যতাব লিপি উদ্ধাব হলে অনার্য কৃষ্ণেব হযত কোনও হদিশ পাওযা যেত। অবশ্য ভবসা কবে তা বলা যায না, কাবণ সিন্ধু লিপি নাকি নিতান্তই ব্যবসাযিক লেখাজোকা।

বাম যে কৃষ্ণেব পূর্ববর্তী তাতে কোনও দ্বিমত নেই। কৃষ্ণ যদি বৈদিক যুগেব অর্থাৎ আর্যদেব ভাবত আগমনেব কালেব কেউ হযে থাকেন, তবে বাম তাবও আগেকাব কোনও বীব, এবং অবশ্যই তাই অনার্য। বাবণকে বাক্ষস বলে বর্ণনা কবা হলেও, তাঁব বিত্ত বৈভব দেখে মনে হয তিনি কোনও অনার্য নবপতি ছিলেন। কুবেবেব বৈমাত্রেয ভ্রাতা তিনি। কুবেব বিবাট ধনশালী বলে প্রসিদ্ধ, বাবণও ঐশ্বর্যশালী। এখন কথা হল, এঁবা কোথাকাব অধিপতি ছিলেন? এইচ, ডি, সাঙ্কালিযা তাঁব চিত্তাকর্ষক গ্রন্থে 'Ramayana Myth or Reality' তে নানান যুক্তি দিযে দেখিযেছিলেন যে লঙ্কা আসলে বর্তমান শ্রীলঙ্কায নয, দক্ষিণ ভাবতেই ছিল। হতে পাবে। আবাব সিন্ধু সভ্যতাব কোনও লুপ্ত পুবীতেও হতে পাবে। সঠিক এখনও তো আব কিছু বলা যায না।

প্রশ্ন বাল্মীকি নিযেও। মজাব কথা হল বাম বিষ্ণুব অবতাব বলে বর্ণহিন্দুদেব পূজা পেলেও, বাল্মীকি পুজো পান হবিজনদেব। মেথব শ্রেণীব মধ্যে আমি বাল্মীকি নামেব প্রচলন দেখেছি। ওঁবা 'বাল্মীকি দিবস' পালন কবেন। বাল্মীকি 'দস্যু' ছিলেন বলে কথিতই আছে, আব দাস ও দস্যু যে অনার্যদেবই আর্যদত্ত অভিধা, তা তো আমবা জানিই। তাহলে কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ দ্বৈপাযণ ব্যাসেব মত বাল্মীকিও কি কোনও 'নীচকুলোদ্ভব' ছিলেন? বামেব কৃষ্ণবর্ণ আব তাব বচযিতা 'দস্যু' অর্থাৎ অনার্য বাল্মীকিব হবিজনদেব মধ্যে জনপ্রিযতা ইত্যাদি থেকে কি এটাই স্পষ্ট হযে ওঠে না যে বামাযণ কাহিনী আদিতে ছিল অনার্যদেবই

লোককথা সম্ভূত মহাকাব্য? কিভাবে সেই বাম অবতাব হযে উঠলেন, পবে একদিন তা আলোচনা কবাব চেষ্টা কবব। আজ বাল্মীকিব সম্বন্ধেই দু এক কথা বলি।

প্রশ্ন জাগা সম্ভব যে হোমাবেব মহাকাব্য পড়ে যদি ট্রয আব মাইসিনীয সভ্যতাব সন্ধান পাওযা গিযে থাকে, তবে বাল্মীকিব মহাকাব্য থেকে অযোধ্যা ও লঙ্কাব হদিস আমবা পাচ্ছি না কেন? প্রথম কথা হল বামাযণ বামেব প্রায সমগ্র জীবনেব উপাখ্যান আব অন্য দিকে 'ইলিযাড' হল দশ বৎসবব্যাপী ট্রয অববোধেব মাঝখানে মাত্র পঞ্চাশ দিনেব বৃত্তান্ত। অনেকে মনে কবে হেলেন হবণ ও হেলেন উদ্ধাবই বুঝি 'ইলিযাড-এব' উপজীব্য। আসলে তা নয। হেলেন কাহিনী এক পৌবানিক গ্রীক উপকথা। হোমাব তাব মধ্য থেকে এক খণ্ড কাহিনীকে মহাকাব্যেব রূপ দিযেছিলেন। ট্রয অববোধকাবী গ্রীক সৈন্যদেব মধ্যে অন্তর্বিবোধ এবং তাব সমাধানই তাঁব কাব্যেব মূল বিষয, যদিও স্বাভাবিক কাবণেই হেলেন হবণেব পূর্বাপব সমস্ত ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে উথাপিত হযেছে বহুবাবই। বিশাল মহাকাব্যে আছে মাত্র পঞ্চাশ দিনেব কাহিনী। স্বভাবতই প্রতিদিনেব ঘটনাব খুঁটিনাটি বিবৰণ বযেছে অজস্র। বলা হযে থাকে হোমাবই 'বিশ্বেব প্রাচীনতম ওযাব কবেসপণ্ড্যান্ট' বা যুদ্ধেব বিপোর্টাব। শ্লীম্যান এই বর্ণনা পড়ে ট্রয যুদ্ধেব ও সৈন্য চলাচলেব একটি বীতিমত ম্যাপ এঁকে নিতে পেবেছিলেন। লঙ্কাকাণ্ড পড়ে সে বকম সম্ভব কিনা সন্দেহ।

হোমাবেব যুদ্ধ বর্ণনা বাস্তব যুদ্ধেব বিববণ, বাল্মীকিব যুদ্ধ একেবাবেই কাল্পনিক। প্রমাণ স্বরূপ হোমাব থেকে আমাব অক্ষম বাংলায কিছু কিছু সংক্ষেপিত বর্ণনা এবং বামাযণ থেকে এক আধটা উদাহবণ তোমাকে দিচ্ছি। প্রথমে শোন 'ইলিযাড-এব' ৫ম সর্গ থেকে কযেকটি চবণ ঃ

'প্যানডাবাস চিৎকাব কবে বললেন, "ডাযোমীডিস তাহলে বেঁচে আছে? ডাইডিযাসেব পুত্রকে শবাঘাতে পেড়ে ফেলা যাবে না। এবাবে বল্লম ছুঁড়ে দেখি।"

'বর্শা ঢাল বিদীর্ণ কবে ডাযোমীডিসেব বর্ম স্পর্শ কবল। লাইক্যানন পুত্র আনন্দে গর্জন কবে উঠলেন, "খতম।"

'কিন্তু ডাযোমীডিস অকুতোভযে বললেন, " তুমি ব্যর্থ। ববং তোমাবই মৃত্যু আসন্ন।"

'এ কথা বলে ডাযোমীডিস বর্শা ছুঁড়লেন। বর্শা প্যানডাবাসেব ঠিক চোখেব সামনে নাকে আঘাত কবে তাঁব শুভ্র দন্ত পাটিব মধ্যে দিযে চলে গেল। তীক্ষ্ম বর্শা ফলক তাঁব জিহ্বামূল খণ্ডিত কবে চিবুক দিযে বেবিযে এল। বথ থেকে উজ্জ্বল বর্মেব ঝনাৎকাব শব্দে প্যানডাবাস ভূপতিত হলেন।

'ঈনীস মৃতদেহ উদ্ধাবেব জন্য লম্ফ দিযে বথ থেকে গর্জন কবে নামলেন। ডাযোমীডিস একটি পাথবেব চাঁই তুলে নিলেন। এখনকাব দিনে দুজন লোকেও তা তুলতে পাববে না, কিন্তু ডাযোমীডিস অনাযাসে তা ছুঁড়ে মাবলেন। ঈনীসেব কোমবেব নিচে যেখানে জঙ্ঘা মিলিত হযেছে, সেখানে সেই প্রস্তবটি আঘাত কবায তাঁব অস্থিসন্ধি ভগ্ন হল। তাঁব উভয পেশীতন্তু ছিন্ন হযে গেল, বিদীর্ণ ও বক্তাক্ত হল তাঁব ত্বক। মহাবীব ঈনীস ভূতলে জানু পেতে তাঁব একটি বিশাল বাহুব ওপব দেহেব ভব বক্ষা কবলেন। কিন্তু তাঁব চক্ষে পৃথিবী বাত্রিব মত কৃষ্ণবর্ণ হযে গেল।'

তোমায আগেই বলেছি সাবা 'ইলিযাড' জুড়েই বযেছে যুদ্ধ। আব সেই যুদ্ধেব প্রতিটি সৈনিকেব মৃত্যুব বা আঘাত প্রাপ্তিব এমনি বস্তুনিষ্ঠ সব বর্ণনা বযেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই হোমাব নিখুঁতভাবে অ্যানাটমিব এমনি বর্ণনা কবেছেন। কোনও কিছু বাদ দেন নি।

এবারে তুলনা কর রামায়ণের যুদ্ধ বর্ণনার । অরণ্যকাণ্ডের ২৮তম থেকে ৩০তম সর্গের কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি ঃ

'....ক্রমশঃ খরের শরে দিকবিদিক সমুদয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রামও দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ অগ্নির ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ বাণে নভোমণ্ডল যেন মেঘাবৃত করিয়া ফেলিলেন। উভয়ের শরজাল সূর্যকে রোধ করিল।.....ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

'ক্রমশ খর অনল-প্রবেশী পতঙ্গের ন্যায় রামের সন্নিহিত হইল এবং ক্ষিপ্র হস্ততা প্রদর্শন পূর্বক মুষ্টি গ্রহণ স্থানে উঁহার শর ও শরাসন ছেদন করিল। ... রামের দেহ হইতে উজ্জ্বল বর্ম স্খলিত হইয়া পড়িল এবং তিনি শরবিদ্ধ ও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে তিনি অগস্ত্য প্রদত্ত গভীর নাদী বৈষ্ণব ধনু সজ্জিত করিয়া ঐ নিশাচরের প্রতি ধাবমান হইলেন....এবং ক্রোধভরে উহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন।...খর ক্রুদ্ধ হইয়া চার বাণে রামের বক্ষ বিদ্ধ করিল। মহাবীর রামও ক্ষতবিক্ষত ও শোনিতাক্ত হইয়া ছয়টি শর যোজনা করিয়া এক শরে মস্তক, দুই শরে বাহু ও তিন অর্ধচন্দ্র কার শরে উহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে ভাস্করের ন্যায় প্রখর ত্রয়োদশ শানিত নারাচ গ্রহণ করিয়া, একটি দ্বারা উহার রথের যুগ, চারটি দ্বারা বিচিত্র অশ্ব, একটি দ্বারা সারথির মস্তক, তিনটি দ্বারা রথের ত্রিবেণু, দুইটি দ্বারা অক্ষ এবং একটি দ্বারা ধনুর্বাণ ছেদন করিয়া আর একটি দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন খর.....গদাধারণ করিয়া লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইল।

.....খর হাসিতে হাসিতে কহিল " রাম। তুই চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছিস, আজ তোকে নষ্ট করিয়া তাহাদের স্ত্রীপুত্রদের নেত্রজল মুছাইয়া দিব।"

'এই বলিয়া খর ক্রোধভরে গদা নিক্ষেপ করিল। খরের প্রকাণ্ড গদা স্বতেজে বৃক্ষ গুল্ম সমুদয় ভস্মসাৎ করতঃ ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতে লাগিল। রাম ঐ কালপাশ সদৃশ গদাকে নভোমণ্ডলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।'

শেষ পর্যন্ত রাম অস্ত্র প্রহারে খরকে জর্জরিত করে ফেললে সে শোণিতাক্ত কলেবরে ছুটে এল। তা দেখে রাম 'সত্বরে দুই তিন পদ অপসৃত হইলেন এবং ইন্দ্র প্রদত্ত অগ্নিতুল্য এক শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর মহাবেগে খরের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল এবং সে 'শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া..... অশনিচ্ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পড়িল।'

এই আনুপূর্বিক বর্ণনায় যে রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তা ও ডিটেলের কাজ আছে তা অত্যন্ত চমৎকার, কিন্তু এই যুদ্ধ অলৌকিক। এতে লৌহমুখ শরগুলি আকাশকে মেঘের মত আচ্ছন্ন করে অন্ধকার করে রাখে, দুজন যোদ্ধার মাঝখানে নিক্ষিপ্ত গদা বেশ খানিকক্ষণ ধরে আকাশে উড়ে আসতে থাকে, এবং আকাশেই শরে গদা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। হোমারের যুদ্ধ বর্ণনার বাস্তবতা এতে তুমি পাবে না। ইলিয়াড এর যুদ্ধে যদিও দেবতারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু যুদ্ধ চলেছে লৌকিক যুদ্ধের মত।

আমি বাল্মীকিকে দোষ দিচ্ছিনা, ছোটও করতে চাইছি না। ভারতীয় শিল্পসাহিত্যের আদর্শ পাশ্চাত্য পদ্ধতি থেকে আলাদা। সে কারণেই বাল্মীকিতে হোমার আশা করা বাতুলতা। এবং তাই হোমারের ট্রয় ও মাইসীনিয়া খুঁজে পাওয়া গেলেও বাল্মীকির অযোধ্যা ও লঙ্কা খুঁজে পাওয়া অনেক বেশি মুশকিল হবে। বাল্মীকি ও হোমারের বর্ণনা রীতির যে প্রভেদের কথা বললাম, এ প্রভেদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প রীতির এক মৌলিক পার্থক্য। বিষয়টি আমার মতে রামায়ণের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা বিচারে অত্যন্ত জরুরি। শ্রীম্যান যা খুঁজে

পেযেছিলেন, আমাদেব প্রত্নতাত্ত্বিকদেব তা খুঁজে নেওযা শক্ত। কেন, সে কথাই বলছি।

জাপানী বা চীনা শিল্প আমবা যা দেখি, এক নজবে তাব দেশজ রূপ চোখে পড়ে। কিন্তু আমাদেব আধুনিক ভাবতীয শিল্প, দুঃখেব বিষয, কিছু শ্রদ্ধেয ব্যতিক্রম বাদে বড় বেশি পাশ্চাত্য প্রভাবিত। এই প্রভাবকে পাশ কাটিযে যদি তুমি গ্রীক ও ভাবতীয ভাস্কর্য, ইউবোপীয ও অজন্তা-কাংড়া-মোঘল চিত্রকলাব তুলনা কব, তাহলে দেখতে পাবে যে ইউবোপীয বীতিতে বাস্তবানুকতিব যে ঝোঁক দেখা যায, ভাবতীয তথা প্রাচ্য বীতিতে তা অনুপস্থিত। আমাদেব মূর্তিতে বা রূপাবোপে পার্সপেকটিভ কিংবা গড়নেব যথাযথতাব চাইতে যেটা বেশি বযেছে তা হল একটা আদর্শাযিত ভাবনাব আবোপ। চোখ, মুখ, চিবুক, বসাব ভঙ্গি-কোনওটাই ঠিক বাস্তব নয, কতকগুলি নির্দিষ্ট ধাবণা বা মুদ্রা তাতে ফুটে ওঠে। ইউবোপীয চিত্রকলায যেখানে কাছেব দৃশ্য বড় ও দূবেব দৃশ্য ছোট কবে দেখাবাব বাস্তব বীতি বযেছে, আমাদেব ভাস্কর্যে সেখানে মূর্তিব ছোটবড় তাদেব ভূমিকা অনুযাযী, বাজা সেখানে বড, কিন্তু পবিচাবক হবে ছোট। বিভিন্ন বসেব জন্য যে বিভিন্ন ভঙ্গি নির্দিষ্ট আছে, ভাবতীয শিল্পী সেটি অনুসবণ কবে থাকেন। আমাদেব তা বুঝে নিতে কষ্ট হয না।

ছৌনৃত্য বা যাত্রায প্রচণ্ড জগঝম্প ও মৃদঙ্গেব শব্দেব সঙ্গে আসবে চবিত্রদেব শূন্যে অস্ফালনে মধ্য দিযে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বোঝানো যায, ইউবোপীয 'বাস্তব' বীতিব সঙ্গে সেটা মেলেনা। তাই বামাযণেব যুদ্ধগুলি ইলিযাড-এব যুদ্ধেব মত 'বাস্তব' নয যদিও যুদ্ধেব আস্বাদ গ্রহণে সাহিত্যবসেব দিক থেকে সেটা কোনও বাধা নয।

বামাযণ থেকে তোমাকে আব একটা উদাহবণ আজ দেব। অযোধ্যা কাণ্ডেব দ্বাত্রিংশ সর্গ। বাম বনবাসে যাওযাব আগে দান কবছেন। এক বৃদ্ধ হতদবিদ্র ব্রাহ্মণ এলেন ত্রিজট নামে। 'এক ছিন্ন শাটী দ্বাবা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন পূর্বক ভার্যাব সহিত বাজভবনে প্রবেশ পূর্বক' তিনি বামেব কাছে ধন যাঞ্চা কবলেন। বাম পবিহাস কবে বললেন, দেখ, আমাব অসংখ্য ধেনু আছে, কিন্তু তন্মধ্যে এক সহস্রও বিতবণ কবা হয নাই। এক্ষণে তুমি যতদূব এই দণ্ড নিক্ষেপ কবিতে পাবিবে, ততদূব যে পবিমাণ ধেনু থাকিবে সমুদযই তোমাব। তখন 'ব্রাহ্মণ সত্বব কটিতটে শাটী বেষ্টনপূর্বক দণ্ডকাষ্ঠ ঘূর্ণিত কবিযা প্রাণপণে নিক্ষেপ কবিলেন। দণ্ড নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবেগে সবযূব পবপাববর্তী বৃষবহুল গোষ্ঠে গিযা পতিত হইল'।

ত্রিজট তো প্রচুব গরু পেলেন, কিন্তু আমাব প্রশ্ন হল, তাঁব এই দণ্ডটি কতদূব গিযেছিল। স্মবণে বর্ণনা পেয়েছি সম্পূর্ণ ভাবে কোশল বাজ্যেব বাজধানী অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তৃত। এক যোজন দশ মাইলেব বেশি। তাহলে অযোধ্যাব দৈর্ঘ্য ১২০ মাইল, প্রস্থ ৩০ মাইল আযতনটা ভেবে দেখ এখনকাব দিনেও অতবড় শহব তুমি কল্পনাও কবতে পাবনা, একশখানা কলকাতা ওব মধ্যে সেঁধিযে যাবে' আব ঐ বাজধানীব মধ্যে বাজপুবীটি কোথায? চতুর্দিকে পথ, বিপনী, হর্ম্য এবং পবিখা বেষ্টিত দুবধিগম্য দুর্গেব মধ্যস্থলে বাজপুবীব অবস্থানেব যে বর্ণনা বামাযণে বযেছে, তাতে বাজপুবী থেকে সবযুব দূবত্ব কম হওযাব কথা নয। বিশ্বামিত্র যখন বালক বাম লক্ষ্মণকে নিযে যাত্রা কবেছিলেন, সে সমযকাব বর্ণনায লেখা আছে যে বাজপুবী থেকে সবযুব কাছে আসতে তাঁদেব অর্ধযোজন অর্থাৎ মাইল পাঁচেক হাঁটতে হযেছিল। তাহলে ত্রিজটেব নিক্ষিপ্ত দণ্ড 'সবযুব পবপাববর্তী বৃষবহুল গোষ্ঠে' গিযে কিভাবে যে 'পতিত হল', তা কোনও

সমাধান পাওয়া যায না। আগেও বলেছি, আবাবও বলছি–বামাযণেব বর্ণনাকে আক্ষবিক ভাবে সত্য বলে মেনে নিলে অনেক প্রশ্নেবই সমাধান মিলবে না। অতএব, সে চেষ্টা বৃথা। কাবণ, বাল্মীকি হোমাব নন। সমুদ্র থেকে কতদূবে কোথায় ট্রয নগবীব অবস্থান, হোমাব পড়ে শ্লীম্যান তা পবিষ্কাব জানতে পেবেছিলেন। বাল্মীকিব কাছে এমনটি আশা কবা যায না। তাঁব সৃষ্ট জগতে বস্তুনিচয় নিউটনেব নিয়ম মেনে চলেনা। এখানে লোহাব শব আকাশে ভেসে থাকে, গদা আকাশ পথে পাখিব মত উড়তে উড়তে আসে, ব্রাহ্মণেব নিক্ষিপ্ত দণ্ড মাইলেব পব মাইল ছুটে চলে। এমনকি বাল্মীকিব অযোধ্যাকে এখনকাব অযোধ্যা শহব তো দূবেব কথা, কলকাতা বা বোম্বাইএব পঞ্চাশ গুন জাযগাযও ধবানো যাবে না। হোমাবেব বর্ণনা বাস্তবেব অনুগত, বাল্মীকিব বচনা এমন কোনও আনুগত্য স্বীকাব কবে না। বাল্মীকি পড়ে তুমি যদি বামেব জন্মস্থানেব ভৌগোলিক অবস্থানটি সঠিক ভাবে জানতে চাও, তুমি হতাশ হবে। তবে ঐতিহাসিকবা নানা বৃত্তান্ত ঘেঁটে যে হদিশ পেতে পাবেন, সেটা ভিন্ন কথা। এখন যাবা চিৎকাব কবে বামেব জন্মস্থান চিহ্নিত কবে ফেলছে, তাদেব জিজ্ঞাসা কবি, আগে মানচিত্রে বাল্মীকিব ১২০ বাই ৩০ মাইল আযতনেব অযোধ্যাটি দেখাও তো বাপু'

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

আজ চাবপাশেব সমস্ত কর্ম চঞ্চলতা স্তব্ধ। সবকাবেব খোলা অর্থনীতিব বিরুদ্ধে সাবা দেশ জুড়ে যে শিল্প ধর্মঘটেব ডাক দেওযা হযেছিল, পশ্চিমবঙ্গে তা সর্বাত্মক বন্ধেব রূপ নিযেছে। দোকান পাট, বাজাব হাট, গাড়ি ঘোড়া, স্কুল কলেজ–সব বন্ধ। স্বতস্ফূর্তভাবেই ব্যাপাবটা ঘটে গেছে। আগামীকাল সবাই ঠাট্টা রুবে বলবে, 'ওঃ, পশ্চিমবঙ্গে? এখানে বনধ মানেই ছুটি।' অথচ এবাই গতকাল অব্দি তাবস্ববে বলছিল, 'পশ্চিমবঙ্গে এবাবে ধর্মঘট হতে দেবনা'। আসলে এসব কথা যে নেতাবা বলছিলেন, তাঁদেব অনুগামী মানুষদেবও এই ধর্মঘট বিবোধিতায সায নেই। একে তুমি একটা নিষ্ক্রিয প্রতিবোধ বলতে পাব, কিন্তু প্রতিবোধ অবশ্যই। তাছাড়া সক্রিয প্রতিবোধও হচ্ছে ভাবত জুড়ে। ধর্মঘটেব সমর্থকদেব জোব লড়াই কবতে হচ্ছে সেইসব জাযগায যেখানে কেন্দ্রেব শাসক দল এবং ধর্মান্ধ প্রতিক্রিযাপন্থীবা একযোগে ধর্মঘটেব বিবোধিতা কবছে। কম বেশি ধর্মঘট হবে সর্বত্র। ধর্মঘট সর্বাত্মক হবে বিহাবেও। বিহাবেব নামে অনেকে নাক সিঁটকোয। বলে থাকে যে ওবা সব বিহাবী, খইনি খাওযা, ছাতুখোব 'বুদ্ধু'। ওবা গাযেব জোব বোঝে, মাথাব ভেতবটা ওদেব ফাঁকা। তোমাদেব বিচাবে ওবা কুলীন নয। কিন্তু মনে বেখ দেশেব দবিদ্রতম মানুষদেব বাস ঐ বাজ্যটিতে। দেশেব বিবাট সংখ্যক মজুবও বাস কবেন ঐ বাজ্যে, এবং সাবা দেশে ছড়িযে আছেন ঐ বাজ্যেব অসংখ্য শ্রমজীবী। কিছুদিন আগে কমিউনিস্ট পার্টিব সম্মেলন যখন কলকাতায হযেছিল, তখন দেখেছিলাম বিহাবেব লাখ লাখ মানুষ এখানে এসেছিলেন। তাঁদেব শৃঙ্খলাপবাযণতা ও সংস্কৃতিব উচ্চমান দেখে স্তম্ভিত হযে গিযেছিলাম। যীশুখ্রীষ্ট গোযাল ঘবে জন্মেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বালক বযসে ছিলেন গোপবালক। শাসক শ্রেণীকে লক্ষ্য কবে সেই কথাটাবই পুনবাবৃত্তি কবতে পাবি আমবা ঃ 'তোমাবে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' গোকুল মানে যমুনা তীবে সেই গ্রাম যেখানে কৃষ্ণ বড় হযেছিলেন। গোকুল মানে আবাব গোষ্ঠ

এবং গরুব পালও হয়। এখন তোমবা যাদেব 'গরুব পাল' মনে কব, তাদেব মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে আগামী দিনেব নেতৃত্ব। তাবা শুধু বিহাবে নয়,ভাবতেব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আজকেব এই শিল্প ধর্মঘটেব মধ্য দিয়ে ওবা তাবই জানান দিচ্ছে। এখন যাবা হাসছে, নিজেদেব ক্ষমতা, ঐশ্বর্য আব বহ্বাবম্ভ নিয়ে উল্লাস কবছে, বলছে, 'কিছু নয় কিছু নয়, মেঘেব গর্জন,/নাচো গাও পান কব আনন্দিত মন,' তাবা মূর্খ, কামানেব গোলাব আওযাজ বুঝতে পাবছেনা। বুঝতে হয়তো একটু সময় নেবে।

বিহাবেব 'বুদ্ধু'দেব কথা ওঠায় ইতিহাসেব অনেক কথাই মনে এল। যে বিহাব তোমাদেব কাছে অন্ত্যজ, ভাবতীয ইতিহাসেব এক মহানাট্যেব যবনিকা একদিন সেখানেই উত্তোলিত হয়েছিল। সুদীর্ঘকাল জুড়ে পাটলিপুত্র, মগধ, বৈশালী, গযা, বাজগীব, নালন্দা প্রভৃতি ছিল ইতিহাসেব কেন্দ্রবিন্দু। বুদ্ধেব ধর্মপ্রচাবেব প্রধান কেন্দ্রস্থলও ছিল এই অঞ্চল। ভেবে দেখলে বুঝবে প্রাচীন ভাবতীয সভ্যতাব জাজ্বল্যমান নিদর্শন এই অঞ্চলেব মত ভাবতবর্ষেব আব কোথাও নেই। কিভাবে এবা যবনিকাব অন্তবালে চলে গেল? কেন এদেব প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা? তাব কোনও ঐতিহাসিক কাবণ আছে কি? আমাব মনে হয আছে। কিছু কিছু তোমায বলি।

বুদ্ধদেব দীর্ঘ আশি বছব বেঁচেছিলেন। এই অঞ্চলে তিনি ঘুবে বেড়িয়েছেন অজস্র। অসংখ্য মানুষ তাঁব অনুগামী ছিল। বিবেকানন্দ এক জাযগায বলেছেন, বুদ্ধদেব যে বেদ, পুবোহিততন্ত্র আব যাগযজ্ঞেব বিরুদ্ধে প্রচাব কবেও অতো দীর্ঘজীবন লাভ কবেছিলেন তাতেই প্রমাণ হয যে হিন্দুবা কত সহিষ্ণু। তাঁব এই কথাটা ঠিক মানতে পাবি না। বুদ্ধ যাদেব বিরুদ্ধে প্রচাব কবেছিলেন, তাবা সমাজেব সমস্ত সমর্থন হাবিয়েছিল। বেদ ও পুবোহিততন্ত্রেব প্রতি বীতস্পৃহ সহস্র সহস্র মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দুকুল প্লাবী নদীব মত বুদ্ধ যেভাবে এগিয়ে ছিলেন, তাতে কারু সাধ্য ছিল না যে তাঁকে স্পর্শ কবে। যীশু বা মহম্মদকে যে প্রতিকূলতাব সম্মুখীন হতে হয়েছিল, বুদ্ধদেবকে তা হতে হযনি।

বিপুল জনসাধাবণ তাঁব অনুগামী হঁযেছিল। এবং সেটা অকাবণে ঘটেনি।

প্রথমত পশুপালক যোদ্ধৃজাতি আর্যদেব কাছে যজ্ঞেব যে মূল্য ছিল ভাবতবর্ষেব কৃষিজীবী মানুষেব কাছে তা ছিল না। আগুন নয, জলই ভাবতীয কৃষিজীবী মানুষেব জীবনেব কেন্দ্রবিন্দু। তাব কৃষিকর্মেব আব এক নিযামক হল সূর্য। জলে তর্পণ ও সূর্য প্রণাম তাই আদি ভাবতীয প্রথা, অগ্নিযজ্ঞ নয। দ্বিতীযত পশু শিকাব, পশুবলি, গো হত্যা ইত্যাদিব প্রতি স্বভাবতই কৃষক জনসাধাবণেব বিরূপতা ছিল, অথচ বৈদিক প্রথায এই সব পশু হত্যা চলত লাগামছাড়া ভাবে। আজকেব নিষ্ঠাবান হিন্দুব শুনতে যতই খাবাপ লাগুক ঋগ্বেদেবই ১০ম মণ্ডলেব ৮৯নং সূক্তে দেখতে পাচ্ছি ইন্দ্রেব উদ্দেশ্যে এই ১৪ নম্বব ঋকটি ঃ 'হে ইন্দ্র। যেরূপ গো হত্যা স্থানে গাভীগণ হত হয, সেরূপ তোমাব ঐ অস্ত্রে বাক্ষসগণ নিপতিত হয়ে শযন কবে।' গাভী হত্যাব জন্য যাবা নির্দিষ্ট স্থান বেখেছিল, তাবা যে সেখানে নিযমিত গরু বলি দিত, তাতে কি কিছু সন্দেহ আছে? ঐ একই মণ্ডলেব ৮৬ নং সূক্তে আবাব দেখছি এই বকম ঃ ' হে বৃষাকপি বনিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্র যুক্তা এবং আমাব পুত্রবধূ। তোমাব বৃষদেব ইন্দ্র ভক্ষণ করুন। আমাব জন্য পনেব বিশটি বৃষ তুমি পাক কবে দাও। আমি খেযে শবীবেব স্থূলতা সম্পাদন কবি, আমাব উদবেব দুপার্শ্ব পূর্ণ হোক।' এই সূক্তটি কিঞ্চিৎ হাস্যবসাত্মক, কিন্তু তাতে বৃষমাংসেব জন্য লোলুপতাব ব্যাপাবটি বুঝতে অসুবিধে হয না। আব একটি হাল্কা চালেব

ঋক এই রকম ঃ ' যারা চার দিক হতে অশ্বের পাক দর্শন করে, যারা বলে তার গন্ধ মনোরম হয়েছে এখন নামাও, এবং যারা মাংস ভক্ষণের জন্য অপেক্ষা করে, তাদের সঙ্কল্প আমাদের সঙ্কল্প হোক।' প্রথম মণ্ডলের ১৬২ নং সূক্তের ১২নং ঋক্ এটি। ইন্দ্রের জন্য এক শত মহিষ পাকের উল্লেখ রয়েছে ষষ্ঠমণ্ডলের ১৭নং সূক্তে। মোট কথা বৈদিক যুগে গরু, মহিষ ও ঘোড়া পাইকারি ভাবে মেরে খাওয়ার রীতি ছিল। স্বভাবতই এ জিনিস কৃষির প্রতিকূল। তৃতীয়ত বৈদিক যুগের শেষ দিকে যে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তন করা হল, তার ফলে এক দিকে পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য, ভ্রষ্টাচার ও লাম্পট্য বাড়ছিল, অন্য দিকে সব রকমের অধিকার বর্জিত শূদ্রদের মধ্যে বাড়ছিল বঞ্চনার বেদনা ও ক্ষোভ। বৈশ্যদের মনেও যে লাঞ্ছনা ও অপমানের বেদনা ছিল, তার উদাহরণ ইতিপূর্বে আমি দিয়েছি। ফলে যজ্ঞ বিরোধী, গো হত্যা বিরোধী, পুরোহিততন্ত্র বিরোধী একটি সামাজিক শক্তি বুদ্ধের সমর্থনে আগুয়ান হয়েছিল। বুদ্ধদেবের অসংখ্য অনুগামীদের মধ্যে যেমন অতি সাধারণ মানুষ ছিলেন, তেমনি ছিলেন শ্রেষ্ঠীরাও। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, যার ফল ষড়দর্শনের এবং বেদ ও বেদান্তের মধ্যে বিবাদ। এই সব অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাও ইতিপূর্বে কিছু বলেছি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব তো ছিলই। তাই কৌলীন্য গর্বী ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিত্যক্ত কিছু রাজশক্তিকেও তিনি সাথে পেয়েছিলেন, যাদের মধ্যে বিশেষ প্রতাপশালী ছিলেন মৌর্যরা। মোট কথা, বুদ্ধদেব সমাজের এক বিপুল অংশকে সাথী করে পুরনো বৈদিক চিন্তাধারার ফাটল ধরা দুর্গটিকে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন। 'হিন্দু সহিষ্ণুতা নয়, অনুকূল ঐতিহাসিক পরিবেশই ছিল তার কারণ।

বুদ্ধের ধর্ম আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ছিল বর্তমানের এই বিহার অঞ্চল। এই অঞ্চলে এত বৌদ্ধবিহার গড়ে উঠেছিল যে মনে হয় সে কারণেই এই এলাকার নামই হয়ে গেল বিহার। পরবর্তীকালে এই বৌদ্ধধর্ম প্রসারের প্রতিক্রিয়ায় যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার পাকা হয়ে বসল, তখন সে তার পুরনো ভুল থেকে শিক্ষা নিল, বৌদ্ধ ধর্মের বহু মূল কথাকে আত্মস্থ করল, বুদ্ধকে অবতার বানাল, বিনিময়ে যে জিনিসটিকে উদ্ধার করল, তা হল বর্ণাশ্রম ধর্ম। এই চমকপ্রদ বিজয়-ইতিহাসটি পরে একসময় বলব।

বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপতন যে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরভ্যুত্থানে সহায়ক হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই অধঃপতন বলতে যদি শুধু আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের বিলাস বা অসংযত জীবনযাপনকে বোঝাই তা হলে সেটা হবে অতিসরলীকরণ। আসলে বৌদ্ধধর্ম ক্রমে বুদ্ধের শিক্ষা থেকেই সরে এসেছিল। বৌদ্ধ 'মহাযান' গোষ্ঠী অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধকে ঈশ্বরে পরিণত করেছিল। আর্য অনার্য নানা দেব দেবীরা ক্রমে এসে তাদের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে প্রবেশ করতে লাগল, শুধু তাদের নাম হল কিঞ্চিৎ ভিন্ন, এবং এই সমস্ত দেবতাদের কেন্দ্রস্থলে রইলেন বুদ্ধ। বোধিসত্ত্বের জন্ম জন্মান্তরে নানা রূপ গ্রহণ এবং শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ জন্মলাভ - মহাযানীদের এই ধারণাই অবতারবাদের ধারণাটিকে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করল। অর্থাৎ হিন্দু অবতারবাদও আসলে বৌদ্ধদেরই অবদান। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্মের অস্ত্রেই বৌদ্ধধর্মকে পরাজিত করল। বুদ্ধের অবতার স্ট্যাটাসটি রইল, শুধু তিনি এবারে হলেন বিষ্ণুর অবতার। কিন্তু বুদ্ধ তো ঐতিহাসিক পুরুষ, তিনি বৌদ্ধদের উপাস্য। বিষ্ণুর অন্য আরও অবতার চাই। তাঁদের কোথায় পাওয়া যাবে? সমস্যা হল, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের গর্ব করার মত তেমন মানুষ কোথায়? তখনই চলল পুরাণ অন্বেষণ, অতীত কীর্তির অনুসন্ধান। আর্য ইন্দ্র-বরুণাদি সাধারণের গ্রহণযোগ্য নয়। তাই অনার্য লোক বিশ্বাসে যে সব বীরদের নাম ছিল, যাদের

নিযে মহাকাব্য পুবাণ ও গাথা বচিত হযেছিল, সেইসব নাম নিযেই সুচতুব নব্য বলীযান ব্রাহ্মণেবা হাজিব হলেন সাধাবণ মানুষেব দববাবে। বিস্মৃত নামগুলিকে তাঁবা জনপ্রিয কবে তুলতে লাগলেন। হস্তিনাপুব, দ্বাবকা, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, মথুবা, বৃন্দাবন ঘিবে গড়ে উঠতে থাকল এক নূতন 'কাল্পনিক ইতিহাস', ইতিহাস ও কল্প কাহিনীব সমন্বযে গড়া এক নূতন পবিমণ্ডল। ঠিক কখন যে এই ব্যাপাবটি ঘটেছিল, তা আজ বলা মুশকিল, তবে বৌদ্ধযুগেব পবে ব্রাহ্মণ্যধর্মেব পৃষ্ঠপোষক গুপ্ত বাজাদেব সমযকেই এব ঘটনাকাল বলে নির্দেশ কবা যুক্তিযুক্ত।

এই বৌদ্ধ-বিজযেব ঘটনা যে একেবাবে নিবামিষ ছিল, তা বলা যায না। বিদেশী পবিব্রাজকবা আমাদেব দেশেব যে সব বৌদ্ধ বিহাব বা স্তূপেব কথা বর্ণনা কবে গেছেন, সেগুলি আজ অবলুপ্ত। কিভাবে কতদিনে তা হল, তাও সব এখন জানা যায না। তবে ব্রাহ্মণ্যবাদ যে বৌদ্ধধর্মকে প্রবলভাবে আক্রমণ কবেছিল, তা নিঃসন্দেহ। এ আক্রমণ কি কেবল মৌখিক, দৈহিক নয? বামাযণেব বামেব একটি উক্তি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত কবেছিলাম, আব একবাব তোমাকে তা মনে কবিযে দিচ্ছি। জাবালিকে বাম বলেছিলেন যে নাস্তিক এবং বৌদ্ধ 'তস্কবেব মত দণ্ডার্হ'। ভেবে দেখ, বাম একজন আদর্শ বাজা,-তাঁব জবানিতে শুনছি, বৌদ্ধকে তস্কবেব মত সাজা পেতে হবে অর্থাৎ ধর্মাচবনেব স্বাধীনতা 'বামবাজ্যে' স্বীকৃত নয। তস্কবেব মত সাজা বলতে কী বোঝায? এই সাজা নিশ্চযই দৈহিক। অপমান, লাঞ্ছনা, কাবাবাস, প্রাচীন ভাবতে অনেক সময হাত পা কেটে দেওযা ইত্যাদি ছিল তস্কবেব শাস্তি। বৌদ্ধদেব যে এভাবে শাযেস্তা কবা হত, বামেব কথাযই তা স্পষ্ট। তাছাড়া লেখায কথায গঞ্জনা ও উপেক্ষা তো ছিলই। এইভাবেই ক্রমে বাস্তব ইতিহাস ম্লান হযে গেল, উজ্জ্বল হযে উঠল কল্পকাহিনী। পাটলিপুত্র, মগধ আব বৈশালীব মাহাত্ম্যকে খর্ব কবে ভাস্বব কবে তোলা হল অযোধ্যা, মথুবা আব দ্বাবকাব নানা কল্পিত কীর্তিগাথা।

আমাব ইউ.পি ব বন্ধু মিশ্রকে তো তুমি সজ্জন বলেই জান। সে আমায বলেছিল, 'আবে বিহাব? বিহাব কা বাত ছোড়। বিহাবকা লোগ সব বুদ্ধু হ্যায'। তাবপব আমাকে ব্যাখ্যা কবে এও বলেছিল যে ওদেব দেশে নাকি কথা আছে যে বিহাবে বুদ্ধ ঘুবে বেড়িযেছিলেন বলেই ওবা সব 'বুদ্ধু'। কথাটা হযতো একেবাবে অমূলক নয। পূর্ববঙ্গে আশ্রযপ্রাপ্ত বিতাড়িত নেড়া বৌদ্ধবা পবে দলে দলে মুসলমান হযে গিযেছিল বলে তাবা যেমন 'নেড়ে', তেমনি বিহাবেব অসংখ্য বৌদ্ধকেই ঘৃণা ভবে 'বুদ্ধু' বলাব চল হযে গিযেছিল। বামাযণে যাদেব 'তস্কব বৌদ্ধ' বলা হল, বটনাকাবীবা তাদেব বোকা 'বুদ্ধু' বলে প্রচাব কবে দিল। সেইসব অপবাদ আজও ঘোচেনি। কিন্তু অন্যদিকে, ইতিহাসেব মিছিলও স্তব্ধ হযে যাযনি। আজও বিহাবে সে মিছিল চলছে।

॥ ছত্রিশ ॥

বামাযণ প্রসঙ্গটিকে দাঁড় কবিযে বেখে গত চিঠিতে একটু অন্য কথায ঢুকেছিলাম, যদিও সেটা একেবাবে অপ্রাসঙ্গিক নয। কাবণ, বুদ্ধ কাহিনীকে বাদ দিযে ভাবতীয সংস্কৃতি-তাব বেদ, উপনিষদ, পুবাণ, মহাভাবত, বামাযণ,-কিছুই বোঝা যাবে না। কথাটাকে আবও বিশদভাবে পবে ব্যাখ্যা কবব। আপাতত একটি উপমা দিযে তা বোঝাই।

ভাবতবর্ষেব উত্তবে হিমালয পর্বতমালা দক্ষিণেব সুবিশাল এই উপমহাদেশেব দিকে তাকিযে একক মহিমায দাঁড়িযে আছে। কিন্তু হিমালয কি বিচ্ছিন্ন কোনও ভৌগোলিক সত্তা? তা তো নয। ভাবতীয সমভূমিব নদী ত্রযেব স্রষ্টা ও ভাবতবর্ষেব মৌসুমি বাযু প্রবাহেব নিযন্ত্রক হিমালযই ভাবতেব বিশিষ্ট রূপটিকে সৃষ্টি কবেছে। উত্তবে নগেন্দ্র হিমালয যদি না থাকত, তবে ভাবতবর্ষেব এই বিচিত্র বর্ণ মনোহাবী মূর্তিটি কোথায পেতাম? হিমালয তাই অনন্য ও বিশিষ্ট হযেও ভাবতবর্ষেব সমগ্র ভূপ্রকৃতিব অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদেব দেশেব ইতিহাসে বুদ্ধ যুগও ঠিক তেমনি। ভাবতবর্ষেব ইতিহাসেব এক প্রান্তে বুদ্ধ হিমালযেব মত মাথা উঁচু কবে দাঁড়িযে আছেন। তাঁকে অস্বীকাব কবা যায না, তাই তাঁকে একটি দাযসাবা প্রণাম ঠুকে আমবা ভাবি, আমাদেব ভাবতীয সংস্কৃতি এক বিশিষ্ট 'হিন্দু সংস্কৃতি,' বেচাবা বুদ্ধ অনেক মহীযান, কিন্তু এই সংস্কৃতিব থেকে অনেক দূবে। আমাদেব এই ধাবণা একেবাবেই সত্য নয। তাব একটি উদাহবণ হিসেবে গত চিঠিতে অবতাব তত্ত্বেব ব্যাপাবটি পেড়েছিলাম। মহাযানী বৌদ্ধবা বুদ্ধকে অবতাব কবে তোলাব প্রতিক্রিযাতেই ভাবতবর্ষেব ব্রাহ্মণ্যবাদীবা বিষ্ণুব অবতাব তত্ত্বটিকে খাড়া কবেছিল। বুদ্ধেব মত এক ঐতিহাসিক সত্যকে টেক্কা দিতে গিযে, একেবাবে মনগড়া গল্পে যে চিঁড়ে ভেজেনি, ভিজতে পাবেনা, তা আমবা অনুমান কবে নিতে পাবি। অর্থাৎ অবতাব হতে গেলে স্বীকৃত বীব হওযা চাই। বাম বা কৃষ্ণ নিশ্চযই সে বকম স্বীকৃত লৌকিক বীব ছিলেন, না হলে সাবা ভাবতবর্ষ তাঁদেব মানবে কেন? এবং নিশ্চযই এঁবা বুদ্ধ পূর্ববর্তী, কাবণ দশ অবতাবেব মধ্যে এঁদেব স্থান বুদ্ধেব আগে। লক্ষ্য কব, আদিম অনার্যদেব খুশি কবাব জন্য তাদেব উপাস্য মাছ, শুযোব, কচ্ছপ, সিংহ, প্রভৃতি জীব জন্তুকেও অবতাব বানিযে দেওযা হযেছিল।

এই যে টিপিক্যাল ব্রাহ্মণ্য কৌশল–'মেনে নাও, কিন্তু এমন ভাবে মানো যাতে তোমাব নিজেব মতটাই ওপবে থাকে'— সে কৌশল আজও অব্যাহত আছে। গতকাল বাতেই দূবদর্শনে তাব একটি নমুনা দেখলাম। ডাঃ ভীমবাও আম্বেদকবকে আমবা সবাই জানি হিন্দু পুবাণ–মাহাত্ম্যবাদেব কঠোব সমালোচক বলে। হিন্দু ধর্মেব প্রতি বীতশ্রদ্ধ হযে তিনি পবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ কবেছিলেন। সেই আম্বেদকবেব জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁব প্রতি 'সশ্রদ্ধ' একটি কাহিনী চিত্র দেখান হচ্ছিল বেশি বাতেব দিকে। ছবি শুরু তাঁব তথাকথিত জন্ম বৃত্তান্ত থেকে। দেখান হল, ভীমবাও জন্মাবাব আগে তাঁব বাবা গিযেছিলেন পবিবাবেব এক গৃহত্যাগীব খোঁজে। সেই সাধুব সন্ধান পাওযা গেল। কিন্তু তিনি গ্রামে আসতে বাজি হলেন না। তিনি কিছু ধর্মকথা বললেন এবং ভীমবাওযেব বাবাকে আশীর্বাদ কবলেন যে তাঁব চতুর্দশ পুত্র জন্মাবে এবং সেই হবে এক অসাধাবণ খ্যাতিমান পুরুষ। বাবা জিজ্ঞাসা কবলেন, 'এই বযসে সন্তান? তা কিভাবে সম্ভব?' সাধু বললেন, 'ভগবানেব ইচ্ছায সবই সম্ভব।' গ্রামে ফিবে এলেন ভীমবাওযেব বাবা, এবং যথাকালে 'ভগবানেব ইচ্ছায' ভীমবাওযেব জন্ম হল। হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য ভীমবাওযেব নিগ্রহ, সামাজিক অন্যাযেব বিরুদ্ধে তাঁব সংগ্রাম, তাঁব ব্যক্তিত্ব–সবই এই ছবিতে পবে দেখান হল। কিন্তু গোড়াতেই যে জন্ম কাহিনী বলা হল, তাতেই হিন্দু সংস্কাব বিবোধী ভীমবাও হিন্দু সংস্কাবেব অঙ্গ হযে গেলেন। ভীমবাও হিন্দু আচাব আচবণেব বিবোধী, তথাপি তিনি হিন্দুদেব নমস্য, কেননা তাঁব এই বিবোধ তো হিন্দুদেব ভগবানেবই ইচ্ছায। ভগবানেব লীলা কে বুঝতে পাবে? অতএব, ভীমবাওযেব সাবা জীবনব্যাপী সংগ্রাম সত্ত্বেও হিন্দু ঐতিহ্যে তাঁব স্থান অটুট বইল। আজকেব ইলেকট্রনিক মাধ্যমেব যুগেই যদি 'মিথ'

তৈবিব কাজ সমান সক্রিয থাকে, তবে সেই প্রাচীন যুগে তা কতটা কার্যকবী ছিল বুঝতেই পাবছ।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। হিমালযেব উপমাটিকে যদি আব একটু বাড়িযে নিযে যাই, তা হলে বলতে পাবি 'ভাবতবর্ষেব ভূখণ্ডেব ওপব দিযে প্রবাহিত' বহু কাহিনীব বাযুস্রোত নানা লোক বিশ্বাসেব বাষ্পে ঘনীভূত হযে বৌদ্ধযুগেব অভিঘাতে কযেক শতাব্দী ধবে যে বর্ষণ ঘটিযে ছিল, আমবা যাকে 'হিন্দু সংস্কৃতি' বলি তা সেই বর্ষণেবই ফসল। উপমাটিকে অন্য দিক দিযে ঘুবিযে আবাব বলতে পাবি, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র যেমন হিমালযেব অপব দিকে উৎপন্ন হযে ভাবতবর্ষে এসেছে, বাম কথা ও কৃষ্ণ কাহিনীবও উৎস তেমনি বুদ্ধ যুগেব অপব পাবে। কিন্তু ওপাবে যা ছিল নিতান্তই স্থানীয পাহাড়ি নদী, এ পাবে এসে তা ক্রমে হযেছে সুদূব বিস্তাবী, ঐশ্বর্যেব জনযিতা ও মহীযান।

উপমা কোনও যুক্তি নয। যুক্তিব কথায পবে আসব। আপাতত যে কথাটাকে আমি স্পষ্ট কবে তুলতে চাইছি,তা হল এই যে বৌদ্ধযুগ আমাদেব দেশেব ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ কাল বিভাজিকা। ভাবতবর্ষেব বর্তমান ইতিহাসেব সূত্রপাত সেই থেকেই।

অতএব বাম, বামাযণ, বাল্মীকি ইত্যাদিব তাৎপর্য ও কাল নির্ণযেব প্রসঙ্গে বুদ্ধেব কথা আসবেই। আমবা মোটামুটি এই বকম একটা ছক তৈবি কবে নিতে পাবি ঃ

(১) কৃষ্ণ যদি আর্যদেব ভাবত আগমনেব সমযেব লোক হন এবং তাঁব সাথে যদি ইন্দ্রেব বিবোধ হযে থাকে, তবে বাম নিঃসন্দেহে তাঁব আগেকাব কালেব, এবং অবশ্যই অনার্য। কাবণ আমি কোথাও বামেব সাথে ইন্দ্রাদি দেবগণেব সম্পর্ক পাচ্ছি না, বামাযণে ইন্দ্রেব উল্লেখ যদিও আছে অনেক। অথচ বামেব অবি নিশ্চিতরূপেই বাবণ, যিনি শিবেব ভক্ত। এবং শিব যে অনার্য দেবতা, বৈদিক দেবতা নন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দশ অবতাবেব হিসেবেও বামকে কৃষ্ণেব আগে স্থাপন কবতে হয।

(২) বাল্মীকি যে বুদ্ধ পববর্তী তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বামকে দিযে বৌদ্ধ নিন্দা কবাচ্ছেন–তাই শুধু নয, বামাযণেব সমগ্র পবিমণ্ডলটিই বৌদ্ধ যুগেব আগে কল্পিত হওযা সম্ভব ছিল না। বেদে উপনিষদে ইন্দ্র বরুণাদিব প্রাধান্য, বিষ্ণু বা শিবেব সাক্ষাৎ পাওযা যায না। অথর্ব বেদে ভূতপ্রেতেব সাক্ষাৎ পাই, মগধেব উল্লেখ বযেছে এই বেদে। উপনিষদে যজ্ঞকে যে 'অপবা বিদ্যা' বা নিকৃষ্ট বিদ্যা বলা হচ্ছে তা তো তোমায আগেই বলেছি। অন্য দিকে শিবেব অনুগামীবাও যে যজ্ঞ বিবোধী ছিলেন, তাব স্মৃতি শিবেব লণ্ডভণ্ড কবে দেওযা দক্ষযজ্ঞেব কাহিনীব মধ্যে বযে গেছে। বদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মকেও আমবা যজ্ঞ বিবোধী বলে জানি। অতএব আমবা দেখতে পাচ্ছি যে বৈদিক যুগেব অবসান, অনার্য ভাবনাব উত্থান ও মগধেব অভ্যুত্থান ইতিহাসে এমন একটি গ্রন্থিতে এসে মিলেছে, যেখান থেকে বৌদ্ধ যুগেব আবম্ভ কাল। বৌদ্ধ যুগ বেশ কযেক শতাব্দী স্থাযী হযেছিল, নৃপতি বিম্বিসাবেব কালে যাব জযযাত্রা শুরু, অশোকে এসে তাব চূড়ান্ত বিকাশ। কিন্তু, এই সমযটিতে বেদবাদী ব্রাহ্মণ্য শক্তি যে চুপচাপ বসে থাকেনি, পববর্তী সমযে ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুধর্মেব উত্থানই তাব প্রমাণ। এই সমযটিতেই বিভিন্ন চিন্তাধাবার সমন্বয ঘটিযে সকলেব গ্রহণযোগ্য একটি ধর্মমত সৃষ্টি হযেছে, বৈদিক দেবতাদেব স্থলে বিষ্ণু ও শিব প্রাধান্য বিস্তাব কবেছে। বৈদিক ব্রহ্মা শুধু বযেছেন নামে মাত্র কর্তা। বামাযণে আমরা যে চিন্তা ভাবনাব সাক্ষাৎ পাই তা এই সমন্বযী চিন্তা, এবং এতেই প্রমাণ হয যে তা বুদ্ধেব বেশ পবেব যুগেব সৃষ্টি। অর্থাৎ বাম আব বামাযণ অনেক যোজনেব তফাৎ। মাঝখানে

একটি নয, দুটি বিপ্লব ঘটে গেছে। আর্যবা ভাবতে এসেছে এবং উত্থান ঘটেছে বৌদ্ধধর্মেব। ফলত বহু শতাব্দীব অপব প্রান্ত থেকে আগত বামেব ততটুকুই বামাযণে আছে, যতটুকু হোমিওপ্যাথিক ওষুধে থাকে আসল ভেষজেব নির্যাস।

অতঃপব তোমাব ডাযালগটি অনুমান কবতে পাবছি। তুমি বলবে, 'ওহে বাচাল চূড়ামনি, তুমি ইতিহাসবেত্তা হলে কবে থেকে?' আমি সবিনযে বলব যে আমি ইতিহাসবিদ নই। ঐতিহাসিকদেব বক্তব্য পড়ে ও স্রেফ সাধাবণ জ্ঞান বা 'কমনসেন্স' থেকে কথাগুলি বলছি। তুমি বা কোনও সুহৃদয পাঠক যদি আমাব ক্রনোলজি বা কালানুক্রমে ক্রটী খুঁজে পাও, জানালে বাধিত হব। তবে, আমি সাহস কবে যে কথাগুলি বলছি, তা যে একেবাবে অযৌক্তিক নয, তাব প্রমাণ স্বরূপ ইতিহাসবেত্তা নন কিন্তু বোদ্ধা এমন একজন ব্রিটিশ সাহিত্যানুশীলনকাবীব বক্তব্য থেকে উদাহবণ দেব। হোমাবেব 'ইলিযাড'-এব ইংবেজি অনুবাদেব ভূমিকায অনুবাদক ই. ভি. বিউ এক জাযগায লিখছেন ঃ 'হোমাবেব বর্ণনা কি কোনও অর্থে ঐতিহাসিক? এব উত্তব হ্যাঁ ও না-দুইই। আমাব মনে হয না যে ট্রযেব যুদ্ধেব কাহিনী বলতে গিযে তিনি এমন কি কোনও অতিসবলীকৃত ইতিহাসও উপস্থাপনা কবছেন। ট্রয বা ইলিযাম বলে একটা জাযগা ছিল, অবশ্যই ছিল। এবং আজ আমবা জানি যে তা একাধিকবাব ধ্বংস হযেছিল। কিন্তু তবু, তিনি যে কযেক পুরুষ আগেকাব এক দশ বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধেব বর্ণনা দিযেছেন, তা ট্রযে কিংবা অন্যত্র কোথাও আমাব মতে সংঘটিত হযনি, (দেবতাদেব যুদ্ধে অংশগ্রহণেব ব্যাপাবটা বাদ দিযেও নয)। এ ছিল এক বিশেষ ধবণেব কল্পকাহিনী-'ফিকশান'-যা হোমাবেব বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এই কাহিনীতে তিনি এমন সব চবিত্রদেব যোগ কবেছিলেন, যাদেবকে তাঁব শ্রোতৃমণ্ডলী নিজেদেব শাসককুলেব পূর্বপুরুষ বলে বিশ্বাস কবত এবং যাদেব কেউ কেউ সত্যিই ছিল বলে আমবাও বেশ বিশ্বাস কবি। আমাব এই বক্তব্য যদি ঠিক হয, তবে তাতে হোমাবেব কাহিনী ও চবিত্র সৃষ্টিব গৌবব প্রভূত পবিমাণে বৃদ্ধিই পায। ব্রোঞ্জযুগেব যুদ্ধেব এক তাক ঠাসা সত্য বিববণেব চাইতে এক খণ্ড ইলিযাড আমাব কাছে দামি।'

ইলিযাড সম্বন্ধে একজন ইলিযাড ভক্ত যা বলতে পাবেন, বামাযণ সম্বন্ধে বামাযণ ভক্ত আমবা সবাই কি সে কথা বলতে পাবি না? বিশেষত যখন ইলিযাডেব ট্রয ও মাইসিনীযাব ঐতিহাসিকতা নির্ণিত হওযা সত্ত্বেও বামাযণেব অযোধ্যা ও লঙ্কাব কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই, তখন?

॥ সাঁইত্রিশ ॥

আজ একটু ব্যস্ততাব মধ্যে আছি-গৃহিনী পিত্রালযে যাচ্ছেন অতএব, চিঠিব কলেবব বড় কবতে পাবছিনা, আমাদেব আলোচনাও স্থগিত বাখতে হচ্ছে। আমি যদি শিবঠাকুবেব যুগেব হতাম তাহলে কোনও সমস্যাই থাকত না। তাঁব একাধিক গৃহিনীব মধ্যে যে ডিভিশন অব লেবাব ছিল-একজন বাঁধতেন, একজন খেতেন এবং অপবজন বাগ কবে বাপেব বাড়ি যেতেন-সে সব সুযোগ এখন আব নেই। এখন একজনকেই খেতে, বাঁধতে, বাগ কবতে ও বাপেব বাড়ি যেতে হচ্ছে। ফলে কাজেব চাপ বেশি এবং তাই একালেব গৃহকর্তাকেও গৃহিনীব সাথে কিছু কিছু কাজে লেগে পড়তে হচ্ছে। হাযবে, সেই বহুপত্নীব যুগ আব নেই! সেই বামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।

আর, সেজন্যই অনেকে বিলাপ করছেন এবং জোর করে সেই রামের যুগ ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। তুমি বলতে পার যে শিবঠাকুরের তিন কন্যার প্রসঙ্গে আবার রামকে নিয়ে টানাটানি কেন? রাম তো একমাত্র পত্নীর আদর্শ স্বামী। কিন্তু, তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। যদিও 'রামও নেই অযোধ্যাও নেই' কথাটা আমি বলেছি আলংকারিক অর্থেই। রাম রাজত্ব বলতে আমরা একটা 'আদর্শ' সময়কে বোঝাতে চাইছি। বাল্মীকি একজন আদর্শ চরিত্রের অনুসন্ধানে ছিলেন। নারদ ও ব্রহ্মা তাঁকে সেই আদর্শ চরিত্রের সন্ধান দিলেন এবং তিনিও সে ভাবেই তাঁর মহাকাব্য রচনা করলেন। আমি আগেই বলেছি, বাল্মীকির রচনারীতি হোমারের থেকে আলাদা। বাস্তব নয়, একটি আদর্শকে তিনি পরিস্ফুট করতে চান। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে মডেল দেখে আঁকা হয়, ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকাটি হচ্ছে মন থেকে। কিন্তু মন থেকে আঁকলেও চার পাশের মডেল যে সেখানে ঢুকে বসে আছে, তারা যাবে কোথায়?

অতএব বাল্মীকির মহাকাব্যেও তাঁর কাল প্রতিফলিত হয়—অবশ্যই সেটা রামের কাল নয়, যেমন রিউ বলেছেন যে হোমারের কাব্যে আঁকা হয়েছে হেলেনের কাল নয়, হোমারেরই কাল। বাল্মীকির মহাকাব্যে তাঁর কালের সামাজিক বিপ্লবগুলি কিভাবে ধরা পড়েছিল, সে সম্বন্ধে অসাধারণ আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আগামী চিঠিতে সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। আজকে ধান ভানতে যে শিবের গীত (বা রামের গীতও বলতে পার) শুরু করেছি, সেটা সেরে নিই।

শিবঠাকুর বল, রাম বল, আর কৃষ্ণই বল চরিত্রগুলিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দিয়েছেন। এগুলি কোনওটাই শিবঠাকুর, রাম বা কৃষ্ণের কাজকর্ম গতিবিধির পুলিশ ভেরিফিকেশন নয়।

তোমাকে আমাদের সেই বৈরাগির গানের কথা বলেছিলাম না? সেই গ্রাম্য কবি তাঁর মত করে কৃষ্ণের যে ছবিটি এঁকেছিলেন এবং তার মুখে যে সব সংলাপ বসিয়েছিলেন তাতে কৃষ্ণ একটি এঁচড়ে পক্ব গ্রাম্য বালক হয়ে উঠেছিল। আবার 'শিবায়নে' শিবের যে বর্ণনা আছে তা এক কামুক গ্রাম্য পুরুষের, কালিদাসের কুমারসম্ভবের শিবের সঙ্গে তা মেলে না। এদিকে আবার আমাদের ছড়ার শিবঠাকুরের ঘরে কোথা থেকে কে জানে তিন কন্যা ঢুকে বসে আছে, যদিও আমরা শিবকে একপত্নীর স্বামী বলে ভাবতেই অভ্যস্ত। অবশ্য সতী, উমা, দুর্গা—এরা বিভিন্ন সময়ের স্ত্রী—গ্রাম্য কবি হয়তো এই তিন জনকেই এক সময়ে নিয়ে এসেছিলেন। অপর দিকে তোমায় বলেছি রামের একপত্নীত্ব সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে। কারণ মহাকাব্যের যুগে একপত্নীত্ব কোনও আদর্শ ছিলনা, অন্তত রাজা মহারাজা ব বীরপুরুষদের ক্ষেত্রে। রামায়ণ মহাভারতের অনেক আদর্শ চরিত্রেরই যখন একাধিক পত্নী, তখন খামোখা রাম কেন একটি মাত্র স্ত্রী নিয়ে থাকবেন, তা বোঝা যায় না। বস্তুত রামের একটি মাত্র পত্নী ছিল, এমন কথা বাল্মীকি কখনও বলেন নি, এটা পরবর্তী যুগের ধারণা। আমার কথাটা কি তোমার অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে? বুঝিয়ে বলছি শোন।

প্রথমত পুরাকাহিনীতে কোনও রাজা বা রাজপুরুষের প্রধানা মহিষীর বা মহিষীদের নাম উল্লেখেরই রীতি ছিল। আরও মহিষী থাকতেন, কিন্তু তাদের আলাদা করে উল্লেখের প্রয়োজন থাকত না। রাজার অন্তঃপুর মানেই অসংখ্য স্ত্রী । তার মধ্যে যিনি বা যাঁরা প্রধান, তাঁরাই উল্লিখিত হতেন। মাঝে মাঝে কথায় কথায় এই সত্য বেরিয়ে আসে। মন

দিযে কাব্য পাঠ কবলেই সেটা বোঝা যায। যেমন ধব, দশবথ। দশবথেব তিন বাণি বলেই আমবা জানি। দশবথেব পুবীতে যে অসংখ্য বমণী তাঁব স্ত্রী ছিলেন, এটা লক্ষ্য কবি না। অথচ, বামেব বনগমনেব আগে ও পবে দশবথেব অসংখ্য স্ত্রীব বর্ণনা বহুবাব বাল্মীকি আমাদেব দিযেছেন। তাব থেকে একটি তোমায শোনাচ্ছি ঃ

'ক্রমশঃ পুবী মধ্যে বামেব বাজ্য নাশ ও বনবাস বার্তা প্রচাবিত হইল। তখন বাজ মহিষীবা প্রাণাধিক বামকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায গ্রহণার্থ আগমন কবিতে দেখিযা আর্তস্ববে চীৎকাব কবিতে লাগিলেন।....দশবথেব প্রিয মহিষীবা বিবৎসা ধেনুব ন্যায....বোদন কবিতে লাগিলেন। ....দশবথ অন্তঃপুব মধ্যে এই ঘোবতব আর্তবব শ্রবণপূর্বক পুত্রশোকে দেহ কুণ্ডলিত কবিযা আসনে অধোমুখে লীন হইযা বহিলেন।'

এই বাজমহিষীবা কাবা? কৌশল্যা এব মধ্যে নেই, কাবণ, একটু পবেই দেখতে পাচ্ছি এই 'মাতৃগণে'ব সঙ্গে সাক্ষাতেব পবই বাম কৌশল্যাব ঘবে গেলেন। কৈকেযী তো এব মধ্যে থাকতেই পাবেন না। তাহলে? বর্ণনা শুনেই তুমি বুঝতে পাবছ–এই 'মাতৃগণ' যাঁদেব কান্নায ঘোবতব আর্তবব উঠেছিল, তাঁবা নিশ্চযই সংখ্যায প্রচুব। এমনি বর্ণনা আবও একাধিকবাব আছে। দশবথেব তিন প্রধানা মহিষী ছাড়াও যে আবও বহুসংখ্যক মহিষী ছিলেন, বাল্মীকিব বর্ণনায তাব প্রমাণ বযেছে ভূবি ভূবি।

এখন এত স্ত্রী কোথা থেকে এল? বাজাবা কি অতবাব কবে বিবাহ কবতেন? তা নয, তা সম্ভবও ছিল না। বিবাহেব সময কন্যা দানেব সঙ্গে যে সালঙ্কাবা সখীদেবও দান কবা হত, তাবা সকলেই হত অন্তঃপুবেব স্ত্রী। 'হাবেম' কেবল যে মুসলমান বাদশাদেবই ছিল, তা নয। কাব্যে নাটকে প্রতিটি 'হিন্দু' বাজাব এই 'হাবেম' দেখা যায, 'পুবস্ত্রী' নামেব আড়ালে তাদেব প্রকৃত চেহাবাটা আমবা বুঝতে পাবিনা।

এখন প্রশ্ন হল বামেব কি এ প্রকাবেব স্ত্রী পবিপূর্ণ 'অন্তঃপুব' ছিল? নিশ্চযই ছিল এবং বাল্মীকিই তাব বর্ণনা কবেছেন। প্রথমত বিবাহেব সময অন্যান্য বাজকুমাবীব মত সীতাব সঙ্গেও জনক 'শত সংখ্যক সখী' অন্য বহু মূল্যবান যৌতুকেব সঙ্গে দান কবেছিলেন। এই 'সখী'বা নিশ্চযই বামেব অন্তঃপুবভুক্ত হযেছিল। তবে বাম এই স্ত্রীদেব নিযে কাটাবাব মত সময 'বাল্মীকি বামাযণে' বিশেষ পান নি, কাবণ, খুব অল্পকালেব মধ্যেই তাঁকে বনে যেতে হল। বাম ফিবে আসাব পবে বাল্মীকি এক জাযগায অবশ্য লিখেছেন যে কৌশল্যা সেই আনন্দেব দিনে বামেব অভিষেক অনুষ্ঠানেব উদ্দেশ্যে 'বধূদেব' সুসজ্জিত কবতে লাগলেন। এই 'বধূদেব' কথাটি আমাদেব অনেক পণ্ডিতবা মেনে নিতে চাইছেন না। তাঁবা সংস্কৃত ভাষাব নানা বিতর্ক তুলে কথাটাকে বাতিল কবে দিতে চাইছেন। আবাব 'বামাযণেব' অনুবাদক শব্দটিকে একেবাবে 'বানব বধূ'দেব কবে দিযেছেন। কিন্তু 'বধূদেব' হলে ক্ষতি কি? দশবথেব অন্তঃপুবেব অন্য পত্নীবা যদি বামেব 'মাতৃগণ' হন, তবে সীতা ভিন্ন বামেব অন্তঃপুবেব অন্য মহিলাবা কৌশল্যাব 'বধূগণ' ছাড়া আব কী? যাই হোক 'বামাযণে' বামেব পত্নী রূপে সীতাকেই আমবা শুধু পাই; তাব কাবণ বামাযণেব কাহিনীই হল তাঁব বিবাহেব পব বনবাস ও বনবাস থেকে ফিবে বাজ্যলাভ পর্যন্ত। বামেব অন্তঃপুবেব অন্য নাবীদেব এই কাব্যে কোনও ভূমিকা নেই।

তুমি বলবে, বামেব বাজ্য লাভেব পব তো উত্তবকাণ্ডও আছে। কিন্তু, কথা হল, এ ব্যাপাবে এখন পণ্ডিতবা প্রায একমত যে মূল বামাযণ বামেব অভিষেক পর্যন্তই। কাবণ, প্রথমত, মহাকাব্যেব আবম্ভে নাবদেব বর্ণনায বামেব বাজ্যলাভ পর্যন্তই আছে। মনে বাখতে হবে

নারদের এই বর্ণনাই সমগ্র মহাকাব্যের সারাংশ। দ্বিতীয়ত, ষষ্ঠ সর্গের পরই প্রথানুসারে কাব্যের সমাপ্তি সূচক যে সব কথা বলতে হয় তা সবই বাল্মীকি লিখেছেন। তুমি পড়লেই বুঝবে যে এখানেই মহাকাব্য শেষ। উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। নিজে দেখে নিও। তৃতীয়ত, পণ্ডিতরা বলছেন যে উত্তরকাণ্ডের ভাষা ও বর্ণনা বাল্মীকির ভাষা ও বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। এছাড়া অন্য নানা যুক্তিও আছে। সে প্রসঙ্গে পরে একসময় আসা যাবে।

যে কথা বলছিলাম, আপাতত এটা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই যে রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে রাম আর অন্য কোনও মহিষী সংগ্রহ করার সুযোগ পাননি। পেলে কি তিনি করতেন না? না করার কারণ কী? রামায়ণে কোথাও তো বহুবিবাহ নিন্দিত নয়। অযোধ্যার বর্ণনা প্রসঙ্গে বাল্মীকি যে সব ঐশ্বর্যের কথা বলেছেন, তার মধ্যে এও আছে যে অযোধ্যা বারবিলাসিনীতে পূর্ণ ছিল। রামকে আনতে যাওয়ার জন্য ভরত যে মিছিলটিকে পাঠিয়েছিলেন, তাতে গণিকারা ছিল বিশিষ্ট স্থানে। এমন কি তোমার ঐ উত্তরকাণ্ডে সীতার বনবাসের আগে রামের যে অন্তঃপুরের বর্ণনা একবার পাচ্ছি তাতে মদ্যপান, নৃত্যগীত ও ভোগলালসার কিছুই কমতি নেই। এর মধ্যে রামের একপত্নীত্ব একটু বেখাপ্পা নয় কি? রাজকীয় বিলাসব্যসন ও ভোগ লালসার রীতি অনুসারে সবই ঠিক চলছে, শুধু একাধিক বিবাহে অরুচি? এটা কেন? আমার মনে হয় না, বাল্মীকি রামায়ণের এই 'আদর্শ' প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। ঘটনাচক্রে এরকমই হয়ে গেছে। এখন আমরা বর্তমান কালের নিরিখে এটাকে বাল্মীকির 'আদর্শ' বলে মনে করছি।

যাই হোক, কথায় কথায় বা বলা যায় বিনা কথার চিঠি বেশ বড়ই হয়ে গেল। ওদিকে অন্য কাজ ফেলে এই ছাই পাঁশ লেখা-নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য গৃহিনী রাগ করছেন। অবশ্য রাগ করে 'বাপের বাড়ি যাওয়ার' চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবেন না এই ভরসায়ই এতটা বকবক চালিয়ে গেলাম। পরের বারে আসল প্রসঙ্গে আবার ফিরব।

॥ আটত্রিশ ॥

রাম প্রসঙ্গে তোমাকে এলোমেলো যে সব কথা কদিন ধরে বলেছি, তার মধ্যে হয়ত লক্ষ্য করেছো, আমি এক নয়, একাধিক রামের কথা বলেছি। প্রথম জন প্রকৃত রাম, যিনি কোনও অনার্য গোষ্ঠীর বীর ছিলেন এবং যাঁকে ঘিরে একটি কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। এই রাম ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের চেয়ে প্রাচীন বলেই আমার বিশ্বাস। সেই রাম রাবণের যুদ্ধের হদিস হয়তো বা সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনরূপে প্রাপ্ত রহস্যময় লিপিগুলির ভাষা উদ্ধার করা গেলে কোনওদিন পাওয়া যেতে পারে,—সুমের সভ্যতার লিপি উদ্ধার করে গিলগামেশের কাহিনী আর প্রাচীন মহাপ্লাবনের গল্পের উৎস যেমন পাওয়া গেছে, সেই ভাবে। অবশ্য এটা আমার অনুমান মাত্র। ইতিহাস যে সব জায়গায় একইভাবে এগিয়েছে, তা তো নয়।

দ্বিতীয় জন মহাকাব্যের রাম, বাল্মীকি নামক দস্যু অর্থাৎ অনার্য দাস যার স্রষ্টা। অনার্য হলেও এই মহাকবি সংস্কৃত ভাষায় ও আর্য সংস্কৃতি চর্চায় যে উচ্চমান অর্জন করেছিলেন, তা তাঁকে আর্যদের কাছে যেমন গ্রহণীয় করেছিল, অপর দিকে অনার্য লোক পরম্পরাকে কাব্যে রূপ দেওয়ার ফলে অনার্যদের মধ্যেও তাঁর সম্মান ও লোকপ্রিয়তা বেড়েছিল। আর্য ও অনার্যের মধ্যে বাল্মীকি এইভাবে রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে এক সেতু নির্মাণ করেছিলেন।

আমি আলোচনা করে দেখিয়েছি যে বাল্মীকির কাল অবশ্যই বুদ্ধ পরবর্তী, অর্থাৎ প্রকৃত রাম ও মহাকাব্যের রামের মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান। বাল্মীকি ভারতীয় শিল্প ভাবনা অনুযায়ী একজন আদর্শ মানুষের চিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর জানা ছিল রামের জনপ্রিয় কাহিনীটি। সেই কাহিনীকেই তিনি মহাকাব্যের রূপ দেন। প্রচলিত লৌকিক কাহিনীকে কাব্যের বা নাটকের রূপ দেওয়াটা ছিল প্রাচীন রীতি। গ্রীক মহাকাব্য ও নাটক এবং ভারতীয় কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে। ইংরেজিতে শেক্সপীয়রও কোনও মৌলিক কাহিনী সৃষ্টি করেন নি। সবই প্রচলিত লোককথা।

মহাকাব্যের এই রামের মধ্যে, আমরা বাল্মীকির কালের পরিচয়ই খুঁজে পাই, বহু শতাব্দীর ওপারের রামের নয়। এই মহাকাব্যে রামের কাহিনীটুকু মাত্র অল্প বিস্তর আছে, আর সমস্তই বাল্মীকির সৃষ্টি। এতএব এতে বাল্মীকির পারিপার্শ্বিক, তাঁর কালের চিন্তা ভাবনাই যে প্রতিফলিত হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাহলে রামায়ণে আমরা বাল্মীকির কালের ইতিহাস কিছু খুঁজে পেতে পারি কি? আমি তোমাকে আগে বলেছি হোমারের মহাকাব্যের মত বাল্মীকির রচনা বাস্তবানুকৃতি নয়, এতে কল্পনার মিশেল বেশি। হোমার একটি বাস্তব মডেলকে অত্যুচ্চ কল্পনার প্রসাদে এক প্রাচীন কাহিনীর রূপ দিয়েছিলেন, বাল্মীকি প্রাচীন কাহিনীটিকে কল্পনায় সমৃদ্ধ করে মহাকাব্য সৃষ্টি করেছিলেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ছবি থেকে তুমি তাঁর মডেলটিকে সনাক্ত করতে পার, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে কোনও মডেল নেই। তুমি তাঁর ছবিতে তাঁর কালের কোনও একটি বিশেষ মানুষকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু তাঁর কালকে তো পাবে, এবং তাঁর অজান্তেই বহু মুখের আদল তাতে এসেছে যা তাঁর কালের সত্যিকারের মানুষদের মুখের আদল। আমাদের রামায়ণ মহাভারত থেকেও তেমনি আমরা সেকালের একটি ছবি পাব, যা ইতিহাসের বাস্তব তথ্যের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে যেভাবে সেই ইতিহাসকে মহাকাব্যের গভীরে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন, তা অতি অমূল্য। সে সম্বন্ধে তোমায় পরে বলছি। তার আগে আমি আমার তৃতীয় রামের কথা সেরে নিই।

আমার তৃতীয় রাম হলেন অবতার রাম। বাল্মীকির রামায়ণে কিছু মিশেল দিয়ে এই রাম পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সৃষ্টির প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল। এবং এই অবতার রামের পরাকাষ্ঠা ঘটেছিল তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসে'। প্রমাণ হিসেবে তুমি প্রথমে বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ করে দেখ। তোমাকে আগেই বলেছি মহাকাব্যের প্রথমেই আমরা দেখছি যে বাল্মীকি একজন আদর্শ মানুষের সন্ধান করছেন, দেবতার বা অবতারের নয়। এবং তারই ফলে নারদ তাঁকে শোনালেন রামের কাহিনী। বাল্মীকিও যে কাব্য রচনা করলেন তাতে তিনি তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী একজন আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ বীর, আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ রাজা হিসেবে রামকে চিত্রিত করলেন, ভক্তের ভগবান বা দোষত্রুটি তুচ্ছতা বর্জিত ঈশ্বর হিসেবে নয়। মনে করে দেখ, মহাভারতেও রামকাহিনী রয়েছে। সেখানেও তিনি কোনও অবতার নন, একজন দুঃখী রাজার উদাহরণ মাত্র। তোমাকে আগেই বলেছি, বনবাসকালে যুধিষ্ঠির যখন মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কোনও নরপতি ছিলেন কিনা, তখন তিনি উদাহরণ দিলেন রামের। মার্কণ্ডেয় সামান্য কয়েক কথায় রামের জন্মকথা সারলেন। তিনি বললেন,'রাজন্। পূর্বে ঈক্ষাকু বংশসম্ভূত অজ নামে এক সুবিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম দশরথ।..... দশরথের চারিপুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন।

তাঁহাবা সকলেই ধর্ম ও অর্থ চিন্তা বিশাবদ। বামেব জননী কৌশল্যা, ভবতেব জননী কৈকেযী এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নেব জননী সুমিত্রা। বিদেহবাজ দুহিতা সীতা বামেব প্রিযতমা মহিষী হইবেন বলিযা বিশ্বকর্মা স্বযং তাঁহাকে নির্মাণ কবেন।' ব্যস, এই হল বামেব জন্ম বৃত্তান্ত। তুলনায বাবণেব জন্ম বৃত্তান্ত অনেক বড় এবং জমজমাট, কাবণ বাবণেব পেডিগ্রী অর্থাৎ কুলজি অনেক সম্ভ্রান্ত। বাবণ স্বযং ব্রহ্মাব নাতি, কুবেবেব ভ্রাতা এবং মহর্ষি বিশ্রবাব পুত্র। অতএব, জন্মবৃত্তান্তেব দিক থেকে মহাভাবতেব উপাখ্যানেব বামও কোনও কেউকেটা নন।

এইখানে একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে বাখি। মার্কণ্ডেযব কথা লক্ষ্য কবেছ তো? সীতা বামেব 'প্রিযতমা মহিষী' ছিলেন। প্রিযতমা যখন, তখন নিশ্চযই অন্য মহিষীও ছিলেন। অর্থাৎ বামেব একমাত্র বিবাহেব সংবাদ মার্কণ্ডেযব জানা ছিল না। মহাভাবতেব কাহিনীতেও বামেব বিবাহ, বিবাহেব পব বনবাস, তাবপব বাজ্য লাভ এবং সেখানেই ইতি। অতএব বাম সাবা জীবনে কতগুলি বিবাহ কবেছিলেন, তাব খবব ঐ কাহিনীতেও নেই।

যাই হোক, প্রসঙ্গে ফিবি। ইতিপূর্বে বলেছি পণ্ডিতবা এ ব্যাপাবে এখন প্রায নিঃসন্দেহ যে বাল্মীকি বামাযণেব সপ্তম খন্ড এবং প্রথম খন্ডেব বহু অংশই প্রক্ষিপ্ত। সপ্তম খন্ড অর্থাৎ উত্তব কান্ড কেন প্রক্ষিপ্ত, তাব কাবণ তোমাকে আগেই বলেছি। ঐ উত্তব কান্ডে এবং প্রথম খন্ড অর্থাৎ বাল কান্ডে পুবাণেব নানা কাহিনীব মধ্য দিযে বামেব অবতাবত্ব, অলৌকিক জন্ম কথা ইত্যাদি বর্ণনা কবা হযেছে। তাব বচনা শৈলীও আলাদা। অতএব সিদ্ধান্ত কবা যায যে অবতাব বাম মহাকাব্যেব বামেব বেশ পবেব ব্যাপাব। বাম কাহিনী ও বামাযণ অত্যন্ত জনপ্রিয হওযায, তাবই মধ্য দিযে অবতাবত্বেব ভাবমূর্তিটি গড়ে তোলা সহজ ছিল, এবং সে জন্যই ব্রাহ্মণ্যবাদীবা প্রক্ষিপ্ত অংশ জুড়ে বামাযণকে তাঁদেব পছন্দমত কবে গড়ে তুলেছিলেন। অবশ্য তাতেও কাজ হযনি, অনেক জোড়াতালি দিযেও সংস্কৃত বামাযণেব বাম আদতে একজন মস্ত মাপেব মানুষই বযে গেছেন, যথেষ্টভাবে অবতাব হযে ওঠেন নি। সে কাজটি সমাধা কবেছিলেন তুলসীদাস। ঐতিহাসিকবা এ ব্যাপাবে একমত যে বামভক্তিব প্রচলন আমাদেব দেশে তুলসীদাসেব আগে তেমন ছিলনা। তাঁব কাব্যই বামভক্তিব প্লাবন আনে। আব সেকাবণেই হিন্দীভাষীদেব মধ্যে বামভক্তিব এত প্রাবল্য। শ্রদ্ধা, বিনয, স্বাগত সম্ভাষণ ও আন্তবিকতাব সম্বোধনই তাঁদেব মুখে 'বাম বাম', আবাব চিব বিদাযেব সম্ভাষণও 'বাম নাম সত্ হ্যায'। বাম ভাবনাব দ্বাবা এত আপ্লুত আমাদেব দেশেব আব কোনও ভাষাভাষীবা নন।

এই যে তিন প্রকাব বামেব কথা বললাম, তাব মধ্যে মহাকাব্যেব বামে বাল্মীকিব কাল কেমনভাবে প্রতিফলিত হযেছিল সে কথা ববীন্দ্রনাথেব বক্তব্য দিযে শুরু কবি। ববীন্দ্রনাথেব 'ভাবতবর্ষেব ইতিহাসেব ধাবা' প্রবন্ধটি নানা কাবণে চিত্তাকর্ষক। ববীন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদেব ধাবে কাছে কখনও এসেছেন বলে শুনিনি। কিন্তু ইতিহাসেব দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যায ও বিশ্বব্যাপী অবিবাম গতিশীলতাব হেগেলীয তত্ত্বে যে তাঁব আকর্ষণ ছিল, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থেব কবিতাগুলিতে তা ফুটে উঠতে দেখি। ভাবতবর্ষেব ইতিহাস বিষযে লিখতে গিযে তিনি প্রথমেই শুরু কবছেন এই বলে যে : "সমস্ত বিশ্বব্যাপাবেব মধ্যেই একটা নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিদ্রা ও জাগবণেব পালা আছে; একবাব ভিতবেব দিকে একবাব বাহিবেব দিকে নামা উঠাব ছন্দ নিযতই চলিতেছে। থামা এবং চলাব অবিবত যোগেই বিশ্বেব গতিক্রিযা সম্পাদিত। বিজ্ঞান বলে, বস্তুমাত্রই সচ্ছিদ্র,

অর্থাৎ 'অস্তি' এবং 'নাই' এই দুইযেব সমষ্টিতেই তাব অস্তিত্ব।" ভাবতবর্ষেব ইতিহাসকে ৮ন এই উত্থান পতনেব ছন্দেব মধ্যে প্রত্যক্ষ কবেছিলেন। সেই 'ইতিহাসেব প্রথমাঙ্কেই আমবা আর্য অনার্যেব প্রচণ্ড জাতি সংঘাত দেখিতে পাই।' এই সংঘাতেব মধ্য দিযে আর্যবা সংহত হযেছিল, কিন্তু ববীন্দ্রনাথ বলছেন এই সংঘাতে যাবা আর্য বীব, ভাবতবর্ষেব মহাকাব্যে তাদেব বড় একটা উল্লেখ নেই। তিনি মনে কবেন, হযতো জন্মেজয এমন একজন বীব ছিলেন। পুবাণে জন্মেজযেব যে সর্পযজ্ঞেব কথা আছে, তাতে হযতো সর্প–উপাসক অনার্য নাগ জাতিকে ধ্বংস কবাব একটা নিদারুণ উদযোগেব ইতিহাসই প্রচ্ছন্ন আছে। কিন্তু জন্মেজয পুবাণে প্রাধান্য পাননি, পেযেছেন তাঁবাই যাঁবা আর্য অনার্যেব মিলন ঘটিযেছিলেন। এমন একজন মিলনকাবী হলেন বাম। ববীন্দ্রনাথ দেখিযেছেন যে ভাবতবর্ষে এক দীর্ঘ সময জুড়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিযেব এবং আর্য অনার্যেব দ্বন্দ্ব ও মিলনেব পালা চলেছিল। বামাযণ ও মহাভাবত সেই দ্বন্দ্ব ও মিলনেব প্রতিচ্ছবি। কেমন কবে এই তত্ত্বটিকে ববীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা কবলেন, খুব সংক্ষেপে সে কথা পবেব চিঠিতে বলে আমাব কিছু অক্ষম ভাষ্য তাব সঙ্গে যোগ কবব। আজ এখানেই থামা যাক।

॥ উনচল্লিশ ॥

আজ বড়দিন, কিন্তু আবহাওযা বড়ই অপ্রসন্ন। সূর্যদেবেব দেখা নেই। অসমযেব এই বৃষ্টি বাদলাব মধ্যেও অবশ্য চাবদিকে উৎসবেব আমেজ। আলোকসজ্জা, পিকনিক, সেজেগুজে বেড়াতে যাওযা, কেক খাওযা–সব প্রোগ্রামই প্রায অটুট বযেছে, ঠাণ্ডা জোলো হাওযা উৎসাহকে একেবাবে নিভিযে দিতে পাবেনি। খ্রীস্টানবা এই দিনটিকে যীশু খ্রীস্টেব জন্মদিন হিসেবে পালন কবেন, কিন্তু অগণিত মানুষ যাঁবা খ্রীস্টেব ভজনা কবেন না, তাঁদেব কাছেও দিনটি উৎসবেব। উৎসবেব চবিত্রই এবকম। কত বিচিত্র ধাবা যে এসে তাতে মেশে! মজাব কথা কি জান? খ্রীস্টেব জন্মেব আগে থেকেই এ উৎসব চলছে। আর্যদেব কাছে যেমন অনার্য, খ্রীস্টানদেব কাছে তেমনি 'প্যাগান' –বির্ধমী, কদাচাবী বলে নিন্দিত। বড়দিনেব উৎসব আসলে কিন্তু সেই পৌত্তলিক প্যাগানদেবই উৎসবেব রূপান্তব।

ব্যাপাবটা তোমায একটু বুঝিযে বলি। তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছ যে, খ্রীস্টেব জন্ম থেকে যে খ্রীস্টাব্দ শুরু বলে মনে কবা হয, সেই খ্রীস্টাব্দেব প্রথম তাবিখে না জন্মে খামোখা খ্রীস্ট বছবেব শেষে জন্মাতে গেলেন কেন? আদিতে মার্চ থেকে ক্যালেণ্ডাব শুরু হত, সে অনুযাযী খ্রীস্টেব জন্ম তাবিখ হওযাব কথা ছিল পযলা মার্চ। তাহলে এই ২৫ ডিসেম্বব এল কোথা থেকে? আসলে দিন বড় হতে থাকাব প্রাবম্ভেব এই তাবিখটিকে বোমান সাম্রাজ্যেব প্যাগানবা তাদেব উপাস্য 'অপবাজেয সূর্যদেবেব জন্মদিন' হিসেবে পালন কবতেন। খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ কবে বোমান সম্রাট প্রথম কনস্ট্যানটিন প্যাগান বিশ্বাসেব সাথে মিল বক্ষাব জন্য ঐ ২৫ তাবিখটিকেই যীশু খ্রীস্টেব জন্মদিন বলে ঘোষণা কবেন। এইভাবে যীশু ও সূর্যদেব প্যাগানদেব কাছে ক্রমে একাকাব হযে যায এবং যীশুখ্রীস্টেব জন্মদিন হিসেবে ২৫ ডিসেম্বব তাবিখটিও গৃহীত হযে যায।

শুধু যীশুখ্রীস্টেব জন্ম তাবিখ নয, আবও অনেক কিছু খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদেব আচবণে ঢুকে গেছে যা প্যাগান প্রভাবিত। যেমন ধব মাতা মেবীব ব্যাপাবটি। বাইবেলেব 'নববিধান'

অর্থাৎ 'নিউ টেস্টামেন্টে' মেরীর প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত, অথচ খ্রীস্টধর্মে 'মা ও ছেলের' চিত্রকল্পটি এতই জনপ্রিয় যে তা খ্রীস্টীয় ভাবনা ও পশ্চিমী শিল্পকলাকে কি প্রবলভাবে অভিভূত করেছিল, তা হয়ত তুমি জান। এর কারণ কী? কারণ হল আদিম গোষ্ঠীভুক্ত প্যাগানদের মাতৃতান্ত্রিক দেবীপুজার ঐতিহ্য। প্যাগান অনুভূতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাতা মেরীর এক রকমের পুজোই প্রচলিত হয়ে যায়, যার ফলে যীশুর চাইতেও কখনও কখনও মাতা মেরীই খ্রীস্টানদের কাছে বেশি ভাস্বর হয়ে ওঠেন।

অথচ যীশুখ্রীস্ট একজন ঐতিহাসিক মানুষ, তাঁর জন্ম এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর প্রবেশ ঘটে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। ধনবান ও ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রচার ও শহীদের মৃত্যুবরণ তাঁকে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। বিশেষত রোমান সাম্রাজ্যের নিপীড়িত ও বিক্ষুব্ধ দাসশ্রেণীর মধ্যে যীশুর জনপ্রিয়তা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম দিকে রোমান সাম্রাজ্য যীশু অনুগামীদের বলপ্রয়োগে ঠেকাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সম্ভব নয় দেখে তিন শতাব্দী পর রোমান সম্রাট প্রথম কনস্ট্যানটিন নিজেই যীশুখ্রীস্টের ধর্মমত গ্রহণ করেন। ক্ষমতা, অর্থ ও সাম্রাজ্য মদমত্ততার বিরোধী যীশুর বাণীর তরলীকরণ তখন থেকেই ঘটতে থাকে। ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে যীশুকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করা হয় এবং তার প্রেম ও ক্ষমার দিকটিকেই বড় করে তুলে শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদকে ধীরে ধীরে লঘু করে ফেলা হতে থাকে। ইতিহাসের চাইতে কিংবদন্তী বড় হয়ে উঠতে থাকে, দীনহীনের প্রেমের ঠাকুর ক্রমে এক ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যের রাজধর্মের ঈশ্বর হয়ে যান। রোমান সাম্রাজ্য এই ভাবে একদিকে খ্রীস্ট–অনুরাগী বিদ্রোহী দাসদের ঠেকায় এবং অন্য দিকে খ্রীস্টের 'এক ঈশ্বরে'র ধর্ম প্রচারের দ্বারা সারা সাম্রাজ্যে 'এক ঈশ্বর ও এক রাজার' তত্ত্ব স্থাপন করে।

ফরাসী দার্শনিক প্যাস্কাল বলেছিলেন যে যীশুখ্রীস্টের জীবনকথায় তাঁর ৩৩ বছরের জীবনের মধ্যে বিবরণ মেলে মাত্র তিন বৎসরের। আমি বাইবেল পড়েছি , কিন্তু এ বিষয়ে পণ্ডিত নই; তবে মিলিয়ে দেখেছি বিলিতি এনসাইক্লোপিডিয়ায় লেখা এই কথাটি সত্য যে সেখানে তাঁর জীবনের কুল্যে ৫০ দিনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে, বাকি সমস্ত কিছুই অজ্ঞাত। আর এই পঞ্চাশ দিনের কাহিনীও নানা অলৌকিক গল্প কথায় রঞ্জিত।

আজ বড়দিন উপলক্ষে তোমার কাছে যীশু প্রসঙ্গ উথ্থাপন করার উদ্দেশ্য হল এই উদাহরণ তুলে ধরা যে কেমন করে একদিকে লোককথা, লোকবিশ্বাস ও কিংবদন্তী এবং অন্য দিকে শাসকদের নানা কূটকৌশলে ও বলপ্রয়োগে ইতিহাসের মানুষটি হারিয়ে যায় পরিবর্তে গড়ে উঠতে থাকে এক ভিন্ন চরিত্র–এক অতিমানব, একটি কল্পিত পুরুষ ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশি ইতিহাস–সচেতন ইউরোপেই ইতিহাসের সীমা· মধ্যেও যদি এ কাণ্ড ঘটে, তবে ভারতবর্ষের মত দেশে ইতিহাসের দিগন্তের ওপারে যে তা আরও অনেক বেশি পরিমাণে ঘটেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

তবে একটা প্রভেদ আছে। ইউরোপে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রশক্তি প্যাগানদের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্যকে এক ধর্ম, এক ঈশ্বর, এক রাজার অধীন করেছিল; অন্যদিকে ভারতবর্ষে আর্য অনার্য, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ জৈন অজীবক প্রভৃতি নানা মতাবলম্বী কখনও একাকার হয়ে যায়নি।রবীন্দ্রনাথ তাই এই মৌলিক তত্ত্বটি উপস্থিত করেছিলেন যে ইউরোপে সামাজিক সামঞ্জস্য সাধিত হয়ে যাওয়ায় সেখানে রাষ্ট্রীয়

অসামঞ্জস্য বা বিভেদই প্রধান, রাজায় প্রজায় শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্যের সাধনাই সেখানে ইতিহাস। অপরপক্ষে সামাজিক সামঞ্জস্য বিধান না হওয়ায় বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমন্বয় সাধনাই ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন কি ভারতবর্ষের বর্তমান ইতিহাসের দিকে তাকালেও রবীন্দ্রনাথের এই মতের সারবত্তা উপলব্ধি করা যায়। এখানে আজও শ্রেণীদ্বন্দ্বকে ছাপিয়ে বারে বারে জাতিদ্বন্দ্ব প্রাধান্য লাভ করতে চাইছে। একে পছন্দ করি না করি, একে অস্বীকার করার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের এই মত আমার মত মার্ক্সবাদীকেও আকৃষ্ট করে এ কারণেও যে ইতিহাসের এও এক দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা। মার্ক্সসীয় ব্যাখ্যার সাথে তার কতটা মিল বা গরমিল, সে কথা পরে আলোচনা করব, আপাতত তাঁর কৌতূহলোদ্দীপক বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে বলি।

রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যের যুগে দুটি পরস্পর বিরোধী জাতিদ্বন্দ্ব ও তার সমাধানের প্রয়াসের কথা বলেছেন। একটি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে, অপরটি আর্যে অনার্যে। বেদের মন্ত্র ও যজ্ঞ প্রণালী এবং আনুষঙ্গিক নানা শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অভিভাবক ব্রাহ্মণদের মর্যাদা যে ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছিল, তা আমরা উপনিষদের যুগেই দেখেছি। সেখানে বৈদিক যাগযজ্ঞকে নিকৃষ্ট বিদ্যা বলা হচ্ছে এবং ক্ষত্রিয়দের কাছে ব্রাহ্মণের নীতি শিক্ষা লাভ করতে দেখা যাচ্ছে। যাজ্ঞবল্ক্য ছাড়া অধিকাংশ উপনিষদ প্রবক্তাই ব্রাহ্মণেতর। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা হ্রাসের এই সন্ধিক্ষণে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়। উপনিষদে যেমন যজ্ঞাদিকে বজায় রেখে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা দেখা যায়, বৌদ্ধধর্মের বিপ্লব ছিল তার চেয়ে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারত ইতিহাস চর্চা' প্রবন্ধে বলছেন, 'বৌদ্ধযুগ ভারত–ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্য ভারতবর্ষ ও হিন্দু ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধ যুগে সেই সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি এক ধর্মবন্যায় ভাঙিয়াছিল–শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্মের আহ্বানে ভারতবাসীর সঙ্গে মিশিয়াছিল। ....বৈদিক যুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানে সন্ধিস্থল বৌদ্ধ যুগ। এই যুগে আর্য ও অনার্য এক গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল।' বৌদ্ধধর্মের অপসারণের পর বৌদ্ধ যুগের 'এই মিশ্রণকে যথা সম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে।'

বৌদ্ধযুগের পরবর্তী হিন্দুযুগ, রবীন্দ্রনাথ যাকে পুরাণের যুগ বলেছেন, তার বৈশিষ্ট্যগুলি কী? তিনি দেখাচ্ছেন যে মহাকাব্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হয়েছে। তাতে নব্য ক্ষত্রিয়ের নানা বিচিত্র অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত দুইই ক্ষত্রিয়ের কাহিনী। তার মধ্যে ব্রাহ্মণকে বর্ণ শ্রেষ্ঠর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, বিষ্ণুর বুকে ব্রাহ্মণ ভৃগুর পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে ব্রাহ্মণের পূজনীয়তাও স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মার জায়গায় শ্রেষ্ঠ হয়েছেন বিষ্ণু, এবং রাম ও কৃষ্ণ দুই মহানায়ককেই দেখা যায় ক্ষত্রিয় রূপে। ক্ষত্রিয়দ্বেষী পরশুরাম রামের কাছে পরাজিত হয়েছেন আর বশিষ্ঠ রাজকুলগুরু হলেও রামের দিগ্বিজয়ী অভিযানে গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ক্ষত্রিয়কুলজাত বশিষ্ঠদ্বেষী বিশ্বামিত্র। অপরদিকে আর্য অনার্য বিরোধও আছে। রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গের মধ্য দিয়ে অনার্য দেবতা শিবের পরাভবকে সূচিত করা হচ্ছে। রাবণ বিজয় সেই পরাভবের আর একদিক। কিন্তু তারই মধ্যে গুহক, সুগ্রীবসহ বানরকুল ও বিভীষণের সঙ্গে রামের সখ্যের কাহিনীর মধ্য দিয়ে আর্য–অনার্য মিলনের সুরও বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে বানর ও ভল্লুকদের সঙ্গে মিত্রতা করে রামের সৈন্যসজ্জা,

ববীন্দ্রনাথ তাদেব স্পষ্টতই বানব ও ভল্লুক উপাসক অনার্য বলে চিহ্নিত কবেছেন।

ববীন্দ্রনাথ বামাযণেব মধ্যে একটি রূপকার্থও আবিষ্কাব কবেছিলেন। বিদেহবাজ জনক যে হলকর্ষণ কবেন, তাঁব অযোনিসম্ভবা কন্যাব সীতা নামেব অর্থই যে লাঙ্গলেব বেখা আব বামচন্দ্র যে উদ্ধাব কবেন অহল্যাকে–যে অহল্যা কথাব অর্থ পতিত জমি–তা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত কবেন যে বামেব দক্ষিণ অভিযানেব মধ্যে আর্য কৃষিভিত্তিক সভ্যতাব বিস্তাবেব কাহিনীই প্রচ্ছন্ন আছে।

ববীন্দ্রনাথ তাঁব 'ভাবতবর্ষে ইতিহাসেব ধাবা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁব অনবদ্য ভাষায যে এইসব বক্তব্যগুলি উপস্থিত কবেছিলেন, তাব কতখানি গ্রহণযোগ্য আমি জানিনা, কিন্তু মহাকাব্যেব মধ্যে একটি অলিখিত ইতিহাসকে প্রচ্ছন্নরূপে আবিস্কাব কবে তিনি যে ঐতিহাসিকদেব ইতিহাস অনুসন্ধানেব একটি পথ নির্দেশ কবেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্য বিধানেব মধ্য দিযে ইতিহাসেব অগ্রগতিব এই তত্ত্বেব সঙ্গে মার্ক্সসেব পদ্ধতিব মিল বযেছে। বৈদিক যুগ থেকে বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধযুগ থেকে পুবাণেব যুগে প্রবেশকে তিনি বলছেন এক একটি বিপ্লব। তবে তাব এই বিপ্লবেব তত্ত্ব ইউবোপীয ছকেব সঙ্গে মেলেনা। এ বিষযে আলোচনাব প্রযোজন আছে। পবে একদিন তা কবা যাবে। এবং তা কবতে গিযে আব একটি প্রশ্নেবও সমাধান কবতে হবে। তা হল এই যে বৌদ্ধধর্মেব প্রাগ্রসব চিন্তা এবং মহামিলন, প্রেম ও মৈত্রীব বাণী শেষ পর্যন্ত ভাবতে টিকতে পাবল না কেন?

ঠিক আজই পৃথিবীব ইতিহাসে এমন এক বেদনাদাযক পবাজয ঘটল, যা এক ভিন্ন পবিপ্রেক্ষিতে হলেও ভাবতবর্ষে বৌদ্ধ ধাবাব পবাজযেব সঙ্গে নানাভাবে তুলনীয। আজ বাষ্ট্রপতি মিখাইল গোববাচভ পদত্যাগ কবলেন, মহামহিমময সোভিযেত দেশেব আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটল। তাব ভালোমন্দ ন্যায অন্যাযেব নানা বিচাব দীর্ঘদিন ধবে এখন চলবে। কিন্তু যে জিনিস আব একবাব প্রমাণিত হল, তা হল এই যে কোনও ব্যবস্থা বা নীতি কেবলমাত্র উত্তম হলেই টিকে থাকেনা, তা টিকিযে বাখাব জন্য লড়াই চাই এবং চাই অর্থনীতি, সমাজ ও জনমানসে অনুকূল ভিত্তি। বৌদ্ধ চিন্তা অনেক প্রাগ্রসব হওযা সত্ত্বেও ভাবতবর্ষেব আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থা ও জনমানস তাব পক্ষে প্রতিকূল হযেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সে তাই পবাভূত হযেছিল। তবে সে আলোচনা আপাতত স্থগিত বইল।

॥ চল্লিশ ॥

একটা বছব চলে গেল। অনেক ভগ্নস্তূপ পিছনে ফেলে আমবা নূতন বর্ষে প্রবেশ কবলাম। ফিবে তাকালে দেখতে পাই একেব পব এক স্বপ্নেব প্রাকাব বিধ্বস্ত হযে গেছে। তাব কান্না, দীর্ঘশ্বাস, বিক্ষোভ যেমন শুনতে পাচ্ছি, অন্যদিকে তেমনি শুনতে পাচ্ছি উল্লাসধ্বনি। আজকে কলকাতাব সর্বাগ্রগণ্য ইংবেজি দৈনিকটিব সম্পাদকীয মন্তব্যে পড়লাম যে মার্ক্সস এবং নেহরুব মত ব্যক্তিবা ইতিহাসে বাতিল হযে গেছেন। ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক ভালো কথা বলা সত্ত্বেও প্রবন্ধ লেখক ভুলে বসেছেন যে বর্ষপঞ্জী আব ইতিহাস এক নয। তাৎক্ষণিক ঘটনাব উপব ইতিহাসেব বায লেখাটা ভুল। তোমাকে তো ইতিপূর্বে লিখেছি যে কেমন কবে যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হওযাব তিনশ বছব পব ঈশ্বব বলে পবিগণিত হযেছিলেন। অপব দিকে বুদ্ধ তাঁব আশি বৎসবেব জীবনেই যদিও সাফল্য লাভ

কবেছিলেন কিন্তু তাঁব প্রচাবিত ধর্মেব এক বিশাল সাম্রাজ্যেব বাজধর্ম হতে লেগে গিযেছিল আবও আড়াইশ বছব। তাবও কযেক শতাব্দীব মধ্যে ঐ ধর্ম এ দেশ থেকে বিতাড়িত হযেও পৃথিবীব বৃহত্তম দেশেব মানুষেব ধর্মে পবিণত হযেছিল এবং এ দেশেও হিন্দুধর্মেব আববণেব মধ্যেই টিকে গিযেছিল। যীশুখ্রীষ্টেব বিবোধীবাই তাকে ঈশ্বব বানিযেছিল আব বৌদ্ধধর্মেব বিতাড়কবা বুদ্ধকে বানিযেছিল অবতাব। এব কোনওটাই দু এক বছবেব ব্যাপাব নয। কযেকশ বছব ধবে এই সব প্রক্রিযা চলেছিল। সুতবাং খববেব কাগজ পড়ে ইতিহাস সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী কবাটা কোনও কাজেব কথা নয। কথাটা তোমাকে আব একটু ব্যাখ্যা কবে বলি। যে সম্পাদকীযটিব কথা বলছি, তাব শিবোনামটি চমৎকাব ঃ 'Aryans ate beef'–'আর্যবা গোমাংস খেতেন'। কোনও এক স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইযে এ বকমেব একটা সত্য কথা লেখাব ফলে প্রচণ্ড হৈ হট্টগোলেব সৃষ্টি হযেছিল। সম্পাদক বলেছেন যে এই হট্টগোল হাস্যকব ও বিদ্যাচর্চাব স্বাধীনতাব পক্ষে প্রতিবন্ধক। সঠিক ভাবেই ইতিহাসকে মর্জি মাফিক লেখাব তিনি তাই বিবোধিতা কবেছেন। যাবা ঐ হৈ হট্টগোল কবছিল তাবা যে ভাবতবর্ষেব বড় বড় চাবটি বাজ্যে আজ ক্ষমতাসীন এবং তাবাই যে তাঁদেব এলাকায মর্জি মাফিক ইতিহাস লিখবাব ব্যবস্থা কবেছেন, সে কথা অবশ্য সম্পাদকীয লেখক বলেন নি। আজই ববং ঐ পত্রিকাব প্রথম পৃষ্ঠায বড় কবে খবব দেওযা আছে যে ঐ সব হট্টগোলকাবীদেব তথাকথিত 'একতা যাত্রা'কে স্বাগত জানাতে গুজবাটে বিপুল জনতা অপেক্ষা কবছে। গুজবাটে, অর্থাৎ কিনা গান্ধীজীব বাজ্যে। যে গান্ধীজী এই তথাকথিত 'একতা পন্থী'দেব একজনেব হাতে প্রাণ দিযেছিলেন। তাবলে উক্ত পত্রিকাব সম্পাদক নিশ্চযই এইসব ঘটনা থেকে মনে কবেন না যে সাম্প্রদাযিক ভাবনাব ক্ষেত্রে গান্ধীজী ইতিহাস কর্তৃক বাতিল আব তাঁব হত্যাকাবীবাই গৃহীত। এ বকম সিদ্ধান্ত হবে অদূবদৃষ্টিব লক্ষণ। ইতিহাস বড়ই নির্মম। কিন্তু অন্তিমে তা সত্যকেই জযী কবে। লেনিন, মার্ক্স, গান্ধীজীকে আজ যাবা ইতিহাসেব পাদপীঠ থেকে টেনে নামাচ্ছে, তাদেব অশালীন চিৎকাব কখনওই ইতিহাসেব বিজয বার্তা হতে পাবে না। যে নেহরুব প্রতি কটাক্ষ কবে তাঁব উদ্ধৃতি সম্পাদকীযটিতে দেওযা হযেছে, তাঁব সেই কথাটিই কি ঠিক নয যে ইতিহাস হল 'স্থিতাবস্থাব শক্তিসমূহেব সঙ্গে পবিবর্তনশীলতাব শক্তিগুলিব লড়াই'? এ লড়াই দীর্ঘস্থাযী হতে পাবে, কখনও কখনও স্থিতাবস্থাই জযীও হতে পাবে, কিন্তু পবিবর্তনেব অন্তিম বিজয অনিবার্য। তা না হলে তো মানব সভ্যতাব অগ্রগতিই স্তব্ধ হযে যাবে।

এখন, এইসব সামযিক জয পবাজযেব মধ্যে অনেকেব কাছে ইতিহাসটাকেই গোলকধাঁধা মনে হতে পাবে।মনে হতে পাবে পবস্পব যুযুধান নানা পক্ষ যেহেতু নিবন্তব তাব নিজেব নিজেব কোলে ঝোল টেনে চলেছে, অতএব, ইতিহাস নির্ভবযোগ্য নয। আমাদেব এই পত্রালাপেব একজন বিদগ্ধ পাঠকও তাই মনে কবেন।

আমাদেব আলোচিত বিষযগুলি নিযে তাঁব অনেক সুচিন্তিত ভাবনা দিল্লী থেকে তিনি লিখে পাঠিযেছেন। একদিন সেসব নিযে আলোচনা কবব। আজ শুধু ইতিহাস বিষযে তাঁব মন্তব্যটি তোমায শোনাচ্ছি। তিনি লিখছেন ঃ 'আপনি সত্যদর্শনেব উপায হিসাবে ইতিহাসেব আশ্রয নিযেছেন........। কিন্তু মুশকিল হল ইতিহাস কখনওই অবিকৃত অবস্থায পাওযা যায না। আগামীকালেব ইতিহাস বইযে কেউ লিখবে তখনকাব দিনে বন্যা হলে বিশেষ একটি মতে বিশ্বাসীবাই কেবল সবকাবি আনুকূল্য লাভ কবত,.......আবাব কেউ সেই একই সময ও স্থানেব কথা বলতে গিযে বলবে সবকাব

বন্যাপীড়িতদেব ব্যাপকভাবে সাহায্য কবত। অতএব ইতিহাসেব ওপব কোনও ভবসা নেই।'

একথা ঠিকই যে একই ঘটনা বা একই বস্তু দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণেব পার্থক্য হেতু নানা জনেব কাছে নানা বকম প্রতীযমান হতে পাবে। এই নানা বিপবীতমুখী ধাবণাব মধ্য থেকে কিছু সাধাবণ সত্যেব নিবিখ আবিস্কাব কবাই বিজ্ঞানেব কাজ। ইতিহাসও সে অর্থে একটি বিজ্ঞান। যেখানে নানা স্বার্থেব সংঘাত বযেছে, সেখানে তো বটেই, এমন কি অতি সাদামাটা ঘটনা সম্বন্ধেও ঐকমত্যে আসা অনেক সময কঠিন হয। এই যে কদিন ধবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, এসম্বন্ধেও দেখছি আমাব বাড়িতে নানা মতভেদ। আমাব মেযে বেবোবাব সময কিছুতেই মাফলাব নিতে চায না, বলে 'ঠাণ্ডা কোথায? এবকম প্রতিবাবই পড়ে।' আমাব অশীতিপব বৃদ্ধা মা আবাব প্রতিবাবই শীতেব কটা দিন বোজ বলেন 'এবাবেব মত শীত কখনও পড়ে নাই।' আবাব আমাব গৃহিনী বিচিত্ররূপিনী। সাবা দিন বলে কযে তাঁকে গবম জামা গাযে দেওযানো যায না, কিন্তু লেপেব নিচে ঢোকাব আগে তাঁব মোজা কার্ডিগ্যান ইত্যাদি'ত সুসজ্জিত হযে নেওযা চাই, না হলে নাকি শীতে ঘুম হবে না। এই নৈবাজ্যেব মধ্যে আমাদেব চিন্তাভাবনাকে আমল না দিযে ব্যাবোমিটাবেব পাবদ শৈত্যেব নির্ভুল হদিস দিযে চলে। শুধু তাই নয, শতবর্ষ আগে কোন দিনটি আজকেব চেযেও শীতলতব ছিল, নথিপত্র তাবও সঠিক হিসেব বলে দেয।

একথা ঠিকই, মানব–ইতিহাসেব ... প্রস্তুত কবাব মত এবকম কোনও বেডিমেড ব্যাবোমিটাব নেই, কিন্তু তাকে ... এপ ক...াব নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। যে কোনও ঐতিহাসিক নিদর্শনেব বযস নির্ণয কবাব জন্য 'কার্বন–১৪' পবীক্ষা এখন সম্পূর্ণ নির্ভবযোগ্য। লিখিত দলিল সাহিত্য ইত্যাদিব তুলনামূলক বিচাব, কোদাল গাঁইতিব সাহায্যে মাটিব ভিতব থেকে ইতিহাসেব সাক্ষ্য সংগ্রহ ইত্যাদি নানা প্রক্রিযায ইতিহাসকে জানাব চেষ্টা কবছেন পৃথিবীব বিভিন্ন প্রান্তেব বিদ্বজ্জনেবা। সত্যানুসন্ধিৎসাই তাঁদেব ব্রত। একথা সত্য যে এই অন্বেষণ কঠিন, অন্বেষণলব্ধসত্যকে বিচাব পুনর্বিচাব কবাও প্রযোজন এবং সমস্ত প্রকাবেব ভাবাবেগ ও একদেশদর্শিতা থেকে মুক্ত হযেই এ কাজ কবতে হবে। কিন্তু কঠিন বলেই তা পবিত্যজ্য নয। মানব জীবনেব কোন কাজটাই বা সহজ? সবচেযে সহজ বুঝি আহাব, নিদ্রা ও মৈথুন। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যাবে, তাও সহজ নয, এই সহজকে পাবাব জন্যেই কত মানুষ পাগল।

ইতিহাস ছাড়া আমবা ভবিষ্যতেব দিকে যাত্রা কবতে পাবি না। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন যে বাঙালী ইতিহাস ছাড়া বাঁচতে পাবে না, একথাটা তিনি তাবৎ মানবজাতিব পক্ষে সত্য বলেই বলেছিলেন। অতএব ইতিহাসেব সত্য যতই দুবধিগম্য হোক, তাকে পাবাব চেষ্টা কবতেই হবে। ঘটনাকে কাছে থেকে যাবা দেখে তাদেব নানা পক্ষেব নানা মতেব অবণ্য থেকে প্রকৃত ইতিহাসকে উদ্ধাব কবা ছাড়া পথ কী? আমাদেব উক্ত পাঠকই শুধু নন, তাঁব মত চিন্তা আবও অনেকেই কবেন। কদিন আগে 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' একজন নামী বিজ্ঞানচর্চাকাবীব প্রবন্ধ পড়লাম। তাতে তিনি বলছেন যে বিজ্ঞানেব ওপব ভবসা নেই, কাবণ বহু প্রশ্নেব জবাব সে জানে না। ঠিকই তো! বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূবিদ্যা, শাবীব বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র –কেউই সব প্রশ্নেব জবাব জানে না। সব প্রশ্নেব জবাব কোনওদিন জানাও যাবে না, কাবণ জানাব কোনও শেষ নেই। শুধু প্রশ্ন হল, বিজ্ঞান যদি না জানে তবে কে জানে? বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ভাবনা অনেক জেনেছে, আজ সে যা জানেনা কাল

তা জানাব চেষ্টা কবছে। অন্যদিকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কাব জানাব কোনও চেষ্টাই কবছে না। আমবা কোন পথ বেছে নেব? বাম এক আদর্শ চবিত্র ছিলেন বলে তাঁব পুজো কবব না বাম চবিত্রেব বিবর্তন সম্পর্কে ইতিহাস অনুসন্ধান কবে সত্যকে জানতে চাইব? কোনটা বেশি জরুবি? বিশ্বাস না সত্য? অন্ধ আনুগত্য না জ্ঞান? চিন্তাব স্বাধীনতা না শাস্ত্রেব অনুশাসন?

আদর্শ তো একটা স্থিব বস্তু নয়, কিংবা কোনও আদর্শে বিশ্বাস নয় চিবন্তন। একথা তো তোমাকে আগেই বলেছি যে বাল্মীকিব বামেব জনপ্রিযতা এজন্য নয় যে তিনি এক আদর্শ চবিত্র। এবকম আদর্শ চবিত্র আবও আছে, যেমন যুধিষ্ঠিব। আবাব বাম চবিত্র, ববং আবও বেশি 'আদর্শ' রূপে অঙ্কিত হযেছেন অন্য গ্রন্থে– যেমন, 'অধ্যাত্ম বামাযণে' বা 'যোগ বাশিষ্ট বামাযণে'। অথচ বাল্মীকিব বামেবই জনপ্রিযতা কেন? তাব কাবণ বাল্মীকিব বচনা কুশলতা। শৌর্যে, নিষ্ঠায, প্রেমে, দুর্বলতায বামেব যে মনোহব মূর্তি বাল্মীকি অঙ্কন কবেছেন, তা আজও তাঁব মহাকাব্যেব পাঠককে অভিভূত কবে। বাম যদি দোষগুণেব অতীত এক দেবতামাত্র হতেন, যদি তাঁব মধ্যে মানবোচিত দুর্বলতাগুলি প্রকাশ না পেত, যদি তিনি দুঃখে কাতব, প্রেমে অবিবেচক, কখনও কখনও ঈর্ষাবিদ্ধ বা অকাবণ ক্রোধে চঞ্চল না হতেন, তা হলে ঐ চবিত্রটি এত জনপ্রিযতা অর্জন কবতে পাবতনা। আদর্শ ও বাস্তবতা, কল্পনা ও স্বাভাবিকতা, মহত্ত্ব ও তুচ্ছতাব মিশ্রণই বাম চবিত্রকে সোহাগা মিশ্রিত সোনাব মত ঔজ্জ্বল্য দিযেছে।

বামকে আদর্শ ও বাস্তবেব মিশ্রণ রূপে অঙ্কন কবতে গিযে বাল্মীকি কী বকম দ্বন্দ্বেব সম্মুখীন হযেছিলেন, এবং তিনি কিভাবে তাব সমাধান কবাব চেষ্টা কবেছিলেন, আজ তোমাকে তাব একটি উদাহবণ দেব। বিষযটি সীতাব অগ্নি পবীক্ষা।

তোমাব কি এটা অস্বাভাবিক মনে হয না যে, যে সীতাকে ফিবে পাবাব জন্য বাম অত অসাধ্য সাধন কবলেন, সেই তাকেই লাভ কবাব পব হঠাৎ বামেব মধ্যে বৈবাগ্য উপস্থিত হল কেন? অপহৃতাকে গ্রহণ কবা যদি নীতিবিরুদ্ধই হবে তবে তাকে পাবাব জন্য এত সাগব লঙ্ঘন, এত যুদ্ধ, তাকে আনাব জন্য দূত প্রেবণ, তাকে নিযে আসা–এই সব কেন? কেনই বা সীতাকে ফিবে পাবাব জন্য বামেব বাবংবাব মর্মভেদী বিলাপ? বামেব এই সব বিলাপ কি কপটতা? কিন্তু বাম তো কৃষ্ণেব মত কপট নন। তা'হলে? এই স্ববিবোধিতাব একটাই ব্যাখ্যা হয। তা হল এই যে আদিতে যে কাহিনীটি ছিল, তাতে 'সতীত্ব' নিযে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। বাম বাবণকে পবাজিত কবে সীতাকে ফিবে পেলেন এবং বাম ও সীতা বাজা ও বানি হলেন–এটাই ছিল গল্প। কিন্তু বাল্মীকিব সমকালীন সমাজে ব্যাপাবটা এত সহজ ছিলনা। তাই তাঁকে সীতাকে দিযে অগ্নিপবীক্ষা কবাতে হল এবং তা কবাতে গিযে 'আদর্শ চবিত্র' বামকে কলঙ্কিত কবতে হল।

তুমি বলতে পাব, এসব আমাব স্বকপোল কল্পনা। বেশ, মহাভাবতেব 'বামোপাখ্যান'টি খুলে দেখ। সেখানে সীতাব 'অগ্নিপবীক্ষা' নেই। সেখানে বযেছে ইন্দ্র বরুন বাযু অগ্নি ইত্যাদি দেবতাদেব কাছে সীতাব সতীত্বেব ঘোষণা এবং দেবতাগণ কর্তৃক সেই ঘোষণাব সত্যতা স্বীকাব। তাহলেই দেখছ সীতাব অগ্নিপবীক্ষাটি সম্পূর্ণই বাল্মীকিব কল্পনা প্রসূত, মূল কাহিনীতে তা কখনওই ছিলনা।

বাল্মীকি অগ্নিপবীক্ষাব ঘটনাটি সৃষ্টি কবলেন কেন? প্রথমত এটা সম্ভব যে তাঁব সময়ে নাবীব সতীত্ব প্রমানেব জন্য অগ্নিপবীক্ষাব বীভৎস প্রথাব প্রচলন হযে গিযেছিল,

মহাভাবতেব 'বামোপাখ্যান' সংকলনেব কালে তা ছিল না। দ্বিতীযত এই নাটকীযতা সৃষ্টিব দ্বাবা মহাকবি সীতা চবিত্রেব ঔজ্জ্বল্যকে অনেক বাড়িযে তুললেন। এতে সমাজপতিবা সন্তুষ্ট হলেও তাঁবা লক্ষ্য কবেননি যে বাল্মীকি বাহ্যত ঃ সামাজিক বীতিকে মেনে নিলেও প্রকৃতপক্ষে কষাঘাত কবেছেন এই হৃদযহীন অমানবিকতাকে। এই কাজেব জন্য বামকে সীতাব জবানিতে বাল্মীকি নীচাশয বলে ভর্ৎসনা কবেছেন সমাজপতিবা বুঝতে পাবেননি, এ তাদেবই নীচাশযতাব বিরুদ্ধে ধিক্কাব, কাবণ সীতাব মুখে বাল্মীকি এটাও পবিস্কাব কবে দিতে ভোলেন নি যে সীতাব বিরুদ্ধে এই সন্দেহ বামেব পূর্বাপব আচবণেব সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। মহাকবি এমন অসঙ্গতি ঘটালেন কেন? নিশ্চযই সমাজপতিদেব দাবি মেনে নিযে।

আমাব এই সব কথায যদি তোমাব বিশ্বাস না হয, তাহলে বাল্মীকি বামাযণে অগ্নিপবীক্ষাব আগে সীতাব মুখেব কথাগুলিই একবাব শোন ঃ 'নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেমন রূঢ় কথা বলে, তুমি তা কেন বলছ? তুমি আমাকে যা ভাবছ, আমি তা নই। অস্বাধীন অবস্থায বাবণ আমাকে ছুঁযেছিল, কিন্তু তাব আমি কী কবতে পাবি? আমাব অধীন যে হৃদয, তা যে তোমাতেই ছিল, তা যদি এতদিন একসাথে থেকেও তুমি না বুঝে থাক তবে তাতেই তো আমাব সব নষ্ট হযে গেছে। তা ছাড়া তুমি যদি আমাকে পবিত্যাগই কববে, তবে হনুমানকে যখন আমাব খোঁজে পাঠিযেছিলে, তখন কেন তা জানাও নি? তা হলে তৎক্ষণাৎ আমি মবতাম, সকলেব এত কষ্ট হত না। তুমি বাগেব বশে নিতান্ত নীচ ব্যক্তিব মত এখন এসব বলছ। তুমি বিচাবক্ষম হযেও আমাব চবিত্র বুঝলেনা। লক্ষ্মণ' তুমি আমাব জন্য চিতা সাজাও। মৃত্যুই আমাব এই বিপদেব ঔষধ।'

এ সব কথাব কি কোনও জবাব আছে? প্রতিটি যুক্তিই অব্যর্থ। দ্রৌপদীকে আমবা তেজস্বিনী বলে জানি, কিন্তু এখানে সীতাও আগুনেব মত জ্বলে উঠেছেন। অগ্নি পবীক্ষা নয, এই অগ্নিবর্ষী ধিক্কাবই সীতাব পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠা কবে। লক্ষ্য কবে দেখ, সীতা বলছেন না যে তিনি প্রচলিত অর্থে 'সতী'। তিনি বলছেন, 'অস্বাধীন অবস্থায বাবণ আমাকে স্পর্শ কবেছিল, আমি তাব কই কবতে পাবি? আমাব দেহ যাই হোক, হৃদয মনে আমি তোমাতেই অনুবক্ত। অতএব আমি সতী।' পববর্তী কালেব সংস্কৃত কবিবা প্রেমকে দেহসর্বস্ব কবে ছেড়েছিলেন, কিন্তু বাল্মীকি বলছেন হৃদযেব প্রেমেব কথা, যাকে দৈহিক কোনও অনাচাবই কলুষিত কবতে পাবেনা। বাল্মীকি এই বক্তব্য মাথামোটা সমাজপতিবা ধবতে পাবেননি। কিন্তু বাল্মীকিব বাম এব তাৎপর্য বুঝতে পেবেছিলেন। তিনি তাই 'অবনত মুখে উপবিষ্ট' হযেই বইলেন, বাকপটু এই মানুষটি একটি কথাবও উত্তব দিতে পাবলেন না। বাল্মীকি লিখছেন, 'অনন্তব লক্ষ্মণ বোষবশে বামেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন এবং আকাবে প্রকাবে তাঁহাব মনোগত ভাব বুঝিতে পাবিযা তাঁহাবই আদেশে চিতা প্রস্তুত কবিলেন। তৎকালে সুহৃদগণেব মধ্যে কেউই ঐ কালান্তক যমতুল্য বামকে অনুনয কবিতে কি কথা কহিতে....সাহসী হইল না।'

বাল্মীকি তাঁব কালেব নীচতা থেকে বামকে বক্ষা কবতে পাবেন নি। আবাব এই নীচতা তিনি ক্ষমাও কবেন নি। সেখানেই তাব কবি জনোচিত মহত্ত্ব। তিনি সীতাব জবানিতে তাঁব 'আদর্শ মানুষ'কে 'নীচ ব্যক্তি' সম্বোধন কবিযেছেন। এছাড়া তাঁব উপায ছিল না। কাবণ, অগ্নি পবীক্ষা না কবালে বাল্মীকিব বামাযণই সমাজপতিদেব ছাড়পত্র পেত না।

আশা কবি তোমায বোঝাতে পেবেছি যে বিশ্বাস নয, যুক্তি ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিই

কেবল সমস্যাব সমাধান কবতে পাবে। বামাযণে অগ্নিপবীক্ষা আছে, মহাভাবতে নেই। তাহলে কোন বর্ণনাটি সত্য? আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকিকৃত বামাযণেব নাকি মহর্ষি বেদব্যাস বিবচিত পঞ্চম বেদ মহাভাবতেব? বিশুদ্ধ সত্য বলে ব্রহ্মাব সার্টিফিকেট তো পেযেছে উভযেই। 'বিশ্বাসী' এব কী জবাব দেবেন? জবাব দিতে হবে ইতিহাসকেই।

অপবদিকে সামাজিক অনুশাসন অনুযাযী সীতাব 'সতীত্বেব, পবীক্ষাব সঙ্গে বাম সীতাব সংশযাতীত প্রেমেব যে অসঙ্গতি, তাবই বা সমাধান কী? এ প্রশ্নেবও জবাব দেবে বিশ্বাস নয, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি।

ইতিহাস আমাদেব বলে যে 'আদর্শ' কোনও কাল নিবপেক্ষ বস্তু নয, যুগে যুগে তা বদলায। এই পবিবর্তনেব তাগিদে একই ঘটনা ও চবিত্র বিভিন্নকালেব সাহিত্যে নানা রূপান্তব লাভ কবে। 'বামাযণ' ও 'মহাভাবতে' একই কাহিনীব ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনাব বহস্য হল এই। এ ব্যাখ্যা মেনে নিলে বাম, ব্যাস ও বাল্মীকি, সকলেবই মহত্ত্ব বজায থাকে, আবাব পবিবর্তনশীল ইতিহাসটিও স্পষ্ট হযে ওঠে। বাল্মীকিব কালেব আদর্শেব সঙ্গে আমাদেব কালেব তো বটেই, এমন কি মহাভাবতেব কালেব এবং বাল্মীকিব নিজেব আদর্শবোধেব যে নানা দ্বন্দ্ব বযেছে, আগামীতে এ সম্বন্ধে আবও কিছু বিশদ বলাব ইচ্ছে বইল।

॥ একচল্লিশ ॥

তুমি অভিযোগ কবেছ যে আমাব চিন্তা নিম্নগামী, তাই বাম চবিত্রকে 'টেনে হিঁচড়ে নিম্নস্তবে নামিযে আনতে' আমি আনন্দ পাই। তোমাব আবও অভিযোগ যে আমি 'পাশ্চাত্যেব স্থূল ধ্যান ধাবণাব চর্বিতচর্বন' কবছি। তোমাব উষ্মাব আশু কাবণ বামেব বিবাহ প্রসঙ্গ। তুমি বলেছ যে পশ্চিমী কোনও গবেষক বা গবেষিকা এবকম একটা থিওবি খাড়া কবাব চেষ্টা কবেছেন যে বামেব একাধিক পত্নী ছিল। আমি নাকি সে কথাবই প্রতিধ্বনি কবেছি মাত্র। তা, পাশ্চাত্যেব মতামতে তোমাব এত আপত্তি আছে, তা তো জানতাম না। ম্যাক্সমুলাব, শেলিং, গ্যেটে, বর্লাঁব উদ্ধৃতি দিযে প্রাচীন ভাবতীয মহিমা প্রমাণে তো তোমাব কখনও ক্লান্তি নেই। সাহেবদেব যে কোনও প্রশংসাযই তো আমবা গদগদ হযে যাই। কেবল তাঁদেব মতটা অনুকূল না হলেই কি আপত্তি?

সুতবাং পাশ্চাত্যেব মতামতেব কথা থাক। আমি তো ভাই সাহেবদেব কোনও উদ্ধৃতি দিইনি। স্বযং মহাকবি বাল্মীকি যা লিখেছেন, তাবই উল্লেখ কবেছি মাত্র। 'বামোপাখ্যান' প্রসঙ্গে মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভাবতে যা লিখেছেন, তাও তোমায বলছি। ঐ মহাগ্রন্থে মহামুনি মার্কণ্ডেযেব জবানিতে শুনছি যে জানকী বামেব 'প্রিযতমা মহিষী' ছিলেন। প্রিযতমা যখন, তখন অন্য প্রিয ও প্রিযতববা নিশ্চযই ছিল। বাল্মীকি নিজেও কৌশল্যাব 'পুত্রবধূগণে'ব কথা বলেছেন। কিন্তু আধুনিক অনুবাদক ও সংকলকবা শব্দটিকে ভ্রান্ত বিবেচনায পবিবর্তন কবে নিযেছেন, যদিও অন্যভাবে একই কথা বামাযণে বযে গেছে। অযোধ্যা কাণ্ডেব অষ্টম সর্গে বামেব যৌববাজ্যে অভিষেকেব উদ্যোগেব খবব শুনে মন্থবা কৈকেযীকে কি বলছে শোন। সে নানা কথাব পব বলছে, 'জানকী সহচবীদেব সহিত আমোদ আহ্লাদে কালযাপন কবিবে, আব ভবতেব প্রভাব পবাহত দেখিযা তোমাব বধূবা মনেব দুঃখে ম্রিযমান হইবে'। অনুবাদক বামেব ক্ষেত্রে 'বধূবা' কথাটিকে 'বানব বধূবা'

করে দিয়েছেন, কিন্তু ভরতের ক্ষেত্রে তার আর কোনও পরিবর্তন করেননি। অথচ, ভরতের ও তো রামের মত এক স্ত্রীর কথাই আমরা জানি। নয় কি? অতএব ওহে ঐতিহ্যগর্বী! এই সোজা কথাটাই মেনে নাও যে রাজ অন্তঃপুরে শুধু বিবাহিতা স্ত্রীটিই বধূ নয়, তার সঙ্গে যৌতুক রূপে প্রাপ্ত অন্য সহচরীরাও বধূ। স্ত্রীর সঙ্গে তার সহচরীদের প্রতিও স্বামীর সমান যৌন অধিকার। এতে দুঃখিত হবার ও বিব্রত বোধ করবার কোনও কারণ নেই, এটাই ছিল সামাজিক প্রথা। হিন্দু রাজা ও অভিজাতদেরও 'হারেম' ছিল, বহু বিবাহ হিন্দু কুলীনদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বীভৎস ভাবে প্রচলিত ছিল। এবং আজও বহু বিশিষ্ট হিন্দু আছেন, যাঁদের একাধিক বিবাহের কথা আমরা জানি। সে সব কথা এখন থাক, রামায়ণের কথাই বরং আরও কিছু বলি। রামায়ণে এক পুরুষের এক স্ত্রীর কোনও সংস্কার নেই, শুধু তাই নয়, তাতে এক নারীর একমাত্র পতির সংস্কারটিও অনুপস্থিত। কথায় কথায় রামায়ণের 'আদর্শ' চরিত্রেরা যেভাবে নারীদের বলে দেয় অন্য পুরুষের কাছে চলে যেতে এবং বিবাহিতা নারীরা পর পুরুষদের বলে 'তুমি আমায় পাবেনা'–তাতেই বোঝা যায় স্ত্রীরা এই সমাজে বহু ভোগ্যা হতেন, তবে স্বেচ্ছায় নয়, পুরুষের ইচ্ছানুসারে। সেই বিখ্যাত সংলাপ তো তোমার মনেই আছে যখন বনের মধ্যে সোনার হরিণের মায়াময় ডাক শুনে সীতাকে ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক লক্ষ্মণকে সীতা তীব্র ভর্ৎসনা করে বলছেন, 'তোমার মৎলব আমি বুঝি। রাম বিগত হলেই তুমি অথবা ভরত আমাকে নেবে। সেই ফন্দি তোমরা আটছ।' সীতা লক্ষ্মণকে ক্রোধে গর্হিৎ কথা বলেছেন, কিন্তু রামের মৃত্যু হলে সীতা যে রামের ভাইয়ের অধিকারে চলে যাবেন, একথাটা বানিয়ে বলেন নি। রাম নিজেই সীতাকে আর এক জায়গায় খুব ঠাণ্ডা মাথায় বলছেন,'রাবণের ঘরে তুমি এতদিন ছিলে, এখন আর তোমাকে আমি নিতে পারব না। তুমি লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বিভীষণ বা সুগ্রীব–যার কাছে খুশি যাও, আমার কোনও আপত্তি নেই।' রাম শাস্ত্রবিরুদ্ধ বাজে কথা বলার লোক নন, সমাজে একরম প্রথা অপ্রচলিত থাকলে এ কথা তিনি নিশ্চয়ই বলতেন না। বন গমনের আগে রাম অযোধ্যা কাণ্ডের চতুর্বিংশ সর্গে কৌশল্যাকে যে বলেছেন, 'স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন ভর্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু', রামায়ণ বর্ণিত সমাজে একথাটাই পরম সত্য। সপ্তবিংশ সর্গে সীতাও রামকে বলছেন, 'স্ত্রীলোক আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারেনা, কেবল পতিই তার গতি।' স্ত্রীলোকের এই অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য তার একজন ভর্তা চাই। ভর্তা মৃত হলে অথবা ভর্তা তাকে পরিত্যাগ করলে সে অন্য ভর্তার অধিকারে যাবে, বলপ্রয়োগ দ্বারা অথবা বাধ্য হয়ে। রামায়ণে এই বিধিই বর্ণিত আছে। কথাটা কটু মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য। সীতা ও রামই এ কথা বলেছেন, আমি নয়। সীতা এই ব্যবস্থার জন্য দুঃখিত এবং প্রতিবাদী, কিন্তু রাম নন। এই ব্যবস্থাকে তিনি অনুমোদন করেন, এমন কি প্রিয়তমা সীতার জন্য এ বিধান দিতেও তাঁর কোনও কুণ্ঠা নেই। রামায়ণের অন্য চরিত্ররাও এ নিয়ম মেনে চলেন, এবং তাতেও রামের কোনও আপত্তি দেখা যায় না। সুগ্রীবের পত্নী রুমাকে হরণের জন্য বালীকে এবং সীতা হরণের অপরাধে রাবণকে রাম বধ করলেন। কিন্তু বালীর মৃত্যুর পর অনায়াসে রুমার সঙ্গে বালীর প্রিয়তমা মহিষী তারাও সুগ্রীবের পত্নী হলেন এবং রাবণের প্রিয়তমা রানি মন্দোদরী হলেন বিভীষণের পাটরানি। এ সব কিছুতে রাম বা লক্ষ্মণের কোনও আপত্তি দেখা যায়নি। তুমি হয়ত বলবে ওরা বানর, ওরা রাক্ষস–ওদের আচার আচরণ আলাদা। কিন্তু তা তো মানা যায় না। বাল্মীকি বানর ও রাক্ষসদের সমাজ ও আচার আচরণ হুবহু রামচন্দ্রের সমাজের মত

হয়েছে 'ধর্ম'। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে দ্যূত সভায় নিয়ে এল, আলুলায়িত বসনা একবস্ত্রা অর্ধনগ্না পাঞ্চালী বৃথাই সকলের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে লাগলেন এবং ভীম অত্যন্ত কুপিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে কঠোর কথা বলে উঠলেন, তখন দ্রৌপদীর প্রিয়তম স্বামী কৃষ্ণ সখা মহাবীর অর্জুন কি বলে উঠলেন জানো? বললেন, 'হে ভীমসেন! তুমি পূর্বে কখনও তো এমন দুর্বাক্য বলো নি। তোমার মতিভ্রম হয়েছে? হে বৃকোদর! ধর্মাচরণ কর। ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করো না। দেখ, মহারাজ ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে শত্রুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দ্যূত ক্রীড়া করেছেন, এটাই আমাদের পক্ষে যশস্কর'। তখন ভীম শুধু বললেন, 'ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্ষাত্রধর্মানুসারে কাজ করেছেন বলেই তো এখনও কিছু করিনি, না হলে তাঁর হাত দুখানা পুড়িয়ে দিতাম।'

দেখতে পাচ্ছতো ধর্ম কী? ধর্ম মানে 'রিলিজিয়ন' নয়, ধর্ম হল যা কিছু সমাজকে ধরে রাখে তাই। অর্থাৎ পাশ্চাত্যে যাকে 'ল' (Law) বলে আমরা তাকে বলি 'ধর্ম' এবং এই ধর্ম সমাজের বিধান অনুসারে অবশ্যপালনীয়। গ্রীক মহাকাব্যে যেমন নিয়তি, ভারতীয় মহাকাব্যে তেমনি নীতি বা ধর্ম। এই ধর্মের কাছে সকলেই অসহায়। ভীষ্ম শুধু বলতে পারেন,'হে কল্যাণি। ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞেরাও তা সম্যক নিরূপণ করতে পারে না, আমিও পারছি না।' ধর্মের এই ভয়ংকর অনুশাসন থেকে তাঁর পাত্রপাত্রীদের রক্ষা করার জন্য কবি তাই মাঝে মাঝে অলৌকিকতার আশ্রয় নেন। 'পোয়েটিক জাস্টিস' এর জোরে সীতা আগুনে ঢুকেও মরে না, অগ্নি দেব তাঁকে কোলে করে নিয়ে আসেন, আর দ্রৌপদীকে বস্ত্র যোগান স্বয়ং ধর্ম। মহাকবি লিখেছেন, 'মহাত্মা ধর্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। ধর্মের কি অনির্বচনীয় মহিমা' ধর্ম প্রভাবে নানা রাগরঞ্জিত বসন সকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরব্ধ হইল। মহীপালগণ দুঃশাসনকে ভর্ৎসনা করিয়া দ্রুপদনন্দিনীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।' মহাভারতের 'সভা পর্বে'র ৬৬নং অধ্যায়ে এই রকম লেখা আছে। রাজসভার ধর্ম, কৌরবসভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গ,মহামহা ধনুর্ধরগণ, ভীষ্মের মত জ্ঞানতপস্বী ও পুরোহিতগণের ধর্ম, স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম যখন যাজ্ঞসেনীর অসহায়তার কোনও প্রতিবিধান করতে পারেনা, তখন কবির ধর্ম তাঁকে রক্ষা করে। সমাজপতির ধর্মের ওপরে এইভাবে কবি তাঁর ধর্মের বিজয় বজায় রাখেন। সীতা ও দ্রৌপদীকে মহাকবিরা বাঁচিয়ে দেন। কিন্তু সমাজের অন্য নারীরা? তাদের কে বাঁচাবে? সতী নারীকে করে আগুন ছেড়ে দিয়েছে? ধর্ষিতা রমণীকে করে ধর্ম জুগিয়েছে এক টুকরোও কাপড়? কবি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে তাঁর কাব্যে সতী নারীকে যে জিতিয়ে দেন, তাকেই যদি তুমি ধর্ম বল, তবে বাস্তব জগতে তোমার কোনও ভরসা নেই। আর ভীষ্ম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, কর্ণ যাকে ধর্ম বলছেন, রাম যে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য 'কালান্তক যমে'র মত দাঁড়িয়ে আছেন, তাকে যদি ধর্ম বল, তবে তোমার কোনও ত্রাণ নেই । এই ধর্ম শাসকের পক্ষাবলম্বী ও নিষ্করুণ।

তুমি বলেছ রাম ধর্ম রক্ষার জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন তার জন্য আমাদের গর্ববোধ করা উচিত–সেই ধর্মই হিন্দুর গৌরব। রামের জন্মস্থান নিয়ে তোমার কোনও মাথাব্যথা নেই, কিন্তু রাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের যে উচ্চ আদর্শগুলির মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে, তার প্রতি তোমার অনুরাগ অত্যন্ত গভীর এবং এই কারণেই তুমি রামভক্ত, কোনও সঙ্কীর্ণতা এর মধ্যে নেই।

সমাজেব 'উচ্চ আদর্শ' যে বামাযণে প্রতিফলিত নয, সে কথা তো তোমায বললাম। তাই বামেব প্রতি আমাব মনোভাব ভিন্ন। তোমাব অনুভূতিব প্রতি শ্রদ্ধা বেখেও আমি বলব যে বাম আমাবও অতি প্রিয চবিত্র, কিন্তু তাঁব আদর্শেব প্রতি আমাব কোনও 'ভক্তি' নেই। আমাব প্রিযতম মানুষদেব মধ্যে তুমি একজন, কিন্তু তোমাব চিন্তা ভাবনা আদর্শেব প্রতি আমাব আনুগত্য থাকাব যেমন কোনও প্রশ্ন নেই, এও ঠিক তেমনি। আমাদেব পবম্পবেব চিন্তা ভাবনা নিযে যেমন আমবা আদান প্রদান কবি, বামেব চিন্তাভাবনা জীবন ও চবিত্র থেকে আমাদেবও নানাভাবে সমৃদ্ধ হতে ক্ষতি নেই। বাম চবিত্রেব মধ্যে আমবা যে এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, সুখে দুঃখে সমান স্থিতধী, কর্তব্যপবাযণ, অমিত তেজা ও অসাধাবণ বলশালী পুরুষকে প্রত্যক্ষ কবি, সহজেই তা আমাদেব মনোহবণ কবে। বিনয, মিষ্টবাক্য, নম্র ব্যবহাব, শ্রদ্ধা, বন্ধুবাৎসল্য ও প্রবল ব্যক্তিত্বেব দ্বাবা তিনি সকলেব মন জয কবে নেন। কিন্তু 'আদর্শ' জিনিসটা আলাদা। আদর্শ হল তাই, যা আমি নিজেও হতে চাই, এবং যা হবাব জন্য আমি অনেক কিছু হাবাতেও বাজি থাকি। বাম চবিত্র কি সে অর্থে অনুকবণযোগ্য? অন্তত আজকেব যুগে? এত কথাব পবও নিশ্চযই তুমি তা বলবেনা।

আমি তোমাকে বাববাব বলেছি যে বাল্মীকিব বামেব চেযেও 'আদর্শ' কবে বচনা কবা হযেছে অন্যান্য বামাযণ যেমন 'অধ্যাত্ম বামাযণে'ব বামকে, কিন্তু জনপ্রিযতায বাল্মীকিই সকলেব শীর্ষে। তাব কাবণ, বাম তাব কাব্যে এক অবতাব মাত্র নয, দোষে গুণে মানুষ। আদর্শ চবিত্রকে মানুষ শ্রদ্ধা কবে, কিন্তু সেই সব আদর্শেব মধ্যেও বাস্তব জীবনে যে ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি নিযে মানুষ, সাহিত্যে তাবই প্রতিফলন জনপ্রিয হয। ভাবতীয সাহিত্যে কোনও মহাকাব্যে যদি আদর্শ নাযকেব সন্ধান কবতে হয, তবে সেটি অশ্বঘোষ বচিত 'বুদ্ধচবিত'। সাহিত্যবসেব বিচাবে এই মহাকাব্যটি অতি উৎকৃষ্ট মানেব হওযা সত্ত্বেও জনপ্রিযতায বাল্মীকিব মহাকাব্য তাকে বহুদূব ছাড়িযে গেছে। অথচ বুদ্ধেব মহত্ত্বেব সঙ্গে বামেব কোনও তুলনাই চলেনা। বুদ্ধ মানুষেব দুঃখে কাতব হযে এই জগতকে দুঃখ থেকে মুক্ত কবাব জন্য বাজত্ব, ভার্যা, ধনবত্ন ও কামিনীকুলকে পবিত্যাগ কবে এক অজানা জগতে পাড়ি দিলেন। নানা প্রলোভন ও বৈবিতাকে জয কবে অবশেষে তিনি ধর্মচক্র স্থাপন কবলেন–যে ধর্মেব মূলে কথা হল কল্যাণ, প্রেম, মৈত্রী ও অহিংসা।

বামও বাজ্য পবিত্যাগ কবে বনে গেলেন বটে কিন্তু তা বুদ্ধেব মত চিবদিনেব জন্য নয, মাত্র চৌদ্দ বৎসবেব জন্য, এবং এই ত্যাগ ভ্রাতৃপ্রীতি বা নিবাসক্তিব জন্যও নয, এব কাবণ হল 'ধর্ম' অর্থাৎ সামাজিক বিধিব প্রতি আনুগত্য, লোক ভয ও পবলোক ভীতি। আপত্তি কববে? বেশ, বামেব জবানিতেই কথাগুলি শোনা যাক। অযোধ্যা কাণ্ডেব একবিংশ সর্গে বাম কৌশল্যাকে বলছেন, 'আমি বনে যাইব, আপনি অনুমতি প্রদান করুন।....আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইযা পুনবায গৃহে প্রত্যাগমন কবিব। শোক কবিবেন না,...আমি নিশ্চয কহিতেছি, পিতাব আদেশ পালন কবিযা বনবাস হইতে পুনর্বাব গৃহে প্রত্যাবর্তন কবিব। দেখুন, আপনি, আমি, জানকী, লক্ষ্মণ ও সুমিত্রা,– আমবা এই কযজন পিতা যাহা বলিবেন তাহাই কবিব, ইহাই যথার্থ ধর্ম।' 'ধর্ম' কেন? বাম লক্ষ্মণকে বলছেন, 'মহাবাজ আমাদেব পিতা, আমাদিগেব উপব তাঁহাব সর্বাঙ্গীণ প্রভুতা আছে। বিশেষতঃ কৌশল্যাব তিনি ভর্তা, তিনিই গতি, তিনিই ধর্ম।.... তাঁহাব আজ্ঞাক্রমে তিনিও অন্য অনাথা স্ত্রীলোকেব ন্যায আমাব সহিত এই স্থান হইতে বহিষ্কৃত হইতে পাবেন। অতএব ইনি বনগমন বিষযে আমাদেব আদেশ করুন, আমি ব্রতকাল পূর্ণ কবিযা যাহাতে প্রত্যাগমন

কবিতে পাবি আমায এই রূপ আর্শীবাদ করুন।...জীবন কাহাবই চিবস্থাযী নহে, সুতবাং অধর্মানুসাবে অদ্য এই তুচ্ছ পৃথিবীকে হস্তগত কবিতে আমাব কিছুতেই স্পৃহা হইবে না।' বাম নির্লোভ নন, চৌদ্দ বৎসব পব নিজেব বাজ্য ফিবে পেতে তাঁব উৎকণ্ঠা বযেছে, কিন্তু এই বাজ্যেব এবং পুত্র ও পত্নীব উপবে বাজাব যে 'সর্বাঙ্গীণ প্রভুতা' বযেছে, সে কথা মনে বেখে তিনি বিবোধে যেতে প্রস্তুত নন। পিতৃ 'আজ্ঞা' অন্যায জেনেও তিনি তা পালনে প্রস্তুত, কাবণ প্রচলিত ধর্ম বাজ্যেব ওপবে বাজাব, পুত্রেব ওপবে পিতাব এবং পত্নীব ওপবে পতিব 'সর্বাঙ্গীণ' প্রভুতাকেই স্বীকাব কবে। অন্যাযকাবীব এই প্রভুত্বকে কি তুমি ন্যাযসঙ্গত মনে কব?

বাজ্য ত্যাগ কবে বামেব মনে যে বেদনা ও ক্ষোভ জমা হযেছিল, তা প্রকাশ পায ঐ সর্গেব ত্রিপঞ্চাশ সর্গে। সেখানে তিনি লক্ষ্মণকে বলছেন,'.....বাজাব মতিভ্রম ও এই বিপদ উপস্থিত দেখিযা আমাব নিশ্চয প্রতীত হইযাছে যে ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। দেখ, পিতা যেমন আমাকে পবিত্যাগ কবিলেন এই রূপ স্ত্রীব প্রবর্তনায মূর্খও কি আজ্ঞাব'হী পুত্রকে ত্যাগ কবিতে পাবে? ভার্যাব সহিত ভবতই সুখী, তিনি একাকী অধিবাজেব ন্যায সমগ্র কোশল বাজ্য উপভোগ কবিবেন। পিতা জীর্ণ হইযাছেন, আমিও অবণ্য আশ্রয কবিলাম, সুতবাং তিনি একাকীই বাজা হইবেন । কৌশল্যা, সুমিত্রা, দশবথ ও নিজেব দুর্ভাগ্যেব জন্য শোক কবতে কবতে বাম বললেন, 'মনে কবিলে আমি বোষ ভবে একাকী শবনিকবে অযোধ্যা কি সমগ্র পৃথিবীও নিষ্কন্টক কবিতে পাবি, কিন্তু ভাই' আমি কেবল পবলোক ভয ও অধর্ম ভযেই বাজ্য গ্রহণ কবিলাম না।

বাল্মীকি লিখছেন এই সব বলতে বলতে ও বিলাপ কবতে কবতে বাম 'অশ্রুপূর্ণ মুখ' হলেন। বামেব এই বিষাদ স্বাভাবিক, কিন্তু তা নিতান্তই সাধাবণ মানুষ সুলভ, এতে কোনও আদর্শ নেই। বুদ্ধ অকুতোভযে সংসাব ধর্মকে তুচ্ছ কবে বাজ্য ত্যাগ কবেন, আব বাম বাজ্যলোভ ও সংসাবেব প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও 'ধর্ম ভযে ও পবলোকেব ভযে' বাজ্য ছেড়ে গিযে বিলাপ কবেন। কোনটি আদর্শ?– বুদ্ধ না বাম? সাধাবণ মানুষেব পক্ষে কোনটি স্বাভাবিক, বামেব মত বিলাপ, না বুদ্ধেব মত নির্বেদ?

আমি ববং বলব, ভবত বামাযণেব এক আদশ চবিত্র। তিনি অন্যাযেব প্রতিবাদ কবেন, অযাচিত ধনে লোভ কবেন না, এবং যথার্থ ভ্রাতৃপ্রেমেব বশবর্তী হযে অনাযাসে লব্ধ বাজ্য জ্যেষ্ঠ এ্াতাকে প্রত্যর্পণ কবেন। সেই ভবতেব প্রতি বাব বাব বাম নানাভাবে সন্দেহ প্রকাশ কবেছেন ও অন্যায মন্তব্য কবেছেন। প্রখ্যাত ইতিহাসকাব, গবেষক ও পণ্ডিত দীনেশ চন্দ্র সেন ভবতেব প্রতি এই অবিচাবেব সমালোচনা কবেছেন, কিন্তু বাল্মীকি অঙ্কিত বামেব পক্ষে এটাই ছিল স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি বাধ্য হযে কিছু ত্যাগ কবেন, তাব মনে অসূযা ও বিদ্বেষ থাকাই সম্ভব। বামেব মধ্যে তাবই প্রকাশ ঘটিযে বাল্মীকি এই চবিত্রটিকে বাস্তব কবে তুলেছেন। বাল্মীকিব বাম তাই বক্তমাংসেব মানুষ। তিনি বিবাট, কখনও কখনও তিনি মহান, তিনি প্রিযও, কিন্তু অশ্বঘোষেব 'বুদ্ধ চবিতে ব নাযকেব মত এক আদর্শ মহামানব তিনি নন। তোমাব অভিযোগ সত্য নয। বাম চবিত্রকে কলঙ্কিত কবা আমাব উদ্দেশ্য নয। মহাকবি যেভাবে চবিত্রটিকে সৃষ্টি কবেছেন, ঠিক সেভাবেই আমি তাকে অবিকৃত তুলে ধবতে চাইছি মাত্র।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

এ বছব হযে গেছে, তোমাব সাথে এই নিযমিত পত্রালাপ চলছে। এবই মধ্যে বিশ্বে কী অভূতপূর্ব সব পবিবর্তন ঘটে গেল। লক্ষ লক্ষ শহীদেব বক্তে বাঙানো লাল পতাকা প্রায বিনা প্রতিবোধে পৃথিবীব বিশাল অঞ্চল জুড়ে ক্ষমতাব শীর্ষ থেকে নিচে নেমে গেল। আজ তাই অত্যাচাবীব আনন্দেব দিন। বুশ সাহেবদেব ঔদ্ধত্য অশালীন চিৎকাবে পৃথিবীকে ভয ধবিযে দিতে চাইছে। কিন্তু সেই বলদর্পী বুশ যখন জাপানেব প্রধানমন্ত্রীব পাযেব কাছে বমি কবে লুটোপুটি খান আব গোপনে বাখা ক্যামেবায ধবা পড়ে তা প্রচাবিত হযে যায, তখন তা লুটেবাদেব বখবা নিযে পাবস্পবিক দ্বন্দ্বেব এক প্রতীকী ছবি হযে উঠে। গবজ বড় বালাই। তাই অসুস্থতা নিযেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছোট তবফ জাপানেব ঘবে ছোটেন তোযাজ কবতে। তাতে মানও গেল, পেটও ভবল না। বুশ শূন্য হাতে ফিবে এসে নিজেব দেশে এখন ধিক্কাব কুড়োচ্ছেন। তাই মান বাখতে আবাব সাদ্দামেব পিছনে লেগেছেন তাঁকে ইবাকেব তখত থেকে হটাতে পাবেন কিনা। এই হল মার্কিন 'গণতন্ত্র'।

ভিযেৎনাম, চিলি, বাংলাদেশ, নিকাবাগুযা–সর্বত্রই ওদেশেব বোম্বেটেবা নিজেদেব নাক গলাবাব অধিকাবকেই বলেছে 'গণতন্ত্র'। বাশিযায যে এখন কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ কবে দেওযা হযেছে, তাও ওদেব বড় পছন্দসই 'গণতন্ত্র'। অর্থাৎ সকলেব জন্য সমান অধিকাব বা মানবিক অধিকাবেব কথাটা ওবা যখন বলে, তখন ওদেব আসল লক্ষ্য হল প্রভুত্ব ও শোষণেব অধিকাব, গণতন্ত্রেব সঙ্গে তাব কোনও প্রকৃত সম্পর্ক নেই। পৃথিবীব বিবাট অঞ্চল জুড়ে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমেব বিপর্যযে এবা যে খুশি হবে, তাতে সন্দেহ কি। কিন্তু বাছাধনেবা নিজেদেব দগদগে ঘাগুলি লুকোবে কি কবে? পৃথিবীব সবচেযে সম্পদশালী দেশেব অলিতে গলিতে পথে ফুটপাতে ক্ষুধাব বিপুল বাজত্ব আব অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশে বক্তপতাকাকে নামিযে দেওযাব সঙ্গে সঙ্গেই দাবিদ্র্য, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বেকাবিব শকুনে ওসব দেশেব আকাশ আজ আচ্ছন্ন। সঙ্কটেব কালোছাযা ভাবতেব আকাশকেও ছেযে ফেলেছে। স্বাধীনতাব পব দীর্ঘদিন ধবে আমবা যে 'কল্যাণ বাষ্ট্রেব' বুলি আউড়েছি, তাকে বাতিল কবে দিযে নূতন সব তত্ত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। বিদেশী বড় বড় পুঁজিপতিদেব জন্য এখন খোলা দবজা দিযে ঢুকে পড়াব আমন্ত্রণ, আব দেশেব শ্রমিকদেব জন্য খোলা দবজা দিযে বিদেয হওযাব নোটিশ। আত্মনির্ভবতাব কথা এখন সেকেলে হযে গেছে। এখন দেশকে বিকিযে দেওযাব পালা চলছে। নেহরু যে পবিকল্পিত অর্থনীতিব প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন, যা'ব ফলে দেশেব বিবাট বিবাট শিল্প গড়ে উঠেছে তাব সমস্ত ফযদাটুকু লুটে নেবাব পব এখন টাটা বিড়লাবা দেশেব দুর্দশাব জন্য পবিকল্পিত অর্থনীতিকেই দাযি কবছে।

আব মজাব কথা হল নেহরুব উত্তবাধিকাবীবা এই অকৃতজ্ঞদেব কথাই মেনে নিচ্ছে এবং একই সঙ্গে পবিকল্পিত অর্থনীতিব প্রবক্তা দেশেব মহান আত্মত্যাগী নেতা সুভাষচন্দ্র ও পবিকল্পিত অর্থনীতিব এক নম্বব বিবোধী মুনাফা অর্জনকাবী শিল্পপতি জে, আব, ডি, টাটাকে 'ভাবত বত্ন' উপাধি দিযে নিজেদেব দেউলিযাপনা প্রকট কবে তুলেছে, প্রমাণ কবেছে যে শুধু নেতৃত্বদানে নয সাধাবণ কাণ্ডজ্ঞানেও এবা নিঃস্ব। এই যখন এক সর্বগ্রাসী

নৈরাশ্যজনক অবস্থা, তখন একে একে নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আর গান্ধী–নেহরুর 'বিবিধের মাঝে ঐক্যবদ্ধ' ভারতের স্বপ্নকে ভূলুণ্ঠিত করে বিভেদকামী আত্মম্ভরী ও কর্তৃত্বপরায়ণ ধর্মধ্বজী ঠেঙাড়ের দল পবিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, তাতে আর বিস্ময় কি? 'আমরা সকলেই ভারতীয়'–এ কথার পরিবর্তে অতি উচ্চকণ্ঠে এখন দেশের 'বড় বড়' নেতারা নিজ নিজ ধর্ম ও ভাষার প্রতিভূ হিসেবে কথা বলতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করছেন না, খোলাখুলি তারা সাম্প্রদায়িক প্রচার করছেন, সংবিধানের কোনও তোয়াক্কা না করে। আশ্চর্যের কথা কী জান? দেশের শাসন কর্তা ও বড় বড় পত্রিকাগুলি, যারা এতদিন কমিউনিস্টরা কোথায় 'পবিত্র সংবিধান,' বিচারব্যবস্থা ও আইনের বিরোধিতা করছে, তা দেখার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকত, তাদের 'দেশাত্মবোধ' ও 'জাতীয়তাবোধ' এখন অবশ হয়ে আছে। দেশের উচ্চতম স্থানগুলি থেকে দীর্ঘলালিত সব মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে।

তুমি ভেবনা যে অশ্রু বিসর্জন করার জন্য আজ আমি চিঠি লিখতে বসেছি। ইতিহাসকে যারা লড়াই বলে মনে করে, তারা এও জানে যে লড়াইয়ে হার জিৎ দুই–ই হয়। অন্যায়, অবিচার ও অস্বাভাবিকতা আজ যদি জয়ী হয়ে থাকে, কাল তার পরাজয় অনিবার্য। 'সত্যমেব জয়তে' কথাটা আমি এই অর্থে মানি। সুতরাং, আমি কোনও দুঃখ প্রকাশ করছি না, আমি তোমাকে দেখাতে চাইছি যে আদর্শ, নীতি, মূল্যবোধ, ধর্ম ইত্যাদির ধারণাগুলি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনা, বারবার তার পরিবর্তন হয়। জয়–পরাজয় ও উত্থান–পতনের মধ্যে দিয়ে নানা স্বার্থ ও নানা চিন্তার সংঘর্ষেই ইতিহাস এগিয়ে চলে।

বেদের যুগ থেকে রামায়ণের কাল পর্যন্ত নানা রীতিনীতির এই পরিবর্তনের অনেক প্রমাণ তোমাকে আমি দিয়েছি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে বেদের প্রথম যুগে নারী ছিল স্বয়ংশাসিতা। নারীর ওপর পুরুষের অধিকার তখন স্থাপিত হয়নি, উর্বশীরা পুরুষদের একচ্ছত্র মালিকানায় তাই যেতে রাজি হতনা কিছুতেই। মহাভারতেও দেখতে পাই শান্তনু গঙ্গাকে বাঁধতে পারেন নি, যেদিন একাধিপত্য চেয়েছেন, গঙ্গা ফিরে গেছেন নিজের ঘরে। আবার দেখ দ্রৌপদীর সঙ্গে পাঁচ ভাইয়ের একত্রে বিবাহের বৃত্তান্তও রয়ে গেছে ঐ মহাকাব্যে। নানা গল্প কাহিনী বলে এই 'অশাস্ত্রীয়' ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন ব্যাসদেব, কিন্তু সেগুলি অজুহাত হিসেবে পোক্ত হয়নি। পাণ্ডবদের জন্ম বৃত্তান্তেও দেখা যাচ্ছে যে কুন্তীর বহুচারিতারই ফল তারা। দ্রোণের জন্ম নাকি কলসীতে আর সত্যবতীর জন্ম মাছের পেটে। এইসব অলৌকিক জন্ম কথার মানে একটাই, তা হল এই যে এইসব পুরাণ কাহিনী যখন সঙ্কলিত হয়েছিল, তখনকার সংস্কারের পক্ষে পুরুষের পরিবর্তে নারীর ইচ্ছাধীন এইসব জন্ম বৃত্তান্ত মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এদের পিতৃপরিচয় ছিল অজ্ঞাত, তাই নানা দেবতা–গন্ধর্ব–অপ্সরা ইত্যাদির যত গল্প। আমরাও তো ছেলেবেলায় দেখেছি, আমাদের মা–বাবা–মাসি–পিসিরা যে কথা লুকোতে চাইতেন, তা নিয়ে একটা আষাঢ়ে গল্প জুড়তেন, আমরাও বিশ্বাস করতাম। মরে গেলে বলা হত, স্বর্গে বেড়াতে গেছে, সন্তান হওয়াকে বলা হত ভগবানের আশীর্বাদ, ভাই হলে বলা হত মা হাসপাতাল থেকে কিনে এনেছে, ইত্যাদি এমনি সব কথা। প্রাচীন পুরাণকারেরাও তেমনি নানা অলৌকিক কথা বলে বাস্তব সত্যটিকে আড়াল করতেন। কুন্তীর মন্ত্রবলে দেবতাদের 'বরে' সন্তান হওয়ার কাহিনীও এমনি গল্প কথা। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী এক অতীত বৃত্তান্ত, মহাকবি তাকে কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে নানা অলৌকিক অজুহাতের দ্বারা শোধন করে নিয়েছেন। এই উপলক্ষে আমি ডঃ অতুল সুরের

লেখা 'ভাবতে বিবাহেব ইতিহাস' গ্রন্থেব দ্বিতীয অধ্যায থেকে কযেকটি লাইন তুলে দিচ্ছি, পড়ে দেখ ঃ 'বৈদিক যুগে..... নবপবিণীতাব বিবাহ কোনও বিশেষ ব্যক্তিব সঙ্গে হতনা, তাব সমস্ত সহোদব ভ্রাতাগণেব সঙ্গেই হত। অন্তত আপস্তম্ব ধর্মসূত্রেব যুগ পর্যন্ত এই বীতি প্রচলিত ছিল।....পববর্তী কালে মনু বিধান দিযেছিলেন যে কলি যুগে কন্যাব বিবাহ যেন সমগ্র পবিবাবেব সঙ্গে যৌথভাবে না হয। তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে কলিকালেব পূর্বে কন্যাব বিবাহ সমগ্র পবিবাবেব সঙ্গেই হত।' কথাগুলি প্রণিধান যোগ্য।

মহাভাবত যে যুগে বচিত হয, সে যুগে নাবীব স্বতন্ত্রতা আব ছিলনা। তাই দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীব পত্নী হলেও আদিযুগেব নাবীব মত তাঁব হাতে নিযন্ত্রণেব ক্ষমতা ছিলনা, তিনি সেখানে স্বামীদেব যৌথ সম্পত্তিব চেযে বেশি কিছু নন। স্ত্রী যে জমিব মতই পুরুষেব সম্পত্তি সে কথাটা প্রকট হযেছে ক্ষেত্রজ সন্তান ও নিযোগ প্রথাব তত্ত্বে। বিচিত্রবীর্যেব মৃত্যুব পব তাঁব দুই স্ত্রী অম্বা ও অম্বালিকা এবং তাঁদেব দাসীব গর্ভে ব্যাসদেব 'নিযোগ প্রথা' অনুযাযী সত্যবতীব দ্বাবা আদিষ্ট হযে যে 'ক্ষেত্রজ' পুত্রদেব উৎপাদন কবেছিলেন, তাঁবাই মহাভাবতেব তিন বিখ্যাত চবিত্র–ধৃতবাষ্ট্র, পাণ্ডু আব বিদুব। এখানে স্ত্রীবা হলেন ক্ষেত্র অর্থাৎ জমি। জমিতে যেই বীজ বপন করুক, ফসলেব মালিক যেমন ক্ষেত্রপতি, তেমনি স্ত্রীব গর্ভে যেই সন্তান উৎপাদন করুক, সন্তানেব পিতা হলেন স্ত্রীব পতি–'ক্ষেত্রজ সন্তানে'ব ধাবণাব পিছনে এই লজিক ক্রিযা কবেছিল, এবং পুবাতন সমাজে তা প্রচলিত ছিল। মহাভাবতে 'ক্ষেত্রজ' পুত্রেব উদাহবণ আবও অনেক আছে। পাণ্ডববাও পাণ্ডুব 'ক্ষেত্র' কুন্তী ও মাদ্রীব গর্ভে অন্যেব দ্বাবা উৎপাদিত হযেছিলেন। শাস্ত্রমতে মহাভাবত হল পুবাণ, তাই অনেক কথা তাতে খোলাখুলি বলা আছে। কিন্তু বামাযণ হল কাব্য, তাই তাতে সংস্কাব বিরুদ্ধ কথা সাধাবণত সবাসবি বলা হযনি। খানিকটা অনুমান কবে নিতে হয। যেমন দশবথ ছিলেন কোশল বাজ আব কৌশল্যা নামেই প্রকাশ যে তিনি কোশল বাজকন্যা, অতএব তাঁবা দুইজন যে আত্মীয ছিলেন তা বোঝাই যায। আবাব দশবথেব চাব পুত্রও তাঁব নিজেব নয, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিব যজ্ঞেব ফল খেযে তাঁবা হযেছিলেন। অর্থাৎ বামেবা দশবথেব ঔবস পুত্র নয ক্ষেত্রজ পুত্র। সীতাও জনকেব নিজেব ঔবস কন্যা নয। এইভাবেই বামাযণেও কিছু কিছু আদিমতাব চিহ্ন বযে গেছে। আমি তোমাকে আগেই দেখিযেছি যে একপত্নীক পুরুষেব আদর্শ বামাযণ মহাভাবতে কোথাও নেই। বামাযণে নাবীব একনিষ্ঠ পতিপ্রাণতাব একটা আদর্শ তুলে ধবা হযেছে বটে কিন্তু সেটি নিশ্ছিদ্র নয। একই নাবীব দ্বিতীয পতি গ্রহণেব কথা তাতে অকপটে বলা আছে, এবং তা প্রধান চবিত্র বামেব দ্বাবা সমর্থিতও হচ্ছে। তাঁবই মধ্যে এসে পড়েছে সীতাব ভযংকব অগ্নি পবীক্ষাব বৃত্তান্ত। আমি তোমাকে দেখিযেছি যে এই পবীক্ষাব কথা মহাভাবতেব কাহিনীতে নেই, এবং তা বাল্মীকিবও অভিপ্রেত ছিল না। বিবহী বামেব বহু বিলাপেব মধ্যে এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ উল্লেখ নেই। সীতাকে না পেযে বাম যখন তাঁকে উদভ্রান্তেব মত খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সে সময এক জাযগায দেখলেন মত্ত পুরুষ ও সীতাব পদচিহ্ন, বক্তবেখা, অলঙ্কাব চূর্ণ, ভগ্ন ধনুক ও তূনীব ইত্যাদি। বাম তখন দেবতাদেব প্রতি ক্ষিপ্ত হযে উঠলেন, হুংকাব দিযে বললেন, আমি ভালোমানুষ বলে আমাবই যত নিগ্রহ। বেশ তবে দেবতাবা দেখুন, আমি এই বিশ্বসংসাব ধ্বংস কবে দেব, 'যদি দেবগণ পূর্ববৎ কুশলিনী সীতাকে আমায অর্পণ না কবেন, তিনি হৃত বা মৃতই হোন, যদি তাঁহাকে না দেন, তবে আমি সমস্ত সংসাবই ছাবখাব কবিব।' তাবপব যখন জটাযুব কাছে সীতা হবণেব সংবাদ পান, তখন তাঁব তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিযা বাল্মীকি লিপিবদ্ধ কবেছেন এইভাবে ঃ 'বাম

বিহঙ্গবাজ জটাযুব মুখে সীতা সংক্রান্ত প্রিয সংবাদ পাইযা দ্বিগুণ সন্তপ্ত হইযা উঠিলেন, এবং শবাসন বিসর্জন ও অবশ দেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক বোদন কবিতে কবিতে ভূতলে পতিত হইলেন।' হৃত নাবীকে যে পবিত্যাগ কবতে হবে, এ বকম কোনও কথা বামেব মুখে নেই, ববং হৃত সীতাকে ফিবে পাবাব ব্যাকুলতাই আছে। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায যে বামাযণে অগ্নি পবীক্ষাব অংশটি তৎকালীন সামাজিক অনুশাসনেব সঙ্গে সঙ্গতি বক্ষাব জন্যই বচিত হযেছিল। গত কিছুদিন ধবে দেশে বিদেশে যেমন একটা প্রতিক্রিযাব, ন্যায ও শুভবুদ্ধিব পশ্চাদপসবণেব যুগ চলছে, বামাযণ বচনাব যুগটিও ছিল তেমনি। নাবীব যে পবাধীনতা সেখানে অঙ্কিত হযেছে, তাব আগেব যুগে তা ছিলনা, বাল্মিকীব কবি মনও তাকে সম্পূর্ণ স্বীকাব কবেনি এবং আধুনিক নীতিবোধেব সমর্থন তা পেতেই পাবে না। বৌদ্ধ বিদ্বেষী, নাবী বিদ্বেষী, পুরুষ শাসিত এক বলদর্পী সমাজেব মাঝখানে বসে কবি যা বচনা কবেছিলেন তাব মধ্যে এই নূতন ও পুবাতনেব দ্বন্দ্ব, দুর্বলেব প্রতি সবলেব অন্যায আচবণ ও সে কাবণে কবিব বেদনা যদি তুমি দেখতে পাও, তবে আব অহেতুক বামাযণেব সব নীতিগুলিকেই 'চিবন্তন' বলে তোমাব মনে হবে না। মহাকাব্যেব চবিত্রবা অত্যন্ত বড় মাপেব মানুষ। তাদেব ভুল, দোষ, গুণ, কামনা বাসনা, প্রেম, আত্মত্যাগ, আত্মসাৎ–সবই সাধাবণেব চেযে অনেক বড় মাপেব, শুধু আমাদেব নয অন্য দেশেব মহাকাব্যেও। তাব মধ্য থেকে যদি কিছু মহৎ আদর্শ খুঁজে নিতে পাবি, তাতে দোষেব কিছু নেই, কিন্তু মহাকাব্যেব কালকে বা তাব কোনও এক বা একাধিক চবিত্রকে একালে অনুকবণীয আদর্শেব প্রতিভূ মনে কবাটা বিপজ্জনক। খানিকটা হাস্যকবও। সেকালেব নমস্য নাযক নাযিকাদেব বিবাহ বহির্ভূত জন্ম কথা, বাজবাজাদেব বড় বড় হাবেম, এক পতিব বহু পত্নী ও এক পত্নীব বহু পতি, নিযোগ প্রথা, শ্রদ্ধাব নামে প্রশ্নহীন আনুগত্য, নাবীব প্রতি অত্যাচাব ও ধর্মেব নামে তাব সাফাই ইত্যাদি জিনিসগুলি যে একালেব নীতিবোধেব ছাড়পত্র কিছুতেই পেতে পাবে না, তোমাব মত যুক্তিবাদী মানুষ নিশ্চযই তা মানবে। এই সাদা কথাটকে ভুলিযে দেওযাব জন্য যাবা 'সনাতন ধর্মে'ব কথা বলছে, তাবাও অনেকেই হযত জানে যে সে বকম 'সনাতন' ধর্ম কিছু নেই–বেদ উপনিষদে, বামাযণ মহাভাবতেই তা ক্রমাগত পবিবর্তিত হযে চলেছে।

॥ তেতাল্লিশ ॥

তুমি লিখেছ, 'তোমাব চিঠিতে দ্রৌপদীব বস্ত্রহবণেব সময ধর্ম কর্তৃক তাঁব লজ্জা নিবাবণেব যে উল্লেখ তুমি কবেছ,তাতে আমাব খটকা লেগেছিল। কাবণ, আমবা তো জানি কৃষ্ণই দ্রৌপদীব লজ্জা নিবাবণ কবেছিলেন। কিন্তু ধুলো ঝেড়ে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভাবত খানা খুলে দেখলাম, তুমি খুঁজে পেতে উদ্ধৃতি ঠিকই দিযেছ। তবে তাতে কৃষ্ণেব কথাই বিশেষভাবে আছে এবং এই অংশটিব শিবোনামও হল ''বস্ত্রহবণে দ্রৌপদীব কৃষ্ণস্তব–কৃষ্ণ কর্তৃক দ্রৌপদীব লজ্জা নিবাবণ।'' ধর্মেব প্রসঙ্গটি কি এখানে প্রক্ষিপ্ত? বামাযণ মহাভাবত নিযে তুমি যে সব পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছ এ ব্যাপাবে তা কী বলে?' আমাব 'পাণ্ডিত্য' নিযে তোমাব এই বক্রোক্তি সত্ত্বেও বেদ উপনিষদ নিযে আমাব বিভিন্ন মন্তব্যে আগে তুমি যে বকম ক্রুদ্ধ হতে, এখন তা একটু স্তিমিত হযে আসায স্বস্তি পাচ্ছি। তুমি বোধহয বুঝতে পেবেছ যে আমি কোনও 'কালাপাহাড়' নই। বস্তুবাদী

দৃষ্টিভঙ্গিব মধ্যে নির্মোহ সত্যান্বেষণেব আন্তবিকতা আছে, কোনও ধ্বংসকামিতা নেই, তাও হযতো তুমি বুঝেছ। তবে, এখনও তা মুখে স্বীকাব কবনি। বেদেব কাল থেকে যে গল্প শুরু কবেছিলাম, গীতা পর্যন্ত এসে তা শেষ কবাব ইচ্ছে আছে, মাঝখানে বুদ্ধ প্রসঙ্গটিও বাকি বযেছে। আমাদেব ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিযে আজ চতুর্দিকে যে বিকৃত প্রচাবেব ঢক্কা নিনাদ চলছে, তাবই পবিপ্রেক্ষিতে আমাব এইসব মতামত সম্পর্কে তোমাব একটা সামগ্রিক মূল্যাযন আমি সব শেষে আশা কবব। তুমি যে আমাব সব কথা মেনে নেবে, তা তো হতেই পাবে না। কিন্তু তাতে কী? বিভিন্ন মতেব সংঘর্ষেই তো সত্যেব আলো জ্বলে ওঠে। চিন্তাব পৌনঃপুনিকতা, চর্বিত চর্বন ও একরূপতা মনেব স্থবিবতাবই লক্ষণ।

যাই হোক, এবাব তোমাব প্রশ্নে ফিবি। কালীপ্রসন্ন সিংহেব অনুবাদে, তুমি যা লিখেছ ঐ শিবোনামই আছে বটে, কিন্তু সেটা কি বকম জানো? যে বকম পত্রিকাগুলিতে হেডলাইন থাকে এক, কিন্তু খবব থাকে আব এক, সেই বকম। বামাযণে 'কৌশল্যা বধূদিগকে সুসজ্জিত কবিতে লাগিলেন' কথাটা যেমন সঙ্কলক ও অনুবাদকেব দৌলতে 'কৌশল্যা বানব–বধূদিগকে সজ্জিত কবিতে লাগিলেন' হযে গেছে, তেমনি ভাবে–ঠিক কে তা কবছেন এবং মহাত্মা কালীপ্রসন্নেব এতে কতটা হাত আছে জানিনা–দেখা যাচ্ছে সঙ্কলনেব দৌলতে এখানেও মূলেব বক্তব্যটি পালটে গেছে। কৃষ্ণেব মাহাত্ম্য শিবোনামে যেমন প্রকাশ পেযেছে, কাব্যাংশে তা পাযনি। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু সম্পূর্ণ উদ্ধৃত কবা যাক ঃ

'তদনন্তব দুঃশাসন সভামধ্যে বলপূর্বক দ্রৌপদীব পবিধেয বসন আকর্ষণ কবিবাব উপক্রম কবিলে দ্রৌপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা কবিতে লাগিলেন, 'হে গোবিন্দ! হে দ্বাবকাবাসী কৃষ্ণ। হে গোপীজনবল্লভ! কৌববগণ আমাকে অপমানিত কবিতেছে, তুমি কি তাহাব কিছুই জানিতেছ না?...হা জনার্দন! হা কৃষ্ণ! হা মহাযোগী! বিশ্বাত্মা! আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি, হে গোবিন্দ! এই বিপন্নজনকে পবিত্রাণ কব।' সেই দুঃখিনী ভামিনী এইরূপে ভুবনেশ্বব কৃষ্ণকে স্মবণ কবিযা অবনতমুখী হইযা বোদন কবিতে লাগিলেন। করুণামৰ কেশব যাজ্ঞসেনীব করুণবাক্য শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণপ্রিযতমা কমলাকে পবিত্যাগ কবিযা আগমন কবিতে লাগিলেন। এদিকে মহাত্মা ধর্ম অন্তবিত হইযা নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত কবিলেন।' এবপব সমস্তটাই ধর্মেব কীর্তিকাহিনী,–সে উদ্ধৃতি আগেই আমি তোমাকে দিযেছি।

ওপবেব এই উদ্ধৃতি থেকে কি মনে হয না যে দ্রৌপদীব লজ্জা নিবাবণ সম্বন্ধে প্রচলিত ধাবণাব মধ্যে কিছু ভুল আছে? হিন্দী সিনেমায বা দূবদর্শনে কৃষ্ণেব হাতেব তালু থেকে যে হু হু করে ফিন্‌লেব কাপড় বেবিযে এসে দ্রৌপদীকে জড়িযে ফেলতে দেখা যায, মূল মহাভাবতে কিন্তু সে বকম ছবি নেই। কালীপ্রসন্নেব মহাভাবতে দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণ যাজ্ঞসেনীব কান্না শুনে প্রাণপ্রিযতমা কমলাকে ছেড়ে ছুটে আসতে লাগলেন, কিন্তু বস্ত্র তো জোগালেন মহাত্মা ধর্ম। মনে বাখতে হবে মহাভাবতে ধর্ম একজন প্রধান দেবতা, যুধিষ্ঠিব তাঁবই পুত্র, এবং ঐ মহাকাব্যেব অনেক সংকট মুহূর্তেই এই ধর্মকে অবতীর্ণ হতে দেখা যায। বনপর্বেব শেষে একটি বিখ্যাত দৃশ্য হল যুধিষ্ঠিবকে বকরূপী ধর্মেব কতকগুলি গূঢ়প্রশ্ন, যাব মধ্যে বিখ্যাত ছিল ঃ 'সুখী কে ? আশ্চর্য কী ? পথ কী ? বার্তাই বা কী ?' ধর্মেব প্রশ্নেব উত্তব না দিযে অন্য ত্রিভুবনজযী বীব ভাইযেবা যখন একে একে সবোববেব জলে পড়ে গতাযু হলেন, তখন যুধিষ্ঠিব ধর্মেব প্রতিটি প্রশ্নেব উত্তব দিযে তাঁকে খুশি কবলেন ও ভাইদেব বাঁচিযে তুললেন। ঐ চাবটি প্রশ্নেব উত্তবে যুধিষ্ঠিব কী বলেছিলেন তা

নিশ্চযই তোমাব মনে আছে। বলেছিলেন, 'অঋণী ও অপ্রবাসীই সুখী। প্রতিদিন প্রাণীদেব মৃত্যু দেখেও যে সকলেই চিবজীবী হতে চায তাই আশ্চর্য। তর্ক, বেদ, স্মৃতি, কোনও কিছুই এক কথা বলেনা, মুনিদেবও নানা জনেব নানা মত আব ধর্মেব তত্ত্ব জ্ঞানগুহায নিহিত, অতএব মহাজনেব পথই পথ। সূর্যরূপ অনলে বাত্রি ও দিবসেব ইন্ধনে মহামোহরূপ কটাহে ঋতু ও মাস রূপ হাতা বেড়ি দিযে মহাকাল যে প্রাণীদেব পাক কবে চলেছে, তাই বার্তা।' বুদ্ধদেব বসু তাঁব 'মহাভাবতেব কথা'য যুধিষ্ঠিবকে মহাভাবতেব নাযক এবং বনপর্বেব এই দৃশ্যটিকে যুধিষ্ঠিবেব শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রজ্ঞাব এক চমৎকাব নিদর্শন বলে প্রতিপন্ন কবেছেন। মহাভাবতেব শেষ দৃশ্যেও দেখি মহাপ্রস্থানেব পথে কুকুব রূপী ধর্মকে। যুধিষ্ঠিব যখন স্বর্গেব বথে আবোহণ কবাব সময ঐ কুকুবটিকেও সঙ্গে নিতে চাইলেন, তখনই তিনি সশবীবে স্বর্গে যাবাব শেষ পবীক্ষায উত্তীর্ণ হলেন। প্রকৃতপক্ষে মহাভাবতেব প্রায প্রতিটি কাহিনীব মধ্যে ধর্ম জিজ্ঞাসা অচ্ছেদ্য ভাবে ছড়িযে আছে। ধর্মেব এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত জটিল, বামাযণেব মত সহজ সবল নয, অনেক বিচিত্রও। অসংখ্য পথেব কাটাকুটিতে গোলকধাঁধাব মত এই ধর্মবাজ্যে তাই যুধিষ্ঠিব সহজ সমাধান দেন ঃ মহাজন যে পথে গেছেন তাই পথ–অসংখ্য মানুষেব যাত্রাপথই হল দিশাবী। যুধিষ্ঠিব যেহেতু বেদ, স্মৃতি, মুনি, তর্কবিদ বা তত্ত্বজ্ঞানী, কোনওটিকেই প্রামান্য মনে কবছেন না, সুতবাং এখানে মহাজন অর্থ মহৎ ব্যক্তি নয, মহান জনতা। ধর্মধ্বজীবা যুধিষ্ঠিবেব এই সবল কথাটিকে মান্য কবলে ধর্মেব কলহ অনেক কমত।

কথায কথায সামান্য প্রসঙ্গান্তবে চলে এসেছি, তবে বিষযটি অবান্তব নয। মহাভাবত প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে মূল কাব্যেব প্রধান দেবতা হলেন ধর্ম, কৃষ্ণ নন। দ্রৌপদীব লজ্জা নিবাবণ কবলেন ধর্মই। কৃষ্ণ কমলাকে ছেড়ে ছুটে আসা ছাড়া আব কিছুই কবলেন না। অন্তত কালীপ্রসন্নেব অনূদিত মহাভাবতে। তাই বুঝতে হবে যে তাঁব এই নিস্ফল ছুটে আসাব ঘটনাটিই প্রক্ষিপ্ত, এবং এই জোড়াতালিটি খুব কাঁচা হাতেবও হযে গেছে। কাবণ দ্রৌপদী স্মবণ কবলেন দ্বাবকাব কৃষ্ণকে, আব ছুটে এলেন গোলকধামেব সুখশয্যা থেকে কমলা অর্থাৎ লক্ষ্মীব পতি কেশব, তাও তিনি 'আগমন কবিলেন' নয, 'আগমন কবিতে লাগিলেন'। অর্থাৎ তাঁব আসাব মধ্য পথেই ধর্ম দ্রৌপদীব লজ্জা নিবাবণ কবে ফেলেছেন, কৃষ্ণেব জন্য তা ফেলে বাখেন নি। অতএব, কৃষ্ণেব ভূমিকা এখানে অবান্তব। নানা দিক ভেবে চিন্তেই পণ্ডিতবা সিদ্ধান্ত কবেছেন যে মহাভাবতে কৃষ্ণ প্রসঙ্গটি প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণকে বাদ দিলে মহাভাবতেব কাহিনীব কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হযনা। কিন্তু অন্য কোনও চবিত্রকে বাদ দিলে তাব কাহিনী দাঁড়াবে না। মহাভাবত কাহিনীব মধ্যে কৃষ্ণ বহিবাগত। তাঁকে প্রথম দেখা যায দ্রৌপদীব স্বযম্বব সভায এবং তাব পব থেকে তাঁকে পাই পাণ্ডবদেব সখা ও পবামর্শদাতা, কূটনীতিজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবেত্তা এক বীব রূপে। অবশ্য 'বীবত্বে' তাঁব পুঁজি হল অলৌকিক ক্ষমতা ও ধূর্তবুদ্ধি—বাহুবল নয। মোটকথা কৃষ্ণ মহাভাবতেব অপবিহার্য চবিত্র নন। শুধু তাই নয, মহাভাবত বর্ণিত দ্বাবকাব কৃষ্ণ, বিষ্ণু পুবাণ–হবিবংশ–ভাগবত পুবাণ ইত্যাদিতে বর্ণিত মথুবা বৃন্দাবনেব কৃষ্ণ আব ব্রহ্মবৈবর্ত পুবাণ, জযদেব বচিত 'গীতগোবিন্দ' ও বৈষ্ণব সাহিত্যেব শ্রীবাধাব কৃষ্ণ—এই সবই কিন্তু আলাদা। দূবদর্শনেব পণ্ডিতেবা 'মহাভাবতে' এই সব কিছুকে একত্রে জুড়ে দিযেছিলেন, যাতে মনে হয মহাভাবত বুঝি কুরুবংশেব মত কৃষ্ণেবও কাহিনী।

প্রক্ষিপ্ত হলেও মহাভাবতে কৃষ্ণ এক অতি অসাধাবণ চবিত্র। কাহিনীব মধ্যে তাঁব অপবিহার্যতা থাকুক আব নাই থাকুক, কৃষ্ণ যখনই উপস্থিত হন, তখনই অসাধাবণ বুদ্ধিমত্তা, চবিত্র মাধুর্য, আলাপচাবিতা ও গভীব জ্ঞানবত্তায় পাঠকেব মন কেড়ে নেন। এব সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস যুক্ত হযে ক্রমে তিনি অন্য চবিত্রগুলিকে জনপ্রিযতায ছাপিযে গেছেন। এই কৃষ্ণেব মুখেই পবে পুবো শ্রীমদ্ভগবদগীতাটি বসিযে দেওযা হয। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেব মধ্যে এই উপস্থাপনা যতই নাটকীয হোক, তা যে খাপছাড়া সন্দেহ নেই। এবং সে কাবণেই এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব 'কৃষ্ণচবিত্র' গ্রন্থেব ৯ম–১১শ পবিচ্ছেদে গীতাকে মহাভাবতেব মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁব কিছু কথা তাঁব নিজেব মুখেই শোন। 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' প্রবন্ধে গীতাব দ্বিতীয অধ্যায ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন ঃ 'যুদ্ধক্ষেত্রে উভয সেনাব সম্মুখে বথ স্থাপিত কবিযা, কৃষ্ণার্জুনে যথার্থ এরূপ কথোপকথন যে হইযাছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষেব সেনা ব্যূহিত হইযা পবস্পবকে প্রহাব কবিতে উদ্যত, সেই সমযে যে এক পক্ষেব সেনাপতি উভয সৈন্যেব মধ্যে বথ স্থাপন কবিযা অষ্টাদশ অধ্যায যোগধর্ম শ্রবণ কবিবেন, একথাটা বড় সম্ভবপব বলিযা বোধ হয না। .... যে ব্যক্তি এই গ্রন্থেব প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জুনেব কথোপথন কালে সেখানে উপস্থিত থাকিযা সকলই স্বকর্ণে শুনিযাছিলেন, এবং শুনিযা সেইখানে বসিযা সব লিখিযাছিলেন বা স্মৃতিধবেব মত স্মবণ বাখিযাছিলেন, এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পাবে না।' দেখছ তো? ধর্মেব কথাবার্তা নিযে আমাব মত অধার্মিকই যে শুধু হাসিঠাট্টা কবে তা নয, বঙ্কিমচন্দ্রেব মত নিষ্ঠাবান হিন্দুও তা কবে গেছেন। কাবণ একটাই। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী ও মানবিকতাবাদী।

মহাভাবতেব মত বামাযণেও যে অনেক প্রক্ষিপ্ত আছে, সে কথা তো আগেই তোমাকে বলেছি। বামকে অবতাব কবে তোলাব জন্যই এই সব প্রক্ষেপন। বামাযণেব পুবো সপ্তম খণ্ডটিই প্রক্ষিপ্ত হযেছে বামেব অবতাবতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ও সীতাকে নির্বাসিত কবে স্মৃতিকাবদেব নাবী বিদ্বেষী শাস্ত্রানুশাসনকে ঈশ্বব সিদ্ধ প্রমাণ কবাব জন্য। এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণেব মধ্যে সবচেযে অকাট্য ও জাজ্বল্যমান হল ষষ্ঠকাণ্ডেব শেষে লিখিত সমাপ্তি সূচক 'ফলশ্রুতি'টি। ষষ্ঠ কাণ্ডেব শেষে বামেব সিংহাসন লাভেব পব লেখা হচ্ছে ঃ

'তিনি দশ সহস্র বর্ষ বাজ্য শাসন কবেন এবং প্রভূত দক্ষিণা দানপূর্বক দশবাব অশ্বমেধ যজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবেন। ...তিনি পবমসুখে বাজ্য শাসন কবিতে লাগিলেন.....তাঁহাব বাজ্যকালে কোনও স্ত্রীলোক বিধবা হয নাই, হিংস্র জন্তুব কোন রূপ উপদ্রব ছিল না....' ইত্যাদি। এবং অতঃপব সর্বশেষে ঃ

'এই প্রাচীন আদিকাব্য মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। ইহা বেদমূলক, ধর্মজনক, যশস্কব, আযুষ্কব ও বাজগণেব বিজযপ্রদ। যে ব্যক্তি এই কাব্য সর্বদা শ্রবণ কবেন, তিনি বীতপাপ হইযা থাকেন।..... এই সম্পূর্ণ বামাযণ শ্রবণ বা পাঠ কবিলে নাবাযণ প্রীত হইযা থাকেন......'।

অর্থাৎ এখানেই যে বামাযণ সম্পূর্ণ, তাতে সন্দেহ নেই।

তাহলে, সব মিলে কী দাঁড়াচ্ছে? অবতাববাদ বেদে উপনিষদে নেই, 'ধর্মগ্রন্থ' বলে পবিচিত বামাযণ মহাভাবতেও প্রক্ষিপ্ত। সুতবাং অবতাববাদ সনাতনত্বেব দাবি কবতেই পাবে না। অথচ, সেই অবতাব নিযেই সনাতনপন্থী হিন্দুবা সাবা দেশ জুড়ে গোলমাল বাধিযে দিযেছেন।

সপ্তম পর্ব

॥ চুয়াল্লিশ ॥

পঞ্জিকায আজ কোনও একটা শুভযোগ আছে। আমাদেব বাড়িব অদূবে তাই কৃষ্ণকীর্তনেব পালা চলছে। সবাই সেখানে গেছে, বাড়িতে আমি একা। এস, আজ আমবা আমাদেব মত কবে কৃষ্ণ কথা বলি। কৃষ্ণেব কথা উঠলে আমাব খ্রীষ্টেব কথাও মনে পড়ে। খ্রীস্ট ও কৃষ্ণ বা কৃষ্ট নামেব সাদৃশ্যেব জন্যই কিনা জানিনা, কৃষ্ণ ও খ্রীস্ট একই কল্পনায অনুবঞ্জিত, এবকম একটা তত্ত্ব প্রচলিত আছে। দু জনেবই অলৌকিক জন্মকথা, দুজনেবই পালক পিতাব গৃহে বড় হওযা, দু জনেবই পশুপালকদেব মধ্যে জীবন যাপন, দু'জনেবই ক্ষমতাশালীব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদি তথ্যেব ওপবে এই তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। যীশু ও কৃষ্ণেব মধ্যে আব একটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য আমি দেখতে পাই এই যে উভযেই যে শক্তিব বিরুদ্ধে লড়াই কবেছিলেন, ক্রমে তাদেবই দ্বাবা কযেক শতাব্দীব মধ্যে পবিণত হযেছিলেন তাদেবই আবাধ্য দেবতায ও সম্পূর্ণ ভিন্ন চবিত্রেব কিংবদন্তীব নাযকে।

আমাব এই কথাটাকে বোঝাবাব জন্য যীশু দিযে শুরু কবি। কাবণ যীশুকে ইতিহাসেব গণ্ডিব মধ্যে পাই, কৃষ্ণকে এখনও পাইনি। অবশ্য কোনও একটি চিঠিতে আমি যে লিখেছিলাম যীশুখ্রীস্ট একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁব জন্ম ও মৃত্যু ঐতিহাসিক ঘটনা, নদীযা জেলা থেকে একজন মনোযোগী পাঠক এ সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ কবেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তিনি রুশ বিজ্ঞানীদেব লেখায পড়েছেন যীশু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। যীশু যোশেফেব বাগদত্তা মেবীব গর্ভে তাঁদেব সহবাসেব পূর্বেই পবিত্র আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন বলে বাইবেলে লেখা আছে। এই অলৌকিক কাহিনীকে পত্রলেখক যীশুব অনৈতিহাসিকতাব প্রমাণ বলে উপস্থিত কবেছেন।

একথা ঠিকই যে যীশুব ঐতিহাসিকতা বিষযে ঐতিহাসিকদেব মধ্যে মতভেদ আছে এবং এ ব্যাপাবে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হযনি। আমি ঐতিহাসিক নই, তাই কোনও নিঃসংশয বায দিযে দেওযা উচিত নয। যীশুব ঐতিহাসিকতা বিষযে আমাব ঐ মন্তব্য কবাব আগে 'আমাব মনে হয' বাক্যাংশটি যুক্ত কবা উচিত ছিল। আমাব কেন তা মনে হয, সে সম্বন্ধে দু এক কথা এখন বলব।

ঐতিহাসিক পুরুষ বা বমণীদেব ঘিবে নানা অলৌকিক কথা অস্বাভাবিক কিছু নয। এমন কি বামকৃষ্ণ বিবেকানন্দেব মত অতি সাম্প্রতিক কালেব মানুষদেবও জন্ম ও ক্রিযাকলাপ নিযেও নানা অস্বাভাবিক গল্প কথা প্রচলিত আছে। অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্তেব মত একজন বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকও নির্বিচাবে সেসব অসম্ভব কাহিনী তাঁব 'পবমপুরুষ শ্রীবামকৃষ্ণ' প্রভৃতি জনপ্রিয গ্রন্থগুলিতে ঢুকিযে দিযেছিলেন। 'ভাবতেব সাধক' ও 'ভাবতেব সাধিকা' খুব জনপ্রিয গ্রন্থ, এবং তাতে যাঁদেব জীবন বর্ণনা কবা হযেছে তাঁবা ঐতিহাসিক। কিন্তু কাহিনীগুলি অলৌকিকতায পূর্ণ। ধর্ম বিশ্বাসেব সঙ্গে প্রায অচ্ছেদ্যভাবে জনমানসে অলৌকিকতাব বিশ্বাস মিশে থাকে বলেই এ ঘটনা ঘটে। এমন কি বিবেকানন্দেব মত

যুক্তিবাদী মানুষও অলৌকিকতাকে একেবাবে উড়িয়ে দেন নি। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে তোমবা যতই মেলাতে চেষ্টা কব, এই দুই মেরু কখনও মিলতে পাবে না।

বুদ্ধ তো ঐতিহাসিক ব্যক্তিই ছিলেন এবং তিনি ছিলেন যুক্তিবাদীও। অথচ তাঁব জন্ম কাহিনীটি যীশুব জন্ম কাহিনীব চেযেও এক কাঠি সবেস। বুদ্ধদেব শুধু স্বযম্ভূই নন, অযোনি সম্ভবও। 'বুদ্ধচবিত' গ্রন্থেব প্রথম সর্গেব নামই হল 'ভগবানেব জন্ম'। তোমাব আমাব মত আটপৌবে জন্ম যাদেব কপালে আছে, তাবা কি আব ভগবান হতে পাবে? অতএব ভগবান বুদ্ধেব জন্মও অসাধাবণ। বুদ্ধচবিতে লেখা আছে বুদ্ধদেবেব মাতা 'গর্ভধাবণেব পূর্বে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মেঘেব মধ্যে যেমন চাঁদ প্রবেশ কবে তেমনি এক শ্বেতহস্তী তাঁব দেহে প্রবেশ কবছে,' এবং তাতেই তিনি গর্ভিনী হন। প্রসবকালে তিনি লুম্বিনী বনে শয্যায আশ্রয নেওযাব পবে 'বুদ্ধচবিত'কাব অশ্বঘোষেব ভাষায 'ব্রতশুদ্ধ সেই দেবীব পার্শ্বদেশ থেকে তাঁব বেদনা বা পীড়া সঞ্চাব না কবে লোকহিতেব জন্য পুত্রজন্মগ্রহণ কবলেন। যেমন উরু থেকে ঔর্বেব হস্ত থেকে পৃথুব, মস্তক থেকে ইন্দ্রতুল্য মান্ধাতাব, বাহুমূল থেকে কক্ষীবানেব জন্ম, তাঁব জন্মও তেমনি হযেছিল। গর্ভ থেকে নির্গত হবাব পব কালক্রমে তাঁব এমন শোভা হল, মনে হল তিনি আকাশ থেকে নেমে এসেছেন, কাবণ তিনি অযোনিজাত।' এই সব অলৌকিক জন্মকথা সত্ত্বেও বুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাই, যীশুবও ঐতিহাসিক ব্যক্তি হতে বাধা নেই।

যীশুখ্রীষ্টেব মৃত্যুব কথা অন্তত একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক খুব সাদামাটা কথায দ্ব্যর্থহীনভাবে লিপিবদ্ধ কবে গেছেন, তিনি ট্যাসিটাস। ট্যাসিটাসেব জীবনকাল আনুমানিক ৫৫ থেকে ১১৭ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি তাঁব বিখ্যাত 'অ্যানালস' গ্রন্থেব চতুর্দশ অধ্যাযে ৬৪ খ্রীষ্টাব্দেব বোমেব বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডেব ঘটনাব বর্ণনা দিযে লিখেছেন ঃ 'যখন লোকে সন্দেহ কবতে লাগল যে এটি নীবোবই কীর্তি, তখন তিনি জনশ্রুতিকে চাপা দেওযাব জন্য অন্যেব ঘাড়ে দোষ চাপালেন, কুখ্যাত ও নীতিভ্রষ্ট খ্রীস্টানদেব সাজা দিতে লাগলেন। এদেব গুরু খ্রীষ্টেব নাম অনুসাবে লোকে এদেব এই নামে ডাকত। এই খ্রীস্টকে টাইবেবিযাসেব বাজত্বকালে জুডিযাব গভর্নব পনটিযাস পাইলেটাস মৃত্যুদণ্ড দিযেছিলেন।' ট্যাসিটাস আবও বলেছেন যে এই সব খ্রীস্টানদেব অপবাধেব জন্য ততটা নয, এদেব প্রতি নাগবিকদেব ঘৃণাব জন্যই ব্যাপক হাবে মৃত্যুদণ্ড দেওযা হযেছিল। এই কাহিনীকে অবিশ্বাস কবাব কাবণ নেই।

ওপবেব উদ্ধৃতিটি থেকে কতকগুলি জিনিস দেখা যাচ্ছে। প্রথমত খ্রীস্ট নামক একজন ব্যক্তি ছিলেন, খ্রীস্টধর্ম প্রসাবেব অনেক আগে সেই ট্যাসিটাসেব কালে তাঁব কিছু অনুগামীও ছিল এবং বাজশক্তি ছিল এদেব বিরুদ্ধে। দ্বিতীযত খ্রীস্টকে বোমান সম্রাট টাইবেবিযাস-এব নির্দেশে মৃত্যুদণ্ড দেওযা হযেছিল। মৃত্যু যখন হযেছিল, তখন জন্মও নিশ্চযই হযেছিল। এ কাবণেই আমি বলেছি যে খ্রীষ্টেব জন্ম ও ক্রুশবিদ্ধ হযে মৃত্যুব ঘটনা ঐতিহাসিক, এবং তাই যীশু ঐতিহাসিক ব্যক্তি। চিঠিতে আমি এ কথাও বলেছি যে কালক্রমে ঐতিহাসিক যীশুখ্রীস্ট কাল্পনিক যীশুখ্রীষ্টেব আড়ালে চলে গেছেন। আমবা এখন কিংবদন্তীব যীশুব কথাই শুনি, ঐতিহাসিক যীশুব নয।

কিংবদন্তী কখনও হাওযায গড়ে ওঠেনা, তাব বাস্তব ভিত্তি থাকে। ট্যাসিটাসেব উল্লেখ থেকে বোঝা যায যে যীশুখ্রীস্ট বিদ্রোহী ছিলেন। বাইবেলেব বর্ণনা থেকে বোঝা যায শুধু বাজশক্তি নয, পুবোহিততন্ত্রেব বিরুদ্ধেও তাঁব বিদ্রোহ ছিল। যীশুব জন্মভূমি বহিঃশক্তি

বোমান সম্রাটদেব পদানত ছিল, সেখানে বিদ্রোহও ঘটত, সেই সব বিদ্রোহ দমনেব কাহিনী ইতিহাসেই আছে। পুবোহিত শ্রেণী ববাববই পবজীবী, তাবা বিদেশী সম্রাটেব পদলেহী হবে আশ্চর্য কি? সাধাবণ মানুষেব ওপব তাদেব অত্যাচাবও ছিল। এবই মধ্যে যীশুব বিদ্রোহ বিস্ফোবক অবস্থা সৃষ্টি কবেছিল, এবং তাই তাঁকে বোমান সম্রাটেব নির্দেশেই ক্রুশবিদ্ধ কবা হযেছিল। শহীদেব মৃত্যু যীশুকে অধিকতব শক্তিশালী কবে তুলেছিল। ক্রমে তাঁব অনুগামীব দল বেড়েই চলল। যাঁকে 'ইহুদীদেব বাজা' বলে ক্রুশবিদ্ধ কবা হল, তিনি বোমেব অ-ইহুদী দাসদেব কাছেও জনপ্রিয হযে উঠলেন, কাবণ দাসবাও নিপীড়িত ও পদদলিত। ট্যাসিটাসেব বর্ণনায পাচ্ছি যে যীশুব মৃত্যুব বছব ত্রিশেক পবে নীবোব বাজত্ব কালে অথবা তাবও বছব পঞ্চাশেক পবে যখন ট্যাসিটাস শেষ বযসে তাঁব 'অ্যানালস্' লিখছেন, তখন খ্রীস্ট একজন বিদ্রোহী, সাজাপ্রাপ্ত মানুষ মাত্র এবং তাঁব অনুগামীবা 'কুখ্যাত, নীতিভ্রষ্ট' বলে ঘৃণাব পাত্র। কিন্তু তখনই যে অসংখ্য মানুষেব মনে আগামী দিনেব 'মহান পবিত্রাতা'ব ভাবমূর্তি নিভৃতে গড়ে উঠেছিল, ট্যাসিটাস বোধহয তাব খবব জানতেন না।

তোমাকে আগেই বলেছি, এব আড়াইশ বছব পবে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে যীশুকে ঈশ্বব বলে ঘোষণা কবা হয। ঘোষণা কবলেন বোমান শাসকবাই। ততদিনে যীশুব বিদ্রোহী পবিচযটি লুপ্ত হযে গেছে, তিনি হযে উঠেছেন করুণাব অবতাব। যীশুব মৃত্যুব জন্য বোমান সাম্রাজ্যেব চণ্ডনীতি দাযি নয, দাযি কেবল ইহুদীবা-এই বকমেব একটা গল্পও তৈবি হযে গেছে, ইহুদীদেব দুর্নামেব বিনিমযে 'ইহুদীদেব বাজা' যীশুখ্রীস্ট 'মানব পবিত্রাতা'য পবিণত হযেছেন। ইহুদী ধর্মেবই উত্তবসূবী,এক মহান ইহুদী প্রবর্তিত খ্রীস্টধর্মেব ইহুদী বিদ্বেষ সেই থেকে শুরু। ইতিহাসে এমনি কত যে সব পবস্পব বিপবীত স্রোত বইতে থাকে, খ্রীস্টেব জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন তাবই প্রমাণ।

আমি তোমাকে বলতে চেষ্টা কবেছি যে ভাবতবর্ষে কৃষ্ণেব ক্ষেত্রেও এ জাতীয ঘটনাই ঘটেছিল বলে মনে হয। কৃষ্ণেব গাযেব কালো বঙ তাঁব অনার্য বংশোৎপত্তিকে নির্দেশ কবে। কৃষ্ণ চবিত্রেব স্রষ্টা ব্যাসদেবও তো অনার্য কুলজাত এবং ঘোব কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণেব সঙ্গে অনার্য যোগাযোগেব অনেক প্রমাণই পাওযা যায। মহাভাবতে ও পুবাণে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ মথুবাব গোপালক ও গোপিনীগণ এবং দ্বাবকাব যাদব নবনাবীদেব প্রিয সখা ও নেতা ছিলেন। গোপ ও গোপিনীবা স্পষ্টতই নিম্নবংশ জাত। যাদব কুলেব কথা মহাভাবতে যা লেখা আছে, তা সংক্ষেপে এই বকম ঃ

বাজা যযাতিব দুই পত্নী ছিলেন-একজন ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী, অপবজন শূদ্রকন্যা দাসী শর্মিষ্ঠা। দেবযানীব দুই পুত্র যদু ও তুর্ববসু থেকে যাদব ও যবন এবং শর্মিষ্ঠাব তিন পুত্র অনু, দ্রুহ্য ও পুরু থেকে ম্লেচ্ছ, বৈভোজ ও পৌবব বংশ উৎপন্ন হযেছিল। মহাভাবতেব ভাষ্য অনুসাবে একমাত্র শূদ্রানী জাত পৌবব বংশই গবীযান, এই বংশেই কুরু-পাণ্ডবেব জন্ম। ম্লেচ্ছ, যবন ইত্যাদি যে শ্রদ্ধেয ছিল না, তা বলাই বাহুল্য, আব যাদব বংশ সম্বন্ধেও যযাতিব শাপ ছিল এই যে যদুব ঐ বংশে কেউ বাজা হতে পাববে না। অর্থাৎ আসলে আমাব ধাবণা, যাদব এমন এক আদিম অনার্য জাতি, যাদেব মধ্যে সাম্যাবস্থা বযে গিযেছিল, বাজাব উৎপত্তি হযনি। পৌববদেব তুলনায তাবা ছিল 'নীচু' জাতি। পুবাণকাবেবা অবশ্য কুরুকুলেব সঙ্গে সাম্য বাখাব জন্য পবে যাদবদেব মধ্যেও বাজাবাজবাব বর্ণনা দিযেছেন। তবে কৃষ্ণ যে 'যাদবকুল-শ্রেষ্ঠ' হওযা সত্ত্বেও তাদেব বাজা ছিলেন না, এটা তাৎপর্যপূর্ণ।

অপবদিকে পণ্ডিতেবা নাবাযণকে অনার্য দেবতা বলে মনে কবেন। তাব কাবণ নাবাযণেব সঙ্গে জল ও সাপেব সম্পর্ক। নাবাযণ নাগ শয্যায জলেব ওপবে শযান থাকেন বলেই তাঁব নাম নাবাযণ (নাব + অযণ)। সাপখোপ অনার্যদেব চিহ্ন। অন্যদিকে আর্যদেব ধর্মাচবণেব কেন্দ্রবিন্দু অগ্নি, অনার্যদেব জল। আর্যবা যজ্ঞ কবতেন, অনার্যবা তর্পন। সেই জলেব দেবতা অনন্ত শয্যাশাযী নাবাযণেব সঙ্গে কৃষ্ণেব একাত্মতাও তাঁব অনার্য উৎসকে নির্দেশ কবে। তোমাকে আগেই ঋগ্বেদেব কৃষ্ণাসুবেব সঙ্গে ইন্দ্রেব ভযংকব সংঘর্ষে কৃষ্ণেব বিপুল পবাজযেব কথা বলেছি। ক্রুশবিদ্ধ যীশু যেমন প্রথমে অবদমিত ইহুদী ও দাসদেব মধ্যে কিংবদন্তীব মহানাযকে এবং পবে ক্রুশবিদ্ধকাবী বোমানদেবই পবম ঈশ্ববে পবিণত হযেছিলেন, পবাজিত কৃষ্ণও সেরূপ প্রথমে অবদমিত অনার্য, নিম্নবর্ণ ও আদিম জাতিদেব মধ্যে এবং পবে ক্রমে দমনকাবী আর্যদেব মধ্যে এক মহামহিম অবতাররূপে পুনর্জন্ম লাভ কবেছিলেন—এই সম্ভাবনাকে বাতিল কবা যায না।

এটা ঠিক যে আমি 'সম্ভাবনা'ব কথা বলছি, কাবণ যীশু সম্পর্কে যতটুকু বা ইতিহাসে উল্লেখ বযেছে, কৃষ্ণ সম্পর্কে তাও নেই। কিন্তু, পুবাণকাবেবাই কৃষ্ণ সম্পর্কে যে কাহিনী লিখে গেছেন, তাব নানা সঙ্গতি অসঙ্গতিব মধ্যেই আমাব বক্তব্যেব কিছু কিছু প্রমাণ বযেছে, যা তোমায দেবাব চেষ্টা কবব।

প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও কৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু বলি। তোমাকে আগেই বলেছি কৃষ্ণদেব পূর্ব পুরুষ যযাতি মহাভাবতেব কাহিনী অনুযাযী দুখানা বিযে কবেছিলেন—অর্থাৎ কিনা খাস বিযে। ফাউ যে সহচবীদেব পেযেছিলেন, সেটা এখানে বলছি না। এই পত্নীদেব একজন হলেন শুক্রাচার্যেব কন্যা দেবযানী, আব একজন অসুব কন্যা, দেবযানীব দাসী শর্মিষ্ঠা। এই শর্মিষ্ঠা প্রথমে ফাউ হিসেবে যযাতিব অন্তঃপুবেব মধ্যেই ছিল, পবে সে যযাতিকে পটিযে পাটিযে অন্যতমা প্রধানা মহিষী হয। এবং সেটা গোপনে। শুক্রাচার্য জানতে পেবে যযাতিকে শাপ দেন, তাতে তাঁব অকাল বার্ধক্য আসে। তখন যযাতি ছেলেদেব বলেন তাঁব জবা গ্রহণ কবতে। বড় ছেলে যদু এবং অন্যান্য তিন ভাই বাজি না হওযায, যযাতি তাঁদেব শাপ দেন। যদুকে শাপ দেন যে তাব বংশে কেউ বাজা হবে না। অন্যদেব শাপ দেন কারু বংশ ম্লেচ্ছ, কারু বংশ যবন হবে বলে । কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতাব জবা গ্রহণ কবলেন, এবং পবে যযাতি জবা ফিবিযে নিলে তিনিই যথাসমযে বাজ্য পেলেন। এই পুরুব বংশেই দুষ্যন্ত, ভবত ও কুরু কুলেব জন্ম। মহাভাবতেব এই কাহিনীকে সত্য বলে মেনে নিলে দেখা যায ঐ মহাকাব্যেব সকল নাযকেবাই বর্ণসংকবেব ফসল। ভীষ্মেব বিমাতা সত্যবতী, ধৃতবাষ্ট্র ও পাণ্ডুবা যাঁব নাতি, তিনি তো মৎস্যজীবীব কন্যা ছিলেনই, —এঁদেব পুবো বংশটাই শূদ্রানী শর্মিষ্ঠা ও ক্ষত্রিয যযাতিব গোপন মিলনেব ফল। অন্য দিকে কৃষ্ণ যে যদুবংশেব সন্তান, সেই যদুবংশও ক্ষত্রিয যযাতি ও ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানীব পুত্র থেকে জাত। নিম্নবর্ণেব পুরুষেব সঙ্গে উচ্চবর্ণেব নাবীব এই বিবাহ, হিন্দু শাস্ত্রে যাকে 'প্রতিলোম বিবাহ' বলে, তা যে শাস্ত্র মতে উচ্চবর্ণেব পুরুষেব সঙ্গে নিম্নবর্ণীযাব 'অনুলোম বিবাহে'ব চে"যও গর্হিত ও ঘৃণিত, তা নিশ্চযই তুমি জান। অথচ মজা হল, প্রতিলোম বিবাহজাত বংশোদ্ভূত এই কৃষ্ণই মহাভাবত অন্তর্গত বলে কথিত শ্রীমদ্ভগবদগীতায বর্ণসংকবেব তীব্র নিন্দা কবছেন। বর্ণসংকবেব কথাটা তুলেছিলেন অর্জুন। গীতাব 'অর্জুন বিষাদ' নামক প্রথম অধ্যাযেব ৩৯–৪৩ শ্লোকে অর্জুন আশঙ্কা প্রকাশ কবছেন যে কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে যদি তিনি আত্মীয পবিজনদেব হত্যা কবেন, তবে কুলক্ষয হবে। কুলক্ষয হলে স্ত্রীবা ব্যাভিচাবিনী হবেন, এবং তাতে বর্ণসংকবেব ফলে

সনাতন ধর্ম রসাতলে যাবে। তবে, কৃষ্ণ অর্জুনের এই আশঙ্কাকে কোনও পাত্তা না দিয়ে তাঁকে যুদ্ধ করতে বলেন। কী বলেন এবং তা কোন যুক্তিতে, সে কথা বিস্তারিত পরে আলোচনা করব। এখন বর্ণসংকর সম্বন্ধে কৃষ্ণের কী বক্তব্য, সেদিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মে প্রবুদ্ধ করার জন্য 'কর্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ে ২৩-২৪ শ্লোকে বলছেন, 'হে পার্থ, এই তিন লোকে আমার কিছু মাত্র কর্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা প্রাপ্তব্যও আমার কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম করিয়া থাকি। যদি আমি কর্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসকল আমি উৎসন্ন দিব, বর্ণসংকরের কর্তা হইব এবং প্রজা সকলের মালিন্য হেতু হইব।' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রধান 'কর্ম'ই হল বর্ণসংকর রোধ করা, তা না হলে জগৎ উৎসন্নে যাবে' কৃষ্ণ গীতায় অন্যত্রও বর্ণসংকরকে সর্বনাশের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ের ১৩ নং শ্লোকে তিনি দাবি করছেন যে 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং' অর্থাৎ 'আমিই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি'। 'গুণকর্ম বিভাগশঃ' কথাটা সঙ্গে যোগ করায় অনেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে গুণ ও কর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি নানা বর্ণ হবে-এ কথাই এখানে বলা হচ্ছে, জন্মসূত্রে বর্ণভেদের কথা নয়। কিন্তু, এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য নয়। কারণ, জন্মসূত্রে বর্ণভেদ না হলে বর্ণাশ্রম ব্যাপারটাই থাকে না। গুণ ও কর্ম অনুযায়ী নানা ধরণের সামাজিক ভেদ সব সমাজেই আছে, তাকে বর্ণভেদ বলে না। বর্ণভেদটাই হিন্দু ধর্মের নিজস্ব। তা ছাড়া জন্মগত ভেদ না থাকলে বর্ণসংকরের প্রশ্ন আসে কোথায়? সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, কৃষ্ণ এখানে যা বলছেন তার মর্মার্থ হল যে আগে বর্ণ বিভাগ ছিল না (বেদের আদি যুগে বর্ণ বিভাগ যে ছিল না, তা তো আমরা দেখেছিই), তিনিই গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজে বর্ণবিভাগ করে দিয়েছেন। প্রতিটি বর্ণের জন্য গুণ ও কর্ম নির্দিষ্ট আছে-সে অনুযায়ী প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। অর্জুন ক্ষত্রিয় বর্ণজাত, তাঁর কাজ যুদ্ধ করা। এতে কুলক্ষয়, আত্মীয় হত্যা, গুরু হত্যা করতে হলেও তা করতে হবে।

কৃষ্ণের মুখে বর্ণসংকর থেকে ত্রিলোক উৎসন্ন হওয়ার কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্রও অবাক হয়ে বলেছেন, 'সংসারে এত অমঙ্গল থাকিতে ঈশ্বরের আলস্যে বর্ণসংকরোৎপত্তির ভয়টাই প্রবল কেন? ....দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্বদেশব্যাপী রোগ, হত্যা....এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা না বলিয়া বর্ণসাঙ্কর্যের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত ত্রস্ত কেন?' যুক্তি ও ভক্তির দোটানায় পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্গত প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পান নি। যে প্রশ্নটা আমার মনে এর চেয়েও প্রবল হয়ে উঠছে তা হল, শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন দুজনেই বর্ণসংকরের ফলে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মুখেই বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষ কেন? এইসব অসঙ্গতির কারণ খুঁজতে গেলেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসে। সেই বেড়ালটা তোমায় এবার দেখাই।

আসলে গীতার কথাগুলি অর্জুন ও কৃষ্ণের মধ্যে কথোপকথন যে নয়, যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে এরকম একটা বাক্যালাপ যে চলতেই পারেনা, সে কথা বঙ্কিমই বলেছিলেন, একথা তোমাকে আগেই বলেছি। এই সব কথাবার্তা যিনি বা যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা কথাগুলিকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অবতাররূপী কৃষ্ণের মুখে বসিয়ে দিয়েছিলেন,-ভক্ত পাঠক উপরোক্ত সব অসঙ্গতি নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। গীতায় অনেক চমৎকার দার্শনিক কথা থাকা সত্ত্বেও তার আসল উদ্দেশ্য হল বর্ণাশ্রম ধর্মকে পাকা করা এবং সে কারণেই কৃষ্ণ ও অর্জুন দু জনকে দিয়েই বলানো হচ্ছে যে বর্ণসংকর হলে ত্রিভুবন রসাতলে যাবে।

ভাবতবর্ষে বাজা ও পুবোহিত শ্রেণী শোষণেব যে একটি পাকা ব্যবস্থা কবেছিলেন, তা পৃথিবীতে অনন্য। এই কলটিব নাম 'বর্ণাশ্রম' ব্যবস্থা। উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে শোষণ ও শাসন কববে, এবং সেটাই হবে 'ধর্ম'। বৌদ্ধধর্ম এই ব্যবস্থাটিকে ভেঙে দিতে চাইছিল বলেই বৌদ্ধদেব প্রতি যত বিদ্বেষ। যাই হোক, সেটা পবেব কথা। এখন কৃষ্ণ কথাটি সাবি।

যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন ইহুদী বংশোদ্ভুত, ইহুদীদেব নেতা ও বোমান সাম্রাজ্যেব শত্রু। বোমান স্বার্থেব বক্ষক বাজতন্ত্র ও পুবোহিততন্ত্রেব হাতে সেই খ্রীস্টেব নামে প্রচাবিত খ্রীস্টধর্ম হল ইহুদী বিদ্বেষী। তেমনি কৃষ্ণ যদিও অনার্য সম্ভূত, এবং পুবাণকাববা তাঁকে আর্য বানাবাব তাগিদে তাঁকে বর্ণসংকব জাত বংশেব সন্তান বলে পবিচয দিলেন, তবুও সেই কৃষ্ণই প্রচাবিত হলেন 'বর্ণাশ্রম' ধর্মেব প্রবক্তা রূপে। এত বড় অসঙ্গতিব পবেও তুমি নিশ্চযই কৃষ্ণেব নামে প্রচাবিত কথাগুলিকে তাঁব মুখনিসৃত বাণী বলে বিশ্বাস কববেনা।

মূলে কৃষ্ণ যে একটি বিদ্রোহী চবিত্র, পুবাণেব মধ্যেই তাবও ইঙ্গিত মেলে। এবাবে সে সম্বন্ধে বলব। তবে, আজ নয, কাবণ মনে হচ্ছে ওদিকে কৃষ্ণকীর্তন শেষ হযেছে। বাস্তায কলবব শুনছি। বাড়িব লোকেবা ফিবে আসছে। সুতবাং এখন আমাব কৃষ্ণকথা বন্ধ কবি।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

যে কথা বলছিলাম। ব্রাহ্মণ পুবাণবেত্তা ও শাস্ত্রকাবেবা কৃষ্ণকে দিযে তাঁদেব মনমত কথা বলিযে নিলেও, একটু লক্ষ্য কবলেই তুমি দেখবে, এই কৃষ্ণও কিন্তু একটি বিদ্রোহী চবিত্র। কথাটা একটু গোড়া থেকে বলি। আগেই বলেছি বিভিন্ন পুবাণে কৃষ্ণ কাহিনীব বিভিন্ন বর্ণনা আছে। সেগুলি জুড়ে একটি অখণ্ড কৃষ্ণকাহিনীব সৃষ্টি হলেও, তাব মধ্যে বিস্তব ফাঁক বযে গেছে। বলা হয যে কৃষ্ণ-বলবাম জবাসন্ধেব ভযে সমস্ত যাদবকুলকে নিযে মথুবা ছেড়ে দ্বাবকায চলে আসেন বৈবতক পর্বতেব নিবাপদ আশ্রযে বাজ্য গড়ে তোলাব জন্য। প্রথমত 'ত্রিভুবনজযী' কৃষ্ণ জবাসন্ধেব ভযে সকলকে নিযে পালাবেন,এটা কোনও যুক্তিযুক্ত কথা নয। দ্বিতীযত ঐসব পুবাণেই অনেকগুলিতে লেখা আছে যে জবাসন্ধ আঠাব বাব মথুবা আক্রমণ কবে পবাজিত হযেছিল। তাহলে এই পলাযন কেন ? তৃতীযত দ্বাবকাব কাছাকাছি আদৌ কোনও পাহাড় নেই। চতুর্থত যদি ধবেও নিই যে সুদূব অতীতে বৈবতক বলে পর্বত সত্যই ছিল, তাহলেও মথুবাব কাছাকাছি এত সব দুবধিগম্য পাহাড় পর্বত থাকতে যাদবেবা নিবাপদ পাহাড়েব খোঁজে সদলে হাজাব দেড়েক মাইল দূবে পালিযে চলে এসেছিলেন কেন, তাব কোনও ব্যাখ্যা নেই। এ সব কাবণে আমাব মনে হয, আসল কথা হল দ্বাবকায একধবনেব কৃষ্ণকথা এবং মথুবা বৃন্দাবন ইত্যাদি অঞ্চলে আব এক ধবনেব বা বিভিন্ন ধবনেব কৃষ্ণকথা প্রচলিত ছিল। সেগুলিকে একত্র কবাব জন্যই শেষ পর্যন্ত মথুবাব যাদবদেব দ্বাবকায নিযে ফেলা হয, কাবণ তা না হলে কাহিনীব পাবম্পর্য বজায থাকে না।

দ্বাবকা ও মথুবাব ভৌগোলিক দূবত্ব অনেক হলেও, দুযেব মধ্যে একটা সমাজগত অভিন্নতা আছে। উভয সমাজেই বাজা নেই, অধিবাসীদেব মধ্যে বযেছে সাম্য ও স্ত্রী পুরুষেব অবাধ মেলামেশা। আমি বৈদিক সমাজ আলোচনাকালে আগেই তোমাকে দেখিযেছি যে এগুলি হল বাজতন্ত্র গড়ে ওঠাব আগেকাব আদিম সমাজেব লক্ষণ।

বৃন্দাবনে কেউ বাজা ছিল না, আব দ্বাবকায উগ্রসেন নামেমাত্র বাজা হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচবিত্র' গ্রন্থেব তৃতীয খণ্ড ষষ্ঠ পবিচ্ছেদে আলোচনা কবে দেখিযেছেন যে সেখানে আসলে বল, বীর্য, বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই নেতা ও সকলেব মান্য। এই বাজা না থাকাব ব্যাপাবটাকে ব্যাখ্যা কবাব জন্যই, মনে হয, পুবাণে যদুবংশেব প্রতি যযাতিব শাপেব গল্পটা বানানো হযেছে। সেই বকম একটা বাজহীন বংশে কংস, জবাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি যখন বাজতন্ত্র কাযেম কবতে চাইলেন এবং অত্যাচাবী বাজা হযে উঠলেন, তখন কৃষ্ণ তাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন। অতএব পুবাণেব এই কৃষ্ণ আদিতে বাজতন্ত্র বিবোধী। এই বাজাবা যে ব্রাহ্মণপূজক ও ব্রাহ্মণদেব দ্বাবা সমর্থিত ছিলেন, তাবও প্রমাণ আছে। ভীম ও অর্জুনকে নিযে কৃষ্ণ জবাসন্ধেব পুবীতে ঢুকেছিলেন ব্রাহ্মণেব ছদ্মবেশে এবং ব্রাহ্মণেব প্রতি জবাসন্ধেব ঐকান্তিক ভক্তিব সুযোগে তাঁকে একান্তে হত্যা কবেছিলেন, এই কাহিনী মহাভাবতেই বযেছে।

এবাবে মহাভাবতেব সভাপর্বে কৃষ্ণকে ভীষ্ম শ্রেষ্ঠত্বেব মর্যাদা দিলে শিশুপাল প্রতিবাদ কবে কী বলেছিলেন শোন। সভাপর্বেব ৩৬–৪৪ অধ্যায জুড়ে বিবাট বাগবিতণ্ডাব মধ্যে শিশুপাল যা বলতে চেযেছিলেন, তা হল ঃ 'বাসুদেব ঋত্বিক নয, আচার্য নয এবং বাজাও নয।'.....'বালকেবাও যাকে ঘৃণা কবে এই কৃষ্ণ এক সামান্য গোপাল মাত্র।' 'বলবান কংসেব আশ্রযে থেকে সে সেই কংসকেই হত্যা কবেছিল।' 'ধর্মাত্মা জবাসন্ধ যাকে দাস বলে হত্যা কবতে ঘৃণা বোধ কবেছিলেন, এ সেই কৃষ্ণ।' অতএব তিনি কৃষ্ণকে এই বলে যুদ্ধে আহ্বান কবলেন, 'হে কৃষ্ণ তুমি বাজা নহ, তুমি দাস, দুর্মতি ও পূজাব অযোগ্য পাত্র, পাণ্ডবগণ বালকত্ব বশতঃ ভূপালদিগকে অতিক্রম কবিযা তোমাকে পূজ্যবৎ পূজা কবিতেছে।'

এইসব কাহিনী থেকে কৃষ্ণেব যে ছবিটি ফুটে ওঠে, তা হল এই যে বর্তমান উত্তবপ্রদেশ ও গুজবাটেব কতকগুলি আদিম গোষ্ঠীব মধ্যে তিনি উপাস্য ছিলেন এবং অপব দিকে তিনি বিবোধীদেব দ্বাবা দাস এবং বাজা ও ব্রাহ্মণ বিবোধী বলে নিন্দিত হতেন। মহাভাবতেব সভাপর্বে দেখা যায যুধিষ্ঠিবেব সভায উপস্থিত সমস্ত বাজাবাই কৃষ্ণেব বিরুদ্ধে শিশুপালেব সমর্থক, কিন্তু কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দিযে শিশুপালকে মেবে ফেলে তাদেব মুখ বন্ধ কবে দেন। মহাভাবতে এইভাবে কৃষ্ণকে অলৌকিক ক্ষমতাধব কবে জিতিযে দেওযা হয বটে, কিন্তু মথুবা থেকে কৃষ্ণেব পলাযন বা গোপনে হীন কৌশলে শত্রু হত্যাব অন্য কাহিনীব সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয। একজন লৌকিক নাযককে এইভাবে মহাভাবতে অবতাব বানানো হল–সে কথায পবে আসছি। তবে এ পর্যন্ত এটা বোধহয বোঝা গেল যে কৃষ্ণ কথা আদিতে ছিল লৌকিক, বাজতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিবোধী এবং সাম্যবাদী–সমাজাশ্রযী।

তোমাকে এ বিষযে আবও দুএকটি প্রমাণ দিই। এক নম্বব, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্রপূজাব বিবোধিতা। কৃষ্ণ বললেন ঃ গরুবাই আমাদেব দেবতা, গোবর্ধন পর্বত আমাদেব বক্ষা কবে, সেও দেবতা। অতএব, এদেব পুজো কব, দীনদবিদ্রদেব খাওযাও, ইন্দ্রপূজায প্রযোজন কী? নন্দ তাই কবলেন এবং ফলে ইন্দ্রেব কোপ, ইন্দ্র কতৃক প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও বৃন্দাবনবাসীদেব তা থেকে বক্ষাব জন্য শ্রীকৃষ্ণেব গিবিগোবর্ধন ধাবণেব গল্প তো জানই। গল্প যাই হোক কৃষ্ণেব প্রকৃতি ও জীবপ্রীতি এবং ইন্দ্র–বিবোধটাই লক্ষণীয। দ্বিতীয গল্পটা এই বকম। একদিন গোপালেবা ক্ষুধায কাতব হযে খেতে চাইলে কৃষ্ণ বললেন, 'ঐ দেখ ব্রাহ্মণেবা যজ্ঞ কবছে, ওখানে গিযে আমাব নাম কবে অন্ন ভিক্ষা

চাও।' গোপালেবা তাই কবল। ব্রাহ্মণেবা তাদেব তাড়িযে দিলেন। ওবা ফিবে এলে কৃষ্ণ বললেন, 'যাও, অন্তঃপুবেব ব্রাহ্মণকন্যাদেব কাছে আমাব নাম কবে খেতে চাও।' গোপালেবা তাই কবল। ব্রাহ্মণ কন্যাবা তো খেতে দিলই, উপবন্তু কৃষ্ণেব কাছে তাবা কৃষ্ণ-দর্শনে ছুটে এল এবং নিজেদেব কৃষ্ণেব কাছে সমর্পণ কবল। কৃষ্ণ কিন্তু তাদেব ফিবিযে দিলেন, গোপিনীদেব মত আপন বলে গ্রহণ কবলেন না। এই গল্পেবও বিশদ ব্যাখ্যায আমি যাচ্ছি না, কিন্তু এই গল্পে ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞেব সঙ্গে কৃষ্ণেব বিবোধেব একটি ছবি এবং ব্রাহ্মণদেব মধ্যেই যে কৃষ্ণেব জনপ্রিযতা বাড়ছিল তাব একটি উল্লেখ পেলাম।

বাজা, বাজতন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞ বিবোধী কৃষ্ণেব কথা কিছু শুনলে। এবাবে শোন খোদ গীতায শ্রীকৃষ্ণেব কিছু বেদ-বিবোধী উক্তি; দ্বিতীয অধ্যাযেব ৪২-৪৫ ও ৫৩ নং শ্লোকেব কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদেব অংশবিশেষ উদ্ধৃত কবছি।

'যাহাবা আপাত মনোহব শ্রবণবমণীয বাক্যে অনুবক্ত, বহুবিধ ফল প্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদিগেব প্রীতিকব,....যাহাবা কামনা পবাযণ, স্বর্গই যাহাদিগেব পবম পুরুষার্থ,....সেই বিবেকহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগেব বুদ্ধি সমাধি বিষযে সংশয শূন্য হয না। হে অর্জুন' বেদ সকল সকাম ব্যক্তিদিগেব কর্মফল প্রতিপাদক, অতএব তুমি... ধৈর্যশালী ও অপ্রমাদী হইযা নিষ্কাম হও।..... তোমাব বুদ্ধি নানাবিধ বৈদিক ও লৌকিক বিষয শ্রবণে উদ্‌ভ্রান্ত হইযা আছে; যখন উহা বিষযান্তবে আকৃষ্ট না হইযা স্থিবভাবে পবমেশ্ববে অবস্থান কবিবে, তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ কবিবে।' এব মধ্যবর্তী ৪৬ নং শ্লোকেব বঙ্কিমচন্দ্র কৃত অর্থ এই বকম ঃ 'সকল স্থান জলে পূর্ণ হইলে ক্ষুদ্র জলাশযে যাবৎ প্রযোজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠেব সমস্ত বেদে তাবৎ প্রযোজন'। কথাগুলিব তিনি যা সবলার্থ কবেছেন তা এই ঃ 'সর্বত্র জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশযে লোকেব আব কি প্রযোজন থাকে ? কোন প্রযোজনই থাকে না।....তেমনি যে ঈশ্ববকে জানিযাছে, তাহাব পক্ষে সমস্ত বেদে আব কিছুমাত্র প্রযোজন নাই।'

ওপবে যে শ্লোকগুলিব কথা বললাম,তাব ব্যাখ্যাব মধ্যে আমি এখন যাচ্ছি না। আমি শুধু তোমাকে লক্ষ্য কবতে বলছি বেদ সম্বন্ধে চোখা চোখা মন্তব্যগুলি। বেদবাক্য কিবকম? না, 'আপাতঃ বমণীয ও শ্রুতি সুখকব' অর্থাৎ শুনতে ভাল ও বমণীয বটে, কিন্তু আসলে অন্তঃসাবশূণ্য, কাবণ তা স্বর্গাদিব বাসনায পূর্ণ। যাবা এসব তুচ্ছ কামনা বাসনা নিযেই মত্ত তাবা 'বিবেকহীন' ও 'মূঢ়'। এসব বৈদিক কথাবার্তা শুনেই অর্জুনেব 'বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত' হযে আছে। ঈশ্বব জ্ঞানেব বিশাল পবিধিব তুলনায বেদ 'ক্ষুদ্র জলাশয' ছাড়া আব কিছুই নয।

বেদনিন্দা আব কাকে বলে? মনে আছে তো, তুমি আমাব বেদেব ব্যাখ্যায খাপ্পা হযে মন্তব্য কবেছিলে, 'জহুবি ছাড়া জহব চিনতে পাবেনা, তোমাব মত নাস্তিক কমিউনিস্টেব পক্ষে বেদ হৃদযঙ্গম কবা মুশকিল'? ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কি কমিউনিস্ট ছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণেব এই উক্তিগুলিব ওপব মন্তব্য কবতে গিযে তাঁব অসমাপ্ত গীতাভাষ্য 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'য তাঁব স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকেব সঙ্গে বলছেন ঃ 'কথাটা বড় ভযানক ও বিস্মযকব। ভাবতবর্ষ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বেদশাসিত। আজিও বেদেব যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টেব তাহাব সহস্রাংশেব এক অংশ নাই। সেই প্রাচীনকালে বেদেব আবাব ইহাব সহস্রগুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্য প্রবচনকাব ঈশ্বব মানেন না-ঈশ্বব নাই, এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে সাহস কবিযাছেন, তিনিও বেদ অমান্য কবিতে সাহস কবেন না,- পুনঃ পুনঃ বেদেব দোহাই দিতে বাধ্য হইযাছেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছেন, এই

বেদবাদীবা মূঢ় বিশ্বাসী, ইহাবা ঈশ্ববাবাধনাব অযোগ্য।' তো, এই হলেন বিদ্রোহী শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বাজতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদ, যাগযজ্ঞ ও বেদবিবোধী। বুদ্ধও তাই। কিন্তু বুদ্ধ বড় বেশি জাজ্বল্যমান,তিনি তখনকাব দিনে এক আধুনিক মানুষ। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদীবা 'কণ্টকেন কণ্টকৈবকম্' নীতি অনুসাবে আমদানি কবলেন কৃষ্ণকে, যিনি যজ্ঞবিবোধী, বেদ বিবোধী, অনার্য, নিম্নবর্ণ, ব্রাত্যদেব প্রিয়, কিন্তু যাব মুখে জুতসইভাবে জুড়ে দেওয়া যায বর্ণাশ্রমধর্মেব জযগান, আবাব যাঁব মুখে একটু বেদনিন্দা থাকলেও বেমানান হয না, কাবণ সেটাকে ঈশ্ববেব লীলা খেলা বলে চালিযে দেওযা যায।

আশা কবি আমাব এই কথাটি তোমায বোঝাতে পেবেছি যে খ্রীস্ট বল, কৃষ্টই বল, নানা রূপান্তবেব মধ্য দিযে সব দেশেই পৌবাণিক এই সব চবিত্রগুলি ইতিহাসকে পিছনে ফেলে কিংবদন্তী হযে ওঠে। শুধু তাই নয,ক্রমে শাসকশ্রেণীগুলি তাদেব প্রযোজনেব তাগিদে চবিত্রগুলিকে ইচ্ছেমত বদলেও নেয। সমাজেব নানা অন্যায ও জববদস্তিব বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল এই সব কিংবদন্তীব নাযকেবা যখন লোকপ্রিযতায এমন অটল আসন পেযে যান যে মানুষেব শ্রদ্ধা থেকে তাদেব হঠানো যাবে না, তখনই শুরু হয নূতন কৌশল। সমাজ নাযকেবা একদিন যাদেব বিরুদ্ধে খড়গহস্ত ছিল, তাদেবকে স্বীকাব কবে নেওযা হয এমনভাবে যাতে তাদেব ঈশ্ববত্ব প্রতিষ্ঠিত হয কিন্তু তাদেব জীবনেব প্রকৃত লক্ষ্যগুলি যেন প্রকট হযে না ওঠে। লেখাপড়াব ব্যাপাবটা যখন শাসক শ্রেণীগুলিব সম্পূর্ণ একচেটিযা ব্যাপাব ছিল, সেই প্রাচীনকালে এই কাজটা কবা হত যথেষ্ট নিপুণতাব সাথে। কলমকে বলা হয তববাবিব চেযে শক্তিশালী। কথাটাকে আমবা ভাল অর্থেই বলি। কিন্তু যে কালে কলম ধবাব অধিকাবী ছিলেন একমাত্র উচ্চবর্গেব লোকেবা তখন তাঁদেব সেই কলমেব তববাবিব মুখে কত সত্য যে ভূলুণ্ঠিত হযেছে, তাব ইযত্তা নেই। তাঁবা তাঁদেব মনোমত ভাব ও কথাগুলিকে অবতাবদেব কাজে ও মুখে বসিযে দিযেছেন। কিন্তু একটি চেহাবাব ওপব যতই ছদ্মবেশ পবাও তাব সবটুকুকে তুমি বিলুপ্ত কবে দিতে পাব না। তাই যীশু বল কৃষ্ণ বল, সবাবই কাহিনী, কিংবদন্তী ও বক্তব্যেব মধ্যে এমন বহু উপাদান বযে গেছে, যাব মধ্য থেকে আমবা তাদেব আদত আদলটি খুঁজে পাই। তাবই কিছু কিছু উদাহবণ তোমায দিলাম।

এই কৃষ্ণ প্রসঙ্গ আজ আমি শেষ কবব, কেমন কবে তিনি অবতাব হযে উঠলেন, সে সম্পর্কে আমাব দুএকটি বক্তব্য পেশ কবে, এবং তা কবব ববীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রেব সাহায্যে। কৃষ্ণ কেমন কবে অবতাব হযে উঠলেন, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রে আমবা চমৎকাব জবাব পেতে পাবি। ববীন্দ্রনাথ অবতাববাদে বিশ্বাসী নন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাসী। অথচ, বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী বঙ্কিম অলৌকিকতায বিশ্বাসী ছিলেন না। অলৌকিকতা ছাড়া যে কোনও অবতাবই নেই, অবতাবটি নিতান্ত মনুষ্য নয, স্বযং ঈশ্বব — ভেল্কি বা অলৌকিক কাহিনী ছাড়া যে তা প্রমাণ কবা কখনওই সম্ভব নয—বঙ্কিমচন্দ্র এই সাদামাটা কথাটা ধর্তব্যেব মধ্যে আনেন নি। কৃষ্ণ সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনীগুলি যদি না থাকত,তবে তিনি চাণক্যেব মত কূটনীতিজ্ঞ, কপিলেব মত দার্শনিক, কিংবা গান্ধীজীব মত জননেতা হতেন, অবতাব হতে পাবতেন না। বক্তমাংসেব মানুষ ববীন্দ্রনাথ, টলস্টয বা গ্যেটেব মত বহুমুখী উত্তুঙ্গ প্রতিভাও কখনও অবতাবেব মর্যাদা পায না, অথচ যীশু বা কৃষ্ণ, যাঁদেব সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সবই গবেষণাব বিষয, তাঁবা ঈশ্ববেব অবতাব বলে প্রশ্নহীন ভাবে কোটি কোটি মানুষেব পূজা পান। তাব কাবণ, অলৌকিকতা। অলৌকিকতা ছাড়া, শুষ্ক দর্শন নিযে ধর্ম টেকে না।

কিন্তু অবতাববাদে বিশ্বাসী হওযা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র এই অলৌকিকতাকে নির্মমভাবে ছিন্ন ভিন্ন কবেছেন। শ্রীকৃষ্ণেব বাল্যকাল নিযে যতগুলি অলৌকিক কাহিনী আছে,তাব প্রত্যেকটিব তিনি একটি কবে নৈসর্গিক ব্যাখ্যা দিযেছেন। 'কৃষ্ণচবিত্রেব' দ্বিতীয খণ্ডেব তৃতীয–চতুর্থ পবিচ্ছেদ থেকেই সেই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাখ্যাগুলি কিছু কিছু তোমাকে শোনাচ্ছি।

প্রথমে পুতনা বধ। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, 'পুতনাব আব একটা অর্থ আছে। আমবা যাকে ''পেঁচোয পাওযা'' বলি, সূতিকাগাবস্থ শিশুব সেই বোগেব নাম পুতনা। সকলেই জানে যে শিশু বলেব সহিত স্তন্য পান কবিতে পাবিলে এ বোগ আব থাকেনা।' সুতবাং বঙ্কিমেব মতে কৃষ্ণ কর্তৃক পুতনাবধেব নির্গলিতার্থ হল এই যে, শিশু কৃষ্ণ সবলে স্তন্যপান কবে পুতনা বা 'পেঁচোয পাওযা' বোগকে পবাভূত কবেছিলেন।

কৃষ্ণ শিশুকালে একবাব মাটি খেযেছিলেন। অনেক শিশুবাই তাই কবে। মা যশোদা শাসন কবতে গেলে শিশু মাটি মুখে দেওযাব কথা অস্বীকাব কবে। যশোদা মুখেব ভেতব দেখতে চাইলে কৃষ্ণ হাঁ কবে দেখালেন, তখন সেই মাটিব তালকেই যশোদাব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বলে মনে হল।

কৃষ্ণেব শৈশবে যমলার্জুন ভঙ্গেব যে উপাখ্যান আছে,তাবও বঙ্কিমকৃত সহজ ব্যাখ্যা এই বকম ঃ কৃষ্ণেব দুবন্তপনায যশোদা তাকে দড়ি দিযে উদুখলে বেঁধে বেখেছিলেন। কৃষ্ণ বেশ বলশালী বালক, সেই উদুখল নিযে চলতে চলতে যমলার্জুন গাছেব মূলে আটকে গেলেন এবং তাতে গাছ ভেঙ্গে গেল। বঙ্কিম লিখছেন, 'অর্জুন বলে কুবচি গাছকে। যমলার্জুন অর্থে জোড়া কুবচি গাছ। কুবচি গাছ সচবাচব বড় হয না। যদি চাবাগাছ হয, তাহা হইলে বলবান শিশুব বলে ঐরূপ অবস্থায তাহা ভাঙ্গিযা যাইতে পাবে।' এই সহজ ব্যাপাবটাব ওপবেই নানা বঙ চড়িযে, গাছ দুটিকে শাপগ্রস্থ কুবেব পুত্র বানিযে, কৃষ্ণেব দ্বাবা তাব শাপমোচনেব এক মস্ত 'উপন্যাস' ভাগবতকাব খাড়া কবেছেন বলে বঙ্কিম মত প্রকাশ কবেছেন।

কৃষ্ণেব শৈশবেব প্রতিটি অলৌকিক কীর্তিকলাপেবই এই বকম ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র দিযেছেন। বৎসাসুব, বকাসুব ও সর্পরূপী অঘাসুব হত্যাকে বলবান দুবন্ত বালকেব হাতে স্রেফ একটি বাছুব, একটি বক ও একটি সাপ মাবা যাওযাব ঘটনা বলে বঙ্কিম চিহ্নিত কবেছেন। কালীয দমনেব কাহিনীতে একেক পুবাণে একেক বৃত্তান্ত নিযে তিনি কিঞ্চিৎ বসিকতা কবেছেন। কালীযেব পত্নীদেব কৃষ্ণস্তব বিষযে বঙ্কিম বলেছেন যে, পুবাণ বচযিতা তাদেব মুখে যে সব ভাষা বসিযেছেন, তাতে মনে হয যে তাবা এক একজন দার্শনিক। কোনও পুবাণে আবাব তাদেব স্তব এত মিষ্ট যে মনে হয মনুষ্য পত্নীদেব মুখে বিষ থাকতে পাবে বটে কিন্তু নাগপত্নীদেব মুখে বড় মধু। সমস্ত কাহিনীটিকে বিচাবক বঙ্কিম তাই 'উপন্যাস' বলে ডিসমিস কবে দিযেছেন।

কৃষ্ণ চবিত্র বিচাবেব এই পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্রেব এক অসামান্য অবদান। ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ বিষযে তিনিই পথ প্রদর্শক। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত তাঁব 'কৃষ্ণচবিত্র' সমালোচনায তিনি লিখেছিলেন, 'যখন আমাদেব দেশেব শিক্ষিত লোকেবাও আত্মবিস্মৃত হইযা অন্ধভাবে শাস্ত্রেব জয ঘোষণা কবিতে ছিলেন' (ভেবে দেখ, আজও এদেশে অনেকে তাই কবছেন) 'তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীবদর্প সহকাবে.....শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বাবা তন্নতন্নরূপে পবীক্ষা কবিযাছেন।...... বুঝাইযাছেন জড়ভাবে শাস্ত্রেব অথবা

লোকাচাবেব অনুবর্তী হইয়া আমবা পূজা কবিব না।.....তাহাব পব দেখাইযাছেন, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র।' বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, একটু বেশি পবিমাণেই হিন্দুত্বগর্বী ছিলেন; কিন্তু, একালেব হিন্দুত্ব ওযালাবা যদি তাঁব সেই বিশ্লেষণী বিচাব বুদ্ধিব এক বত্তিও পেতেন, তাহলে দেশে আজ অশান্তি কিছু কম হত।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণেব অলৌকিকতাব অপসাবণ কবে তাঁব আদর্শ মানব মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা কবাব প্রচেষ্টা কবেছিলেন। ববীন্দ্রনাথ আলোচনাক্রমে বলেছেন, 'বঙ্কিম যাহাকে মহাভাবতেব প্রথম স্তবেব কবি বলেন তিনি কৃষ্ণেব ঈশ্ববত্বে বিশ্বাস কবিতেন না, এ কথাও বঙ্কিম স্বীকাব কবিযাছেন।' বঙ্কিম কথিত এই প্রথম স্তবই অকৃত্রিম মহাভাবত, বাকি সবই তাঁব মতে প্রক্ষিপ্ত। তাহলে ঐ অকৃত্রিম আদি কৃষ্ণ কিভাবে অলৌকিকতায ও ঈশ্ববত্বে আবৃত হলেন, বঙ্কিম তাব জবাব দেবাব কোনও প্রযোজন বোধ কবেন নি। এ বিষযে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ থেকে তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত দেব।

গল্পগুচ্ছেব 'খোকাবাবুব প্রত্যাবর্তন' তোমাব নিশ্চযই অনেকবাব পড়া আছে? অনুকূলেব যখন মাত্র এক বছব বযস তখন বাব বছবেব ভৃত্য বাইচবণ বাবুদেব বাড়ি এসেছিল। সেই অনুকূল বড় হল, তাব বিবাহ হল, বাইচবণেব একান্ত অধিকাব থেকে সে চলে গেল, এল খোকাবাবু–অনুকূলেব পুত্র, ছোট্ট 'আনুকৌলব'। সেবা ও ভক্তি পবাযণ বাইচবণ খোকাবাবুকে নিযে মত্ত হযে গেল। খোকাবাবুব সব কিছুই তাব কাছে বিস্মযকব। সে যে মা কে মা, পিসি কে পিসি, ও বাইচবণকে 'চন্ন' বলে তাও। এই শিশু একদিন জলে ডুবে মাবা গেল, বাইচবণেবই এক অসতর্ক মুহূর্তে। খোকাবাবুব মা তাকে শিশু চোবেব অপবাদ দিযে শেষে তাড়িযে দিল। বাইচবণেব মনে অপবাধ–বোধ গেঁথে গেল। দেশে ফিবে কিঞ্চিৎ বেশি বযসে তাব একটি পুত্র সন্তান হল। খোকাবাবু যে 'বিস্মযকব' কাজগুলি কবত, এও তাই কবতে লাগল। বাইচবণেব মনে এ ধাবণা বদ্ধমূল হল যে এই সেই খোকাবাবু। মবে গিযে তাবই ঘবে জন্ম নিযেছে। সে এও ভাবতে লাগল যে মাযেব মন ঠিকই বুঝতে পেবেছিল যে সেই খোকাবাবুকে চুবি কবেছে। সে তাব সাধ্যাতীত ব্যযে নিজ পুত্রকে খোকাবাবুব মতই মানুষ কবে তুলল এবং একদিন একথা বলে সে ছেলেটিকে ফিবিযে দিল 'প্রভু, মা, আমিই তোমাদেব ছেলে চুবি কবিযাছিলাম।' অন্ধ আনুগত্য, জন্মান্তববাদেব ধাবণা, অলৌকিকতায বদ্ধমূল বিশ্বাস কিভাবে সবল মনেব কাছে তুচ্ছকে বিবাট ও নয কে হয কবে তোলে, ববীন্দ্রনাথেব এই অসাধাবণ ট্র্যাজিক গল্পটিতে যেভাবে তা মূর্ত হযে উঠেছে, আমি লক্ষ কথাযও তা বোঝাতে পাবতাম না। ঈশ্ববেব প্রতি অন্ধ আনুগত্য, জন্মান্তববাদেব ধাবণা ও অলৌকিকতায বদ্ধমূল বিশ্বাসই এমনি কবে কৃষ্ণেব তুচ্ছ কাজগুলিকেও বিবাট ও কৃষ্ণ যা নন তাঁকে তাই কবে তুলেছে, এবং কযেক শতাব্দীব প্রক্রিযায অবতাব কৃষ্ণ গড়ে উঠেছেন। ইতিপূর্বে আমি তোমাকে ইঙ্গিত দিযেছি যে পুবাণেব কৃষ্ণ সম্ভবত ঃ এক নন, বহু—একজন মথুবাব, একজন দ্বাবকাব, একজন কুরুক্ষেত্রেব। কবি ও পুবাণকাবেবা পবে এসব কিছুব সমন্বয সাধন কবেছিলেন। হযতো কোনও অতিদূব অতীতেব কৃষ্ণ ঐসব বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিহাসেব দিগন্তেব ওপাবে প্রত্যাবর্তন কবেছিলেন এবং আবোপিত নানা কল্পনাব কারুকার্যে দেবতা হযে উঠেছিলেন। ব্রজেব বাখাল বালক, দ্বাবকাব যদুকুলনেতা ও কুরুক্ষেত্রেব পাণ্ডবসখাকে ঘিবে বচিত ঐসব অজস্র অতিকথাব মধ্য থেকে, 'ঐতিহাসিক কৃষ্ণ'কে বঙ্কিমচন্দ্র খুঁজে বেব কবাব চেষ্টা কবেছিলেন। কিন্তু, ববীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে

ওভাবে তা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব, কাবণ ইতিহাসেব 'মুক্তো' পুবাণ ও কাব্যেব বিস্তীর্ণ সমুদ্রেব গর্ভে নিহিত আছে। তবে ইতিহাসেব তথ্য না পেলেও ইতিহাসেব প্রক্রিযাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র যে বুঝে নিতে সাহায্য কবেছেন, তাব জন্য আমবা তাঁব কাছে ঋণী।

॥ ছেচল্লিশ ॥

তুমি গত চিঠিতে জানিযেছ যে সুমিতা আমাকে 'হিপোক্রিট' অর্থাৎ কিনা ভণ্ড। ভণ্ড তপস্বী যেমন ঈশ্বব মানেনা, ঈশ্ববেব নাম নেয, তেমনি বঙ্কিম–বিবেকানন্দ না মেনেও আমি বঙ্কিম–বিবেকানন্দ আওড়াচ্ছি। সুমিতাব জিজ্ঞাসা, মার্ক্সবাদী হযে এই সব ভাববাদী হিন্দুব দ্বাবস্থ হযেছি কেন? পর্দাব আড়াল থেকে ছুঁড়ে দেওযা এই সব বাঁকা কথাব জবাবে দুএকটা সোজা কথা বলি। প্রথমত বঙ্কিম (বা বিবেকানন্দ) কে আমি মানি কিনা, তাব চেযে জরুবি হল তোমবা মান কিনা। যদি মান, তবে তাঁব কথাগুলিকে মূল্য দেওযা উচিত। আমি হিন্দুত্বেব গৌবব

কবিনা, কিন্তু যিনি কবেন, তিনি যদি বঙ্কিম বা বিবেকানন্দেব মত যুক্তি ও মানবতাবাদকে অবলম্বন কবেন, তবে তাঁব সাথে আমাব মতবিবোধ হলেও তিনি শ্রদ্ধেয। আমি একথাটাই বোঝাতে চাই। ববীন্দ্রনাথ তাঁব 'বঙ্কিমচন্দ্র' ও 'কৃষ্ণচবিত্র' প্রবন্ধ দুটিতে বঙ্কিমেব প্রতি একই সঙ্গে যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও তীক্ষ্ণ সমালোচনাব নিদর্শন বেখেছেন, আমাব কাছে তাই হল আদর্শ। এবপব আমায 'হিপোক্রিট' বল, ক্ষতি নেই। দ্বিতীযত, তুমি বলতে পাব 'বঙ্কিম যাই বলুন, আমাদেব বিচাব কবে দেখতে হবে, কোনটা সত্য'। আমি তাহলে বলব, 'বহুৎ আচ্ছা, এস আমবা সবকিছু বিচাব কবে দেখি। কোনও কিছুই স্বতঃসিদ্ধ নয, সব কিছুই বিচাবেব দ্বাবা গ্রহণীয।' ববীন্দ্রনাথ যদি বঙ্কিমেব সমালোচনা কবে থাকেন, বঙ্কিম কবে থাকেন পুবাণকাবদেব, পুবাণোক্ত কৃষ্ণ কবে থাকেন বেদেব এবং বেদ স্বযং ঈশ্ববেব, তাহলে 'সনাতন', 'চিবন্তন', 'অপবিবর্তনীয' কথাগুলি মূল্যহীন নয কি? সমস্ত সমালোচনা ও বিচাবেব ঊর্ধ্বে 'হিন্দু বিশ্বাসেব' যে অভ্রান্ততাব জিগিব তোলা হচ্ছে, সেটা তাহলে কোথায থাকে! অথচ, বঙ্কিমচন্দ্র বা ববীন্দ্রনাথ বা গীতাব কৃষ্ণ বা বেদ হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী নন। তা তো নয। আমি এই কথাটাকেই প্রমাণ কবতে চাইছি। আমি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী কিনা সেটা এক্ষেত্রে গৌণ। তৃতীযত হিন্দু বা যে কোনও ধর্মেব প্রবর্তক, প্রচাবক বা সমর্থকদেব যে সমস্ত কথা কালেব কষ্টিপাথবে যাচাই হযে আমাদেব কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে, তাতে কি কারু একচেটিযা অধিকাব আছে? জল হাওযাব মতই সে সমস্ত কথা সার্বজনীন, কোনও বিশেষ ধর্মেব বা গোষ্ঠীব নিজস্ব সম্পদ নয। মার্ক্স–এঙ্গেলস–লেনিনেব বক্তব্যও তো প্রতিদিন অসংখ্য অমার্ক্সবাদীবা উচ্চাবণ কবে চলেছেন, তাতে কি কোনও 'পেটেন্ট' আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে? অতএব, বঙ্কিমেব উক্তি উদ্ধৃত কবায আমাব অপবাধ কোথায? সব শেষে বলি, তুমি জান, আমি ডি. ডি. কোশাম্বিব একজন প্রগাঢ় গুণগ্রাহী। তিনি মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক, কিন্তু মার্ক্স–এঙ্গেলস্ থেকে উদ্ধৃতিতে বিবত থাকেন। আমাদেব দেশেব ঐতিহ্যকে বোঝাব পক্ষে আমাদেব দেশেবই চিন্তাবিদ, গ্রন্থ, পৌবাণিক নিদর্শন ইত্যাদি হল সর্বোত্তম সাক্ষ্য। গীতা

বোঝার জন্য তিলক-গান্ধী-বঙ্কিম প্রমুখের দ্বারস্থ তো আমাদের হতেই হবে। এতে দোষ কী?

সুমিতার অভিযোগের জবাব হল। এবারে প্রসঙ্গে ফিরি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণের বেদ নিন্দা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যে উক্তিটি গত চিঠিতে উদ্ধৃত করেছিলাম, তার সঙ্গে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথাও তিনি বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'ইহার ভিতরে একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে', বঙ্কিমের সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বটি কী? সেটি সংক্ষেপে এই রকম ঃ

বেদের উপাসনা ফল প্রাপ্তির আশায়। তার প্রার্থনা হল 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর, হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতরের কথাগুলি বঙ্কিমেরই কলম জাত, আমার নয়। তিনি এও বলেন যে, সাধারণ উপাসকের সঙ্গে উপাস্য দেবের সচরাচর এই সম্পর্কই দেখা যায়। বৈদিক ধর্মে এই যে স্বার্থ বুদ্ধির প্রাবল্য, ক্রমে তা ব্যাপকাকার ধারণ করে। যাগযজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্মের প্রকৃত মর্ম কিছুই আর থাকে না। তখন এই 'বৃথা ধর্মে'র বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ঘনিয়ে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন যে সমাজের উচ্চ প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা বৈদিক ধর্মের এই অসারতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমরা এই সঙ্গে সবিনয়ে যোগ করতে পারি যে কেবল উচ্চ প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাই নয়, আপামর জনসাধারণের মধ্যেও এই উপলব্ধি অতিমাত্রায় ছিল, নতুবা এই প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের পিছনে এত জন সমাগম হত না।

বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন যে বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতি অশ্রদ্ধার কারণে সমাজে 'ত্রিবিধ বিপ্লব' উপস্থিত হয়েছিল। এই বিপ্লবগুলি ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এই সব বিপ্লবের যাঁরা নেতা তাঁদের প্রথম দল হলেন চার্বাক। এঁরাই প্রথম বস্তুবাদী দার্শনিক। চার্বাককে 'উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাশালী' ও এক বিপ্লবের নেতা বলে মনে করলেও বঙ্কিমচন্দ্র চার্বাক- পন্থীদের মতকে যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেননি। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে সেই আদি যুগে বিশ্ব সম্বন্ধে যতটুকু বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, তা তাঁরা দিয়েছিলেন। কিন্তু, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও ভাববাদীদের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণের মুখে এঁরা টিকতে পারেননি। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত কোষগ্রন্থের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তোমাকে দেখিয়েছিলাম যে এঁদের বক্তব্যকে একেবারে লোপাট করে দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে চার্বাক দর্শনের মূল বক্তব্য কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, কেবল তাঁদের সমালোচনা ও তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচারিত দুর্নামগুলি রয়ে গেছে। বিরুদ্ধবাদীরা জবাব দেবার ছলে এঁদের যতটুকু কথা সঠিক বা বিকৃত আকারে উদ্ধৃত করেছেন, সেই কণামাত্র দেখেই শুধু এঁদের প্রতিভার বিরাটত্ব বুঝতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় বিপ্লবী বলেছেন শাক্যসিংহ অর্থাৎ বুদ্ধকে। চার্বাক শুধু ইহলোক মানেন, কর্মফল মানেন না, কিন্তু বুদ্ধ কর্মফল ও পুনর্জন্ম মানেন। তিনি বৈদিক সকাম কর্ম নয়, তৃষ্ণা নিবারণ ও চিত্ত সংযমের দ্বারা ধর্ম পথে নির্বাণ অর্থাৎ পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি লাভের কথা বলেন। বুদ্ধের এই ধর্মপথটি কী, তা নিয়ে আলোচনার আগে 'ধর্ম' বলতে কী বোঝায় তা একটু পরিষ্কার করা দরকার। কেননা এই 'ধর্ম' কথাটি আমাদের দেশে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রথম অর্থের উদাহরণ হিন্দু ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি। এখানে ধর্ম কথাটি ইংরেজী 'রিলিজিয়ন' বোধক-একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আচার আচরণের ও বিশ্বাসের সমষ্টি। আবার ধর, জলের ধর্ম, আগুনের ধর্ম, নারীর ধর্ম-এসব

ক্ষেত্রে ধর্ম কথাটিব অর্থ 'প্রপার্টি' বা 'কোযালিটি'–অবিচ্ছেদ্য গুণ ও কর্ম। তৃতীয যে অর্থে আমবা ধর্ম শব্দটি ব্যবহাব কবি তাব উদাহবণ 'সর্বদা ধর্ম পথে থাকবে,' 'ধর্ম আচবণ কব', 'অধর্ম কবো না' ইত্যাদি। এখানে 'ধর্ম' কথাটিব মানে হল ন্যায ও নীতিনিষ্ঠ আচবণ। আমবা যদিও সাধাবণত ধর্মকে নীতিব সঙ্গে যুক্ত কবি, হিন্দু শাস্ত্রে কিন্তু সাধাবণত ধর্ম কথাটি ওপবেব দ্বিতীয অর্থে ব্যবহাব কবা হয। বলা হয ক্ষত্রিযেব ধর্ম, শূদ্রেব ধর্ম, স্বামীব ধর্ম, স্ত্রীব ধর্ম ইত্যাদি। এই ধর্ম হল কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য গুণ ও কর্মেব ধাবণা, যাব সমষ্টি হিসেবে ঐ ক্ষত্রিয, শূদ্র, স্বামী বা স্ত্রীকে শাস্ত্রে কল্পনা করা হযেছে। ক্ষত্রিযেব ধর্ম বাজ্য শাসন ও পালন কবা, শূদ্রেব ধর্ম শাসিত হওযা ও ক্ষত্রিযেব সেবা কবা। স্বামীব ধর্ম সংসাব প্রতিপালন ও শাসন কবা, স্ত্রীব ধর্ম শাসিত হওযা ও স্বামীব সেবা কবা। ধর্ম সম্বন্ধে এই হল নির্ভেজাল হিন্দু ধাবণা। কিন্তু তৃতীয যে অর্থে ধর্মেব ব্যবহাব হয–নীতি, সৎচিন্তা ও সৎ কর্ম,এদেশে তা হল বুদ্ধেব অবদান। বৌদ্ধধর্মেব তিনটি স্তম্ভ ঃ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। ওঁবা বলেন,'বুদ্ধং শবণং গচ্ছামি, ধর্মং শবণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শবণং গচ্ছামি'। বেদেব কর্মেব পবিবর্তে বুদ্ধেব ধর্ম ভাবতবাসীব কাছে তাঁব মৌলিক অবদান, বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাটাই বলতে চাইছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয বিপ্লবী বলেছেন জ্ঞানবাদীদেব। উপনিষদ ও সাংখ্য সহ ছয দর্শন এই তৃতীয পথেব প্রবক্তা। এই সব দর্শনেব বক্তব্য হল–'জ্ঞানই ধর্ম, জ্ঞানই নিঃশ্রেযস'। এই ষড়দর্শনেব কথা আগে আমবা বিস্তাবিত আলোচনা কবেছি।

বঙ্কিম বলছেন 'শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগেব মধ্যে। কিন্তু...... তিনি দেখিযাছিলেন জ্ঞান সকলেব আযত্ত নহে, ...তিনি আবও দেখিযাছিলেন, ধর্মেব অন্য পথও আছে, অধিকাবীভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষা দুঃসাধ্য। পবিশেষে তিনি ইহাও দেখিযাছেন, অথবা দেখাইযাছেন— জ্ঞান মার্গ এবং অন্য মার্গ, পবিণামে সকলই এক। এই কযটি কথা লইযা গীতা'।

ওপবেব কথাগুলিব সব অর্থ হযত স্পষ্ট হল না, আপাতত তা স্পষ্ট কবাব দিকে আমি যাচ্ছিও না। কিন্তু, যে ব্যাপাবটি স্পষ্ট, তা হল এই যে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্মেব শাস্ত্র–শিবোমণি গীতাকে বেদবিবোধী বিপ্লবেব মধ্য থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন চিন্তাব সমন্বয বলে বর্ণনা কবছেন। বঙ্কিমেব মতে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানবাদী। আমবা আগেও আলোচনা কবেছি যে গীতা উপনিষদেবই সাবভাগ। কিন্তু, গীতা শুধু তাই নয, গীতাব মধ্যে বিভিন্ন মতেব একটা সমন্বয প্রচেষ্টা দেখা যায। এই মতগুলি বেদেব বিবোধিতা থেকে সৃষ্ট। এ পর্যন্ত বঙ্কিম যা বলছেন, তাব সাথে আমাদেব বক্তব্যেব কোনও অমিল নেই। কিন্তু এত আলোচনাব পব যে জিনিসটা বহস্যময মনে হয, তা হল এই যে বেদ যদি 'বৃথা কর্মেব' মন্ত্রণা হয, উপনিষদ–গীতা সবই যদি বেদ–বিবোধী বিপ্লবেব ভাবমন্থনজাত, তবে আবাব বেদ প্রামাণ্যতাব জন্য হিন্দু শাস্ত্রে এত বাড়াবাড়ি কেন? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্নেব উত্তব দেননি। অথচ গীতাব দ্বিতীয অধ্যাযেব ৪৬ নং শ্লোকেব সুস্পষ্ট বেদবিবোধী অর্থকে শঙ্কবাচার্য প্রমুখ ভাষ্যকাবেবা যে স্রেফ চেপে গেছেন, এই মত প্রকাশ কবে তাঁব নিজেব কৃত সবল অর্থ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'মহামহোপাধ্যায প্রাচীন ঋষিতুল্য ভাষ্যকাব টীকাকাবেবা যে এই সহজ অর্থেব প্রতি দৃষ্টি কবেন নাই, আমাব এরূপ বোধ হয না।....(কিন্তু) বেদে কিছু প্রযোজন নাই, এমন কথা....শঙ্কবাচার্য কি শ্রীধব স্বামী কি বলিতে পাবিতেন? বেদ স্বযম্ভুব, অপৌরুষেয, নিত্য সর্বফলপ্রদ। প্রাচীন ভাবতবর্ষীযবা

বেদকেই একটা ঈশ্বররূপ খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি বা শাক্য সিংহ প্রভৃতি যাঁহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজচ্যুত হইযাছিলেন।' সেই কারণেই বঙ্কিমের মতে শঙ্করাচার্য বা শ্রীধর স্বামীকে এমন একটা ভাষ্য রচনা করতে হয়েছে, যাতে 'বেদের মর্যাদা বহাল থাকে'। এবারে পর্দার ওপারে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিইঃ 'শঙ্করাচার্যও কি তবে হিপোক্রিট'?

আমার মনে হয় ব্যাপারটা অত সহজ নয়, বেশ গুরুতর। বেদকে অসার জেনেও এবং ব্যাপক জনসাধারণ বৈদিক যাগযজ্ঞাদির বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কপিলের মত দার্শনিকেরা যে বারে বারে বেদের নামে হলফ করেছিলেন, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে বেদকে অস্বীকার করার পরিণাম ছিল ভয়াবহ অর্থাৎ শক্তিশালী রাজতন্ত্র ও পুরোহিত শ্রেণী জোর করে বেদের অভ্রান্ততার তত্ত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল। গ্যালিলিও যে মৌখিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে বাইবেলের বিশ্বতত্ত্বই ঠিক, তার কারণ তো রাষ্ট্র ও পুরোহিতের নিপীড়ন যন্ত্রই,–নয় কি? এখন প্রশ্ন হল, বেদ অভ্রান্ত নয় জেনেও শাসকশ্রেণী তাকে সর্ববিধ সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখলেন কেন? তার সম্ভাব্য কারণগুলি বলছি ঃবেদ ছিল সংখ্যালঘু আর্য শাসক গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য ও আধিপত্য বজায় রাখার একমাত্র উপায়। আগন্তুক আর্যরা ক্রমেই সুবিশাল অনার্য ভারতবর্ষের চিন্তা চেতনার দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়ছিল। এ অবস্থায় তাদের একমাত্র একান্ত ও অবিকৃত নিজস্ব সম্পদ ছিল বেদ। দীর্ঘকাল পর্যন্ত আর্যদের লিপি না থাকার কারণে এই বিশাল বেদকে একটি বিশেষ ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। আকাশ পৃথিবী ঋতুচক্র পরিমিতি ইত্যাদি বিষয়ে এই গোষ্ঠীর অনুশীলনকৃত জ্ঞানের সঙ্গে ধ্বনি মাধুর্যময় বেদ মন্ত্রগুলিকে তাঁরা যাদুমন্ত্র বা গুপ্ত জ্ঞানের মত ব্যবহার করতেন। আদিম অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের নাগালের বাইরের এই গুপ্ত জ্ঞানই ছিল এই ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণীর শক্তির উৎস। ক্ষত্রিয়রা পরে ব্রাহ্মণের এই একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গীতায়–উপনিষদে বেদ–বিরোধিতা করলেন বটে, কিন্তু দেশব্যাপী আম শূদ্রকুলকে আয়ত্তে রাখার স্বার্থে বেদের অভ্রান্ততা ও অপৌরুষেয়তার মতবাদ ও বেদে উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকারকে স্রেফ বলপ্রয়োগে চালু রাখলেন। বিনিময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে শুধু শাসক নয় দেবতার প্রতিভূ হিসেবেও স্বীকার করে নিলেন, অবতারের পদ পেলেন ক্ষত্রিয়রাই। ব্রাহ্মণ–ক্ষত্রিয়ের এই স্বার্থের লড়াই, আপোস ও ষড়যন্ত্রের কথা আর একটু বিশদ করা যাবে, পরের বারে।

॥ সাতচল্লিশ ॥

তোমাকে গত চিঠি লেখা শেষ হওয়ার পরে ডাক্তারবাবু এলেন। এখন তো আমি সুস্থ। মা অসুস্থ, তাঁকে দেখেন। তারপর খানিকক্ষণ আড্ডা চলে। ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমরা এই যে হিন্দুধর্ম নিয়ে এত তর্ক বিতর্ক করছ, হিন্দুধর্ম কি আদৌ কোনও একটি ধর্ম ?' আমি যোগ করলাম, 'এবং হিন্দু কথাটা আদৌ কি হিন্দু?' সেই ছেলেবেলার ইতিহাসে পড়েছিলাম শার্লেমেন প্রতিষ্ঠিত'হোলি রোমান এম্পায়ার' সম্বন্ধে বলা হত যে তা হোলি (পবিত্র), বা রোমান, বা এম্পায়ার (সাম্রাজ্য) কোনওটাই নয়। আমরা দুই নাস্তিকে মিলে হিন্দু ধর্মের কি সেই দশা প্রতিপন্ন করে ফেললাম? মার কানে

আমাদেব বৈঠকখানাব কথা যায না, কিন্তু মাব প্রতিনিধি তাঁব বৌমা আছেন, তিনি প্রতিবাদ কবলেন। আমি বোঝাতে চাইলাম যে আমাদেব এই কথাগুলি যতটা কালাপাহাড়ি শোনাচ্ছে, ততটা তা নয, আমাদেব এই বক্তব্য শাস্ত্রসিদ্ধ। শাস্ত্রালোচনাব দ্বাবাই কথাগুলি প্রমাণিত হবে। হিন্দুদেব কপিল বযেছেন, যিনি শাস্ত্রেব দোহাই দিযে স্বযং ঈশ্ববকে উড়িযে দিযেছেন, সুতবাং গৃহিনী তো তুচ্ছ, তাঁকে ওড়াতে কতক্ষণ। চা ও আনুষঙ্গিক সাজিযে দিযে তিনি বিনা যুদ্ধে পালিযে গেলেন।

কথাটা ভেবে দেখ। জগতেব অন্যান্য ধর্মেব সাথে হিন্দু ধর্মেব একটা বড় তফাৎ হল এই যে, তাব কোনও নিদিষ্ট ধর্ম প্রচাবক বা নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ নেই। এমন কি কোনও নির্দিষ্ট দেবতাও নেই। ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে হিন্দুদেব কড়াকড়ি ধর্মবিশ্বাসে নয, সামাজিক আচাব আচবণে। তুমি সাবাজীবন ভগবানকে একবাবও না ডেকে, গীতা, বেদ, উপনিষদেব কিছুমাত্র তোযাক্কা না কবে হিন্দু থাকতে পাব, কিন্তু জন্ম মৃত্যু বিবাহে সামাজিক নির্দিষ্ট ক্রিযাকর্মগুলি যদি না কব, তবে তুমি সমাজচ্যুত হবে। সাবা দেশে সামাজিক বীতিনীতি যেহেতু অসংখ্য, হিন্দুব আচাব আচাবণ ধর্ম বিশ্বাসও তাই বিচিত্র ও অসংখ্য। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকাবেবা কেউ 'হিন্দুধর্ম' কথাটিও বলেন নি, 'সনাতন' ধর্মেব কথা বলেছেন। তুমি তো জানোই যে 'হিন্দু' নামটি দিযেছিল আসলে আববী ইবাণীবা, তাবা সিন্ধুকে 'হিন্দু' উচ্চাবণ কবত,তা থেকে সিন্ধু তীববর্তী ও সিন্ধুব এপাবেব সব অধিবাসীবা হযে গেল হিন্দু, আব দেশটাই হযে গেল 'হিন্দুস্তান'। অর্থাৎ মূলে হিন্দু কথাটা জাতিবাচক, ধর্মবাচক নয। যে ভবত থেকে এদেশেব নাম ভাবতবর্ষ সেই ভবত বা তাঁব উত্তব পুরুষেবা কেউ হিন্দু ছিলেন এমন কথা কোথাও লেখা নেই।

তো, এই বিবাট দেশেব বিপুল সংখ্যক মানুষকে তাদেব আচাব আচবণেব কোনও পবিবর্তন না ঘটিযে, তাদেব কোনওভাবে ধর্মান্তবিত না কবে, সকলকে এক সাথে বেঁধে ফেলাব কাজটি যে ব্রাহ্মণেবা কবেছিলেন, তাঁবা যে বিবাট প্রতিভাশালী ছিলেন, সন্দেহ নেই। সেই প্রতিভাব শক্তিতে সাবা দেশে বিভিন্ন ধর্মমত ও বিশ্বাস যে একটি ব্যবস্থাব মধ্যে একত্রিত হযেছিল, তাকে তুমি অন্য ধর্মেব সাথে তুলনা কবতে পাব না, একে বলা যেতে পাবে একটি মঞ্চ বা প্ল্যাটফর্ম। এই মঞ্চে জন্মান্তববাদ, অবতাববাদ, বর্ণভেদ ইত্যাদি কতকগুলি বিশ্বাসেব ঐক্য যেমন আছে, তেমনি আছে অসংখ্য বিভিন্ন দেবতা, বিভিন্ন আচাব অনুষ্ঠান ও ধর্মীয ক্রিযাকর্মাদি, এমন কি নাস্তিক্যও। বিচিত্র পথেব এই সমন্বযেব সঙ্গে অন্য ধর্মগুলি ঠিক মেলে না।

হিন্দুব নানা শাস্ত্রে ধর্ম সম্বন্ধে কোনও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে কি ? তাও নেই। প্রথমে শুরু কব বেদ থেকে। বেদে ধর্ম কথাটা আমি পাই নি। সেখানে পাপ পুণ্যেব কথা আছে–কিন্তু তা যে ঠিক কী, বোঝা যায না। 'ঋত' বলে একটি শব্দ আছ, যাব অর্থ কবা যেতে পাবে এমন এক সত্য নিখিল বিশ্ব যার দ্বাবা নিযন্ত্রিত। এই ঋতেব জিম্মাদাব হলেন বরুণ। তিনি ঋতভঙ্গকাবীদেব পাশবদ্ধ কবেন, তিনি কঠোব, কিন্তু তিনি কোমলও। বরুণেব প্রতি তাই ঋগ্বেদে মাঝে মাঝে প্রার্থনা শোনা যায, 'আমি অজানিতে পাপ কবেছি, তুমি আমাকে পাশবদ্ধ কবোনা, করুণা কব।' ধর্ম সম্বন্ধে এব চেযে জটিলতব কোনও বোধ বেদে নেই।

ধর্ম সম্বন্ধে একটি লোকাযত ধাবণা ছিল, তাব মূল কথা হল ন্যায অন্যায বোধ। এ সম্বন্ধে তোমাকে আমি আগেও কিছু বলেছি। এই ধর্মেব দেবতা ও মৃত্যুব দেবতা, একই। তিনি

যম। মৃত্যুব পব যম দেবতা পাপ পুণ্য অনুযাযী মানুষকে শাস্তি দেন ও পুবস্কৃত কবেন– এই ধাবণা থেকে এই ধর্ম দেবতাব উদ্ভব। বিনয ঘোষ, আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁদেব গবেষণায দেখিযেছেন যে বঙ্গদেশেব গ্রামে গ্রামে ধর্মঠাকুবেব যে উপাসনাব প্রচলন আছে, তা অত্যন্ত প্রাচীন। এই ধর্ম উপাসনা আবাব সূর্য উপাসনাব সঙ্গেও জড়িত। অন্যদিকে সূর্য থেকে বিষ্ণুতে রূপান্তবেবও একটা ব্যাপাব গবেষকবা লক্ষ্য কবেন। বলা যায সূর্য, বিষ্ণু ও ধর্মেব উপাসনা ভাবতবর্ষে একদা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, এবং ক্রমে একটি আব একটিব সাথে মিলে মিশে যায। মহাভাবতেব মত অবিস্মবণীয মহাকাব্যেব আদি কেন্দ্রবিন্দুই ছিলেন ধর্ম দেবতা, সে কথা তোমাকে আগে আমি প্রমাণ সহ দেখিযেছি। পবে কালক্রমে বিষ্ণু ও তাঁব অবতাব কৃষ্ণ মহাভাবতেব কেন্দ্রস্থলে চলে আসেন। মহাভাবতেব ধর্ম জিজ্ঞাসাব একটা বড় সমস্যাই হল এই যে, বহু জিজ্ঞাসাব কোনও সদুত্তব সেখানে নেই। বহুদর্শী পিতামহ ভীষ্ম অনেক সমস্যাব সমাধান কবতে পাবেন না। যে ভীষ্ম কুরুকুলে সিংহাসনেব লড়াই ঠেকাবাব জন্য প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন যে তিনি বিবাহ কববেন না, বা সিংহাসনে আবোহণ কববেন না, তিনিই শেষ বযসে সিংহাসনেব লড়াইযে এমন পক্ষ নিতে বাধ্য হন, যে পক্ষকে তিনি অন্যাযকাবী বলে মনে কবেন। পাণ্ডবেব বনবাস, দ্রৌপদীব লাঞ্ছনা, কুরুকুলেব বক্তক্ষয— কোনও কিছুই তিনি তাঁব ধর্মনীতি দিযে ঠেকাতে পাবেন নি। অন্য দিকে যুধিষ্ঠিবেব দ্যূতাসক্তি, যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ কর্তৃক নানা অন্যায পথ অবলম্বন কবে ভীষ্ম–দ্রোণ–কর্ণাদি হত্যা প্রভৃতিকেও ধর্মনীতি দ্বাবা সমর্থন কবা যায না। গান্ধাবীব যে বিশ্বাস ছিল 'যথা ধর্ম, তথা জয,' তা সত্য হয নি। বল প্রযোগ ও অধর্ম পথেই অনেক জয–পবাজযেব মীমাংসা হযেছে। ফলত মহাভাবত মানবতাব এক বিশাল ট্র্যাজেডী। মহাকবি ব্যাস নির্মোহ ও নিবপেক্ষভাবে সমাজেব ধর্ম অধর্ম সমস্ত কিছুকে উপস্থিত কবেছেন, তাব সমাধানেব চেষ্টা কবেন নি। মহাভাবতেব উপসংহাবে অষ্টাদশ পর্বেব পঞ্চম অধ্যাযে বিলাপ কবে তিনি বলছেন ঃ

'আমি ঊর্ধ্ববাহু হইযা বৃথাই বোদন কবিতেছি, কেহই আমাব বাক্য শ্রবণ কবিতেছে না। ধর্মোপার্জনেব নিমিত্তই অর্থ ও কামে লিপ্ত হওযা মনুষ্যেব কর্তব্য। কাম, ভয, লোভ বা জীবন বক্ষাব নিমিত্ত ধর্ম পবিত্যাগ কবা কখনই কর্তব্য নহে।' কিন্তু কুরুকুল, যদুকুল ও পাণ্ডবেবা ঠিক তাই কবেছেন এবং সকলেব নিধন হযেছে। কৃষ্ণ দ্বৈপাযন ব্যাসদেব তাই ঊর্ধ্ববাহু হযে বোদন কবে চলেছেন। এই অসাধাবণ সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন ট্র্যাজিক উক্তিব সঙ্গে স্থিতাবস্থাব প্রবক্তাবা গীতায কৃষ্ণেব মুখ দিযে যা বলিযেছেন, তাব তুলনা কব।

বাজতন্ত্রেব অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব— বিষয সম্পত্তিব লোভ, অর্থেব মোহ ও কাম— যে বিযোগান্তক পবিণতি ঘটিযেছে, একাকী যুধিষ্ঠিবেব মহাপ্রস্থানেব পথে স্বর্গেব বিনিমযেও সঙ্গী কুকুবটিকে পবিত্যাগে অসম্মতিব সেই দেদীপ্যমান দৃশ্যটি সত্ত্বেও, তা সামগ্রিক ভাবে ধর্মেব পবাভবকে সূচিত কবেছে। মহাভাবতকাবও উপসংহাবে সেই পবাজযেব কথাই বলেছেন। অথচ, মহাভাবতেবই অন্তর্ভূক্ত বলে কথিত গীতাব দৃষ্টিভঙ্গি কত পৃথক। সেখানে কৃষ্ণ সমস্ত সমস্যাব সমাধান কবে দিযে বলেন, 'আত্মা অজব ও অমব। সুতবাং জীব সকলেব জন্য শোক কবো না। তুমি কামনা শূন্য হযে কর্ম কব, যুদ্ধে পবাঙ্মুখ হযো না। ধর্ম সংস্থাপনেব জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। এই যুদ্ধেব শেষে ধর্মবাজ্য স্থাপিত হবে।' কিন্তু, কোথায সেই ধর্ম বাজ্য? কৃষ্ণেব এই ঘোষণাই যদি সঠিক হবে, তবে অষ্টাদশ অধ্যায মহাভাবত সম্পূর্ণ কবে মহাকবিব ঐ বিলাপ কেন? একটু ভেবে দেখলে লক্ষ্য কববে যে মহাভাবতেব ধর্ম জিজ্ঞাসাব সাথে বুদ্ধেব ধর্ম জিজ্ঞাসাব কিছু মিল

ববং দেখতে পাওযা যায। বুদ্ধ বলছেন, কামনা থেকেই দুঃখ, মহাভাবতকাবও সে কথা বলছেন। তিনি বলছেন কামনা বাসনা শূন্য হযে ধর্মোপার্জনেব জন্য জাগতিক কর্মে লিপ্ত হতে হবে। বুদ্ধ বলছেন, 'ধর্মাচাবণ কব। কামনা শূন্য হও। তাহলে নির্বাণ লাভ ঘটবে।' ধর্ম কী? সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ চেষ্টা, সৎ ব্যবহাব ইত্যাদি অষ্টমার্গই বুদ্ধ কথিত ধর্ম। গীতাব ধর্ম কিন্তু আদৌ তা নয। সৎ কর্ম অর্থাৎ নীতিনিষ্ঠ ও মঙ্গলজনক কর্ম গীতাব ধর্ম নয–গীতাব ধর্ম হল বর্ণাশ্রম ধর্ম। গীতাব কর্মও তাই।

তোমাকে একটা খুব সহজ প্রমাণ দিচ্ছি। গীতাব একটি বিখ্যাত উক্তি 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয পবধর্ম ভযাবহ।' ধর্ম অর্থ যদি মঙ্গলদাযক নীতিনিষ্ঠ কর্মই হবে, তবে তা তো সকলেবই ধর্ম হওযা উচিত। তাতে 'স্বধর্ম' 'পবধর্মেব'ব কথা আসে কোথা থেকে? 'স্বধর্ম' কী? প্রসঙ্গটি মনে কব। অর্জুন বলছেন, তিনি যুদ্ধ কবে বাজ্যসুখেব জন্য গুরু, বন্ধু ও আত্মীযদেব হনন কববেন না। অস্ত্র ত্যাগ কবলে ধৃতবাষ্ট্র পুত্রবা যদি তাঁকে হত্যা কবে অথবা তাঁকে যদি যুদ্ধ না কবে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন কবে থাকতে হয সেও ভাল, তথাপি তিনি যুদ্ধে ইচ্ছুক নন। অর্জুনেব এই বিষাদ দৌর্বল্যেব লক্ষণ হলেও তা একান্ত স্বাভাবিক ও মানবিকতামথ। গীতাব কৃষ্ণ এই দৌর্বল্যকে দূব কবাব জন্য কিন্তু কোনও ন্যায নীতিব কথা বলছেন না। তিনি বলছেন, 'তুমি ক্ষত্রিয। যুদ্ধ কবা তোমাব স্বধর্ম। এই যুদ্ধে যদি তোমাব মৃত্যু হয, সেও ভাল। কিন্তু তুমি যদি স্বধর্ম পবিত্যাগ কবে ব্রাহ্মণেব মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কব, তবে সে হবে এক ভযাবহ ব্যাপাব।'

এখানে আমি একটি নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন কবছি। ধব, অর্জুন যদি বাজ্য লোভেব বীভৎসতায বীতশ্রদ্ধ হযে অস্ত্র ত্যাগ কবে শহীদেব মৃত্যুববণ কবতেন অথবা সংসাবত্যাগী সন্ন্যাসীই হতেন, তাহলে তা যুদ্ধেব আশু উদ্দেশ্যেব পক্ষে ক্ষতিকাবক হত সন্দেহ নেই, কিন্তু তা কি আদর্শ হিসেবে খুব নিকৃষ্ট হত? কৃষ্ণ তাকে 'ভযাবহ' কেন বলছেন? অর্জুন কথিত সমাধান এক ভিন্ন পথ সন্দেহ নেই, কিন্তু 'ভযাবহ' বা অশ্রদ্ধেয কি? আসলে গীতাব বচনাকাবেব কাছে বর্ণাশ্রমেব ব্যত্যয মাত্রই ভযাবহ। মনে আছে তো কৃষ্ণেব মুখে সেই উক্তি ঃ 'আমি যদি কর্ম না কবতাম, তাহলে বর্ণসঙ্কবেব ফলে জগৎ উচ্ছন্নে যেত'–যে কথায বঙ্কিমচন্দ্র আপত্তি কবে বলেছেন যে জগতে এত অন্যায অনাসৃষ্টি থাকতে বর্ণসঙ্কব নিযেই কেবল এই মাথা ব্যথা কেন? গীতাব বচযিতাব কাছে জগৎ বর্ণাশ্রমময, বর্ণাশ্রম ছাড়া তাঁব জগৎ নেই।

কর্ম সম্বন্ধেও বুদ্ধে ও গীতাব কৃষ্ণেব বক্তব্যেব মৌলিক তফাৎটা এখানেই। উভযেই নিষ্কাম কর্মেব কথা বলেন। বুদ্ধ বলেন ঃ আকাঙ্ক্ষা থেকেই দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা থেকেই পুনর্জন্ম। আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কবে সৎপথে জীবন যাপন কবলে দুঃখেব অবসান ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি ঘটবে, নির্বাণ লাভ হবে। গীতায কৃষ্ণ বলছেন ঃ নিষ্কাম কর্ম কব, মোক্ষ লাভ হবে। উভযেই নিষ্কাম কর্মেব কথা বলছেন এবং নির্বাণ ও মোক্ষে কোনও মৌলিক তফাৎ নেই। কিন্তু দুটো বড় তফাৎ এইখানে যে প্রথমত বুদ্ধেব ঈশ্বব নেই, আব গীতাব কৃষ্ণ বলছেন, 'আমিই ঈশ্বব, আমাকে কর্মফল অর্পণ কব।' দ্বিতীযত বুদ্ধেব কর্ম হল সৎ কর্ম, কৃষ্ণোক্ত কর্ম হল 'ঈশ্বব নির্দিষ্ট কর্ম'। কৃষ্ণ বলেই দিযেছেন, 'আমি গুণ ও কর্ম অনুযাযী চতুর্বর্ণ সৃষ্টি কবেছি।' সুতবাং চাবিবর্ণেব জন্য কর্ম নির্দিষ্ট আছে–শুধু লক্ষ্য বাখতে হবে প্রত্যেকেব কর্ম যেন এই বিভাগ অনুযাযী হয।

হিন্দু ধর্মে 'ধর্ম' কতটুকু আছে, সে সম্বন্ধে ওপরের আলোচনা থেকে আমরা যা পেলাম তা হল এইঃ

[১] বেদে ধর্মের কথা অতি সামান্য আছে।

[২] পঞ্চম বেদ বলে খ্যাত মহাভারতে ধর্ম জিজ্ঞাসা অতি প্রবল, কিন্তু তাতে কোনও সুনির্দিষ্ট মীমাংসা নেই, বরং ধর্মের পরাভবের বেদনা আছে। এই প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সেই বিখ্যাত কথাটি আবার স্মরণ করঃ 'তর্ক, বেদ, স্মৃতি কোনও কিছুই এক কথা বলে না, মুনিদেরও নানা জনের নানা মত। আর ধর্মের তত্ত্ব জ্ঞান গুহায় নিহিত, মহাজনের পথই পথ।'

[৩] উপনিষদের বিচরণ জ্ঞান মার্গে। উপনিষদের ধর্ম তাই যুধিষ্ঠিরের কথা অনুযায়ী গূঢ়তত্ত্ব মাত্র, সর্বসাধারণের জন্য তা নয়।

[৪] গীতার ধর্ম সর্বসাধারণের বটে, কিন্তু তা নির্ভেজাল ধর্ম নয়, 'স্বধর্ম'। সেখানে ক্ষত্রিয় ধর্ম, ব্রাহ্মণ ধর্ম, শূদ্র ধর্ম আছে, কিন্তু কোনও অভিন্ন হিন্দুধর্ম নেই।

অতএব, ডাক্তারবাবু খুব ভুল বলেছেন, বলতে পার না।

॥ আটচল্লিশ ॥

একদল মানুষ আছে যারা দেশের যাবতীয় দুঃখকষ্টের জন্য 'বিধর্মী'দের দায়ী করতে লেগেছে। এ জন্য তাদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিলে, তারা বলে থাকে, 'আমরা তো সাম্প্রদায়িক নই, নির্ভেজাল ভারতীয়। আমরা অহিন্দুদের ভারতীয়করণ চাই।' এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, ভারতীয়কে ভারতীয় করতে হবে। ভারতীয় বলতে এরা কী বোঝে?

ভারতবর্ষের গত সাড়ে চার হাজারের কিছু বেশি বছরের ইতিহাসের যে হদিশ পাওয়া গেছে, তার দিকে একবার তাকাও। মাটি খুঁড়ে সিন্ধু সভ্যতা ও তার প্রস্তুতি পর্বের যে সব আদিমতম নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার কাল ২৭০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই সভ্যতা অনার্য, কিন্তু নিশ্চয়ই ভারতীয়। এই সভ্যতার বয়স যখন হাজার বছর পেরিয়ে গেছে, তখন, আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে আর্যরা ভারতে আসার পর প্রায় হাজার বছর ধরে চলেছে আর্য–অনার্য সংঘর্ষ ও সম্মিলন। সেই সব রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কথা বেদের ছত্রে ছত্রে বলা আছে, মিলনের ইতিহাসটি ধরা আছে মহাকাব্যে পুরাণে ও ধর্মমতের বিবর্তনে। এই দুই পক্ষের কোনটি ভারতীয়? আর্যরা না অনার্যরা? কারা বহিরাগত? কারা এদেশী?

ইতিমধ্যে লোহা আবিষ্কৃত হয়েছিল। বন কেটে জনপদ গড়তে গড়তে আর্যরা সিন্ধুর তীর থেকে যখন কোশল, মগধ, পাঞ্চাল, বারানসীতে এসে পৌছল, তখন ভারতের এই পূর্বাঞ্চলে ইতিহাসের এক মহানাট্যের সূত্রপাত হল। প্রাচীন গোষ্ঠীতন্ত্রগুলি ভেঙে গিয়ে রাজতন্ত্রগুলি গড়ে উঠল, এবং এই বিভিন্ন রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে, রাজ্যগুলির অভ্যন্তরে ও রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে নানা যুদ্ধে, দ্বন্দ্বে, হত্যায়, বিলাপে পরিবেশ আকীর্ণ হয়ে উঠল এবং তখন জীবন ও মৃত্যু, সম্পদ ও দারিদ্র্য, ভোগ ও বৈরাগ্য, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, হিংসা ও করুণা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে লোকচিত্ত মথিত হল। দুঃখ ও দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ নিয়ে ভাবিত হলেন দার্শনিক। আর্যদের ভারত আগমনের হাজার বছর পরে ৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ নাগাদ এই সংক্ষুব্ধ সময়ের সূত্রপাত।

ভাবতবর্ষেব ইতিহাসেব খানিকটা স্পষ্ট ছবি আমবা এ সময থেকেই পাই। পববর্তী হাজাব বছবে ইতিহাস ছাড়া আব যে জিনিসটিকে পাই তা ধর্ম–প্রধানত বুদ্ধ প্রচাবিত ধর্ম–যদিও শুধু তাই নয, বযেছে আবও নানা বিশ্বাস ও মতবাদ। তবে নিঃসন্দেহে বুদ্ধ এই কালপর্বে সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধেব প্রচাবিত ধর্ম বেদ বিবোধী এবং অ–আর্য ও অনার্য। কথাটা বিশদ কবে আব একটু পবে তোমায বলছি।

এই হাজাব বছবে ভাবতবর্ষে ভাস্কর্য, স্থাপত্য, শিল্প কলা ও সাহিত্যেব যে স্ফূবণ ঘটেছিল, তা এক কথায ভাবতীয সংস্কৃতিব অক্ষয সম্পদ। সাঁচি, ভাবহুত, মথুবা, গান্ধাবেব শিল্প কলা, অজন্তাব চিত্রাবলি, বামাযণ মহাভাবত সবই এ যুগেব ফসল।

বামাযণ মহাভাবত অবশ্য পববর্তী 'হিন্দু যুগে' পবতেব পব পবত প্রক্ষিপ্ত কাহিনী ও চিন্তা ধাবায ভাবাক্রান্ত হযে এমন ঢাউস হযে উঠেছে, যে তাব মূল সহজে চেনা যায না। তবে এটা এখন নিশ্চিত বলা যায যে সেই মূল কাব্য আদৌ ধর্মগ্রন্থ ছিল না, ছিল কেবল অবিস্মবণীয মহাকাব্য, যাব বিষযবস্তু মানুষ, অসাধাবণ মহিমান্বিত মানুষ, দেবতাদেব সঙ্গে যাদেব চলত মোলাকাত ও পাঞ্জাব লড়াই। খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে ৫০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই হাজাব বছবে বৌদ্ধ ধর্মেব বিকাশ, বিবর্তন ও অবশেষে নিক্রমণ ঘটেছে, তাব পাশাপাশি চলেছে বেদ–উপনিষদ আশ্রযী ব্রাহ্মণ্যবাদেব বিকাশ। বৌদ্ধ, লোকাযত ও ব্রাহ্মণ্য ধাবাগুলি কখনই সমান্তবাল বেখাব মত বিচ্ছিন্নভাবে এগোযনি, সমাজে তা সম্ভব নয। তাবা পবস্পবকে প্রভাবিত কবেছে ও তাদেব মিলিত ত্রিবেণী ধাবা আজ থেকে হাজাব দেড়েক বছব আগে গুপ্তবাজাদেব আমলে বা তাব আগে পবে এক নতুন ধাবা রূপে আত্মপ্রকাশ কবে, পববর্তীকালে যাব নাম হয 'হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি'। আগেকাব হাজাব বছবেব প্রভাব তাব ওপব এতই প্রবল ছিল যে এই নূতন হিন্দু ধর্মে বুদ্ধ হলেন অবতাব আব নাস্তিক কপিলকে সিদ্ধ পুরুষদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বেব শিবোপা দিলেন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায স্বযং শ্রীকৃষ্ণ।

৫০০ খ্রীস্টাব্দেব আগে পবে 'শক, হূন, দল পাঠান মোঘল' বাববাব ভাবতেব বাইবে থেকে ভাবতবর্ষে যে প্রবেশ কবেছে, আপাতত সে আলোচনা আমি উহ্য বাখছি। পাঠান মোগল ও ইসলাম ধর্মেব আগমণ ভাবতবর্ষেব ইতিহাসেব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমাজ বিপ্লবকাবী ঘটনা, কিন্তু আমি হিন্দুধর্মেব বিকাশেব পবিপ্রেক্ষিতে ভাবতেব ইতিহাসটিকে দেখাতে চাইছি বলে সেটা এখন বাদ দিচ্ছি। তাহলে গত সাড়ে চাব হাজাব বছবেব ইতিহাসকে মোটামুটি ভাবে কযেকটি পর্বে এই বকম ভাগ কবা যায ঃ

১ম পর্ব ঃ ১০০০ বছব ঃ আর্য পূর্ব সংস্কৃতি

২য পর্ব ঃ ১০০০ বছব ঃ আর্য–অনার্যে সংঘর্ষ ও মিলন প্রযাস

৩য পর্ব ঃ ১০০০ বছব ঃ অনার্য ধাবাব আধিপত্য, বৌদ্ধ ধর্মেব উত্থান ও পশ্চাদপসবণ

৪র্থ পর্ব ঃ ১৫০০ বছব ঃ আর্য ও অনার্য ধাবাব সম্মিলন, ব্রাহ্মণ্য ধাবাব বিজয, হিন্দুধর্মেব উদ্ভব ও প্রসাব।

এখন, যাবা ভাবতীযকবণেব কথা বলছেন তাদেব জিজ্ঞাসা কব, ওপবেব এই চাবটি পর্বেব মধ্যে কোনটি ভাবতীয? প্রথম পর্বটিকে নিশ্চযই নির্ভেজাল ভাবতীয বলা যেতে পাবে, কিন্তু সেখানে কি তাঁবা ফিবতে চান? যদি দ্বিতীয বা তৃতীযটিকে বল, তবে নিশ্চযই হিন্দুধর্মকে বিদায দিতে হয। অথচ ঐ পর্বগুলি 'ভাবতীয নয' বলা কি সম্ভব? আব চতুর্থটিকেই যদি শুধু ভাবতীয বল, তবে তা হবে সত্যেব অপলাপ, কাবণ এই শেষ

পর্বটি হল 'খাঁটি ভাবতীয' অনার্যদেব সঙ্গে 'বহিবাগত' আর্যদেব দু'হাজাব বছবেব লড়াইযেব শেষ পবিণাম ও ভাবতবর্ষে আর্যদেব অন্তিম বিজয ঘোষণা। যদিও এই বিজয ঘোষণা অবিমিশ্র নয, ইংবেজীতে যাকে বলে ওযান–আপ–ম্যানশিপ অর্থাৎ কিনা 'ওপবে থাকা'–তাই।

ভাবতবর্ষে কোনও একটি বিশেষ ধর্ম, মত বা সম্প্রদাযেব চিবকেলে একচেটিযা অধিকাব নেই, সুতবাং কোনও সম্প্রদায বিশেষ 'ভাবতীযকবণে'ব কথা বলে নিজেদেব মতটিকে চালু কবতে পাবেন না। ভাবতবর্ষ সমস্ত ভাবতীযদেব, তাব ইতিহাস অসংখ্য চিন্তা ভাবনাব দ্বন্দ্বেব অর্থাৎ মিলন ও সংঘর্ষেব মধ্য দিযে এগিযেছে, ওপবেব এই ছকটিতে আমি সেটাই দেখাতে চাইলাম।

এবাবে বৌদ্ধ ধর্মকে কেন অ–আর্য ও অনার্য এবং হিন্দু ধর্মকে কেন আর্য–অনার্য ধাবাব সম্মিলন বলছি, সে কথা সংক্ষেপে বলব। বৌদ্ধধর্ম বলতে আমবা কযেকটা জিনিস বুঝি, যেমন, বেদ আত্মা বর্ণাশ্রম ইত্যাদিব বিবোধিতা, শ্রমণ ও ভিক্ষু, পুনর্জন্মবাদ, নির্বাণ ইত্যাদি। এই সব কিছুই অ–আর্য অর্থাৎ আর্য প্রথা বহির্ভূত এবং এব অনেক কিছুই অনার্য অর্থাৎ ভাবতবর্ষে আর্য পূর্ব জনগোষ্ঠীব প্রথা অনুসাবী। শ্রমণ ও ভিক্ষুদেব ব্যাপাবটিই দেখ। বুদ্ধ নিজে প্রথমে গৃহত্যাগী যোগী বা শ্রমণেব জীবন বেছে নেন এবং পবে শ্রমণদেব সঙ্ঘ গঠন কবেন। এটি একটি অনার্য প্রথা। সিন্ধু সভ্যতাব নিদর্শন হিসেবে পাওযা মাটিব ফলকে যোগী পশুপতিব ছবি আছে। কিন্তু হিন্দু পুবাণে মুনি ঋষিদেব যে চিত্র পাই, তাঁবা সকলেই গৃহী। জবৎকারু মুনি বিবাহ কববেন না বলেছিলেন, কিন্তু তাঁকে মুনিঋষি ও পূর্ব পুরুষদেব চাপে বিবাহ ও পুত্র উৎপাদন কবতে হযেছিল। অনার্য ভাবতবর্ষে যে সাধুতন্ত্র প্রবল ছিল, সেটি আজও বলবৎ আছে। সাধুতন্ত্রেব একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি বর্ণাশ্রম ধর্মেব বাইবে। সাধুদেব 'বর্ণ' নেই, এবং যে কোনও বর্ণেব মানুষ সাধু হতে পাবেন। বুদ্ধ প্রবর্তিত শ্রমণ ও ভিক্ষু সঙ্ঘও এই অনার্য প্রথা অনুসাবী। বুদ্ধ অবশ্য অনার্য প্রথাগুলিব কিছু সংস্কাব সাধন কবেছিলেন। প্রথমত যোগী ও শ্রমণদেব অতিবিক্ত আত্মনিগ্রহকে তিনি বাতিল কবেছিলেন। তিনি মধ্যপন্থা, অর্থাৎ ভোগবিলাস শূন্য পবিমিত ও সংযত জীবন যাপনেব কথা বলেছিলেন। ফলে প্রথম দিকে তাঁব শিষ্যবা যে তাঁব প্রতি বিরূপ হযেছিলেন ও পবে নিজেদেব ভুল বুঝতে পেবেছিলেন, সে কথা বৌদ্ধ বচনায বলা আছে। আব একটি নূতনত্ব সঙ্ঘ। ইতিপূর্বে শ্রমণ ও পবিব্রাজকেবা ছিলেন, কিন্তু তাঁদেব কোনও সঙ্ঘ ছিল না। বৌদ্ধ শ্রমণবাই বিশ্বেব ইতিহাসে একটি বিশেষ আদর্শেব জন্য সঙ ঘবদ্ধতাব উদাহবণ সৃষ্টি কবেন। অনেক ঐতিহাসিকেব মতে তৎকালীন অনার্য প্রজাতন্ত্র বা বিপাব্রিকগুলিতে বাজ্য শাসনেব যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল, বুদ্ধদেব তাঁব শ্রমণ সঙ্ঘে সেগুলি প্রবর্তন কবেছিলেন।

পুনর্জন্মেব ধাবণাটিও অনার্য। বেদে পুনর্জন্মেব কথা নেই, কোথাও কোথাও পবলোকেব কথা যদিও আছে, কিন্তু আত্মাব ধাবণাটি গড়ে ওঠে উপনিষদে। আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে 'আত্মা' কথাটিব উদ্ভব। বুদ্ধদেব এই আর্য 'আত্মাব' ধাবণাটিকেও বর্জন কবেছিলেন। তাঁব মতে বিশ্বে কোনও কিছুই অমব ও অক্ষয নয, তাই মৃত্যুহীন আত্মাব কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু জন্মান্তব তিনি মানছেন। আগুনেব শিখা যেমন একটি আশ্রয থেকে অন্য আশ্রযে চলে যায, তাঁব মতে জন্মান্তবও তেমনি। কিন্তু এই আগুন কোনও চিবন্তন অস্তিত্ব নয। আগুনকে তুমি জল ঢেলে নিভিযে দিতে পাব, তাহলে আব সে অন্য আশ্রযে যাবে না। তেমনি জীবন এক দেহ থেকে অন্য দেহে আশ্রয নেয,তৃষ্ণাব আগুন জ্বলতে থাকে,

তাই। কামনাব ইন্ধন পেযে তৃষ্ণাব আগুন জ্বলে। ইন্ধন দিও না, কামনা শূন্য হযে সৎ জীবন যাপন কব, তৃষ্ণাব আগুন নিভবে, জীবন আব অন্য দেহে আশ্রয নেবে না। এবই নাম নির্বাণ। উপনিষদে আত্মাব পবমাত্মায লীন হওযাব কথা আছে, বুদ্ধ তা বর্জন কবলেন। শুধু আত্মা নয, পবমাত্মা বা ঈশ্ববও তাই বুদ্ধেব চিন্তায অনুপস্থিত। মোক্ষ বা মুক্তি সম্পর্কে বৌদ্ধ চিন্তা তাই সম্পূর্ণই অ-আর্য, আবাব অনার্য জন্মান্তবেব ধাবণাটি তিনি তাব মধ্যে গ্রহণ কবে নিযেছিলেন।

বেদ ও উপনিষদেব সঙ্গে বুদ্ধেব আব একটি মৌলিক অমিল হল বেদে সকাম কর্মেব ও উপনিষদে জ্ঞান মার্গেব কথা বলা হযেছে। অপব দিকে বুদ্ধেব ধর্মচিন্তাব সমস্তটাই হল নীতিবোধ অর্থাৎ ন্যায অন্যাযেব ধাবণা। আগামী চিঠিতে 'ধম্মপদ' থেকে এ সম্বন্ধে তোমাকে কিছু উজ্জ্বল উদাহবণ দেব। খ্রীস্টেব জন্মেব শ পাঁচেক বছব আগে বুদ্ধেব প্রচাবিত ধর্মমত বিশ্বে প্রেম, করুণা ও মৈত্রীব বাণী প্রচাবেব প্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন। উপনিষদেও সকলেব কল্যাণেব কথা আছে বটে, কিন্তু সে শুধুই প্রার্থনা, আব বুদ্ধেব উপদেশ হল কল্যাণ কর্মে ব্যাপৃত হবাব আহ্বান।

কথাটা একবাব ভেবে দেখ। আজ থেঁকে আড়াই হাজাব বছব আগে এই ভাবতবর্ষে বিশ্বেব প্রথম ধর্মমতেব আবির্ভাব হযেছিল। এ এমন এক ধর্মমত, যাতে আত্মা বা ঈশ্বেবে কোনও স্থান ছিল না, কেবলমাত্র মানব কল্যাণই ছিল যাব উদ্দিষ্ট। সব দিক থেকেই এ ছিল এক অনন্য সাধনা, বিশ্বেব ইতিহাসে প্রায তুলনা বহিত। বঙ্কিমচন্দ্র-ববীন্দ্রনাথ যে একে বিপ্লব বলেছিলেন, তা অমূলক নয। 'ভাবতীযকবণে'ব উদ্যোক্তাবা অনার্য অর্থাৎ সুপ্রাচীন খাঁটি ভাবতীয চিন্তাব এই সুদীর্ঘ গৌববময ইতিহাসটিকে ভুলিযে দিতে চান, তাঁবা প্রচাব কবেন যে ভাবতবর্ষ চিবকালই আত্মা পবমাত্মা আব পবলোক মুখিনতাব দেশ। এদেব ভাবতবর্ষ যে তাই খণ্ডিত ও বিকৃত এবং এদেব স্বদেশচিন্তা যে মেকি, তাতে আব সন্দেহ কী?

॥ উনপঞ্চাশ ॥

গত চিঠিতে বৌদ্ধ সংহিতা 'ধম্মপদেব' উল্লেখ কবেছিলাম। ধম্মপদ, তুমি জান, পালি ভাষায লেখা, সংস্কৃতে নয। পালি সাধাবণ মানুষেব মুখেব ভাষা, আব ধম্মপদেব বক্তব্যও অতি সহজ সবল। বৌদ্ধবা মনে কবেন যে এই গ্রন্থে বুদ্ধেব নিজেব মুখনিসৃত উপদেশই লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধেব জীবনকালে তাঁব মতবাদ লিখিত রূপ পাযনি, তিনি মুখে মুখেই উপদেশ দিতেন। পবে তাঁব মহাপ্রযাণেব পব অশোকেব সময পর্যন্ত শ-তিনেক বছবে তাঁব অনুগামী যে তিনটি সম্মেলন হয, তাতে ক্রমে সব কিছু লিপিবদ্ধ হয। সুতবাং বুদ্ধেব মুখেব কথা হুবহু কিছুই লিখিত নেই। তবে, ধম্মপদে এবং ত্রিপিটকেব অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে বুদ্ধেব মুখেব কথা বলে যে সব লিখিত আছে, তাব মধ্যে পবোক্ষ হলেও তাঁব কণ্ঠস্ববটি আমবা শুনতে পাই। বুদ্ধেব সমসাময়িক শিষ্যবা তাঁব কথাগুলিকে স্মৃতিতে ধবে বেখে পবে লিপিবদ্ধ কবেছিলেন, সমস্ত শিষ্যদেব মধ্যে তা নিযে সম্মেলনে চুলচেবা তর্ক-বিতর্ক হযেছে এবং তাঁব বক্তব্যেব ভাষ্য নিযেও বহু দ্বন্দ্ব হযেছে। কিন্তু তাঁব মুখেব কথাব প্রামাণ্যতা নিযে কোনও বিতর্ক শোনা যায নি। সুতবাং ধবে নিতে পাবি হাজাব হাজাব শিষ্য একত্রিত হযে যে উপদেশগুলিকে তাঁব বক্তব্য বলে মেনে নিযেছেন,

তা মূলত প্রামাণ্য। মানতেই হবে, ধর্মগ্রন্থ বচনাব ক্ষেত্রে এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও পৃথিবীতে অনন্য।

ধম্মপদেব ২৬টি বর্গ বা অধ্যাযে বিভক্ত ৪২৩টি গাথাব মধ্যে যে সবল ও স্নিগ্ধ কবিত্ব বযেছে, তাব কতটা বুদ্ধেব আব কতটা পববর্তী সঙ্কলকেব তা বলা কঠিন। তবে শ্রীবামকৃষ্ণেব উপদেশাবলিতে যেমন আমবা দেখি যে সবল সহজ উপদেশেব মধ্যে এক ধবণেব স্বভাব কবিত্ব থাকে, বুদ্ধেব বাণীব মধ্যেও নিশ্চযই তেমনটি থাকত। উপলব্ধিতে গভীব এবং প্রকাশ ভঙ্গিমায সহজ ও ঋজু বক্তব্যে যে কবিত্ব, যে কবিত্ব বাউল বা ভাটিযালি গানে সহজাত,সে জিনিস বুদ্ধেব উপদেশেব মধ্যেও থাকাটাই স্বাভাবিক।

ধম্মপদেব এই গাথাগুলিব মধ্যে বযেছে এক অতি উচ্চ নীতিবোধ। আলস্য, ঘৃণা, ক্রোধ, জিগীষা, জিঘাংসা ও ইন্দ্রিযপবাযণতাব বিরুদ্ধে অত্যন্ত শান্ত ও মধুব এই উপদেশগুলি। এব কোথাও এতটুকু অহঙ্কাব, স্বার্থবুদ্ধি, পাণ্ডিত্যাভিমান বা দ্বেষ নেই। এ সব দিক থেকে ধম্মপদ ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা একেবাবে দুই মেরুব দুই গ্রন্থ। অবশ্য মিলও বযেছে অনেক। তবে সে সব মিল অমিলেব কথায পবে আসছি। আগে ধম্মপদ থেকে তোমায দু এক কলি শোনাই। অনুবাদক ম্যাক্সমুলব। তস্য অনুবাদক এই অধম।

[চতুর্থ অধ্যায থেকে] ফুলেব বাশি থেকে মালাকাব বানায কত বকমেব মালা। মবনশীল মানুষ এক জন্মে তেমনি অর্জন কবতে পাবে অনেক সুকর্মেব সফলতা।

ফুলেব গন্ধ বাযুব বিপবীতে যায না, যায না চন্দন কিংবা টগব কিংবা মল্লিকাব সুবাস। কিন্তু সুকর্মেব গন্ধ চলে বাতাসেব উজানেও। পুণ্যবান ছড়িযে থাকেন সর্বত্র।

[নবম অধ্যায থেকে] হাতে যাব ক্ষত নেই, সে বিষও ধবতে পাবে হাত দিযে। যাব মধ্যে পাপ নেই পাপ তাব কী কববে?

নির্দোষ, নিবীহ, নিষ্পাপ মানুষেব যে ক্ষতি কবে, বাতাসেব দিকে ছুঁড়ে দেওযা ধুলোব মত পাপ সেই নির্বোধকেই আঘাত কবে।

আকাশে, সমুদ্রে কিংবা গিবিকন্দবে পালিযে গিযে লাভ কী? পাপ থেকে মুক্তি বিশ্বে কোথাও নেই।

আকাশে, সমুদ্রে কিংবা গিবিকন্দবে পালিযে গিযে লাভ কী? বিশ্বে মৃত্যু থেকে কোথাও পবিত্রাণ নেই।

[দশম অধ্যায থেকে] শাস্তিব ভযে সবাই কাঁপে, সকলেই ভয পায মবণকে। মনে বেখ তুমিও তাদেবই একজন। হত্যা কবো না, হত্যা ঘটিও না।

শাস্তিব ভযে সবাই কাঁপে। জীবনকে ভালবাসে সকলেই। মনে বেখ তুমিও তাদেবই একজন। হত্যা কবো না। হত্যা ঘটিও না।

কঠোব বাক্য বলো না, কঠোব জবাবই পাবে। ক্রুদ্ধ কথায ব্যথা বাড়ে, মাবেব বদলে মাব তোমাকেই হানবে।

বাসনাকে যে জয কবেনি, নগ্ন হযে, জটা ধাবণ কবে, ধুলি মেখে, অনশনে, ভূমি শয্যায কিংবা স্থিব হযে বসে থেকে তাব কোনও শুদ্ধি নেই।

চাবুক খাওযা তেজী ঘোড়াব মত উদ্যোগী আব অধীব হও। বিশ্বাস দিযে, পুণ্য দিযে, উদ্যম দিযে, ধ্যান দিযে, বিচাব দিযে তুমি দুঃখকে জয কবতে পাববে। তুমি হবে সুবেদী, সদাচাবী, ভ্রান্তিহীন।

খনকেবা যেখানে খুশি কুযো খুঁড়ে জল তোলে, কর্মকাব তীব বানায, সূত্রধব কাঠকে দেয নূতন আকাব। সৎ মানুষেবা নিজেদেবই গড়ে তোলে।

[পঞ্চদশ অধ্যায থেকে] বিজিত যে সে দুঃখী, তাই জয জন্ম দেয ঘৃণাব। জয পবাজয দুটিকেই যে বর্জন কবেছে, সেই নিস্তাপ, সেই সুখী।

[বিংশ অধ্যায থেকে] আমি পথেব দিশা পেযেছিলাম, কিন্তু তোমাকে নিজেকেই প্রযাসী হতে হবে। তথাগতবা, বুদ্ধবা তো কেবল প্রচাবক মাত্র।

'যা কিছুব সৃষ্টি আছে, তাবই লয আছে'— এ কথা যে জানে দুঃখে সে নিরুদ্বিগ্ন হয, এটাই পবিত্রতাব পথ।

'সৃষ্ট বস্তু মাত্রই দুঃখ ও বেদনাময'–এ কথা যে জানে দুঃখে সে নিরুদ্বিগ্ন হয, এটাই পবিত্রতাব পথ।

ওঠাব সমযে যে ওঠে না, যৌবন ও শক্তিসম্পন্ন হযেও যে অলস, ইচ্ছায ও চিন্তায যে দুর্বল, তাব জন্য জ্ঞানেব কোনও পথ নেই।

একবিংশ অধ্যায থেকে] সৎ মানুষেবা তুষাবাবৃত পর্বতেব মত, দূব থেকে তাদেব উজ্জ্বল দেখা যায। অসৎ লোকেবা বাত্রিতে ছোঁড়া তীবেব মত, তাদেব কেউ দেখে না।

আমি ইতস্তত কিছু উদাহবণ দিলাম, এমনি আবও অনেক আছে। সে সব লিখতে গেলে চিঠি বড় হযে যাবে। শেষ অর্থাৎ ২৬তম অধ্যাযে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বুদ্ধেব দু'একটি বিখ্যাত উক্তি দিযে এই উদ্ধৃতি পর্ব শেষ করছি। তিনি বলছেন ঃ

'জটাধাবণ কবে, ব্রাহ্মণ পবিবাবেব সন্তান হযে, জন্মসূত্রে কেউ ব্রাহ্মণ হয না। সত্য ও ন্যায যাঁব মধ্যে বযেছে তিনিই ব্রাহ্মণ।

'যে দুর্বিনীত ও ধনশালী, সে যাবই পুত্র ও যে কোনও বংশ জাতই হোক, তাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিনা। দবিদ্র ও আসক্তি মুক্ত ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'

এই অধ্যাযে ব্রাহ্মণ তাকেই বলা হযেছে যাঁব মধ্যে ক্ষমা, সংযম, ভালবাসা, লোভ শূন্যতা, প্রশান্তি প্রভৃতি গুণগুলি বযেছে। এবাবে ধম্মপদেব এই দৃষ্টিভঙ্গিব সঙ্গে গীতাব দৃষ্টিভঙ্গিব তুলনা কব। তোমাকে আগে বলেছি যে গীতায মানব ধর্ম নয, 'স্বধর্মে'ব কথা বলা হচ্ছে। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ একাধিকবাব অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবোচিত কবাব জন্য ক্ষত্রিয ধর্ম পালন কবাব, বাজ্য ভোগ কবাব ও নিন্দাভাগী না হবাব উপদেশ দিচ্ছেন। দ্বিতীয অধ্যাযে তিনি বলছেন ঃ

'ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিযেব আব শ্রেযস্কব কর্ম নাই। হে পার্থ। যে সকল ক্ষত্রিয স্বেচ্ছায উপস্থিত মুক্ত স্বর্গদ্বাব স্বরূপ এইরূপ যুদ্ধ লাভ কবে, তাহাবাই সুখী। যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কব, তাহা হইলে স্বধর্ম ও কীর্তি হইতে ভ্রষ্ট ও পাপভাগী হইবে; লোকে চিবকাল তোমাব অকীর্তি কীর্তন কবিবে। সম্মানিত ব্যক্তিব অকীর্তি মবণ অপেক্ষাও অধিকতব দুঃসহ।....তুমি সমবে বিনষ্ট হইলে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে, জযলাভ কবিলে পৃথিবী ভোগ কবিবে। অতএব, যুদ্ধেব নিমিত্ত স্থিব চিত্তে উদ্যম কব, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয পবাজয তুল্যজ্ঞান কবিযা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে পাপ ভোগী হইবে না।'

লক্ষ্য কবে দেখ বুদ্ধ ও কৃষ্ণেব দৃষ্টিভঙ্গিতে কি আকাশ পাতাল তফাৎ, অথচ কৃষ্ণ বুদ্ধেব ব্যবহৃত শব্দগুলিকেই ব্যবহাব কবছেন। তিনিও ধর্ম, পাপ, পুণ্য, জয পবাজয তুল্য জ্ঞান কবা ইত্যাদিব কথাই বলছেন। অথচ আদতে কৃষ্ণেব যুক্তিগুলি হল ঃ

১) অর্জুন যুদ্ধ না কবলে অপবে নিন্দা কববে, ২) যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা কবাই ক্ষত্রিযেব স্বধর্ম, ৩) যুদ্ধে বিজযী হলে বাজ্য লাভ হবে এবং পবাজয হলে লাভ হবে স্বর্গ, অর্থাৎ দুদিকেই লাভ। এ নিতান্ত স্বার্থ বুদ্ধি, জযপবাজয তুল্যজ্ঞান কবাটা এখানে সেই স্বার্থবুদ্ধি জাত কৌশল মাত্র। বুদ্ধ কথিত মানব হিতৈষণাব সঙ্গে এব কোনও মিল নেই। ধম্মপদে জয–পবাজয উভযকে বর্জন কবে কামনা বাসনা শূন্য হতে, সকলেব প্রতি করুণা পবাযণ হবাব জন্য উপদেশ দেওযা হচ্ছে। বলা হচ্ছে সেটাই ধর্ম। হত্যা, ক্রোধ, বাসনা, লোভ ইত্যাদি হল অধর্ম। ধম্মপদেব ধর্ম অর্জুনকে কখনওই যুদ্ধেব জন্য প্রবোচিত কবে না। কৃষ্ণ কোন যুক্তিতে তা কবছেন? তাঁব একটাই তুরুপেব তাস–তা হল স্বধর্ম। এখানে ধবেই নেওযা হচ্ছে যে, ক্ষত্রিযেব কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্ম আছে, যা না কবা পাপ, যা কবা হলে স্বর্গলাভ ও না কবা হলে অকীর্তি ও নবক গতি হবে। বুদ্ধেব নীতিবোধ এ বকম খণ্ডিত নয। তাঁব মতে যা ভাল, তা সবাব জন্যই ভাল, যা শ্রেয তাব কোনও বর্ণভেদ নেই।

তোমাকে আগেই বলেছি বুদ্ধ জন্মান্তব, স্বর্গ, দেবতা ইত্যাদিব ধাবণাকে বর্জন কবেন নি, তাকে আক্রমণও কবেন নি। আমি একটু পবেই দেখাব, এই দুর্বলতা তাঁব ধর্মমতেব পবাজযেব একটা বড় কাবণ। অথচ বুদ্ধ এই ধাবণাগুলিকে প্রতিহত কবলে, তাঁব মতবাদ হত আবও সামঞ্জস্যপূর্ণ; কাবণ তাঁব ধর্মে স্বর্গেব কোনও গুরুত্ব নেই। ধম্মপদ–নবম অধ্যাযে আছে ঃ 'কিছু মানুষ পুনর্জন্ম লাভ কবে, পাপীবা নবকে যায, পুণ্যবান যায স্বর্গে, যাবা সমস্ত কামনা বাসনা থেকে মুক্ত তাবা নির্বাণ লাভ কবে।' পুনর্জন্ম লাভ ও নবকে গমন নিশ্চযই দুঃখেব, কিন্তু স্বর্গ? সেখানে কি সুখ আছে? বুদ্ধ বলছেন, 'না'। ধর্মপদ থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি আগে দিযেছি, তাতে নবম অধ্যাযেব শেষ উক্তি দুটি পড়, দেখবে তাতে বলা হচ্ছে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল কোথাও পাপ বা মৃত্যু থেকে পবিত্রাণ নেই। একমাত্র উপায বাসনা বর্জন কবা, তাহলেই নির্বাণ, এবং তা এই পৃথিবীতেই সম্ভব। তোমাব হাতে যদি ক্ষত না থাকে, তবে বিষে তোমাব ভয কি? নির্লোভ হলে পাপ পুণ্য, জয পবাজয সবই তোমাব কাছে সমান। এই হল বুদ্ধেব মত, আব অন্য দিকে কৃষ্ণ অর্জুনেব লোভকেই চাগিযে দিচ্ছেন, বাজ্যেব ও স্বর্গেব লোভ দেখাচ্ছেন।

সৃষ্ট বস্তু মাত্রেবই লয আছে, সমানুষ মাত্রই মবণশীল–এই জ্ঞান যে মানুষকে সুখে ও দুঃখে সমান নিরুদ্বিগ্ন কবে, যে কথা ধম্মপদেব বিংশ অধ্যায থেকে তোমাকে একটু আগে পড়ে শুনিযেছি। কৃষ্ণও গীতায সে কথা বলছেন। কিন্তু, একটা বড় তফাৎ আছে। গীতায কৃষ্ণ বলছেন এই যে অবিবত সৃষ্টি ও লয, তাব কর্তা তিনিই অর্থাৎ তিনি নিজে অক্ষয ও অব্যয। কৃষ্ণেব এই বক্তব্যকে প্রমাণ কবাব জন্য গীতাব একাদশ অধ্যাযে শ্রীকৃষ্ণেব বিশ্বরূপ প্রদর্শন নামক বীতিমত এক ভোজবাজিব অবতাবণা কবা হযেছে। অবিবত সৃষ্টি ও ধ্বংসশীল এই মহাবিশ্বেব যে ছবি অর্জুনেব বিশ্বরূপ দর্শনেব মধ্যে দেখানো হযেছে, তা কল্পনাব উৎকৃষ্ট উদাহবণ সন্দেহ নেই, কিন্তু কৃষ্ণেব এই ম্যাজিক কি যুক্তি সহ? অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন কবতে কবতে এক সময বলছেন, 'মহাবীব ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধার্তবাষ্ট্রবা, অন্যান্য মহীপাল ও আমাদেব যোদ্ধৃবর্গসহ তোমাব ভযংকব মুখ বিববে প্রবেশ কবিতেছে....তুমি প্রজ্বলিত মুখ বিস্তাব কবিযা এই সমুদয লোককে গ্রাস কবিতেছ। ....হে দেবাদিদেব, তুমি কে?' কৃষ্ণেব উত্তব ঃ 'হে অর্জুন। আমি লোকক্ষযকাবী ভযঙ্কব সাক্ষাৎ কালরূপী হইযা লোক সকলকে বিনাশ কবিতে প্রবৃত্ত হইযাছি।.... আমি পূর্বেই ইহাদিগকে নিহত কবিযা বাখিযাছি। এক্ষণে তুমি এই বিনাশেব নিমিত্ত মাত্র হও।'

এসব কৃষ্ণেব বিখ্যাত উক্তি। এব মধ্যে যে দার্শনিক সত্য বয়েছে, তাতে কোনও মৌলিকত্ব নেই। নিবন্তব পবিবর্তনশীল বিশ্বেব কথা ভাবতবর্ষে কপিলেব কাল থেকেই প্রচলিত আছে। আব উপদেশ হিসেবে এব সার্থকতা কতটুকু? বুদ্ধেব বক্তব্যেব সাথে মিলিযে দেখলে তাব শূন্যগর্ভতা নজবে আসে। বুদ্ধ বলছেন, বিশ্বেব সব কিছুই ক্ষযশীল, অক্ষয অব্যয কিছু নেই। অতএব পবমেশ্বব, আত্মা কিছুই নেই। তবু মানুষ কামনা বাসনা বর্জন কবে বীতশোক হতে পাবে, নির্বাণ লাভ কবতে পাবে। যিনি নির্বাণ লাভ কবেন তিনি দেবতাব চেযেও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তিনি ঈশ্বব নন, জগতেব নিযামক নন। তাই ধম্মপদে বিনযেব সঙ্গে বলা হচ্ছে, তথাগত বা বুদ্ধবা ধর্মেব প্রচাবক মাত্র, উদ্যোগ গ্রহণ কবতে হবে প্রত্যেক মানুষকে নিজেকে। কিন্তু, গীতায বলা হচ্ছে কৃষ্ণই নিযন্তা, সব কিছু হযেই আছে, মানুষকে শুধু নিমিত্তমাত্র হতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সব কিছু যদি ঘটেই থাকে, মানুষ যদি নিমিত্তমাত্রই হয, তা হলে তা কবাব জন্য মানুষেব এত সাধ্য সাধনা কেন বাপু? ভাল বল, মন্দ বল, সব কিছুতো ঘটেই আছে, ঈশ্ববই সব কিছু ঘটিযেছেন। তাহলে তোমাব আমাব উদ্যোগী হবাব প্রযোজন কী? অথচ ধম্মপদে ও গীতায, উভয গ্রন্থেই উদ্যমেব, জ্ঞানেব, কর্মেব প্রশংসা কবা হচ্ছে। স্পষ্টতই গীতাব অবস্থান স্ববিবোধী। নিযত পবিবর্তনশীল, সৃষ্টি ও লযেব অবিবত মালায গাথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব যুক্তিগ্রাহ্য যে ধাবণা সহজ ভাষায বুদ্ধ দিযেছেন, তাব মধ্যে পবমেশ্বেব আমদানি ঘটিযে গীতায তাকে যুক্তিহীন কবে তোলা হযেছে।

এই যুক্তিব অভাব পূবণ কবাব জন্য গীতায প্রচাব কবা হযেছে ভক্তিবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'ভক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট পথ। সর্বধর্মান পবিত্যাজ্য মামেকম্ শবনং ব্রজ। কর্ম ফল আমাকে সমর্পণ কব। তুমি মোক্ষ লাভ কববে।' বুদ্ধেব পথ জ্ঞানেব পথ, কর্মেব পথ, ভালবাসাব পথ। গীতায কৃষ্ণেব পথ জ্ঞানেব পথ, কর্মেব পথ, ভক্তিব পথ। এবং ভক্তিব পথটিই হল তাঁব মতে সর্বোৎকৃষ্ট। ভালবাসা আব ভক্তি, বুদ্ধে ও গীতাব কৃষ্ণে শুধু এটুকুই তফাৎ, আব এ তফাৎটাই সবকিছুকে একবাবে পালটে দিচ্ছে।

ভক্তি ও বিশ্বাস এবং কৃষ্ণ অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। তাই ছেলেবেলা থেকেই একটা কথা আমবা শুনে আসছি, 'বিশ্বাসে মিলায কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূব।' অর্থাৎ কিনা যুক্তিতর্কেব সঙ্গে কৃষ্ণ বিশ্বাসেব একটা বিবোধ বযেছে। অথচ, তোমাকে আমি আলোচনা কবে দেখিযেছি যে আমাদেব দেশে বৈদিক যুগেব শেষেব দিকে বঙ্কিম কথিত যে নানা চিন্তাব আলোড়নেব মধ্য থেকে ভগীতাব সৃষ্টি হযেছিল,সেগুলিব কতকগুলি সামান্য লক্ষণ ছিল যুক্তি, ইন্দ্রিযগ্রাহ্য প্রমাণ নির্ভবতা, আত্মা–পবমাত্মায অবিশ্বাস ইত্যাদি। ষড়দর্শনেব মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র বেদান্ত। অবশ্য বেদান্তেও যুক্তি প্রমাণেব দ্বাবা বিশ্ব প্রক্রিযাকে বুঝবাব প্রযাসেব যে অনেক অসাধাবণ উদাহবণ আছে, তাব দুএকটা নমুনা তোমায দিযেছি। কিন্তু বেদান্ত বা উপনিষদেব শেষ কথা হল অতীন্দ্রিয উপলব্ধি, যুক্তি নয। যাজ্ঞবল্ক্যেব সেই বিখ্যাত হুমকি মনে আছে তো? 'গার্গি ! প্রশ্ন কবো না। মুণ্ড খসিযা পড়িবে।' গীতায এই বিশ্বাসকেই আবও শক্ত ভিত্তিব ওপব দাঁড় কবানো হযেছে।

যাই হোক, এসব কথাব মধ্যে যে কথাটা নিশ্চিত বলে মনে হয, তা হল এই যে আজকে আমবা যে সমস্ত 'বিশ্বাস'কে সনাতন ভাবতীয বিশ্বাস বলে মনে কবি, সেগুলি তা নয। আদি অনার্য ভাবতীয চিন্তায এসব বিশ্বাসেব চেযে যুক্তিই প্রবল ছিল, তাব একটা নির্ভবযোগ্য প্রমাণ হল এই যে, তা না হলে সাবা দেশে হাজাব বছব ধবে বুদ্ধেব যুক্তিবাদী নিবীশ্ববাদী বেদ বিবোধী মত শিকড় গেড়ে বসতে পাবত না, গণ উপেক্ষায

উড়ে যেত। আবার এই যে সব তথাকথিত সনাতন বিশ্বাস, এগুলো যে আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে নিয়ে এসেছিল, তাও নয়। কারণ, তাদের কৃষ্ণ, রাম, আত্মা, পরমাত্মা কিছুই ছিলনা– ঋগ্বেদ তার প্রমাণ। তাহলে এরা এল কোথা থেকে? এসব জিনিস দীর্ঘকালীন সামাজিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নানা বিপরীত চিন্তার সমন্বয়ে আর্য–অনার্য চিন্তার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এদেশেই যে গড়ে উঠেছিল, সে কথাটাই তোমাকে বারবার বোঝাতে চাইছি।

এই দ্বন্দ্ব অর্থাৎ মিলন ও সংঘর্ষের পটভূমিটা আর একবার একটু বুঝবার চেষ্টা করব। এদেশে আর্যরা আসার আগে থেকেই মুনি, ঋষি, যোগী, শ্রমণ, পরিব্রাজকদের জ্ঞানান্বেষণের একটা ঐতিহ্য ছিল। আর্যরা নিয়ে এসেছিলেন কল্পনা ও বিশ্বভাবনার আর একটা ধারা। অনার্যরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন, সম্ভবত এদেশের ঋতুচক্র ও প্রকৃতিরাজ্যে মাঠে ঘাটে গাছে ফুলে ফলে বারবার বিগতের পুনরাগমনের প্রভাবে এই বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু এই ধারণার সঙ্গে আত্মার কোনও সম্পর্ক ছিল না। যদি থাকত তাহলে বেদান্ত ছাড়া অন্য দর্শনে বা অতি বলশালী অবৈদিক মতবাদ বৌদ্ধ ধর্মে তার প্রভাব অবশ্যই পড়ত। তাহলে এই আত্মার ধারণাটা জন্মাল কী করে? আমার অনুমানটা তোমায় বলছি।

আমি তোমাকে কিছুদিন আগে দূরদর্শনের একটি তথ্যচিত্রের কথা বলেছিলাম, Eyes of stone– পাথরের চোখ। এই চিত্রে হিস্টিরিয়াগ্রস্থ বৌটিকে মাঝে মাঝে 'ভূতে পায়'। আসলে সমাজের নানা অত্যাচার,অবদমন ও অপূর্ণ কামনার ফলেই ওর মধ্যে এইসব বিক্রিয়াগুলি ঘটে। দেবীকে খুশি করার জন্য ও তখন নানান কৃচ্ছ্র সাধন করে, দেবীর পুরোহিতরা নানারকমভাবে নিগ্রহ করে ওকে। জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরে, নোংরা পাঁক ভর্তি জল পান করায়, ইত্যাদি সেই কঠিন যাতনার মধ্যে বৌটি নির্বিকার থাকে। ওকে যখন প্রশ্ন করা হয়, 'তুমি এত কষ্ট সহ্য কর কী করে?' সে উত্তর দেয়, 'আমার তো কোনও কষ্ট হয় না। সবই তো লাগে ওর গায়ে, যে আমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।' একটা সূক্ষ্ম অস্তিত্ব ওর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং পরে সে মারের চোটে পালিয়ে যায়— এই হল আদিম ধারণা। আত্মা এই সূক্ষ্ম অস্তিত্বের হুবহু বিপরীত রূপ, দর্পণের প্রতিকৃতির মত। আত্মাও এই রকম দেহতে আসে, দেহ থেকে চলে যায়, কিন্তু সেই আত্মাকে গীতার ঘোষণা অনুযায়ী 'বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, তররারি ছেদন করিতে পারে না'–এই আত্মা অজর অমর ও চিরন্তন। ঐ তথ্যচিত্রের বৌটির ভাষায় সব মার গূঢ় অস্তিত্বের গায়ে লাগে, দেহে লাগে না, আর উলটে, গীতার ভাষায় সব মার দেহে লাগে, গূঢ় অস্তিত্বে লাগে না। দর্পণের তুলনাটিকে একটু বিশদ করে কথাটাকে এবারে এভাবে বলতে পারি ঃ ধরো, তুমি আয়নায় নিজের ছবি দেখছ। ঐ ছবি আসলে আয়নার মধ্যে নেই, আবার সেই ছবি যদিও দৃশ্যত তুমি, কিন্তু আসলে ঠিক তোমার বিপরীত। চিত্রগ্রহণের ভাষায় যাকে বলে 'নেগেটিভ'– অর্থাৎ তুমি নও। আত্মা ব্যাপারটা তেমনি আর্য বৈদান্তিক দর্পণে অনার্য চিন্তার প্রতিফলন। আত্মা আর্য ধারণায় নেই, অনার্য ধারণাও তা নয়, বরং অনার্য ধারণার ঠিক বিপরীত।

বেদান্তের এই আত্মা–তত্ত্ব ভারতবর্ষে প্রথমে কোনও পাত্তা পেল না। জ্ঞানবাদী দার্শনিকদের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। উপনিষদের চিন্তা যে শাসক শ্রেণী অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া ছিল, সে কথা আগেই

বলেছি। তাছাড়া উপনিষদ বৈদিক যাগযজ্ঞেব মোহও ছাড়তে পাবেনি–যাবা 'ভূমা' বা 'ব্রহ্ম'কে জানতে অক্ষম, সেই সংখ্যাগবিষ্ঠ সাধাবণেব জন্য যাগযাজ্ঞেব বিধানই বহাল বইল। অথচ সেকালে ভাবতবর্ষেব মানুষ এই যাগযজ্ঞেব বিলাসিতাব প্রতি ছিল বীতবাগ। কৃষিজীবী আম ভাবতবর্ষ পশুপালক আর্যদেব পশুহত্যা ও বলি প্রথাব বাড়াবাড়িতেও ছিল শ্রদ্ধাহীন। এই পটভূমিতেই অবৈদিক চিন্তাধাবা এবং তাব মধ্যে বিশেষ কবে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই ধর্ম মতেব বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাতে যজ্ঞাদি আচাব আচাবণেব বিধান নেই, পশুবলি নিষিদ্ধ, সকলেব প্রতি প্রেম ও করুণাব কথাই শুধু বলা হয়েছে এবং সর্বোপবি জাতি বর্ণভেদেব কোনও সীমাবেখা তাতে টানা নেই, প্রতিটি মানুষ এই ধর্মমত অনুযায়ী সমান। বুদ্ধ কোনও আত্মা, পবমেশ্বব বা বিশ্ব স্রষ্টাব কথা বলেন নি, তাঁব ধর্মমত অনুযায়ী এ সবেব কোনও প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু, সাধাবণ মানুষেব মধ্যে যে দেবদেবীব বিশ্বাস ছিল, তাকে তিনি নিষিদ্ধও কবেন নি। এমন কি স্বর্গ, নবক ইত্যাদিব ধাবণাকেও তিনি আক্রমণ কবেন নি। কেবল বলেছেন যে স্বর্গ লাভেব চেয়েও শ্রেষ্ঠ হল নির্বাণ লাভ, এবং তা সম্ভব 'তৃষ্ণা' থেকে নিজেকে মুক্ত কবলেই।

বুঝতেই পাবছ, বুদ্ধ খুব বিপজ্জনক লাইন নিয়েছিলেন। দেশেব অগণিত মানুষেব অগণিত দেব দেবতা,– তাদেব তিনি যেমনটা তেমন থাকতে দিলেন, আব নির্বাণেব যে পথ বাতলালেন – স্বীকাব কবতেই হবে, তা অতি দুরূহ। এই অসৎ সমাজ ব্যবস্থাব মধ্যে সৎ থাকা কি সহজ? বাজা, ব্যবসায়ী, আমাত্য, সৈনিক, শান্তি বক্ষক, নগবপাল–যাদেব কাজই হল শোষণ ও পীড়ন–কতকাল তাদেব সদবাক্যেব বশীভূত বাখা যায়? আদৌ কখনও যায় কি? মানুষেব দুঃখেব জন্য বুদ্ধ সমাজেব শোষণ, নিপীড়নকে দায়ী কবলেন না, দায়ী কবলেন স্বয়ং দুঃখীব চিন্তাভাবনাকে। ধম্মপদেব প্রথম দুটি পদই এই বকমঃ

'আমবা যা, তা আমবা যা ভাবি তাবই ফল–আমাদেব চিন্তাব ওপবে তাব প্রতিষ্ঠা, আমাদেব চিন্তা দিয়েই তাব গঠন। কুচিন্তা নিয়ে যে কাজ কবে বা কথা বলে, দুঃখ তাকে অনুসবণ কবে চলে শকট বাহী বলীবর্দেব পদচিহ্নকে।

'আমবা যা, তা আমবা যা ভাবি তাবই ফল, আমাদেব চিন্তাব ওপবে তাব প্রতিষ্ঠা–, আমাদেব চিন্তা দিয়েই তাব গঠন। সুচিন্তা নিয়ে যে কাজ কবে বা কথা বলে, সুখ তাকে অনুসবণ কবে,–যেমন শকটেব চাকা অনুসবণ কবে যেমন শকটেব চাকা অনুসবণ কবে চলে শকটবাহী বলীবর্দেব চবণচিহ্নকে।'

খুব সহজ সবল কথা, আন্তবিকতায় ভবপুব, কথাটা বুদ্ধকেই মানায়, কিন্তু তা চূড়ান্ত ভাববাদী। এব নির্গলিতার্থ হল জগৎকে পবিবর্তন কবাব দবকাব নেই, নিজে ভাল —হও, তুমি সুখী হবে, জগৎ ভাল বলে বোধ হবে। মুশকিল হল, বুদ্ধবা চিবকাল থাকেন না, আব সমাজেব মাথাবা কেউ ভাল নন। বুদ্ধ নিজেই তাঁব উপদেশেব মধ্যে শ্রমণকে সংযত হতে বলেছেন, বলেছেন গেরুয়াধাবী হলেই কেউ ভাল হয় না। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, তাব জীবনকালেই তাঁব সঙ্ঘেব মধ্যে অনাচাব শুরু হয়েছিল। শ্রমণেব যে সমস্ত অপবাধেব তালিকা তিনি দিয়েছেন, তাব মধ্যে লোভ, সঞ্চয়, পবস্ত্রীগমন ইত্যাদি সবকিছুই বয়েছে। শ্রমণদেবই যদি এই অবস্থা, তবে অন্য সাধাবণ মানুষেব তো কথাই নেই।

বুদ্ধ সকলকেই ভাল হতে বলেছেন, বাজা প্রজা, ব্রাহ্মণ, শূদ্র–সকলকেই। কিন্তু বাজা আব ব্রাহ্মণেব ভাল হওয়াব বাসনা নেই, প্রজা আব শূদ্রেব ভাল হওয়াব উপায় নেই।

কী কবে ভাল হবে? ব্রেখ্‌টেব নাটক নান্দীকাবেব 'ভাল মানুষেব পালা' দেখনি? এই সমাজে ভাল হযেছ কি মবেছ। মুশকিল হচ্ছে কি, এই দেহই যে 'পাপেব আকব'। দেহ খেতে চায— তাব উদব, তাব মন, তাব যৌবন– সকলেবই তৃষ্ণা আছে। সেই তৃষ্ণা পবিত্যাগ কবা কি সহজ কথা? এই সমস্যা সত্ত্বেও বুদ্ধেব ব্যক্তিত্ব, তাঁব অনলস ধর্মপ্রচাব, বৈদিক ধর্মেব তুলনায তাঁব উপদেশেব সবলতা, সাধাবণ মানুষেব প্রতি তাঁব ভালবাসা, তাঁব প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সংগঠন এবং বাজশক্তি ও শ্রেষ্ঠীদেব অর্থানুকূল্য বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বেব প্রথম সংগঠিত এক সার্বজনীন ধর্মরূপে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ভাবতবর্ষে এই ধর্মমতেব প্রতিকূলতা ছিল দুদিক থেকে।·এক, বুদ্ধেব ধর্মমতেব নিজস্ব তাত্ত্বিক দুর্বলতা, এবং দুই, বাস্তব বৈবী পবিবেশ। দ্বিতীযটি সম্বন্ধে আগামীতে বলব, প্রথমটি সম্পর্কে কিছু বললাম, আব একটু বলছি।

দেখতেই পাচ্ছ বুদ্ধ প্রচাবিত ধর্মেব একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাব মধ্যে কোনও জেহাদ ছিলনা। তিনি দেবদেবীদেব থাকতে দিলেন, বর্ণাশ্রম ধর্মকে উচ্ছেদ কবতে চাইলেন না, শুধু সকলকে বললেন ভাল হতে। এই তাত্ত্বিক আপোসেব ফলে বুদ্ধেব বিবোধীপক্ষ হাজাব বছব ধবে বৌদ্ধ ধর্মেব পাশাপাশি ভাবতবর্ষে শক্তিশালী হযে উঠেছে। ক্রমে বৌদ্ধধর্মেব মধ্যেই এত দেবদেবীব অনুপ্রবেশ ঘটল, তাতে স্বর্গ ও স্বর্গকামনা এত প্রবল হল, আব বুদ্ধকে সেই দেবদেবীদেব মাঝখানে বসিযে তাঁব কাছে মুক্তি ও স্বর্গলাভেব জন্য মিনতি এত প্রধান হযে উঠল যে বুদ্ধেব নীতিবাদী মানব কেন্দ্রিক ধর্মমতটি আড়ালে চলে গেল। বৌদ্ধদেব মধ্যে এই পবিবর্তিত মতটিই ক্রমে সংখ্যাগবিষ্ঠ হযে উঠল, এবা হলেন মহাযানী। হীনযান, অপব দিকে, কেবলমাত্র 'নিজেকে ভাল কবাব' সঙ্কীর্ণ চিন্তায ও বুদ্ধেব কথাগুলিকে মন্ত্রেব মত উচ্চাবণে নিবিষ্ট হল। অথচ ধম্মপদেই পড়েছ, তাতে ভক্তিব কোনও স্থান নেই।'বুদ্ধবা পথ প্রদর্শক মাত্র, পথ খুঁজে নিতে হবে প্রত্যেককে নিজেকেই।' স্বভাবতই জনগণেব সাথে এঁদেব যোগাযোগ হযে পড়েছিল বিচ্ছিন্ন। ব্রাহ্মণদেব বুদ্ধ 'প্রকৃত ব্রাহ্মণ' হতে বলেছিলেন, কিন্তু তাঁব সেই উপদেশ নজরুলেব ভাষায ছিল 'বাঘ, খাও হে ঘাস' বলাব সামিল। ফলে বৌদ্ধ ধর্মেব পাশাপাশি দেবদেবী, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সমাজে অসাম্য ইত্যাদি ফুলে ফেঁপে উঠতে উঠতে আমবা একসময গীতাব যুগে পৌঁছে গেলাম। সমাজ কর্তাবা ততদিনে এটা বুঝে গেছেন যে বেদেব যাগযজ্ঞ নয, উপনিষদেব জ্ঞানমার্গও নয, সাধাবণ মানুষেব জন্য চাই বৌদ্ধধর্মেব মত সহজ ধর্ম পদ্ধতি, যাব যাব নিজ নিজ দেবদেবীব ওপবে যা হবে অধিকন্তু। বুদ্ধেব যুক্তিবাদ, বুদ্ধেব নীতি প্রচাব ততদিনে পবাজিত। তাঁবা দেখলেন এই সময, সাধাবণকে 'বিশ্বাসেব' বটিকা দিতে হবে। তাতে জ্ঞান, যুক্তি,নীতি–সব কিছুবই অনুপান থাকবে বটে, কিন্তু তাব আসল উপাদানটি হবে ভক্তি। গীতাব নবম অধ্যাযে শ্রীকৃষ্ণ সে কথাই বলছেন। বলছেন ঃ 'যাহাবা ভক্তিপূর্বক আমাব আবাধনা কবে, তাহাবা আমাতেই অবস্থান কবিযা থাকে। যদি দুবাচাব ব্যক্তিও অনন্যমনে আমাব উপাসনা কবে, সে সাধু। .....অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তি পবাযণ বাজর্ষিদেব কথা দূবে থাকুক, যাহাবা নিতান্ত পাপাত্মা, যাহাবা কৃষি প্রভৃতি কার্যে নিবত বৈশ্য ও যাহাবা অধ্যযন বিবহিত শূদ্র, তাহাবা এবং স্ত্রীলোকেবাও আমাকে আশ্রয কবিলে অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ কবিতে পাবে।'

কথাগুলি লক্ষ্য কব। এই ধর্ম আব কেবল পুণ্যবান বাজা ও ব্রাহ্মণদেব ধর্ম নয, পাপাত্মাদেবও ধর্ম। পাপাত্মা কাবা? শূদ্র বৈশ্য ও স্ত্রীলোকেব দল। এ ভাবেই

বেদান্তবাদীবা ভক্তিবাদেব মধ্যে একটা ধর্ম খুঁজে পেল যা বৌদ্ধধর্মকে টেক্কা দিতে পাবে। এই ধর্ম সার্বজনীন, সহজ, আচাব আচবণেব জটিলতা নেই। নীতিনিষ্ঠাবও বালাই নেই। এমনকি দুবাচাবও যদি কৃষ্ণেব ভজনা কবে, তবে সে সাধু। স্বযং দুবাচাবী সমাজ কর্তাদেব পক্ষে এব চেযে ভাল বিধান আব কী হতে পাবে?

অষ্টম পর্ব

॥ পঞ্চাশ ॥

গ্রীক পুবাণেব সেই সিসিফাসেব গল্প মনে আছে তো? কবিন্থেব বাজা কি বাজপুত্র সিসিফাস দেবতাদেব বিচাবে অনেক অপকর্ম কবেছিল, এমন কি একবাব মৃত্যু দেবতাকে কিছুদিন বন্দী কবে বেখে পৃথিবীতে মবণেব পাট উঠিযে দিযেছিল। লোকটি এত ধূর্ত যে নিজেব মৃত্যুব সময বৌকে বলে গিযেছিল, আমাব মৃতদেহেব সৎকাব কবো না। তাবপব তাকে যখন মৃত্যুব বাজাব কাছে নিযে যাওযা হয সে শুধু আবেদন কবে, ‘স্যাব, আমাব মড়াটা এমনি পড়ে আছে, ওটাব একটা সদগতি কবে আসি। আমি এই যাব, আব আসব।’ ভালমানুষ দেবতা ওকে সেই যে যেতে দিল, স্কুল পালানো ছেলেব মত সে আব ফেবে না। অবশেষে ধবা পড়ে তাব এক ভযংকব সাজা হল। একটি প্রকাণ্ড পাথবেব খণ্ডকে একটা উঁচু পাহাড়েব শিখবে ঠেলে তোলাব কাজ দেওযা হল তাকে। সে অনেক পবিশ্রমে যতবাবই পাথবটিকে চূড়ায নিযে যায, ততবাবই সেটি আবাব গড়িযে নিচে নেমে আসে। পুবাণেব গল্প অনুযাযী সিসিফাস অনন্তকাল ধবে এই কাজ কবে চলেছে।

নিযতিকে জয কবাব অদম্য প্রযাস ও তাব ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক ধাবণাটি এই গল্পে রূপ পেযেছিল। আধুনিক কালেও এমন অনেকে আছেন যাঁবা মনে কবেন যে মানুষেব ইতিহাস ঐ সিসিফাসেব কাহিনীব মতই। যতই সে এগোতে চায, বাব বাব সে তাব পুবনো জাযগাটিতেই ফিবে আসে। প্রগতি বলে কিছু নেই, আছে উত্থান ও পতন, আলোব যুগ ও অন্ধকাবেব যুগেব বাব বাব চক্রাকাব প্রত্যাবর্তন।

অন্য মত বলছে ইতিহাসে উত্থান পতন আলো অন্ধকাব আছে ঠিকই, কিন্তু তা ঐ বকম নিযতি নির্দেশিত নয। আমবা যে ইতিহাসেব চেহাবাটিকে দেখি, তা একটু ভিন্ন। সিসিফাসেব দৃশ্যটিকে একটু অন্যভাবে সাজাও। মনে কব একটা পর্বত, তাব শিখবগুলি একেব পব এক ক্রমাগত উপবে উঠে গেছে, মাঝে মাঝে উপত্যকা। সিসিফাস পাথবটিকে ঠেলে প্রথম চূড়ায তুলল, সেখান থেকে পড়ে গেল খাদে। এবাবে দ্বিতীয চূড়া, সেটি একটু উঁচু। দ্বিতীযেব পব তৃতীয, চতুর্থ,....এমনি কবে চলছে। আমবা সকলেই এই সিসিফাস। আমবা এই যে শিখব থেকে শিখবে আমাদেব সভ্যতাকে টেনে নিযে যাচ্ছি, তাতে পথে পতন আছে, মৃত্যু আছে, আছে স্খলন ও আর্তি, কিন্তু সমস্ত বেদনাকে ছাপিযে আছে শিখব বিজযেব স্বপ্ন। ইতিহাসে আমবা বাববাব একই শিখবে ফিবে আসিনা, উঁচুতে আবও উঁচুতে আমাদেব যাত্রা চলছে। ইযেলেৎসিন না কে যেন বলেছিলেন, ‘কমিউনিজম একটা সুন্দব স্বপ্ন, বাস্তব নয।’ ঐ স্বপ্ন আছে বলেই, বাস্তবে সেই স্বপ্নেব জন্য লড়াই চলছে। যতদিন তা অপ্রাপ্ত থাকছে, ততদিন তা স্বপ্ন। যখন সেই শিখব বিজয হযে যাবে, তখন আবও অসংখ্য প্রাক্তন স্বপ্নেব মতই সেটিও বাস্তব হযে উঠবে।

পৃথিবী জুড়ে মানুষেব পশ্চাদপসবনেব যে চিত্র আজ আমবা দেখতে পাচ্ছি, সেটাই কিন্তু

একমাত্র সত্য নয়। কিউবা লড়ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এতদিনে শ্বেতাঙ্গরা বর্ণবৈষম্যবাদকে পরিত্যাগ করেছে। পূর্বতন সমাজতন্ত্রের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের পক্ষের লাখো লাখো মানুষ রাস্তায় নামছে। জাপানে, ফিলিপিনস্‌এ, ব্রিটেনে, জার্মানীতে আমেরিকা বিরোধী মনোভাব গাঢ় হচ্ছে। ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসান হওয়ায় বিপুল মারণাস্ত্র তৈরীর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল মার্কিন অর্থনীতি যে ভিতরে ভিতরে কতটা ভেঙে পড়ছে, বাইরে থেকে আমরা তা ঠাহর করতে পারছি না, কিন্তু ঐ দেশের খবর হল বুশ দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন। মোট কথা ইতিহাস থেমে নেই। চারদিকে যখন রাত্রির অন্ধকার, জীবনের স্পন্দন তো তখনও চলতেই থাকে। সৃষ্টির কানাকানি কখনও থামে না। রাতের শেষে পাখির ডাকে আর ভোরের আলোয় অবাক হয়ে ভাবি, ফুলে ফুলে গাছগুলি এমন ভরে উঠল কখন এবং কী করে!

ইতিহাসকে যদি এরকম সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখ, তা হলে তুমি সাম্প্রতিককালে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পশ্চাদপসরণ এবং ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে বুদ্ধ-ভাবনার পশ্চাদপসরণের একটা মিল খুঁজে পাবে। উত্থান পতন আলো অন্ধকারের দুটি চিত্রের মধ্যে এই মিলটিকে একদিন আড্ডায় বসে ডাক্তারবাবুই হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, সে গল্প তোমায় বলছি, শোন।

এমনিতে তো, তুমি জান, সমাজতান্ত্রিক দেশের ঘটনাবলি নিয়ে প্রতিনিয়ত ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার বিবাদ চলছে। তিনি প্রতিদিন বুশ ও গোরবাচভকে ফাঁসি দিচ্ছেন। তা তিনি দিন, কিন্তু আমার প্রশ্নগুলির উত্তর তিনি দিচ্ছেন না। সোভিয়েত সমাজ প্রতিটি মানুষকে শৈশব থেকে আমৃত্যু খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের যে নিশ্চিত নিরাপত্তা দিয়েছিল, ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। তাহলে সেখানকার মানুষ কি মুর্খ, যে তারা এই সুখের জীবনকে অনায়াসে ত্যাগ করে দুঃখের জীবনকেই বেছে নিল? সেখানকার কোটি কোটি মানুষ, শ্রমিকশ্রেণী ও সুসংগঠিত পার্টি কেন কয়েকজন 'ষড়যন্ত্রকারী নেতার বিশ্বাসঘাতকতাকে' প্রতিরোধ করল না? তারা কেন নিশ্চেষ্ট? আর সমাজতন্ত্র যদি মানুষকে নিশ্চেষ্টই করে, তবে তা কেমন সমাজতন্ত্র? শোনা যাচ্ছে সেখানকার কর্তাব্যক্তিরা সুবিধাভোগী, বিলাস পরায়ণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কী করে তা হল? 'জনগণের অতন্দ্র প্রহরা' কোথায় গেল? পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে তবে মৌলিক অমিল কোথায়?

এসব প্রশ্নের যখন কোনও মীমাংসা হচ্ছে না, সেই সময় একদিন ডাক্তারবাবু চায়ের সঙ্গে পরিবেশিত পকোড়ার সদ্ব্যবহার করতে করতে বললেন, 'দেখ, মার্ক্সবাদ আর বৌদ্ধধর্মে একটা মস্ত মিল দেখতে পাচ্ছি। বৌদ্ধধর্মের জন্ম আর বিকাশ দুইই ভারতবর্ষে, অথচ তা ভারতবর্ষ থেকে বিদেয় হয়ে চীনে, জাপানে, ব্রহ্মে, সিংহলে টিকে গেল। মার্ক্সবাদের জন্ম জার্মানীতে, বিকাশ রাশিয়ায়, দু জায়গা থেকেই তা হটে গেছে, টিকে আছে চীনে, কিউবায়, ভিয়েতনামে। আবার দেখ, চীন দুটোতেই কমন।' আমি গিন্নিকে হেঁকে বললাম, 'আজ থেকে তোমার নাম হল সুজাতা। সুজাতার পায়েস খেয়ে বুদ্ধের মাথা খুলে গিয়েছিল, তোমার পকোড়া খেয়ে ডাক্তার বাবুর মাথা কেমন সাফ হয়ে গেছে, দেখ।' ডাক্তারবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাস্য হাসলেন, তারপর শুরু হল এই নিয়ে আমাদের আলাপ আলোচনার ঝড়।

উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রাগ্রসর চিন্তা মার্ক্সবাদ ঘটনাচক্রে তার প্রয়োগের ক্ষেত্ররূপে

পেযে গিযেছিল পুঁজিবাদী দুনিযাব সবচেযে পশ্চাৎপদ দেশ বাশিযাকে। পুঁজিবাদ তো দূবেব কথা, সামন্ততন্ত্র বা তাব আগেকাব সমাজব্যবস্থাকেও বাশিযা তখনও পেবিযে আসেনি। আব প্রাচীনকালে ঘটনাচক্রে বুদ্ধেব প্রাগ্রসব চিন্তা তাব প্রযোগেব ক্ষেত্ররূপে পেযেছিল সেই দেবদেবী ভূত প্রেত অন্ধ কুসংস্কাব অধ্যুষিত এই ভাবতবর্ষকে। বুদ্ধেব নিবীশ্বব যুক্তিবাদী অত্যুচ্চ নৈতিক চিন্তাগুলি ছিল তাঁব যুগেব তুলনায অনেক বেশি এগিযে। ফলে ঈশ্বব অবিশ্বাসী গুরুবাদ বিবোধী বুদ্ধ কযেকশ বছবেব মধ্যে পবিণত হলেন ঈশ্ববে, আব যে 'রুশ জনস্রোতে লেনিন ভাঙলেন অন্যাযেব বাঁধ,' সেই মহান জনগণ অল্পদিনেব মধ্যেই তাদেব নিজেদেব শক্তিকে ভুলে লেনিন ও স্ট্যালিনকে বানালেন তাদেব দেবতা। দুটোই ইতিহাসেব ট্র্যাজেডি, দুটোই শিখব থেকে পতন, দুটোই ছিল বুঝি অনিবার্য। দুটো ঘটনাই প্রমাণ কবেছে যে কোনও চিন্তা বা কোনও ব্যবস্থা কল্যাণকব বা শ্রেয হলেই যে তা টিকে থাকবে তা নয, বাস্তব আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাব সাথে তাকে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সৌধ যত মনোহবই হোক, নবম মাটিব ওপব তা স্থাযী হতে পাবে না।

রুশ দেশেব কথা এখন থাক, আমাদেব দেশেব কথা একটু বিশদ কবে বলি। বুদ্ধও আমাদেব দেশে এবকম জনস্রোতে অন্যাযেব বাঁধ ভেঙেছিলেন।' তবে তোমাকে আগেই বলেছি বুদ্ধ লেনিন ছিলেন না, তা হওযা সম্ভবও ছিল না। তাঁব মধ্যে যে ভাববাদী সীমাবদ্ধতা ছিল, সে কথা আগে বলেছি, এখন আব নয। এখন একবাব সেকালেব চিত্রটাকে ভাববাব চেষ্টা কব। আর্যবা ততদিনে পঞ্চনদীব তীব ছেড়ে মগধ, কোশল, বাবানসী পর্যন্ত এগিযে এসেছে। পূর্বেকাব সাম্যবাদী গোষ্ঠীতন্ত্রকে নিষ্ঠুবভাবে ভেঙে ফেলে গড়ে উঠছে বাজতন্ত্রগুলি। আর্যদেব অনার্য বিদ্বেষ অনার্য ভাবতবর্ষে সাদা ও কালোব বর্ণভেদ সৃষ্টি কবেছে, যদিও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কাবণেই আর্য অনার্যেব দৈহিক ও আত্মিক মিলন ঘটেছে এবই মধ্যেই। সকলেই দুঃখ থেকে মুক্তি চাইছে, কিন্তু কোথাও ঐকমত্য নেই, আক্ষবিক অর্থেই নানা মুনিব নানা মত। আর্যদেব মধ্যেও ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিযে স্বার্থেব সংঘাত ছিল। বাজতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতাব অধিকাবী বাজা ব্রাহ্মণেব আধিপত্য মেনে নিতে চাইছিল না। উপনিষদে পুবাণে মহাভাবতে বামাযণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিযেব সেই দ্বন্দ্ব ধবা আছে, সে কথা আগে বলছি। বাজাবাও অনেকে ছিল নীচকুলোদ্ভব। নন্দ বংশ, মৌর্য বংশ-কাবুবই কুলগৌবব ছিল না। কৃষি ও ব্যবসায নিযুক্ত বৈশ্যবা যে সমাজে মর্যাদা পেতনা, সে কথা তো বলেইছি। অর্থাৎ সেই দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলাব মধ্যে সকলেই একটা স্থিতাবস্থা চাইছিল। শূদ্র চাইছিল মুক্তি, নিম্নবর্ণেব বাজকুল চাইছিল প্রতিষ্ঠা, ক্ষত্রিযবা ব্রাহ্মণেব ক্ষমতা হ্রাস কামনা কবছিল, ব্যবসাযীবা চাইছিল তাদেব পণ্যেব অবাধ চলাচলেব জন্য সামাজিক নানা বিধি নিষেধ থেকে মুক্তি। কাবণ, নিষেধেব গন্ডীতে থেকে ব্যবসা জমে না। এই ব্যবসাবই স্বার্থে শ্রেষ্ঠীবা আবাব ছোট ছোট বাজ্যে বিভক্ত দেশে যে যুদ্ধ বিগ্রহ ও এক বাজ্য থেকে অন্য বাজ্যে পণ্য চলাচলে বাধা ও শুল্কেব বাড়াবাড়ি ছিল, তাবও অবসান চাইছিল। এমন সময বৌদ্ধধর্ম এল। বৌদ্ধধর্মে সকলেব জন্য যে মুক্তিব আশ্বাস ছিল, সাবা দেশ তাতে আলোড়িত হল। নিম্নবর্ণেব বাজণ্যবর্গেবও এই ধর্ম পছন্দ হল। শ্রেষ্ঠীবা বৌদ্ধধর্মেব প্রসাবেব জন্য অর্থব্যয কবতে লাগল।

এদিকে কুরু, পাঞ্চাল, কোশল, মগধ, লিচ্ছবি প্রভৃতি 'মহাজনপদগুলিকে' একত্র কবে সবাব ওপবে মগধেব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। মহাজনপদগুলিব সবই যে বাজতন্ত্র ছিল, তা নয। লিচ্ছবি ছিল প্রজাতন্ত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নন্দবা ও পবে মৌর্যবাই একচ্ছত্র

হল, সম্রাট অশোকে এসে যাব শেষ পবিণতি। এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায বাহুবল ও ধনবল দুযেবই নিশ্চয প্রযোজন হযেছিল। তাব সঙ্গে প্রযোজন হচ্ছিল একটি সার্বজনীন ধর্মেব। বৌদ্ধধর্ম সেই প্রযোজন মেটাচ্ছিল। অশোকেব বৌদ্ধধর্ম প্রীতিব একটা কাবণ নিশ্চযই ছিল এই যে শূদ্র প্রজা কুল, ধনাঢ্য বৈশ্য ও অবহেলিত ক্ষত্রিযবা অধিকাংশই ঐ ধর্মেব পবিপোষক ছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধেব বীভৎসায অনুতপ্ত অশোক বাতাবাতি বৌদ্ধ হযেছিলেন, অথবা তিনি আগে চণ্ডাশোক ছিলেন পবে ধর্মোপদেশ শুনে হন ধর্মাশোক–বৌদ্ধ পুঁথিতে লেখা এসব কথা অতিবঞ্জিত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বোমিলা থাপাব তাঁব A History of India (Vol I) গ্রন্থে লিখছেন, 'অশোক বাতাবাতি বৌদ্ধ হননি। তিনি তাঁব একটি শিলালিপিতে লিখেছেন যে (কলিঙ্গযুদ্ধেব) আড়াই বছব পবে তিনি বৌদ্ধধর্মেব গভীব অনুবাগী হযেছিলেন।' ১৯৫২–এ পেঙ্গুইন প্রকাশিত বইযেব ৭২ পৃষ্ঠা থেকে এই উদ্ধৃতিটি দিচ্ছি। এই আড়াই বছবে অশোক নিশ্চযই বুঝতে পেবেছিলেন, সমস্ত ভাবতবর্ষকে এক অভিন্ন ব্যবস্থায আনতে গেলে ঐ ধর্মই সবচেযে বেশি সহাযক হবে। অবশ্য অশোক সর্ব ধর্মেব সমমর্যাদাব কথা বলেছেন, এটাও বুদ্ধ ভাবনাবই অবদান।

আজ আমবা যাকে প্রাচীন ভাবতীয শিল্পকলা বলে জানি, তাব প্রথম উন্মেষ আমবা যে সাঁচী ভাবহূত অমবাবতীব বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেব মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, সেটাই প্রমাণ যে বৌদ্ধধর্ম ভাবতবর্ষে নূতন জীবনেব এক জোযাব এনেছিল। এবং শুধু 'আর্যাবর্ত' অর্থাৎ আর্য বিজিত উত্তব ভাবত নয, 'দাক্ষিণাত্য'ও যে সেই জোযাবে প্লাবিত হযেছিল, অমবাবতী, অজন্তা, ভাজ, বাঘ, কার্লে প্রভৃতিব স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলাব ঐশ্বর্য তাবই সাক্ষী।

একটা আশ্চর্যজনক বিষয লক্ষ্য কবেছ? ইতিহাস বলে কথিত বাশি বাশি 'হিন্দু' পুবাণে ভাবতবর্ষেব এই সহস্র বৎসবব্যাপী গৌববোজ্জল ইতিহাসেব আভাস মাত্র নেই। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে জেমস পিন্সেপ এক ব্রাহ্মলিপি উদ্ধাব কবেন এবং পবে তাব সাথে সিংহলেব বৌদ্ধ তথ্যপঞ্জী মিলিযে প্রথম জানা যায যে ভাবতবর্ষে প্রিযদর্শী অশোক বলে এক মহান সম্রাট ছিলেন। অথচ ভাবতীয পুবাণে অশোকেব নাম একজন সামান্য মৌর্য বাজা মাত্র বলে উল্লিখিত। সেই অশোকেব শিলালিপি যে সব স্থানে পাওযা গেছে তা থেকে আমবা জানি যে তাঁব সাম্রাজ্য আসমুদ্র হিমাচল প্রায সাবা ভাবতবর্ষ জুড়েই বিস্তৃত ছিল। মৌর্যদেব সেই দাক্ষিণাত্য অনুপ্রবেশ ও দক্ষিণে বৌদ্ধসংস্কৃতিব প্রসাবেব সুদীর্ঘ ইতিহাসকে আড়াল কবে পুবাণে বযেছে শুধু অগস্ত্য ও বামেব অভিযানেব কল্পনাবঞ্জিত বিবৰণ।

চাবদিকে আজ বলে বেড়ানো হচ্ছে যে বাবব নাকি একটি মন্দিব ভেঙে তাঁব উঁপবে মসজিদ বানিযেছিলেন। ঐতিহাসিকবা এই অভিযোগেব কোনও প্রমাণ পান নি। তবে এটা তো সত্যি যে মধ্যযুগে অনেক মন্দিব ভেঙে মসজিদ, এক ধর্মস্থান ভেঙে অন্য ধর্মস্থান তৈবী হযেছে। কিন্তু এ বিষযে আমাদেব পূর্ব পুরুষদেব যে বেকর্ড, তাতে তৈমুব লংও শিশু প্রমাণিত হন। হিন্দু পুবাণকাবেবা এক হাজাব বছবেব পুবো ইতিহাসকেই মুছে ফেলে তাব ওপবে গড়ে তুলেছেন এক কল্পনাব সৌধ। এক সুমহান ঐশ্বর্যশালী ইতিহাসেব এই ইচ্ছাকৃত ধ্বংসসাধন কি একটি বা দশটি মন্দিব মসজিদ ধ্বংসেব চেযেও ভযংকব অপবাধ নয?

॥ একান্ন ॥

ডাক্তারবাবু আমার গিন্নির সুজাতা নামটিকে পাকা করে নিয়েছেন। কাল এসেই হাঁক দিলেন, 'সুজাতা, আজ নতুন কিছু হোক। দেখি আমাদের কেমন মাথা খোলে'। সুজাতা অমনি সদ্য বই মেলায় কেনা 'চায়ের সঙ্গে টা' থেকে শেখা বিদ্যে জাহির করতে লেগে গেল। আমরাও মার্ক্স রবীন্দ্রনাথ গীতা উপনিষদ থেকে শেখা বিদ্যে জাহির করতে শুরু করে দিলাম। সুজাতা রান্নাঘরে, আমরা বৈঠকখানায়। এই 'ডিভিশন অফ লেবার' অনন্তকাল থেকে চলছে। পুরুষের 'উচ্চ চিন্তা' ও 'মহৎকর্মে'র সৌধটি নারীর প্রতি মুহূর্তের 'তুচ্ছ কাজে'র ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমার এক অবাঙালী বন্ধু ঠাট্টা করে বলে থাকে, আমি মিসেস কে বলে দিয়েছি, বড় বড় ব্যাপারগুলি আমার, ছোট ছোট গুলি তোমার। রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, জাপান এসব আমার এক্তিয়ারে। রান্নাবান্না, বাজার হাট, খাওয়া পরা, এগুলো তোমার। আমাদের তাই কোনও বিবাদ নেই, যে যারটা নিয়ে আছি।'

এই ব্যবস্থাটাকে তুমি কী বল? এ তো এক রকমের দাসত্বই। আর এর মধ্যে কিছু লুকোছাপাও নেই। বাঙালি হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করতে যাবার সময় মাকে বলে যেতে হয়, 'মা তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।' মা যখন এ বাড়ীতে এসেছিলেন, তখন তিনিও 'দাসী' হয়েই এসেছিলেন। দেবরাজ চানানা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'স্লেভারি ইন এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়ায়' 'স্লেভ' বা 'দাস' কথাটির সংজ্ঞা দিয়েছেন এইরকমঃ 'কোনও মানুষ যখন একজন মালিকের সর্বময় কর্তৃত্বাধীন থাকে এবং সেই মালিক যখন তাকে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে, তখন সেই মানুষটি হল দাস।' এই অর্থে আমাদের মনুশাসিত সমাজের স্ত্রীরা পুরুষের দাস বৈ কি।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এই বিষয়টা নিয়েই একটা বিতর্ক সৃষ্টি হল। আমার বক্তব্য ছিল যে আমাদের সমাজের অর্ধেক মানুষকে দাস করে রেখেছি বলেই এদেশে এখনও দাসপ্রথা আছে কথাটা যেমন সত্যি নয়, তেমনি আমাদের দেশে অতীতে দাস ছিল এবং আজও দাস আছে বলেই এদেশে কখনও দাসপ্রথা ছিল, এটা মানতে আমি রাজি নই। দাসপ্রথা বলতে আমি সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে আদিম সাম্যাবস্থা ও সামন্ততন্ত্রের মধ্যেকার পর্বটিকে বোঝাতে চাইছি। গ্রীস রোমে মিশরে এই দাসপ্রথার সবচেয়ে জাজ্বল্যমান প্রমাণ রয়েছে। আমাদের দেশে কমিউনিস্টরা বরাবর মার্ক্সবাদ শিক্ষার ক্লাশে আদিম সাম্যাবস্থা–দাসপ্রথা–সামন্ততন্ত্র–ধনতন্ত্র–সমাজতন্ত্র এই ভাবেই সমাজ প্রগতির ব্যাখ্যা করে এসেছেন। কিন্তু মার্ক্স–এঙ্গেলস্ যে ভারতবর্ষ তথা এশিয়া প্রসঙ্গে দাসপ্রথার পরিবর্তে 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি'র কথা বারবার বলেছেন, সে কথাটি প্রায় উপেক্ষিতই থেকে গেছে। ডাঃ কোশাম্বীর মত ঐতিহাসিকও 'ভারতবর্ষে দাসপ্রথা ছিলনা' একথা জোরের সঙ্গে বললেও মার্ক্স–কথিত 'এশীয় সমাজ' বা 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি' নিয়ে কোনও আলোচনা করেন নি। সুতরাং আমার মত ব্যক্তি আর এ নিয়ে বিশেষ কী বলতে পারে? অতএব সেই মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। আমি মার্ক্স থেকেই 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি' (Asiatic Mode of Production) সম্বন্ধে কিছু কিছু ডাক্তারবাবুর কছে আওড়াচ্ছিলাম। এ সম্বন্ধে তোমাকে পরে বলব। তার আগে 'দাস' শব্দটি সম্পর্কে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক কথা তোমায় বলি।

ইংবেজি তথা ইউবোপীয ভাষায যাকে ‘স্লেভ’ বলে শুধু তাকে বোঝাবাব জন্য একটি নির্দিষ্ট শব্দ ভাবতীয ভাষায নেই। বহু অর্থবাচক একটি শব্দ বযেছে ‘দাস’। এই শব্দটিব অর্থ ববাবব এক ছিলনা, এব নানা রূপান্তব হযেছে। প্রথমে শব্দটি পাই ঋগ্বেদে। তাতে দাস বা দস্যু বলতে বোঝাত অনার্যদেব। তুমি তো জানই দাস হত্যা, দাসেব সম্পত্তি লুন্ঠন, দাস পুবীতে অগ্নি সংযোগ ইত্যাদিব ছড়াছড়ি বযেছে ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদেব দাস যে ‘স্লেভ’ অর্থবাচক নয, তাতে কোনও সন্দেহ থাকতে পাবে না। কাবণ, স্লেভেব কোনও সম্পত্তি থাকে না। আব আদিম সমাজেব মানুষেবা যখন শত্রুকে মেবে না ফেলে তাকে উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টিব কাজে লাগাতে শুরু কবল, তখন থেকেই তো ‘দাস প্রথা’ব সৃষ্টি, সুতবাং স্লেভ অর্থে দাসদেব যুদ্ধে পবাজযেব পব সবাইকে পাইকাবিভাবে হত্যাব কোনও প্রশ্নই ওঠেনা। এ সম্বন্ধে আগেও তোমায কিছু বলেছি।

এই অনার্য দাসদেব সঙ্গে আর্যদেব কোনও সাদৃশ্য ছিলনা। বহিবাগত আর্যবা ছিল ক্ষিপ্রগতি বথ ও অশ্বে বলীযান, তাবা ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ, যাগযজ্ঞাদি একই ধর্মবিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ, ভাষা ও কল্পনায সমৃদ্ধ এবং শান্তিপ্রিয অনার্যদেব তুলনায আক্রমণাত্মক ও হিংস্র। লুঠতবাজ, হত্যা, অগ্নিসংযোগেব মাধ্যমে তাবা কিভাবে সম্পদশালী হযে উঠেছিল, কিভাবে সেই সম্পদেব উত্তাপে তাদেব অভ্যন্তবীণ গোষ্ঠীগত সাম্য উবে গিযেছিল, সে সব কথা আগে বলেছি। আর্যবা প্রথমে পশুপালক হলেও অনার্যদেব সংস্পর্শে এসে এবং ভাবতেব উর্বব জলমাটিতে কৃষিজীবী হযে ক্রমে থিতু হযে বসল। সিন্ধুতীব থেকে পূর্বে এগিযে তাবা একটা নূতন আবিষ্কাব কবে সম্ভবত অনার্যদেব টেক্কা দিযেছিল। তা হল লোহা আবিষ্কাব। লোহায জঙ্গল সাফ কবা সহজ হল, লাঙলেব ফলায লোহা লাগিযে উৎপাদন গেল অনেক বেড়ে। মোট কথা দেশে একটা আর্য ধনাঢ্য গোষ্ঠী যে গড়ে উঠল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সম্পদ সৃষ্টিতে তাবা গ্রীস বা বোমেব মত দাস ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তেমন কোনও উল্লেখ কোথাও নেই। মেগাস্থিনিস যিনি নিজে গ্রীক ছিলেন, তাঁব ভাবত বৃত্তান্তে লেখা আছে যে ভাবতবর্ষে দাস ছিলনা। অর্থাৎ ভাবতে যদি দাস থেকে থাকে, তবে তা যে গ্রীস-বোমেব মত ছিল না, তা নিশ্চিত।

এই ধনাঢ্য আর্যবা ছিল চাবপাশেব বিপুল সংখ্যক দবিদ্র অনার্যদেব দ্বাবা বেষ্টিত। নিশ্চযই এ পযাযে ঋগ্বেদেব যুগেব মত লড়াই চলছিল না, একটা সহাবস্থান ঘটেছিল। আর্যে অনার্যে একটা সংযোগ গড়ে উঠছিল, কিন্তু সেটি ছিল অসম। কাব্যে পুবাণে দেখছি অনার্য গোষ্ঠী থেকে আর্যবা বধূগ্রহণ কবত, কিন্তু আর্য বমণীকে অনার্যেব ঘবণী হতে দেখা গেছে কদাচিৎ। তাছাড়া অনার্যবা কিঞ্চিৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবক্ষাব লোভে আর্যগৃহে সেবক বা ভৃত্য হিসেবে প্রবেশ কবত। আজও দেখা যায গ্রামেব গবিব মানুষ ছেলেটিকে বা মেযেটিকে বড় লোকেব ঘবে পাঠায কখনও সামযিকভাবে, কখনও চিবকালেব মত। কখনও দাবিদ্র্যেব চাপে বা ঋণেব দাযে ছেলে মেযে বিক্রি হযে যায। আগে এবকম হত, বঙ্কিমচন্দ্রেব ‘আনন্দমঠে’ব কালে হযেছে, আজও হচ্ছে। নিশ্চযই পুবাকালে অনেক ব্যাপক ছিল এই প্রথা, হবিশ্চন্দ্রেব কাহিনী তাব সাক্ষী।

আর্য গৃহে অনার্যেব স্ট্যাটাস কী বকম ছিল? আমি একটা বিখ্যাত উদাহবণ তোমাকে দিচ্ছি, তাতে আর্য-অনার্য সম্পর্কেব কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবা যাবে। ঘটনাটি ‘মহাভাবতে’ শান্তনুব সঙ্গে সত্যবতীব বিবাহ। পিতা জাতিতে ধীবব, একজন মুখিযা ব্যক্তি, তাই তিনি ‘দাসবাজ’ বলে উল্লিখিত। এই অভিজ্ঞ বৃদ্ধটি জানতেন তাঁব কন্যাব

রাজগৃহে ঘরণী হওয়ার অর্থ হারেমের অনেকের মধ্যে মিশে যাওয়া মাত্র। তাই তিনি শর্ত দিলেন যে সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রই হবে রাজত্বের উত্তরাধিকারী এবং তার অধিকার হবে নিষ্কন্টক। শান্তনু–পুত্র দেবব্রত এই শর্ত মেনে নিয়ে দু দুটো ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল ভীষ্ম, সে তো সকলেই জানে। যে দুটো বিষয় বড় একটা কেউ লক্ষ্য করেন না, সেটা তোমাকে বলছি শোন। প্রথম কথা, মহাভারতের এই কাহিনীর এক অধ্যায় পরেই দেখা যাচ্ছে সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্যের জন্য ভীষ্ম কাশীরাজ কন্যা অম্বা অম্বিকা অম্বালিকা–তিনজনকে জোর করে তুলে নিয়ে আসেন স্বয়ম্বর সভা থেকে, এবং তার জন্য রাজাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধও হয়। প্রশ্ন হল, দেবব্রত ঐ 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা'র মধ্যে না গিয়ে সত্যবতীকে জোর করে তুলে নিয়ে এলেন না কেন? দাসরাজের শর্ত পালনের দরকার কী ছিল? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বলপ্রয়োগ সম্ভব হলে বীর দেবব্রত নিশ্চয়ই পিছপা হতেন না। কিন্তু, অনার্য প্রধানের মেয়েকে জোর করে তুলে আনা, অনার্য সমাজ ব্যবস্থাকে আক্রমণ করা, সমগ্র অনার্য সমাজকে সবলে বশীভূত করা আর্যদের কল্পনারও অতীত ছিল। আমি তোমাকে আগেই বলেছি ইন্দ্রের হাজার হাজার অনার্য পুরী ধ্বংসের গল্প ছিল নেহাতই অতিশয়োক্তি। কিছু কিছু যুদ্ধ হয়েছিল, অনার্যরা পশ্চাদপসরণও করেছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ গ্রীস ছিল না–এই বিশাল উপমহাদেশকে সামগ্রিকভাবে বলপ্রয়োগে পদানত করা সম্ভব ছিল না। দেবব্রতকে দাস রাজের শর্ত তাই মানতেই হয়েছিল।

দ্বিতীয় কথা, দেবব্রত সত্যবতীকে বললেন, 'মাতঃ রথোপরি আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি', আর সেই যে সত্যবতী রথে চড়লেন আর কোনও দিন তিনি পিত্রালয়ে এলেন না। দাসরাজের সঙ্গে কোনও বৈবাহিক সম্পর্কের দায়ই ছিল না শান্তনুর। অনার্য রমণী আর্যগৃহে বধূ হল, কিন্তু সেই বধূর অনার্য কুল আর্যের আত্মীয় হল না।

আর্য–অনার্যের সম্পর্কের চরিত্রটাই ছিল এই। এ সম্পর্ক অসম, কিন্তু তা কেবল বলপ্রয়োগ নয়, এক ধরনের সহমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যে সহমত আর্য অনার্য উভয় পক্ষেই ছিল অনন্যোপায় হয়ে। এই সম্পর্ক মিলন ও সংযোগের, কিন্তু তা আত্মীয়তার নয়। আর্য গৃহে সত্যবতীরই যখন এই অবস্থা, অন্যদের কথা চিন্তা কর। অসংখ্য অনার্য নরনারী নিজ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও আর্যদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। রাজা রাজপুরুষ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা ধনশালী বণিকেরা বলত, 'আমার এতগুলি গরু, এতগুলি ঘোড়া, এতগুলি স্ত্রীলোক আর এতগুলি দাস আছে।' এইভাবে দাস কথাটিই ভৃত্য বা গোলাম কথার সমার্থক হয়ে গেল। আগে ছিল শুধু 'দাস,' এখন হয়ে গেল 'আমার দাস,' 'তোমার দাস'। এই ভাবে অর্থ বিবর্তন ঘটতে ঘটতে দাস কথার দ্বারা হীন ব্যক্তি, অনুগত ব্যক্তি–এই সবই বোঝানো হতে লাগল। আর্য পুরুষ বা রমণী অধীনস্থ বা অনুগত হলে তাকেও বলা হতে লাগল দাস বা দাসী। পাশাপাশি স্বাধীন দাসের ধারণাটিও রইল, যেমন স্বাতন্ত্র্যগর্বী সত্যবতীর পিতা দাস রাজ।

তাহলে দেখ দাস শব্দটির কতগুলি মানে। দাস শব্দ দ্বারা (১) অনার্য (২) শূদ্র (৩) ভৃত্য (৪) অনুগত ব্যক্তি বা (৫) গোলাম, সবই বোঝানো যায়। এর কারণ কী? সংস্কৃতে সমার্থক শব্দের খুবই বাড়াবাড়ি, এক একটি শব্দের গুচ্ছের সমার্থক শব্দ পাওয়া যায়। এমন কি ওপরের (১) থেকে (৪) প্রতিটিরই একাধিক সমার্থক শব্দ রয়েছে, শুধু (৫) নম্বরটি ছাড়া। তার জন্য বহু অর্থ বাচক 'দাস' ছাড়া কোনও শব্দ বরাদ্দ নেই। আমার মতে শব্দার্থের এই কার্পণ্যের কারণ হল এই যে ইউরোপীয় অর্থের 'স্লেভ' ভারতীয় অর্থনীতিতে

ছিলনা, আব সে কাবণেই মেগাস্থিনিস এদেশে যে 'স্লেভে'ব সন্ধান পান নি, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

মেগাস্থিনিসেব দেশে দাস ব্যবস্থাটা কেমন ছিল? সেখানে উৎপাদনেব এটাই ছিল মুখ্য পদ্ধতি। এখন যেমন ব্যক্তি মালিকানাধীন কাবখানা, তখনও তেমনি নানান ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি ছিল, প্রধানত ভূসম্পত্তি। এইসব সম্পত্তিতে দাসদেব ন্যূনতম খোবপোষেব বিনিময়ে পশুব মত চাবুকেব ঘায়ে খাটানো হত, আব তা থেকেই দাস মালিকদেব প্রচুব মুনাফা হত, সম্পদ হত। কিন্তু, ভাবতে ব্যাপাবটা ছিল অন্য বকম। মুঘল আমলেব শেষ দিকে ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়েব নামে একজন বণিক ভাবত ভ্রমণ কবছিলেন এবং তিনি উল্লেখ কবেছিলেন যে ভাবতবর্ষে ভূসম্পত্তিতে কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। ১৮৫৩ সালেব জুন মাসেব ২ তাবিখে মার্ক্স এবং ৬ তাবিখে এঙ্গেলস পবস্পবকে দুটি চিঠি লিখে বার্নিয়েবেব এই আবিষ্কাবকে প্রভূত গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে ভাবতবর্ষ তথা প্রাচ্যেব সমাজ বিকাশ বুঝতে হলে এই বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবন কবতে হবে। ভাবতবর্ষে ভূসম্পত্তিব ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, সুত৺ খানে গ্রীসেব মত বড় বড় দাস মালিকেব উদ্ভব হয়নি। ঋগ্বেদেব দশম মণ্ডলে৺ .১ ৹ সূক্ত থেকে বাজাব যে অভিষেক মন্ত্র তোমাকে আগে পড়ে শুনিয়েছি, তাতে আ.২, ২ন্দ্র তোমাব প্রজাদেব একায়ত্ত ও কব প্রদা'নোম্মুখ কবেছেন ' এই 'একায়ত্ত' কথাটি লক্ষ্য কব। বাজা একাই মালিক, তাঁব ও প্রজাব মাঝখানে কোনও মধ্যবর্তী মালিক নেই। এই ব্যবস্থাব সঙ্গে গ্রীক ব্যবস্থা মেলেনা।

তাহলে ভাবতবর্ষে শোষণেব ব্যবস্থাটি কী ছিল। সেটা বুঝতে গেলেই 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি,' 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি' এবং বর্ণাশ্রম ধর্মে বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থাটি'কে বুঝতে হবে। এবং সেটি যদি বোঝা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে কীভাবে এদেশেব উৎপাদন পদ্ধতি বৌদ্ধধর্মেব পশ্চাদপসবণ ও হিন্দু ধর্মেব উথানকে অনিবার্য কবে তুলেছিল। অতএব এ সম্বন্ধে দু এক কথা আজ উথাপন কবছি।

আলোচনাটা শুরু কবছি অন্য একটা প্রসঙ্গ টেনে। 'অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' ১৯৮৫ সাল থেকে ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে এক মূল্যবান অনুসন্ধানেব কাজ চালিয়ে বছবখানেক আগে সেইসব তথ্য সম্বলিত 'পীপলস অফ ইণ্ডিয়া' নামে এক বিশাল গ্রন্থ প্রকাশ কবেছেন। হয়ত সুমিতাব ব্যাংকে বইটা আছে। ভাবতবর্ষকে জানবাব পক্ষে বইটি অপবিহার্য। আমাব কাছে ওটা নেই, চেয়ে চিন্তে যা পড়েছি, তাতে একটা মন্তব্য লক্ষ্য কবেছি, সে কথাটা তোমায় বলছি। বইটিতে বলা হয়েছে যে ভাবতবর্ষে এমন কোনও জনগোষ্ঠী নেই বললেই চলে, যাবা নিজেদেব দেশান্তবী বলে মনে কবে না। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীব নিজস্ব লোককথা ও ইতিহাস বয়েছে। দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ বা বাজনৈতিক কাবণে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে দেশান্তবী হওয়াব স্মৃতি ওদেব প্রত্যেকেব আছে। গবেষণাকাবীবা বলছেন যে সাবা ভাবতবর্ষই একটা 'ক্ষেত্র', এই ক্ষেত্রে ববাবব ভাবতবাসীবা এক জায়গা থেকে আব এক জায়গায় গেছে। তাঁবা বলছেন যে দেশান্তবী হওয়ায় ভাবতবর্ষীয়দেব কোন জুড়ি নেই।

মার্ক্স–এঙ্গেলস যে প্রাচীন ভাবতবর্ষে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাব অভাবেব কথা বলেছেন, তাব সাথে এটা মিলিয়ে দেখ। জমিতে মালিকানা থাকলে এভাবে এক জায়গা থেকে আব এক জায়গায় সহজে কেউ যায়না বা যেতে পাবেনা। তাহলে প্রাচীন

ভাবতবর্ষেব চিত্রটা একবাব কল্পনা কব। এখানে শান্তনু–দেবব্রতবা বুঝে গেছেন যে বলপ্রয়োগ কবে এদেশে আদিম অধিবাসী অর্থাৎ অনার্যদেব বাগে আনা যাবে না। আব এদেশেব যাবা আদিম অধিবাসী তাবা স্বতন্ত্র অস্তিত্বে আঘাত না পড়লে বলপ্রয়োগেব পথে যেতে অনিচ্ছুক। তাবা কোনও জাযগা পছন্দ না হলে, স্রেফ সে জাযগা ছেড়ে চলে যাবেন, কাবণ ভাবতবর্ষে ভূমিব অভাব নেই এবং এ দেশেব মাটি স্বর্ণপ্রসূ।

ভাবতবর্ষেব এই প্রেক্ষাপটটিকে মনে বাখলেই বোঝা যাবে যে গ্রীস মিশব ব্যাবিলনেব ছকে এদেশেব ইতিহাসকে ফেলা যাবে না। ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে বলপ্রয়োগেব ন্যূনতা ববাববই ঐতিহাসিকদেব বিস্মিত কবেছে। এ. এল. বাশামেব মত ভাবতপ্রেমী ঐতিহাসিক বলেছেন যে ভাবতবর্ষেব ইতিহাস খুবই 'মানবিকতা পূর্ণ', আমাদেব দেশেও অনেকেই গর্ব কবে বলতে ভালবাসেন যে এ দেশ 'অহিংসাব দেশ', যদিও আমাদেব ইতিহাসেব অলিগলিতে হবিজন, শূদ্র, বিধর্মী, নাবী ও ভ্রূণ হত্যাব বক্তাক্ত ক্লেদ বড় কম নেই। তবে, সে যাই হোক, এদেশেব প্রকাশ্য ইতিহাসে বল–প্রয়োগেব ন্যূনত'ব কথাটি ঠিকই।

মহেঞ্জোদাবো হবপ্পাব মাটি খুঁড়ে যেসব জিনিস পাওযা গেছে, তাব মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রেব স্বল্পতা দেখে ঐতিহাসিকবা বিস্মিত হযেছেন। সভ্যতাব আদিকাল থেকে অস্ত্রশস্ত্র দুটি কাবণে ব্যবহাব কবা হযেছে–এক, বহিঃশত্রুব আক্রমণ থেকে বক্ষা পাওযা এবং দুই, বিপুল সংখ্যক শোষিত মানুষেব ওপব শাসকদেব কব্জা বজায বাখা। প্রথম প্রযোজনটিব তাগিদে দেশেব আপামব জনসাধাবণ সর্বদাই শাসক গোষ্ঠীব হাতে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিযেছে, আব সেই অস্ত্রই যখন তাদেব নিজেদেব বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হতে দেখেছে, তখন ভাগ্যকে অভিশম্পাত দিযেছে। বহিঃশত্রুব ভয দেখিযে জন সাধাবণকে তাঁবে বাখাব কৌশল তো আজও সমান চালু আছে। মোট কথা একটা দেশেব শোষণ ও শাসনেব একটা বিশেষ কৌশল তখনই চালু হয যখন সেটা শাসিতবাও মেনে নেয। ভাবতবর্ষ আর্য আগমনেব আগে এবং পবেও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনেব পূর্ব পর্যন্ত বহিঃশত্রুব ভযে তত্টা ভীত ছিল না। উত্তবে হিমালয ও অন্য তিন দিকে সমুদ্রই ছিল তাব স্বাভাবিক বক্ষাকর্তা। সুতবাং এদেশে সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে সমব সজ্জাব কোনও গ্রহণযোগ্য অজুহাত ছিল না। তাহলে সিন্ধু সভ্যতাব আমলে কী ভাবে জনসাধাবণকে আযত্তে বাখা হত ?

প্রত্নতত্ত্ববিদবা আবিষ্কাব কবেছেন যে একালেব বেলুচিস্তান সিন্ধু পাঞ্জাব, হবিযানা, বাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম উত্তবপ্রদেশ জুড়ে এই সভ্যতাব বিস্তাব ছিল, আযতনেব দিক থেকে প্রাচীন বিশ্বেব ইতিহাসে যাব কোনও জুডি নেই। এত বড এলাকায সভ্যতাব যে সমরূপতা ছিল, তা দেখে মার্শাল সাহেব বিস্মিত হযেছিলেন। বিস্ময আবও বাড়ে যখন দেখা যায যে এই সভ্যতাব কেন্দ্রস্থলে কোনও বিপুল বৈভব ও অস্ত্রশক্তিধাবী ক্ষমতাব সাক্ষাৎ মেলে না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাগুলিব মত পিবামিড, মন্দিব, স্বর্ণ সমাবোহ, বিশাল সৌধ বা জিগুবাটে'ব আকাশস্পর্শী স্পর্ধা সেখানে নেই, আছে সাধাবণেব ব্যবহার্য চমৎকাব প্রযঃপ্রণালী, সুব্যবস্থা সম্পন্ন ঘব, বাস্তাঘাট, স্নানাগাব ইত্যাদি। বিপুল অঞ্চল জুড়ে একটি বাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল সন্দেহ নেই, শ্রেণীভেদও যে ছিল তা ঘবগুলিব আকাব প্রকাবেব বিভিন্নতা থেকে বোঝা যায। গ্রামে শহবে তফাৎ সৃষ্টি হযেছিল, শহবে শহবেও প্রভেদ ছিল-মহেঞ্জোদাবো হবপ্পাব মত এত উন্নত অন্য শহবগুলি ছিল না। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা যে বলপ্রয়োগ ছাড়া বজায বাখা যায না, একথা এখন সকলেই

মানেন। তাহলে ভাবতবর্ষে কিভাবে বাষ্ট্র ও বলেব এই সমীকবণটিব সমাধান কবা হযেছিল ?

বৈষম্য যত বেশি, বলপ্রযোগেব প্রযোজন তত বেশি। তাই বৈষম্যকে একটা সহনীয সীমাব মধ্যে বাখা প্রবণতা ভাবতবর্ষে সব সমযই দেখা যায। 'টাকা পযসা কব, কিন্তু বিলাসিতা কবো না' সঞ্চয কব, আবামে থাক, কিন্তু তোমাব ঐশ্বর্য দেখে যেন পবেব ঈর্ষা না হয, মাঝে মধ্যে দান খযবাৎ কবো'। এই উপদেশ সর্বদাই আমবা শুনে আসছি। দান যে নিজেব ধনকে বক্ষা কবাব জন্যই,–এ কথা তো ঋগ্বেদেব 'দানসূক্তে' অকপটেই বলা হযেছিল, তোমাকে তা পড়ে শুনিযেছি। বলপ্রযোগেব প্রযোজনীযতা কমাবাব আব এক উপায হল শোষিত জনসাধাবণেব মধ্যে এই বিভ্রম সৃষ্টি কবা যে সে শোষিত নয, ওপবে যাবা বসে আছে সেই হুজুবেবা প্রকৃতই মা-বাপ। এই বিভ্রম সৃষ্টি ভাবতবর্ষেব এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। দাস ব্যবস্থায শোষণ বড় নগ্ন, ভাবতীয প্রথাটি ছিল ভিন্ন।

ভাবতীয পদ্ধতিব বৈশিষ্ট্যটি আমবা প্রথমে মার্ক্স-এঙ্গেলস্ এব বচনায পাই। যাকে আমি গত চিঠিতে বার্নিযেবেব ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে ঐ দুই বন্ধুব পত্রালাপে এশীয উৎপাদন পদ্ধতি'ব উল্লেখেব কথা বলেছিলাম। ঐ পত্রালাপেব অল্প কযেক বছব পবে লেখা কার্ল মার্ক্সেব '১৮৫৭–৫৯ সালেব অর্থনীতিক পাণ্ডুলিপি'তে (Economic Manuscripts of 1857-59) এই ধাবণাটিব বিস্তৃততব ব্যাখ্যা পাই। আদিম সাম্যাবস্থা থেকে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে উত্তবণেব তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধাবাব কথা মার্ক্স বলেছেন। একটি নগব ভিত্তিক গ্রীকো–বোমান ধাবা, এটি দাসব্যবস্থাব জন্ম দেয। আব একটি গ্রাম ভিত্তিক জার্মান ধাবা, এটি ভূমি–দাস প্রথাব জনক। কিভাবে এইসব উত্তবণ ঘটেছিল, তাব কিছু কিছু বর্ণনা, খুব সংক্ষেপে গোড়ায দিযেছি, এখন তাব মধ্যে যাব না। তৃতীয ধাবাটিব নাম মার্ক্স দিযেছেন 'এশীয পদ্ধতি', এটি অগ্রসব হযেছিল কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র পথে। সেই স্বাতন্ত্র্যটি সংক্ষেপে বুঝিযে বলছি।

এশীয পদ্ধতিতে, মার্ক্স বলেছেন, ওপবেব দুই ব্যবস্থাব মত জমিতে কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, প্রত্যেকেই জমিব দখলদাব মাত্র। এই দখলদাবি এসেছে গোষ্ঠী মাবফৎ, আদিম সাম্যাবস্থাব মত গোষ্ঠী নির্ভবতা এতে থেকেই যাচ্ছে। মার্ক্স বলছেন, ভাবতবর্ষেব মত দেশে প্রকৃতিকে জয কবা কোনও একা মানুষ বা একক গোষ্ঠীব কর্ম নয। যেমন ধবো ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে সেচ ব্যবস্থা কিংবা বড় বড় সব বন কেটে বসত। লোহা আবিষ্কাবেব পব তখনকাব সুবিশাল অবণ্যসঙ্কুল ভূমিতে কৃষি বিস্তাবেব যে প্রযাস চলেছিল, তাও নিশ্চযই যৌথ কর্ম ছিল। বড় বড় ভূখণ্ডেব মালিকদেব অধীনে কর্মবত দাসদেব যৌথশ্রমেব হাইপোথেসিস বা পূর্বানুমান যখন মানা যাচ্ছে না, তখন ধবে নিতেই হয যে ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী স্বাধীনভাবেই এসব কাজ কবেছিল। এই সব গোষ্ঠীগুলিব কাজকে একটা সংঘবদ্ধ রূপ দেবাব জন্য সেচব্যবস্থা ও কৃষিব প্রযোজনে একজন অধিপতিব, একটা কেন্দ্রীয শাসনযন্ত্রেব প্রযোজন নিশ্চযই হত, এবং লোকে তাব প্রযোজন মেনেও নিত। ভাবতবর্ষেব উর্বব ভূমিতে উদ্বৃত্ত ভালই উৎপন্ন হত। চাষী, তাঁতি, জেলে, কামাব, কুমোব ইত্যাদি নিযে কৃষি ও শিল্পে স্বযংসম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলি গোষ্ঠীভুক্ত লোকদেব জন্য যেমন উৎপাদন কবত, তেমনি উদ্বৃত্তেবও সৃষ্টি হত যা চলে যেত বস্তু ও শ্রমেব আকাবে সেই অধিপতি ও জনগোষ্ঠীব দেবতাব কাছে। এইভাবেই বাজা, বাজ্য, মন্দিব, কব ব্যবস্থা, দেবভোগ ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। গড়ে উঠেছিল শহবও। কিন্তু এ শহব গ্রীক বা বোমান শহবেব মত উৎপাদনেব কেন্দ্র নয। এ শহব বাজা বাজবাদেব কব

আহরণের ও দ্রব্যরূপে পাওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যের বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র। এই 'এশীয় পদ্ধতি'তে একদিকে রয়েছে গ্রামীণ সমাজ এবং অন্যদিকে রাজা ও তার অনুষঙ্গ। এই দুয়ের মাঝখানে রয়েছে সেচ ব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, সরকারি জনকল্যাণ বিভাগ। এ সবই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ও গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা এমন এক বন্ধন, যা থেকে ব্যক্তি মানুষের বেরিয়ে যাওয়ার কোনও পথ নেই। ব্যক্তির চেয়ে সমাজ এখানে প্রধান, এবং রাজা সর্বোপরি ঈশ্বর।

এই ব্যবস্থাটাকে দূর থেকে খুবই মনোরম বা মানবিক বলে মনে হতে পারে, কারণ এতে শ্রেণী শোষণের নির্মমতা নগ্ন হয়ে ধরা পড়ে না। অথচ 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' এই গ্রামগুলির মাথায় পা দিয়েই ভারতবর্ষে একের পর এক রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটেছে, শুধু গ্রামগুলিকে এই সব পরিবর্তন কখনও স্পর্শও করেনি। হাজার হাজার বছর ধরে পরিবর্তনহীন গ্রামগুলির মানুষ লতাগুল্মের মত জন্মেছে ও মরেছে। কখনও তারা মানব জীবনের চরিতার্থতার আস্বাদ পায়নি। অথচ, এই গ্রামের মানুষই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সোনা ফলিয়েছে, সুনিপুণ হাতে তৈরি করেছে সূক্ষ্ম বস্ত্র যা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে তরণী বোঝাই হয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছে, পাথরে ফুটিয়েছে অনুপম কাব্য আর মুখে মুখে রচনা করেছে গান আর পালা। এই সব কিছুই তো জন্ম নির্দিষ্ট কর্ম। চাষীর ছেলে চাষী, কুমোরের ছেলে কুমোর, তাঁতির ছেলে তাঁতি আর কারিগরের ছেলে কারিগর। এই নির্দিষ্ট গণ্ডীবদ্ধ জীবন মানুষকে স্বভাবতই প্রথানুসারী ও অপ্রতিবাদী করে।

মানব জীবনের চরিতার্থতা যে অগ্রগতি, বাধা বিপদকে লঙ্ঘন করে উন্নতির শিখর থেকে শিখরে যাওয়ার প্রয়াস, এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি তার গোড়া কেটে বসে আছে। এতে হা হুতাশ আছে—'মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত', কিন্তু পরলোকে 'মায়ের কোলে' কিংবা কোনও অজ্ঞাত পরজন্মে ছাড়া ইহলোকে এর কোনও নিবৃত্তি নেই। এই পরিবর্তনহীন গতানুগতিক ব্যবস্থায় মানুষ অতি সহজেই রাজা ও ঈশ্বরকে মেনে এসেছে, নিজেদের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে সাম্রাজ্যকে সচল রেখেছে, কিন্তু তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। আর্য শাসকদের আবিষ্কৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম এই ব্যবস্থার সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

তুমি তো আগেই দেখেছ ঋগ্বেদে গোড়ায় ছিল শুধু দুটি বিভাগ, আর্য আর দাস বা দস্যু। পরে দেখা গেল সমাজে নানা পৃথকীভবন,—কেউ বৈদ্য, কেউ তক্ষক, কেউ কর্মকার আবার কেউ স্তোত্র রচয়িতা, কিন্তু এই বিভাগটা বংশানুক্রমিক ছিল না। বংশানুক্রমিক শ্রম বিভাজনের রীতিটা আর্যরা পেল অনার্য গ্রামগুলি থেকে। এর সাথে বর্ণভেদটাকে জুড়ে দিয়ে গড়ে উঠল বর্ণাশ্রম প্রথা। বর্ণ ভেদ মানে তো রঙের ভেদ। প্রথমে কালো মানুষদের বলা হল শূদ্র, তারা যজ্ঞহীন ব্রাত্য, তাদের কর্ম জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট। আর্যরা রইল যজ্ঞের অধিকারী, দ্বিজ, এবং তারাও কর্ম অনুসারে নিজেদের ভাগ করে নিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য রূপে এইভাবে বর্ণভেদ প্রথা চালু হল। 'দাস' কথাটার মত 'বর্ণ' কথাটিরও রূপান্তর ঘটল, অর্থের পরিবর্তন হল।

শাসন ও শোষণের এই কলটি বেশ নিরুপদ্রবেই কাজ করছিল। সাদা আর্যের শ্রেষ্ঠত্বের এই অলিখিত বিধান নিয়ে কোনও গণ্ডগোল ছিল না। কিন্তু বিপদ হয়ে দাঁড়াল 'বর্ণ সঙ্কর' অর্থাৎ রঙের মিশ্রণ। আর এক আপদ হল বৌদ্ধধর্ম। তখন ব্রাহ্মণরা এ দুয়ের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন। সে গল্প পরের বারে।

॥ বাহান্ন ॥

সত্যজিৎ চলে গেলেন। আজ কত কথাই মনে আসছে। ববীন্দ্রনাথকে আমবা হাবিয়েছিলাম আমাদেব শৈশবে। তাঁব মূল্য বোঝাব ক্ষমতা তখনও আমাদেব হযনি। তাবপবতো আমবা বড় হযে উঠেছি ববীন্দ্র পবিমণ্ডলেই, সুতবাং ববীন্দ্রনাথেব ক্ষতি আমাদেব কখনও সইতে হযনি। কিন্তু সত্যজিতেব কথা ভিন্ন। সত্যজিৎকে আমবা পেলাম যৌবনেব দ্বাবপ্রান্তে। তোমাব নিশ্চযই মনে আছে, বেলুড় কলেজেব সহপাঠী সেই শচীনন্দন, যে এখন হার্টেব বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক এবং ববীন্দ্রসংগীত গাওযা ডাক্তাব হিসেবে যাকে ওদেব হাসপাতালে সবাই চেনে, সেই তোমাকে প্রথম চিঠি লিখে জানিযেছিল, 'এক অসাধাবণ বাংলা সিনেমা এসেছে–পথেব পাঁচালী, আজই গিযে দেখে আয', আব তাবপবে আমবা বন্ধু বান্ধববা সবাই পথেব পাঁচালী দেখে ফেললাম। বাতাবাতি সত্যজিৎ ভক্ত হযে গেলাম আমবা। সেই সত্যজিৎ, যাঁব সৃষ্টিকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখলাম, যাকে ভালবাসলাম, তিনি সমযেব কিঞ্চিৎ আগেই আমাদেব চোখেব সামনে প্রযাত হলেন। তিনি এলেন, জয কবলেন, চলে গেলেন। আমাদেব মত অগণিত গুণমুগ্ধেব কাছে এ বিদায বড় মর্মস্পর্শী। আমবা আবও অনেকদিন তাঁকে আমাদেব মাঝখানে চেযেছিলাম।

সত্যজিৎ এমন এক শিল্প মাধ্যমকে বেছে নিযেছিলেন যা বযসে সর্ব কনিষ্ঠ কিন্তু আবেদনে সর্বব্যাপক। আমবা ছোটবেলায বাংলা 'বই' দেখতে যেতাম, সিনেমা ছিল 'বই'এবই এক চলমান রূপ, নাটকেব মত সাহিত্যেব এক উপশাখা মাত্র। কিন্তু সত্যজিতেব পব থেকে আব আমবা 'বই' দেখিনা, 'ছবি' দেখি। চলচ্চিত্র যে প্রকৃতপক্ষে চলমান চিত্র, চলমান গ্রন্থ নয, সত্যজিৎ প্রথম আমাদেব তা শেখালেন এবং অচিবে বাংলা চলচ্চিত্রকে 'ছবি' কবে তুলে, তাকে সাহিত্যেব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিযে তাকে অনাযাসেই বিশ্বেব দববাবে পৌঁছে দিলেন। সেই যে একদিন অপু, সর্বজযা, দুর্গা, হবিহব, ইন্দিবা ঠাকরুণ আব নিশ্চিন্দিপুবেব মাঠ ঘাট জল কাশবন আকাশ ঝড় বেলগাড়ীব অফুবন্ত ছবিব মালা আমাদেব মনেব ফ্রেমে আঁটা হযে গেল, তাবপব থেকে আব কখনও আমবা সত্যজিতেব ছবি মিস কবিনি। কিসেব এই দুর্নিবাব আকর্ষণ? শুধুই কি তাঁব এই নূতন আঙ্গিক? না, তা তো নয, কাবণ প্রকৃতপক্ষে এই আঙ্গিক তো তাঁব নিজস্ব উদ্ভাবন নয। যদিও ভাবতীয সিনেমাব ক্ষেত্রে তাব সর্বাঙ্গীন শিল্পসম্মত প্রযোগ এই প্রথম। তাঁব আবেদন তাঁব বক্তব্যে, যে ভাবে তিনি বাঙালী তথা ভাবতীয জীবন সত্যকে তুলে ধবেন, তাতে।

খুব সবল কবে বললে বলা যায সত্যজিৎ তাঁব ছবিতে মানবিকতাব কথা, অপবাজেয মনুষ্যত্বেব কথা বলেছেন। অপু 'ত্রযী'ব ছবিগুলিব নামকবণ থেকে তাঁব বক্তব্যেবও আঁচ পাওযা যায। দুঃখ দৈন্য তুচ্ছতা ও মৃত্যুব মাঝখান দিযে মানুষ অনববত পথ চলেছে, সে এগিযে যাওযাই তাব 'পথেব পাঁচালী'। নানা বিপর্যযেব মধ্যেও সে 'অপবাজিত'। আব এই চলমান জীবনেব সঙ্গে প্রেম ওতপ্রোত ভাবে মিলে গড়ে ওঠে তাব 'সংসাব', তাব ভুবন, ক্ষুদ্র হলেও যা অনন্ত, গণ্ডিব সীমায থেকেও যা অপবিসীম।

কিন্তু, মানবিকতাবাদী বলেও ব্যাপাবটা স্পষ্ট হযনা, ভুল বোঝাবুঝি থেকে যায, যেমন সেদিন দূবদর্শনেব কোনও ভাষ্যকাব বলছিলেন যে সত্যজিৎ ছিলেন 'মানবিকতাবাদী',

বাজনীতিকবা যে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষেব কথা বলেন, তিনি ছিলেন তা থেকে অনেক দূবে। তাই তিনি 'জলসাঘবে'ব জমিদাব আব 'সদগতি'ব চামাব, দুজনকেই একই ভালোবাসায উপস্থাপিত কবেন। সত্যিই কি তাই? এ সম্বন্ধে সত্যজিতেব কথা তাঁব নিজেব মুখ থেকে শোনা যাক। ঐ দূবদর্শনেই প্রচাবিত বিক্রম সিং-এব সঙ্গে এক সাক্ষাৎকাবে তিনি বলছেন, যে 'হিউম্যানিস্ট' বা 'মানবতাবাদী' অভিধাটি তাঁব ঠিক পছন্দসই নয।

বলছেন ঃ 'মানবতাবাদী? হ্যাঁ, মানুষেব সঙ্গে মানুষেব সম্পর্ককে ফুটিযে তোলা যদি মানবতাবাদ হয, তবে আমি মানবতাবাদী। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেব একটি শ্রেণী থাকে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বও থাকে, আমি সেই দ্বন্দ্বকে সততাব সঙ্গে তুলে ধবাব চেষ্টা কবেছি।'

শ্রেণী দন্দ্বেব কথা কেন? সত্যজিৎ বায কি কমিউনিস্ট? না, তিনি কমিউনিস্ট নন, কিন্তু তাঁব দৃষ্টিভঙ্গিব সঙ্গে কমিউনিস্টদেব দৃষ্টিভঙ্গি মিলে যায। ঠিক এ ধবণেবই কথা আবও খোলামেলা ভাবে আব একজন বলেছিলেন। তিনি প্রেমচন্দ। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ — এ অনুষ্ঠিত সাবা ভাবত প্রগতি লেখক সঙ্ঘেব প্রথম সম্মেলনেব সভাপতিব অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, বিত্তশালীব বাংলো আব বাগিচায শুধু নয, ঝুপড়ি আব জীর্ণকুটিবে যে সৌন্দর্য আছে তা অন্বেষণ কবতে হবে। রূপসী নাবীব বং মাখানো ঠোঁট গাল আব ভুরুই নয, শিশুকে খেতেব আলেব ওপব শুইযে দিযে যে মা ঘর্মাক্ত কলেববে খাটছে তাব গিঁট দেওযা চুল, ফেটে যাওযা ঠোঁট আব বিবর্ণ গালে সৌন্দর্য বযেছে। একদিকে শোষণ ও নিপীড়ন, অন্য দিকে হৃদয, আবেগ আকাঙ্ক্ষা আব কষ্ট সহিষ্ণুতা নিযে যে সমগ্র জগৎ তাকে অঙ্কন কবতে হবে। উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহাব কবিনি, কিন্তু কথাগুলি হুবহু প্রেমচন্দেব নিজেব কথা। পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি সংসদেব 'প্রেমচন্দ শতবার্ষিকী সঙ্কলন' থেকে তুমি পড়ে দেখতে পাব। বইটি তোমাব কাছে আছে, এক কপি তোমাকে দিযেছিলাম। কথাগুলি বলে প্রেমচন্দ যোগ কবছেন, 'সাহিত্য দেশভক্তি বা বাজনীতিব পিছু পিছু চলাব জন্যও নয, ববং তা এদেব আগে আগে চলাব এক মশাল।' সাহিত্য সম্বন্ধে প্রেমচন্দ যা বলেছিলেন, সমগ্র শিল্প সম্বন্ধেই সে কথা সত্য। সত্যজিৎ বা প্রেমচন্দ বাজনীতিব পিছু চলাব লোক নন, কিন্তু বাজনীতিকদেব কাছে তাবা আলোকবর্তিকা, মশাল।

প্রেমচন্দ ও সত্যজিৎ বাযেব মধ্যে যে একটা আত্মীযতা বযেছে, 'সদগতি' ছবিটি তাব প্রমাণ। গল্পটি প্রেমচন্দ লিখেছিলেন ১৯৩১ সালে, আব তাব ঠিক পঞ্চাশ বছব পবে ১৯৮১তে সত্যজিৎ তৈবি কবলেন তাঁব ছবিটি। শোষণেব এমন নির্মম ও নগ্ন চিত্র সত্যজিৎ আব তৈবি কবেননি। শমীক বন্দ্যোপাধ্যাযেব সঙ্গে এক সাক্ষাৎকাবে তিনি বলেছিলেন, এ বকম আবও ছবি কবাব ইচ্ছে তাঁব আছে। কিন্তু, তা আব হযে উঠল না। এই সেদিন আব একবাব দূবদর্শনে ছবিটি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল শত শত বৎসব ধবে চলে আসা ভাবতীয শোষণ ব্যবস্থাব যে বিশিষ্ট রূপ প্রেমচন্দ এঁকেছিলেন, পঞ্চাশ বছব পবে সত্যজিৎ তাব প্রাসঙ্গিকতাব বিন্দু মাত্র পবিবর্তন দেখতে পাননি। সত্যজিৎ বায চিত্রনাট্য লেখাব সমযে ববাবব লেখকদেব লেখা গল্পকে পালটাতেন, ববীন্দ্রনাথও তা থেকে বেহাই পান নি, যে জন্য অনেক ববীন্দ্রভক্তেব অনুযোগ সত্যজিৎকে শুনতে হযেছে। কিন্তু বিস্মযকব ব্যাপাব হল 'সদগতি'তে পণ্ডিতেব জন্য নজবানা হিসেবে দুখিব ঘাস নিযে যাওযা থেকে শুরু কবে সর্বশেষে পণ্ডিতেব গঙ্গাজল ছিটিযে দেওযা পর্যন্ত মূলেব প্রায

কোনও কিছুরই পরিবর্তন সত্যজিৎ করেন নি, এখানে সেখানে কিছু আবশ্যিক সংযোজন ছাড়া। এই একটি ঘটনা প্রমাণ করে, প্রেমচন্দের পরিণত বয়সের সামগ্রিক ভাবনার সঙ্গে সত্যজিৎ কতখানি একাত্ম ছিলেন। 'পরিণত বয়সে'র কথাটা যোগ করলাম একারণে যে প্রথম জীবনে প্রেমচন্দের লেখায় নির্মম শ্রেণীদ্বন্দ্বটি ফুটে ওঠেনি। যাইহোক সে ভিন্ন প্রসঙ্গ, 'সদগতি' নিয়েই আরও দু একটি কথা তোমায় বলব। একটু আগে আমি তোমাকে 'শতশত বৎসর ধরে চলে আসা ভারতীয় শোষণ ব্যবস্থার বিশিষ্ট রূপে'র কথা বলছিলাম। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। 'সদগতি'র দুখিকে কেউ চাবুক নিয়ে তাড়া করে না, সে 'স্বেচ্ছায়' শোষিত হয়। কেন হয়? তার রহস্যটা কী? দেখ, দুখি এক পিঞ্জরাবদ্ধ জীব। বর্ণাশ্রম প্রথা চামার হিসাবে সমাজে তার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সেখান থেকে বাইরে যাবার তার কোনও পথ নেই। তার মুক্তির একটাই পথ আছে, তা হল নিষ্ঠার সঙ্গে সংসার ধর্ম পালন। সব কিছু যদি সে ঠিক ঠিক করতে পারে, তবে পরজন্মে রয়েছে মুক্তির আশ্বাস। কে এই ঠিক ঠিক নিয়মগুলি জানে? জানে একমাত্র ব্রাহ্মণ। ভেবোনা যে এটা কেবল বুজরুকিতে সম্ভব হয়েছে, এ জন্য তাকে অনেক পারদর্শিতা দেখাতে হয়েছে। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ব্রাহ্মণের একটা বড় ক্ষমতা হল 'মুহূর্ত' বা 'লগ্ন' গণনা করা। দুখিয়া এসেছিল ব্রাহ্মণের কাছে তার মেয়ের বিয়ের শুভ মুহূর্তটি জানবার জন্য তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে। ব্রাহ্মণ শুধু পুজো আচ্চা করেন না, তাঁর সম্পত্তিও আছে। দুখিকে সেখানে বেগার খাটানো গেল, সে খাটলও, কারণ গরজ বড় বালাই। মেয়ের বিয়ের শুভ মুহূর্তটি তাকে জানতেই হবে। কাঠ কাটতে গিয়ে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অবসন্ন দুখিয়া যখন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন ব্রাহ্মণ সেই মোক্ষম হুমকিটি দিয়েছিল,'ঘুমুচ্ছিস, ঘুমো, মেয়ের বিয়ের লগ্নও তেমনি বের হবে, আমাকে তখন দুষতে পারবি না।' এই ভয়ঙ্কর কথাটিই দুখিয়াকে ক্ষেপিয়ে তোলে। লগ্ন যদি ঠিক না হয়, তাহলে তো সর্বনাশ–মেয়ের বিবাহিত জীবনে দুঃখ, লাঞ্ছনা বা বৈধব্য সুনিশ্চিত। অতএব সে ক্ষুধার্ত অবসন্ন দেহে পাগলের মত কাঠ চিরতে গিয়ে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ব্রাহ্মণের এই মুহূর্ত গণনার ক্ষমতাটি এখন কেবল পাজি পুঁথিতেই সীমাবদ্ধ। এবং তা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের আড়ালে আচ্ছাদিত হয়ে আছে। কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না। আর্য যাগযজ্ঞ—মন্ত্রবিদরা যাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলতেন, তাঁরা বেদ জানতেন, বেদের সুললিত শ্লোকগুলি তাঁরা ধ্বনিময় উচ্চারণে মন্ত্রের মত বলতে পারতেন। ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে ছিল তাঁদের একচেটিয়া অধিকার। যজ্ঞ বেদী নির্মাণ, যজ্ঞের কাল নিরূপণ ইত্যাদি কর্মের পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসের মধ্য দিয়ে তারা জ্যামিতি, পরিমিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে পারদর্শী হয়েছিলেন। কখন বৃষ্টি হবে, কোন সময় কোন শস্য বপনের অনুকূল ইত্যাদি অর্থনৈতিক সুপরামর্শ তাঁরা কৃষককে অবশ্যই দিতে পারতেন। রাজনীতি, দর্শন, চিকিৎসা বিদ্যা, ভেষজাদি, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে তাদের যে জ্ঞানের অনুশীলন হয়েছিল, তাতে তাঁরা সমস্ত রকমের উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী ও শাসক কুলের পরামর্শদাতার মর্যাদা লাভ করে গিয়েছিলেন। চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের মত বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে তাঁরা সাধারণ মানুষকে তাক লাগিয়ে দিতেও পারতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যা জানতেন, তাকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রচার করার বদলে তাকে একটা গুপ্তজ্ঞানের আড়ালে রাখতেন, তাঁদের ভয় ছিল সকলে যদি এসব কথা জেনে যায় তবে আর ব্রাহ্মণের আধিপত্য থাকবে না। এই কৌশলের ফলে তাদের প্রতিপত্তি বাড়তও।

যেমন ধবো, ওবা বলতে পাবতেন, 'তোমবা পাপ কবেছ, তাই অমুক দিন অমুক সময়ে সূর্যকে বাহু গ্রাস কববে। তখন তোমাদেব স্নান কবে পবিত্র হতে হবে, দেবতাকে পূজা কবতে হবে।' মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখত, ভবিষ্যৎবাণী ফলে গেছে। তাতে ব্রাহ্মণেব সম্মান ও নজবানা দুইই বাড়ত।

এই ব্রাহ্মণবা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। গ্রামেব মানুষবাই ব্রাহ্মণদেব চাইত, বাজাবাও ব্রাহ্মণকে ভূমি ভোগ দখলেব জন্য লিখে দিতেন। এবকম দানপত্রেব খবব ঐতিহাসিকবা দিয়েছেন ভূবিভূবি। এইভাবে বেশ কয়েক শতাব্দী ধবে ভাবতবর্ষেব স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিব বংশ পবম্পবাগত উৎপাদন ব্যবস্থাব সঙ্গে এই ব্রহ্মণ্যধর্ম বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল। সমগ্র জনসাধাবণ ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যকে মেনে নিচ্ছিল। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাব মধ্যে যে হৃদয়হীনতা ও মনুষ্যত্বেব যে অপমান দেখা যায়,–তাব বিরুদ্ধে ধিক্কাব, কখনও বা বিদ্রোহও যে না ছিল, তা নয়। 'সদগতি'তেও সেই বিদ্রোহ আছে যদিও তা টেঁকেনা, কাবণ যে সমাজ সম্পর্কেব ওপবে এই ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে না ভেঙে ফেলে, এই ব্যবস্থাকে হটানো সম্ভব নয়।

বৌদ্ধধর্মেব বাণী ও আদর্শও একদিন ব্যর্থ হয়েছিল সে কাবণেই। বদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতি, বংশানুক্রমিক উৎপাদন ব্যবস্থা, আব জন্মান্তববাদেব দুষ্ট চক্রেব সঙ্গে বুদ্ধেব 'বর্ণ'— নিবপেক্ষ সৎকর্মেব আদর্শটি সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। তোমাকে আমি বাববাব বলেছি, বাস্তব অর্থনীতিক ভিত্তি ও তাব ওপবে গড়ে ওঠা চিন্তা চেতনা যতক্ষণ না নির্মূল হচ্ছে ততক্ষণ কোনও আদর্শ, তা যত মহৎই হোক, টিকতে পাবে না। এই দুখিযাব কথাই ধবো না। তুমি যদি তাকে সৎ চিন্তা সৎ কর্মেব দ্বাবা নির্বাণ লাভেব পবামর্শ দাও, তবে বেচাবা তাব কী বুঝবে। তাব সমস্ত কর্ম ও চিন্তাই তো তাব 'হীন জন্মে'ব দ্বাবা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে সে যে পবমুখাপেক্ষী, মোহগ্রস্থ ও প্রতাবিত হবে, তাতো খুবই স্বাভাবিক। তাবই ফলে আমাদেব দেশেব দুখিযাবা শতাব্দীব পব শতাব্দী ধবে অপমান শোষণ ও মৃত্যুব ফাঁদে ধবা পড়েছে। এই নিবীহদর্শন নির্মম শোষণেব ফাঁদটিকে চূর্ণ কবে দেওযা ছাড়া এই কোটি কোটি দুখিযাদেব মুক্তি নেই।

॥ তিপ্পান্ন ॥

বোফর্স কেলেঙ্কাবীব যে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে তাতে নাকে রুমাল চাপা দিয়েও পাব পাওযা যায় না। এবং এই দুর্গন্ধ ঘাটছেন এই কেলেঙ্কাবীব নায়ক যাঁবা, তাঁদেবই বন্ধুজনেবা। বাজীব গান্ধীকে 'মিঃ ক্লীন' আখ্যা দিয়েছিল যে সব পত্র পত্রিকা, আবাব নবসিংহ ও মনমোহন সিংহেব প্রশংসায়ও পঞ্চমুখ ছিল ঐ তাবাই। কিন্তু এখন যে ভাবে পত্রিকাগুলি প্রধানমন্ত্রীব সত্য গোপনেব তথ্যগুলি ফাঁস কবে দিচ্ছে, তাতে বোঝা যায এসব ওঁদেব ওপব মহলেব অন্তর্দ্বন্দ্ব–আমবা ইতবজনেবা তাতে বড় ঘবেব কেচ্ছা কিছু শুনতে পাচ্ছি মাত্র। ওদেব ভাগ বাটোযাবায বফা হলেই সব চুপ হয়ে যাবে। কিন্তু এতো যাকে ইংবেজিতে 'হিমশৈলেব শীর্ষভাগ' বলে তাই। সামান্যই দেখা যাচ্ছে, তাব অনেক গুণ তলিয়ে আছে দৃষ্টিব বাইবে। আমাদেব এই সমাজেব ওপব তলায যেখানে অভাজনদেব যাতাযাত নিষিদ্ধ, নানা নিষেধেব বেড়াজালে সুবক্ষিত যে এলাকাব বাইবে লেখা থাকে 'ট্রেসপাসার্স উইল বি প্রসিকিউটেড,' সেখানকাব স্বপ্নিল আলোয মদেব

জোয়ারা আর কামিনীকাঞ্চনের সমারোহে প্রতিদিন কত যে দুর্নীতির ঢলাঢলি চলে, তার হাল হকিকৎ কতটুকু আমরা জানি! শুধু যখন সেইসব গোপন কুঠুরিতে দেনা পাওনা নিয়ে বড় রকমের মনান্তর ঘটে যায়, তখনই কেবল বাইরে তা ফাঁস হয়ে পড়ে। সুতরাং আমি নিজে কখনও এসব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই না। সাধারণ মানুষও দেখবে এসব ব্যাপারে কেমন নির্বিকার। সাধারণ মানুষ বলতে আমি 'উত্তেজনার আগুন পোহান' আড্ডাবাজ মধ্যবিত্তের কথা বলছি না, বলছি জনসাধারণের কথা।

দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতেই আবার প্রেমচন্দের একটি তীক্ষ্ম মর্মভেদী গল্প মনে এল। গল্পটির নাম 'নমক কা দারোগা'। 'পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি সংসদের' 'প্রেমচন্দ শতবার্ষিকী সংকলনে'র ভূমিকা থেকে গল্পটির সারসংক্ষেপ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

মুন্সী বংশীধর নুনের দারোগার চাকুরি পেল। ব্রিটিশ সরকার এই ঈশ্বর দত্ত দ্রব্যের ব্যবহারের উপর যখন নিষেধ আরোপ করল, তখন এই নিয়ে ঘুষ প্রবঞ্চনা গেল বেড়ে। আর ভাল ভাল পদ ছেড়ে লোকেরা নুনের দপ্তরের দারোগা হবার জন্য আকুল হয়ে উঠল। এমনি সময় বংশীধর যখন এই পদটি পেল তখন তাঁর ধর্মপরায়ণ পিতা ভাবলেন এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। 'ধর্মপরায়ণ পিতা' কথাটি লক্ষ্য করো। প্রেমচন্দ বলতে চাইছেন আমাদের ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে উৎকোচ গ্রহণের কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু বংশীধর ছিল অন্যজাতের মানুষ। এক রাত্রিতে বিরাট ধনশালী জমিদার পণ্ডিত আলোপীদীন যমুনা নদীর পোলের ওপর দিয়ে সারি সারি গরুর গাড়িতে যখন নুন চালান দিতে অকুতোভয়ে এগোচ্ছিলেন, তখন বংশীধরের কাছে ধরা পড়লেন। কিন্তু ব্যাপারটাকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। প্রথমে তাচ্ছিল্য এবং পরে বাক চাতুর্য ও ঘুষের দ্বারা অব্যাহতি চাইলেন। ঘুষের অঙ্কের প্রস্তাব অবিশ্বাস্য চল্লিশ হাজারে উঠল, কিন্তু নুনের দারোগা ধর্মে অবিচল রইল।

পণ্ডিত আলোপীদীন গ্রেপ্তার হলেন। পণ্ডিতজীকে দেখার জন্য বিস্মিত লোকেরা দৌড়ে এল। এর পরের বাক্য দুটি লক্ষ্য কর। প্রেমচন্দের সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে নাড়িজ্ঞান ছিল প্রবল, তিনি লিখছেনঃ লোকেদের বিস্ময় এ জন্য নয় যে তিনি একাজ কেন করলেন। বিস্ময়ের কারণ হল, তার মত অসাধ্য সাধনকারী ধন ও বাকপটুতার অধিকারী মানুষ কিভাবে আইনের হাতে ধরা পড়লেন।

যাই হোক ধর্মাবতারের আদালতে পণ্ডিত আলোপীদীন বেকসুর খালাস পেলেন, দারোগার জুটল মৃদু তিরস্কার, এবং শেষ পর্যন্ত ন্যায়-পরায়ণতার পুরস্কার স্বরূপ মুন্সী বংশীধর তার চাকুরিটিও খোয়াল। ঘরে ফিরে এই অবিবেচক মানুষটি স্বভাবতই ধিক্কৃত হল। কাহিনী এভাবেই এগোয়, কিন্তু এরপর প্রেমচন্দ গল্পের সমাপ্তি টানেন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায়।

একদিন সন্ধ্যায় মুন্সী বংশীধরের দরজায় পণ্ডিত আলাপীদীন এসে নামলেন। বংশীধরের পিতা তো পুত্রের কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনায় একেবারে নুয়ে পড়লেন। কিন্তু ছেলে তার আত্মসম্ভ্রম বোধ নিয়ে খাড়া রইল। এদিকে বিনয়ে এবং বংশীধরের গুণপনার প্রশংসায় গলে পড়লেন আলোপীদীন। এবং আর্জি পেশ করলেন, দয়া করে বংশীধর কি তাঁর একটা অনুরোধ রাখবেন? বিনয়ের প্রতিদানে বংশীধরকেও বিনয়ী হতে হল। তখন আলোপীদীন প্রস্তাব করলেন বংশীধরকে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত করতে। বার্ষিক ছ হাজার টাকার বেতন, দৈনিক হাত খরচা আলাদা, উপরন্তু গাড়ি বাড়ি দাসদাসী সব

নিখবচায। বংশীধব এই মহত্ত্বে অভিভূত হযে গেল। তাব চোখে জল এল। কিছু মৃদু আপত্তিব পব মুন্সী বংশীধব বাজি হযে গেল। পণ্ডিত আলোপীদীন তাকে জড়িযে ধবলেন।

কাহিনীব এই সাব সংক্ষেপটি দিযে ভূমিকাব প্রেমেন্দ্র মিত্র মন্তব্য কবছেন, 'কিন্তু জয হল কাব? নীতিপবাযণ বংশীধবেব না সূক্ষ্মবুদ্ধি বাকপটু ধনকুবেব পণ্ডিতজীব? শেষ পর্যন্ত জিতল কে? ধর্ম না ধন? এই প্রশ্নে পাঠককে আন্দোলিত কবে প্রেমচন্দ তাঁব গল্প শেষ কবলেন। এ সমাপ্তি একমাত্র প্রেমচন্দেব দ্বাবাই সম্ভব ছিল। আপাতঃসবল গল্প শৈলীব আববণে প্রেমচন্দেব এই বিদ্রূপ বড় তীব্র। মুন্সী বংশীধবেব 'ধর্ম পবাযণ' পিতা সহজেই ধনেব বশীভূত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বংশীধবেব ধর্মও ধনেব কাছে তাবই খববদাবিব কাজে বিক্রি হযে যায। সে যাকে সততা বলে মনে কবে, আসলে তা আনুগত্য মাত্র, প্রথমে যা ছিল ব্রিটিশ সবকাবেব, এবাবে তা হল পণ্ডিত আলোপীদীনেব। আমাদেব এই সমাজে যেখানে ধনেব একাধিপত্য, সেখানে সততা ও ধর্ম শেষ পর্যন্ত কদাচিৎ জযী হযে থাকে।

এমতাবস্থায যাঁবা বলেন যে বৌদ্ধ মঠগুলি দুর্নীতিব আখড়া হযে উঠেছিল বলেই বৌদ্ধধর্ম দেশ থেকে হটে গেছে, তাঁদেব কথা আমাব মনে বিশেষ দাগ কাটে না। বৌদ্ধসংঘে দুর্নীতি যে ছিল না, তা নয, স্বযং বুদ্ধই তো দুর্নীতি পবাযণ শ্রমণকে সাবধান কবে গিযেছেন এবং সে কথা 'ধম্মপদ' থেকে তোমাকে শুনিযেছি। কিন্তু অপব পক্ষে গীতায বা পুবাণে সেই সাবধান বাণী তো নেইই পবিবর্তে বযেছে এই আশ্বাস যে, যে কোনও পাপ কর্ম কবে [illegible]ব প্রতি একান্ত অনুগত হলে বা গাযত্রী মন্ত্র জপ কবলেই মুক্তি, সে সব উদাহবণও [illegible]য দিযেছি। এখন যেমন মন্ত্রীবা বলেন, 'দুর্নীতি কবোনা', আব জনান্তিকে বলেন, 'যদি কব, তবে আমাব শবণাপন্ন হও, আমি বাঁচিযে দেব,' আমাদেব শাস্ত্রে ইন্দ্র অগ্নি কৃষ্ণ প্রমুখ দেবতাবাও প্রকাশ্যে তাই বলছেন। অথাৎ দুর্নীতিব প্রতিযোগিতায ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল এক কাঠি ওপবে, তাব ছাড়পত্র ছিল খোলাখুলি। ক্রমে আমাদেব সমাজদেহে দুর্নীতি এমন ভাবে ছডিযেছে যে তাতে আব সাধাবণ মানুষ মাথা ঘামায না, স্বাভাবিক বলে মেনে নেয এবং তা বংশীধব কিংবা বাজীব গান্ধীব মত মিঃ ক্লীনদেবও গ্রাস কবে।

বৌদ্ধ নিষ্ক্রমণেব প্রধান কাবণ আমাব মতে, দুর্নীতি নয বিচ্ছিন্নতা–যে বিচ্ছিন্নতাব ফলে ভাবতবর্ষেব কমিউনিস্টবা উজ্জ্বলতম দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ আব আদর্শবোধেব মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন কবেও ভাবতবর্ষেব বর্ণবিভাগ, জন্মান্তববাদ ও অদৃষ্ট বিশ্বাসে আকীর্ণ সমাজেব মূল ধাবাব মধ্যে আজও স্থান কবে নিতে পাবল না। আজও শ্রেণী সংগ্রামকে আড়াল কবে বড হযে উঠছে জাতেব লড়াই।

ভাবতবর্ষেব স্বযংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি, তাব বংশানুক্রমিক কর্ম বিভাগ এবং জন্মান্তববাদেব সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বর্ণভেদ প্রথা কী চমৎকাব খাপ খেযে গিযেছিল, সে কথা তো তোমায বলেছি। এই ব্যবস্থাব মধ্য দিযে শাসক শ্রেণী ন্যূনতম বল প্রযোগে কার্য সিদ্ধি কবছিল। ববীন্দ্রনাথেব সেই জুতা আবিষ্কাবেব গল্প মনে আছে তো? সাবা দেশেব ধুলো চামড়ায না ঢেকে প্রত্যেকেব পা ঢেকে দেওযাব সহজ পবামর্শ দিযেছিল এক চামাব। তেমনি সাবা দেশটাকে শাসনে বেঁধে না বেখে প্রত্যেককে আত্মশাসনে বেঁধে দেওযাটাই ছিল সহজ। এদেশেব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সে কর্মটাই কবেছিল। 'সদগতি'ব দুখিযাদেব পাইক ববকন্দাজ দিযে বেঁধে আনতে হয না, তাবা নিজেই এসে ধবা দেয, আত্মপ্রতাবিত হযে। এটাই খাঁটি 'ভাবতীয পদ্ধতি'।

এই পদ্ধতি প্রথম দিকে কোনও পাকাপোক্ত নিয়ম কানুন ছাড়াই গড়ে উঠেছিল। এবং তাব ফলে অনেক ফাঁক ফোকড় থেকে গিযেছিল, যাব মধ্য দিয়ে শাসক কুলেব পক্ষে দুটি বড় বিপদ ঢুকে পড়েছিল,-একটি বৌদ্ধধর্ম, অন্যটি বর্ণসংকব। আদিতে বিভিন্ন বর্ণ বিভাগ সত্ত্বেও নানা বর্ণেব মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ ছিল না, এবং এক বর্ণেব মানুষেব অন্য বর্ণে রূপান্তবেব বিরুদ্ধে কোনও কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হযেছিলেন, দাসী উশিজেব পুত্র কক্ষীবাণ বৈদিক সূক্ত বচনা করেছিলেন, ইতবা অর্থাৎ শূদ্রাব পুত্র বচনা কবেছিলেন ঐতবেয ব্রাহ্মণ আবণ্যক ও উপনিষদ, অনার্য মৎস্যজীবীব পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপাযন ব্যাস হযেছিলেন মহাপণ্ডিত, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ কবি। আর্য অনার্য কালো সাদা, মুড়িমিছবিব এই এক দব হয়ে যাওয়াতে সমাজপতি ও শাসকবর্গ একদিন প্রমাদ গুণবেন, এটাই স্বাভাবিক। আর্য শাসককুল দেখলেন, এভাবে চলতে থাকলে সাদা মানুষেব আধিপত্যই এক সময বিপন্ন হয়ে উঠবে, কাবণ বর্ণসংকবেব ফলে দেশে নির্ভেজাল সাদা বংই আব থাকবে না। অতএব, তাদেব এক নম্বব বিপদ হল এই বর্ণসঙ্কব। দুই নম্বব বিপদ বৌদ্ধ মতবাদ। এই মতবাদে বর্ণ বিদ্বেষ না থাকায়,এর সমর্থক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল অবজ্ঞাত শূদ্রকুল, বর্ণবৈষম্য যাদেব স্বার্থেব খানিকটা পবিপন্থী সেই বণিক সম্প্রদায, বর্ণাশ্রমেব ঢিলেমিব সুযোগে যে শূদ্রেবা বাজা মহাবাজা হয়ে উঠছিলেন তাবা এবং অনেক ছাপোষা ব্রাহ্মণেবাও যাবা ভিক্ষাবৃত্তি কবে কোনওক্রমে বেঁচে থাকছিলেন। শাসকবা দেখলেন এই বৌদ্ধ মতবাদ টিকে গেলে বিদ্রোহ ঘনীভূত হবে এবং ক্রমে বর্ণাশ্রম ধর্মই যদি উঠে যায তবে তা হবে তাদেব পক্ষে একেবাবে সর্বনাশ।

সে কাবণেই গত চিঠিব আগেব চিঠিতে বলেছিলাম যে ব্রাহ্মণ্যবাদ দুটি জিনিসেব বিরুদ্ধে কোমব বেঁধে লেগেছিল, একটি বর্ণসংকব অন্যটি বৌদ্ধ মতবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রেব সাদা মনে কাদা ছিল না, তিনি শ্রীকৃষ্ণেব ধর্মতত্ত্বেব আদর্শ প্রচাব কবতে গিয়ে খটকায পড়েছিলেন যে পৃথিবীতে এত বস্তু থাকতে বর্ণসংকবকেই কেন বিশ্ব বসাতলে যাবাব মূল বলে শ্রীমদভগবদগীতায উল্লেখ কবা হয়েছে। তাঁব আধুনিক মন এটা মেনে নিতে পাবেনি। কিন্তু আর্য শাসককুলেব কাছে বর্ণসংকব ছিল প্রকৃতই এক মহা বিপদ। অতএব, তাব বিরুদ্ধে বর্ণাশ্রমেব নিয়মগুলিকে পাকা কবে তোলাই হল ধর্মশাস্ত্রগুলিব প্রধান কাজ। কালো বর্ণেব কৃষ্ণেব মুখ দিয়ে এই কথাগুলি বলিয়ে সেই শাস্ত্রকাবেবা খুব কূটবুদ্ধিব পবিচয দিয়েছিলেন। গোপকুলেব গোপাল কৃষ্ণ যে আদৌ বৈষম্যমূলক বর্ণভেদেব প্রবক্তা ছিলেন না, সে তো তোমাকে আগেই বলেছি।

বৌদ্ধ দমনেও কূটবুদ্ধিব কমতি ছিল না। কৌশল নেওয়া হয়েছিল তিন বকমেব। এক ঃ যে বৌদ্ধ বিধানগুলি জনপ্রিয কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মেব পক্ষে ক্ষতিকব নয, সেগুলিকে বজায বাখো এবং আত্মস্থ কবো। দুই ঃ স্বযং বুদ্ধকে অবতাব বানিয়ে দাও। এবং তিন ঃ অবজ্ঞা অপবাদ অপপ্রচাব ও নিপীড়নেব দ্বাবা বৌদ্ধ ইতিহাসটিকেই দেশ থেকে মুছে দাও। এই কৌশলগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছি। আব সামান্য দু-এক কথা বলে আগামী বাবে পাততাড়ি গোটাতে শুরু কবব। আমবা বড় বেশি কাল ধবে বক বক কবছি হে' এবাব এটা থামাতে হবে।

॥ চুয়ান্ন ॥

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে যারা দু হাত তুলে নৃত্য করছিল, তাদেরকে একথা জোরের সঙ্গে বলার সময় এসছে, 'তোমরা মূর্খ। অপরের যাত্রা ভঙ্গে বগল বাজাও, নিজের নাকটি যে কাটা গেছে, সেটি খেয়াল কর না।' একা ছড়ি ঘোরাবার সুযোগ পেয়ে আমেরিকা আজ সকলেরই হাতে মাথা কাটছে। তাতে ভারতবর্ষের মত দেশের সেই মহা বিপদ, যারা মুক্ত দুনিয়ার খোয়াব দেখছিল, তারা এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। অবশ্য যাদের হাড় আছে, তাদের কথাই বলছি। যাদের মেরুদণ্ড নেই, তাদের কথা আলাদা, দাঁড়িয়ে উঠে তারা প্রতিবাদ জানাতেও পারবে না।

মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে আমাদের বাজারের বিধি নিষেধগুলি তুলে দিয়ে বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলির জন্য তা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিদানে মার্কিন সরকার একের পর এক ভারতের বিরুদ্ধে বিধি নিষেধ ও হুমকি জারি করে চলেছে। ওদের ৩০১ ধারা, ডাঙ্কেল প্রস্তাব, আণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিতে সই করার জন্য হাত মোচড়ানো ইত্যাদির পর এবার এসেছে রকেট কৃৎকৌশল ক্রয় নিয়ে ভারত ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা। সস্তায় রাশিয়ান জিনিস না কিনে বেশি দামে মার্কিন বস্তু কেনার জন্য এ হল প্রকাশ্য জোর জুলুম। এই জুলুমবাজির প্রতিবাদে ভারত সরকার ভারত-মার্কিন যৌথ নৌ মহড়া বন্ধ করতে পারছে না, কারণ এদের মেরুদণ্ড নেই। আমাদের সাহেবী পত্রিকাটিতে কার্টুন বেরিয়েছে, ভূলুণ্ঠিত নরসিংহকে বুশ লাঠি পেটা করছে। ভারত যে দুর্বল, তার যে ট্যাঁ ফোঁ করা উচিত নয়, পত্রিকাটি তাই বোঝাতে চাইছে।

সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ স্তাবকতা, জাতীয় সম্ভ্রমবোধের অভাব, সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট সাম্প্রদায়িকতা, উস্কানি, বিচ্ছিন্নতার পক্ষে ওকালতি, কোনও কিছুতেই আজ আর কোনও রাখঢাক নেই। দেশপ্রেম ও মানবতার পক্ষের শক্তিরা আজ আচমকা আঘাতে খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গেছে বলেই দুনিয়া জুড়ে এই সব লজ্জাহীন কুৎসিৎ বীভৎসার ঢল নেমেছে।

মাঝে মাঝে পৃথিবীতে এরকম খারাপ সময় আসে। কিন্তু কালো মেঘেও রৌপ্য রেখা দেখা যায়, নিশীথের অন্ধকারেও জন্ম নেয় আগামী দিনের ভ্রূণ। সবকিছু যে একেবারে ফুরিয়ে যায়নি, তার প্রমাণ আদর্শচ্যুত রাশিয়াও অন্তত এখন পর্যন্ত, ভারতকে রকেট কৃৎকৌশল রপ্তানিতে অটল রয়েছে। রাশিয়ার সত্তর বছরের ইতিহাসও সবটাই মুছে যায়নি। সেখানকার মানুষ আবার রক্ত পতাকা তুলছে, আবার সোচ্চার হচ্ছে। তার যে অর্থনৈতিক ভিত এতদিনে তৈরি হয়েছে তা নিশ্চয়ই সব রাতারাতি বদলে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন, যে নদী মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলেছে, তারও সব কিছু হারায়নি, ইতিহাসে কোনও কিছুই একেবারে ব্যর্থ নয়।

ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের ধারাটি সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। সেই ধারাটি দৃশ্যত হারিয়ে গেলেও তার সব কিছুই হারিয়ে যায়নি। বুদ্ধ প্রচারিত নীতিবোধ, তার মানব করুণা, যজ্ঞের নামে অহেতুক হিংসার বর্জন, সরলজীবন যাপনের মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয়গুলি শত শত বৎসর ধরে ভারতীয় জীবনবোধের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। বৌদ্ধ শিল্প কলা ভারতবর্ষের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যেমন পূর্বসূরী তেমনি বৌদ্ধ শিক্ষা প্রচার পদ্ধতি ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনারও পথিকৃৎ। বিহারের নালন্দায় এবং অন্যত্র যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠেছিল, সেগুলি প্রকৃতপক্ষেই ছিল বিশ্ববিদ্যার আলয় এবং সারা বিশ্বের বিদ্যালয়ও। হিউয়েন

সাঙেব বিববণ থেকে জানা যায়, নালন্দায় চিকিৎসা, ভেষজবিদ্যা, শিল্প, কলা, কৃষি ইত্যাদি নানা জাগতিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত, আব এখানে শিক্ষার্থী আসতেন চীন জাপান তিব্বতেব দূব প্রান্ত থেকে। মহাকাব্য ও পুবাণেব যে ফসলগুলি আমবা পববর্তী যুগে পাই, বৌদ্ধ ধম্মপদ, জাতক ও অন্যান্য অসংখ্য সাহিত্য সৃষ্টিব মধ্য দিয়ে তাব জমি তৈবি হয়ে গিয়েছিল। সাধাবণভাবে ভাবতবর্ষে যে নিবামিষাহাব, যৌন শুচিতা বক্ষা ও সবলজীবন প্রীতিব ঐতিহ্য তৈবি হয়েছিল, তোমাকে আমি আগেই বলেছি, সেটি গোঘ্ন, যৌন যথেচ্ছাচাবী ও ভোগ বিলাসী বৈদিক দেবদেবীদেব অনুসাবী নয়, একান্ত ভাবেই বৌদ্ধ। বুদ্ধেব কামনা বাসনা ত্যাগেব উপদেশকে কিভাবে বর্ণাশ্রমেব সঙ্গে যুক্ত কবে ব্রাহ্মণ্যবাদটি গড়ে উঠেছিল, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আকাবে আগেই বলেছি। আবাব দেখো, বুদ্ধ ভগবান নিয়ে মাথা ঘামান নি, সদাচাবই ছিল তাঁব উপদেশেব মূল বিষযবস্তু। হিন্দুধর্মে কোনও ভগবানকে মানা হল অথবা আদৌ হল কিনা, তা নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা নেই, দৈনন্দিন জীবনে শাস্ত্র নির্দিষ্ট আচাবগুলি যদি তুমি পালন কব, তবেই তুমি হিন্দু। ভক্তিমার্গে বিষযটি আৎ'ও সবল, আবাধ্য দেবতাব নাম কবলেই মুক্তি, আব কোনও বাধ্য বাধকতা নেই। হিন্দু ধর্মেব• ভক্তিবাদেব ধাবাটি বৌদ্ধ ধর্মেব মতই সর্বদা জাতপাতেব বিভেদকে দূবে ঠেলে দিতে চেয়েছে, শূদ্র ম্লেচ্ছ যবন–কাউকেই ঘৃণা কবেনি।

এই ভক্তি এবং অবতাববাদ দুই–ই এদেশে মহাযানী বৌদ্ধদেব অবদান। পূজ' ও ব্যক্তিপূজাব বিবোধী ছিলেন বুদ্ধ। তাই আদি বৌদ্ধ শিল্পে অর্থাৎ স'ন'নাথ ভাবহুত সাঁচী অমবাবতী ভাজ কার্লেব ভাস্কর্যে বা অজন্তাব নবম ও দশম গুহা'ব চিত্রগুলিতে বুদ্ধেব কোনও মূর্তি নেই, বুদ্ধকে বোঝাতে প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পববর্তীকালেব গান্ধাব ও মথুবাব অসামান্য বুদ্ধমূর্তিগুলি বুদ্ধ–পূজাব প্রচলনকে সূচিত কবে।

বৌদ্ধধর্মেব অবক্ষয় দু ধবণেব হয়েছিল। হীনযানীবা বুদ্ধেব উপদেশকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা কবে, কেবল বৌদ্ধ–সন্ন্যাসীদেব ব্যক্তিগত নির্বাণ লাভেব দিকে মন দিয়েছিল, মানুষেব দুঃখ দূবীকবণেব বুদ্ধ নির্দিষ্ট ব্রতটি হয়েছিল বিস্মৃত। অপব দিকে মহাযানীবা মানুষেব সাথে সংযোগ বক্ষা কবতে গিয়ে লক্ষ্য কবেছিল যে বৌদ্ধ উপদেশগুলি যাগযজ্ঞ মন্ত্রোচ্চাবণেব আচাব সর্বস্বতাব চেয়ে সবল হলেও, এই সব উচ্চ আদর্শ তুলে ধবা কঠিন, তদুপবি শ্রেষ্ঠী ও বাজশক্তিব প্রতিনিধিবা সর্বদাই অর্থ ও ক্ষমতাব প্রযোগে আদর্শকে তবল কবে দিতে তৎপব। তাবা তাই সহজ পথ হিসেবে বুদ্ধ পূজাব প্রচলন কবেছিল, প্রচলন কবেছিল বোধিসত্ত্বেব কাহিনীব অর্থাৎ অবতাব বাদেব এবং ক্রমে সেই পবিমণ্ডলে বুদ্ধেব আশে পাশে ভাবতবর্ষেব অজস্র দেবদেবীবাও এসে সমবেত হয়েছিল। মহাযানীবা এমন এক 'মীথ' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল যেখানে বুদ্ধই ঈশ্বব এবং অন্য দেবদেবীবা তাঁব পার্শ্বচব। আদিতে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি লেখা হয়েছিল জনগণেব মুখেব ভাষায়, পালিতে। এবাবে ব্রাহ্মণদেব হাতে লেখা হতে থাকল সংস্কৃত শাস্ত্র। যে নানা জাতেব বৌদ্ধ দর্শন উৎপত্তি হতে লাগল, তাতে নাগার্জুনেব মত মহাপণ্ডিতেবা জগৎকে শূন্য বলে প্রচাব কবতে লাগলেন। অন্যদিকে আবাব ইহলৌকিকতাব পবাকাষ্ঠা জন্ম দিল নানা তন্ত্রেব ও ধর্মীয ব্যাভিচাবেব। বুদ্ধ উচ্চদর্শন ও সবলজীবনেব যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন, তা এদেশ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

কিন্তু মহাযানীদেব বুদ্ধপূজা ও বুদ্ধ–অবতাববাদ থেকে ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ্ববেব পূজা ও বিষ্ণু–অবতাববাদ এবং নাগার্জুনেব শূন্যবাদ থেকে শঙ্কবেব মাযাবাদ তো কযেক পা

মাত্র! অতএব, এই উত্তরণ বা অবতরণ ঘটেছিল অনেকটা স্বাভাবিক ভাবেই। কয়েক শতাব্দী ধরে কায়েমী স্বার্থ বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বরবাদ, ঐহিকতা ও বর্ণাশ্রম বর্জিত মানবতাবাদের অবক্ষয়ে স্বভাবতই উৎসাহ জুগিয়েছে। জগতের নিত্য পরিবর্তনশীলতার যে বাস্তব তত্ত্ব বুদ্ধ উপস্থিত করেছিলেন, তা পর্যবসিত হয়েছে এক অবাস্তব শূন্যবাদে। আমি বলছিনা যে নাগার্জুন বা শংকরাচার্যের মত চিন্তাবিদেরা কায়েমী স্বার্থের দাস ছিলেন, কিন্তু তাঁদের চিন্তায় সমাজের উঁচুতলার গণবিরোধী ভাবনাগুলির যে প্রতিফলন ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তোমাকে আগেই বলেছি, বুদ্ধ বর্ণাশ্রমের বিরোধী হলেও তাঁর মধ্যে বর্ণ বিভক্ত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও জেহাদ ছিল না। তিনি বরং মানুষের কামনা বাসনা অর্থাৎ স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিকেই দুঃখের জন্য দায়ী করেছিলেন, শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে নয়। এই দুর্বলতাও এই অবক্ষয়ের জন্য কম দায়ী নয়।

এইরকম একটা ডামাডোলের মধ্যেই ক্রমে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম খানিকটা অদল বদল হয়ে বর্ণ ভেদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম হয়ে উঠল। জাতকের পরিবর্তে পুরাণ, বুদ্ধ চরিতের পরিবর্তে রামায়ণ, বুদ্ধ অবতারবাদের স্থলে বিষ্ণু অবতারবাদ (অবশ্য বুদ্ধের অবতারত্ব বহাল রেখেই), বৌদ্ধ দর্শনের পরিবর্তে বেদান্ত বা উপনিষদের দর্শন ক্রমে স্থান করে নিল। বুদ্ধের সমকালীন যে উপনিষদগুলি এতদিন অবহেলিত ছিল, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচারকরা সেগুলি নিয়ে মেতে উঠলেন। কারণ এতে যাগযজ্ঞের বিরোধিতা আছে, নির্বাণ বা মোক্ষের তত্ত্ব আছে এবং রয়েছে বিশ্বের এমন কিছু বস্তুতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যা বুদ্ধের তত্ত্বের সঙ্গে খানিকটা মিলে যায়, আবার উপনিষদই বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদের পরিবর্তে পরম ব্রহ্মের তত্ত্ব তুলে ধরেছে এমন নিপুণতার সাথে যা বৌদ্ধ দর্শনের বিরুদ্ধে এক চমৎকার হাতিয়ারও বটে।

আমি তোমাকে যে পটভূমিকাটি ব্যাখ্যা করে শোনালাম, তাতে মনে হতে পারে যে বৌদ্ধ ধর্মের নিষ্ক্রমণ ঘটেছিল বুঝি একেবারে নিরুপদ্রবে। কিন্তু, আমার তা মনে হয়না। গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের জয়জয়কার হলেও পরবর্তীকালে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে অথবা বাংলার পালবংশের শাসনকালে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য থেকে মনে হয় যে ঐ ধর্ম সহজে বিদায় নেয়নি। অথচ আশ্চর্যের কথা, এ দেশে বিক্রমাদিত্যের কিংবদন্তী বেঁচে থাকলেও, হাজার হাজার পাতার পুরাণ নামক তথাকথিত ইতিহাস লেখা হলেও, যে সম্রাটরা গুপ্তদের চেয়েও অনেক বড় ও অনেক সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে একমাত্র যাঁরা প্রায় সারা দেশকে একত্রিত করেছিলেন, সেই অশোক ও তাঁর বংশ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। সিংহলের বৌদ্ধ তথ্যপঞ্জিতে উল্লিখিত মহান সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক যে এক ঐতিহাসিক পুরুষ, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তাঁর শিলালিপিগুলি আবিষ্কারের আগে তা ঘূণাক্ষরেও কেউ জানত না। আমাদের দেশের এত এত রচনা টিকে রইল, অথচ এক বিরাট সাম্রাজ্যের কয়েক শতাব্দীর নিদর্শন একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল, এটা কেমন অস্বাভাবিক নয় কি? স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি, অদৃষ্টবাদ ও সংসারচক্রের ধারণায় আবদ্ধ সমাজে যে গতানুগতিকতার জড়তা রয়েছে, সত্যিই তা ইতিহাস গ্রন্থ রচনার অনুকূল নয়। কিন্তু বৌদ্ধদের তো ইতিহাস প্রীতির ঐতিহ্য রয়েছে। বুদ্ধের মৃত্যুর শ তিনেক বছরের মধ্যে বারবার তিনবার রীতিমত 'সম্মেলন' অনুষ্ঠিত করে বৌদ্ধ নথিপত্রগুলিকে তারা পালি ভাষায় সুগ্রথিত করেছিল, যা সিংহলে গিয়ে সুরক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে মৌর্যদের ছিল কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা, সমস্ত কিছুর নথিপত্র তাদের রাখতে হত। যে অশোক সারা দেশজুড়ে অতো শিলালিপি লিখিয়েছিলেন, তিনি কিছুই

ইতিহাস লিখিয়ে রাখেন নি, এটা মানতে কষ্ট হয়। অন্যদিকে অজন্তায় খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত নয় শত বৎসর যেখানে জগতের এক বিস্ময়কর চিত্রশালা গড়ে উঠল, তা একেবারে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল, এও বড় অদ্ভুত।

চার্বাক বল, বৃহস্পতি বল, বুদ্ধ বল, যাদেরই কথা অপছন্দ, ছলে বলে কৌশলে তাদের মুছে ফেলার একটা অবিরত প্রক্রিয়া আমাদের দেশে কাজ করে গেছে। ঐ 'বলে' কথাটায় তোমার কিছু আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু বৌদ্ধ নির্যাতনের কাহিনী তো ইতিহাসেই আছে, যদিও সে ইতিহাস সত্যের ছিঁটেফোঁটা মাত্র। কারণ, সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় এ[illegible] হাজার বছরের অত্যুন্নত সভ্যতার সমস্ত নিদর্শনকে লোপাট করে দেওয়ার কাজ নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়, রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' যে বলদর্পিতার বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ।

যাই হোক, অনেক কথা হল, আর এত কথার পরেও আরও কত কথাই রয়ে গেল না বলা। তবু, এবারে থামতে হচ্ছে। কারণ, আমাদের আশেপাশে যে স্বল্প সংখ্যক শ্রোতারা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা উশখুশ করছেন। ভাবছেন, এদের আলাপ থামবে তো! আমরা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, তা নিয়ে অনন্তকাল তর্কবিতর্ক চলতে পারে। ভারতীয় ঐতিহ্য মহাসাগরের মতই বিপুল, আমরা শুধু সেই মহাসাগরে এসে পড়া কিছু নদনদীর জরিপ করে বেড়ালাম মাত্র। তোমার কথা ধার করেই বলছি, এই বিপুল বারিধির কতটুকু জল কোন অংশ থেকে এসেছে, তার হিসেবের চেয়েও জরুরি হল তার বিস্তার, তার ঔদার্য, তার গর্জনশীল সফেন ঢেউ আর তার বুকের মধ্যে লুকোন অনন্ত সম্পদ আর রত্ন। আমাদের আলাপ যদি সেই বিরাটত্ব বোধ খানিকটাও জাগ্রত করে থাকে, তবে তাই তো বড় প্রাপ্তি। আমাদের এই যে শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁদেরও আমি আমাদের এই আসরের অঙ্গ বলে মনে করছি। কারণ, তাঁরা কেউ উৎসাহ দিয়েছেন, কেউ সমালোচনা করেছেন, কেউ নূতন কথা ধরিয়ে দিয়েছেন— তাঁরাও ছিলেন এই আসরের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার। শুধু তোমার নয়, আরও কত দূর দূরান্তের মানুষের চিঠি পেয়েছি। তার মধ্যে দুজনের কথা আজ বলব, সবার নাম তো করা যাবে না। একজন নদীয়ার মানুষের সংগ্রামের সাথি আশি বছরের ক্ষেতমজুর অমিয় পাল, যিনি তাঁর বৌমার সাহায্যে বিশাল এক পত্র লিখে 'পৃথিবীর পাঠশালায় শেখা' তাঁর জ্ঞানের ভাগ আমাকে দিয়েছেন। অন্যজন দিল্লীর বুদ্ধিজীবী মানুষ পি. পি. সেন যিনি অযাচিতেই আমাকে দিয়েছেন তাঁর সুচিন্তিত ভাবনার ভাগ, যত্ন করে পাঠিয়েছেন একটি উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান আলোচনার প্রতিলিপি। এঁরা দুজন দুই বিপরীত মেরুর মানুষ, কিন্তু একই ভাবধর্মেরই তো! একজন খেটে খাওয়া মানুষ, স্বোপার্জিত শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রখর বস্তুবাদী, ঈশ্বরকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন, এই বয়সেও আমাকে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে বারণ করেন, কারণ এদেশের অধিকাংশ পাঠকই তো ইংরেজি বোঝেন না। অন্যজন বুদ্ধির অনুশীলনে রত, অনুমান করি স্কুল কলেজের উঁচু ডিগ্রী ধারী, বস্তুকে চূড়ান্ত বলে মানতে চান না, মনে করেন বিশ্ব প্রক্রিয়ার কোনও এক অজ্ঞাত নিয়ন্তা রয়েছেন, চিঠিতে অনেক ইংরেজি শব্দ লিখে দুঃখ প্রকাশ করেন এই বলে যে এসব শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ তাঁর জানা নেই। এই সম্পূর্ণ বৈপরীত্যের মধ্যেও এক জায়গায় উভয়ের মিল রয়েছে, তা হল দায়বোধ। স্বদেশ, মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি ভালবাসায় অনেক দূরের অচেনা মানুষকেও এঁরা আত্মীয় বলে মনে করেন, তাঁকে নিজের চিন্তার ও ব্যাকুলতার ভাগ দেন। এই অখণ্ড বন্ধনই তো নানা

'সিন্ধু সভ্যতাব কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভাবতবর্ষে যে এক নিববচ্ছিন্ন সভ্যতাব ধাবা চলে আসছে, ইতিহাসে তা প্রায অনন্য। হযত চীনে এবকম একটা ধাবা বযেছে, যদিও তা প্রকৃতিতে অনেক আলাদা। ভাবতবর্ষেব এই দীর্ঘ সাড়ে চাব হাজাব বছবেব ইতিহাস (যাকে তুমি চাবটি পর্বে ভাগ কবেছ) সামগ্রিকভাবে বিচাব কবাই যে ভাল, এ বিষযে তোমাব সাথে আমাব অমত নেই। আর্য ও অনার্য, বেদান্ত ও অন্য পাঁচ দর্শন, বৌদ্ধ জৈন লোকাযত ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদ, হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ইত্যাদি নানা ধাবাব সম্মিলনে যে ভাবতীয ঐতিহ্যেব সৃষ্টি হযেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভাবতীয চিন্তা মাত্রই যে আধ্যাত্মবাদ নয, এমন কি উপনিষদেব মধ্যেও যে পবমাত্মাবাদেব পাশাপাশি বস্তুবাদী চিন্তাব চমৎকাব নিদর্শন বযেছে, তাব অকাট্য প্রমাণ দিযেছ। তুমি দেখাতে চেযেছ ভাবতবর্ষ মানেই হিন্দুধর্ম নয, আবাব হিন্দুধর্ম আব আধ্যাত্মবাদ এবং আধ্যাত্মবাদ আব অবতাববাদ এক নয,এবং অবতাববাদও এক জাযগায দাঁড়িযে থাকেনি, তাব বিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ কি আমাদেব দেশে, কি ধর্মে, কোনও কিছুই সনাতন কিংবা চিবন্তন নয। তুমি জান যে তোমাব এই মূল বক্তব্যেব সঙ্গে আমাব বিশেষ বিবোধ নেই।

বামেব বা কৃষ্ণেব যে মূল্যাযন তুমি কবেছ এবং এই চবিত্রগুলিব বাস্তবতা ও কাল্পনিকতাকে তুমি যেভাবে ব্যাখ্যা কবেছ, তাব সাথে সম্পূর্ণ একমত না হলেও, অযোধ্যায কোনও একটি বিশেষ জাযগায বামেব সত্যিই জন্ম হযেছিল কিনা তা নিযে আস্ফালন কবাব বাতুলতা আমাব নেই। বাম আমাব অন্তবে আছেন, এবং তিনি বিশ্বব্যাপী, মন্দিব তাব প্রতীক মাত্র। তিনি একটা বিশেষ জাযগায জন্মেছিলেন, এমন স্থূল ভাবনাকে আমি হিন্দুধর্ম বলিনা। বিবেকানন্দ বলেছিলেন হিন্দু যখন মূর্তি পূজা কবে, তখনও সে জানে, ঐ মূর্তি একটা অবলম্বন মাত্র, ঈশ্বব সর্বব্যাপ্ত, তিনি কেবল ঐ মূর্তিতে নেই।'

তুমি সবই লিখেছ, কিন্তু কৌতুকেব বিষয হল বর্ণাশ্রম ধর্ম বিষযে কিছু বলনি। সম্ভবত ঐটিই হিন্দুব দুর্বলতা বলে। আব ঐটিই হিন্দুশাস্ত্রেব এক মূল স্তম্ভ। ববীন্দ্রনাথ যে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'সকল প্রকাব মিলনেব পক্ষে এমন নিপুণ কৌশলে বচিত বাধা জগতে আব কোথাও সৃষ্টি হযনি', সে তো ঐ বর্ণাশ্রমেব কথাই, নজরুল যাকে বলেছিলেন জাতেব নামে বজ্জাতি। আমি তোমাকে দেখিযেছি যে বর্ণাশ্রম একটা মনগড়া কাঠামো নয, আমাদেব দেশে শোষণ ব্যবস্থাবই এটি এক অনন্য কৌশল— অন্যান্য সমাজেব দাসপ্রথাব বিকল্প। দাসপ্রথা সহজেই ধ্বংস হযেছে, বর্ণাশ্রম প্রথা হযনি। ব্রাহ্মণ্যবাদ পৃথিবীব সফলতম শোষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনেব জন্য গর্ব কবতে পাবে। আমি বলছিনা যে তুমিও সেই গববে গববী, কিন্তু তুমি মৌন। যতক্ষণ আমবা এই বর্ণভেদেব বিরুদ্ধে মৌন থাকছি, ততদিন আমাদেব মুক্তি নেই। এব অভিশাপ আমাদেব সমাজকে অক্টোপাসেব বন্ধনে জড়িযেছে। ভাবতীয সমাজেব যা কিছু মহৎ ও যা কিছু উদাব, সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বর্জন কবে তা আত্মস্থ কবা এবং তাব যা কিছু গ্লানি তাকে সবলে বর্জন কবা, এই দুটিই আমাদেব কর্তব্য হওযা উচিত। এবং একাজে গ্রামেব ক্ষেতমজুব থেকে শুরু কবে মহানগবীব বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত, সকলেবই যে ভূমিকা বযেছে, সেটা দেখিযে দিযেছেন আমাদেব পত্রমালাব পাঠকেবাই।

পুনশ্চ

ছ'মাস আগে যে বিষয় নিয়ে পত্রালাপের ইতি হয়েছিল, ভেবেছিলাম তা নিয়ে আর মুখ খুলবনা। কিন্তু, গত ছ–ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা এবং তার প্রতিক্রিয়া যে ভাবে খোদ আমাদের কলকাতা অব্দি ছড়িয়েছে, তাতে যে লজ্জা এবং আত্মগ্লানি ভোগ করছি, তোমাকে নতুন ক'রে এই চিঠি লেখার কারণ হল সেটাই। বছর দুয়েক আগে বোধ করি আমার দ্বিতীয় পত্রে, সত্যজিতের 'দেবী' আলোচনা প্রসঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম যে দায়িত্বপালনে বিলম্ব ও দুর্বলতা, অন্যায় ধর্মান্ধতার কাছে নতিস্বীকার এবং আমাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার আড়ালে দয়াময়ীর স্বামীর মতই আমাদের জীবনেও কি এক ভয়ংকর ট্রাজেডী অপেক্ষমান? সেই আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত হল। আমি ঈশ্বর মানিনা, নাস্তিক। তুমি বলতে পার একটি মন্দির বা মসজিদ ভাঙা হলে আমার কী আসে যায়। একটি মসজিদ তো শুধু ভাঙা যায়নি, ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে বিশ্ববাসীর সামনে ভারতের সম্মান। ঠিক একশ বছর আগে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ গর্ব করে বলেছিলেন অন্যরা ধর্মস্থান ভাঙে, আমরা ভাঙি না, আমরা প্রতিটি ধর্মকে শুধু সহ্য করিনা, সত্য বলে বিশ্বাস করি, এবং নিজ নিজ ধর্মস্থান ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ার পর পারসিক ইহুদী প্রভৃতিরা যখন তাদের আবাসস্থল পরিত্যাগ করে বাস্তুহারা হয়, আমরা তাদের কোল দিই, ইতিহাসেই তার প্রমাণ আছে। আজ যখন উন্মত্ত ত্রিশূলধারী মদমত্ত সাধু আর হাজার হাজার হিন্দু করসেবকের দল মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বহু শতাব্দীর পুরাতন একটি মসজিদকে ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিল এবং তারই ওপরে প্রতিষ্ঠা করল রামের মূর্তি, তখন এই সুপরিকল্পিত দস্যুবৃত্তির পর স্বামীজী বেঁচে থাকলে, তাঁর গর্ব কোথায় যেত?

আমি তো বারবার বলে আসছি যে হিন্দু মানবিকতা, ঔদার্য্য, পরধর্মসহিষ্ণুতা ইত্যাদির হামেশাই যে প্রশংসা করা হয়ে থাকে, তা অনেকটাই অতিশয়োক্তি বা বলা যেতে পারে বিভ্রম। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব যে আশি বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থেকে নির্বিবাদে তাঁর প্রচার চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন, বিবেকানন্দ তা নিয়েও গর্ব করেছেন। তিনি বোধ হয় বলতে চেয়েছেন যে যীশুখ্রীষ্টের মত অল্প বয়সে তাঁকে শহীদের মৃত্যু বরণ করতে হয়নি। কিন্তু, সত্যিই কি এতে গর্ববোধ করার কিছু আছে? যীশু রাজশক্তি এবং জনগণ, কারু কাছ থেকেই জীবদ্দশায় সমর্থন পান নি। অপরপক্ষে ঘটনাচক্রে বুদ্ধ রাজশক্তি, বৈশ্যকুল এবং বিপুল জনসাধারণের সমর্থন, সবই লাভ করেছিলেন। সে কাহিনী ইতিপূর্বে আমি বিস্তারিত বলেছি। তিনি শুধু বিদ্রোহী ছিলেন না, দেশব্যাপী এক বিপ্লবের তরঙ্গ শীর্ষে তিনি অবস্থান করছিলেন। ফলে তাঁর বিরোধীরা সেদিন অনেক দূরে হটে গিয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধকে হত্যা করতে না পারলেও ভারতবর্ষের হাজার বছরব্যাপী বৌদ্ধ ইতিহাসকে হত্যা করে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এই তথাকথিত হিন্দুরাই। যে বোম্বেটের দল হত্যা, লুণ্ঠন, ধ্বংস ও প্রমাণ লোপের বীভৎস তাণ্ডবে মধ্যযুগে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ইতিহাসটাকেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল, তাদেরই সুযোগ্য উত্তরসূরীরা এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ধ্বংস, লুণ্ঠন ও প্রমাণলোপের ক্ষিপ্র কৌশলে মুহূর্তে বাবরি মসজিদের ইতিহাসটাকেই লুপ্ত করে দিয়ে ঐ স্থানটিকে রামের নিশ্চিত

জন্মস্থান বলে ‘প্রমাণ’ করে দিতে চাইছে। এতে নূতনত্ব কিছু নেই। কয়েকশত বৎসর পর আমাদের মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা ঘুম ভেঙে জেগেছে। আমরা ভাবতে ভালবেসেছিলাম যে হিন্দুরা এই বর্বরতা থেকে মুক্ত। মুক্ত হ'লে তো তা গৌরবের বিষয়ই হত, কিন্তু কোনও ধর্মই কি তা হতে পারে? হওয়া সম্ভব? প্রত্যেক ধর্মেই মানুষকে ভালবাসার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধর্মই মানুষকে সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে, যে জন্য রবীন্দ্রনাথ বলছেন ‘সাম্প্রদায়িক ধর্ম’। এবং সম্প্রদায়ে ভেদ থেকেই জন্ম নেয় ‘আমার সম্প্রদায়ই শ্রেষ্ঠ’ এই অহঙ্কার, এবং সেই অহঙ্কার থেকে আসে অবিশ্বাস বিদ্বেষ ও ঘৃণা। হিন্দু ধর্ম এই নিয়মকে কিভাবে লঙ্ঘন করবে?

আমি তোমাকে দেখিয়েছি যে হিন্দু ধর্ম আপাত উদার ও বাহ্যত সহিষ্ণু হলেও ক্রূরতায় ও নিষ্পেষনে কারু থেকে ন্যূন নয়, শুধু তার কৌশলটি হল ভিন্ন—সে ন্যূনতঃ বলপ্রয়োগে কর্ম হাসিলে বিশ্বাস করে। সেই কৌশলটি হল বর্ণাশ্রম, এবং সেই বর্ণাশ্রম ধর্মই হিন্দুর সমস্ত সবলতা ও দুর্বলতার উৎস। নানান মত ও আচরণের মানুষকে এক একটি বর্ণের গণ্ডিতে বেঁধে দিয়ে তাদের নিজস্ব ধর্মাচরণ পালনের যে স্বাধীনতা হিন্দুধর্ম দেয়, তাকেই আপাত দৃষ্টিতে ঔদার্য বলে মনে হয়, যদিও তার মধ্য দিয়েই শোষণ ও নিষ্পেষণও যে নিরুপদ্রবে চলতে থাকে, তা তোমাকে ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করে বলেছি। ভারতবর্ষের শান্তিপ্রিয় মানুষেরা তো বটেই বহু বহিরাগত জনজাতিও এদেশের জলবায়ুতে থিতু হয়ে বসার পর অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব এই ব্যবস্থাটিকে মেনে নিয়েছিল। সহস্র বৎসরের ব্যবহারে এই বর্ণাশ্রম প্রথা ক্রমশই সূক্ষ্ম ও জটিলতর হয়েছিল, এবং আদি চতুর্বর্ণের জায়গায় জন্ম নিয়েছিল তার হাজার হাজার উপবিভাগ। হিন্দুধর্ম কিভাবে তার চতুষ্পার্শ্বের নানা জনজাতিকে এইসব হরেক বর্ণের আওতায় এনেছিল তার এক চমৎকার বিশ্লেষণ পেয়েছিলাম ম্যাক্স ওয়েবার নামক এক জার্মান পণ্ডিতের অসাধারণ গবেষণাপ্রসূত গ্রন্থ ‘দ্য রিলিজিয়ন অব ইণ্ডিয়া’ গ্রন্থে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় লেখা এই বইটি জোগাড় করেছিলাম পুরনো বইয়ের দোকান থেকে। গ্রন্থকারের অনেক সিদ্ধান্তই পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেছেন। ওয়েবার মন্তব্য করেছিলেন বহিরাগত ধর্মের মধ্যে ইসলামই প্রথম হিন্দু বর্ণ বিভেদের গণ্ডিতে আসতে চায়নি, এবং গোল বেধেছে তখন থেকেই; যদিও বর্ণভেদের দাপট এদেশে এতই প্রবল যে মুসলমান বা খ্রীস্টানরাও তার প্রভাব এড়াতে পারেনি। ‘বামুন’ খ্রীস্টান আর ‘শূদ্র’ খ্রীস্টানে বিবাহ চলে না এবং ‘নিম্নবংশ’ জাত মুসলমান থেকেই যান ‘উচ্চবংশে’র মুসলমানের চোখে হেয়। এই আবিলতা সত্ত্বেও ইসলাম[illegible] সুনির্দিষ্ট ধর্মমত নিয়ে এতই স্বতন্ত্র যে হিন্দু বহুমতাবলম্বী বা প্লুরালিস্ট সমাজ [illegible] দাড় করিয়ে রেখেছে এবং ইসলামও হিন্দু বহুমতের মধ্যে অন্যতম ও বহু ব[illegible] মধ্যে এক নিম্নতম হতে সম্মত হয়নি। বলা যেতে পারে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনের পর থেকেই হিন্দু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা থমকে দাঁড়াল এবং একে অপরের মুখোমুখি হল, পরস্পরকে সম্পূর্ণ আত্মীকরণ তাদের কারু পক্ষেই সম্ভব ছিল না। এই ঘটনার পর হিন্দু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার আর বিশেষ বিস্তার ঘটেনি, ররং ক্রমে তার ক্ষয় ঘটেছে। কেন তা ঘটেছে বলে আমার মনে হয়, তা তোমায় বলছি।

প্রথমত হিন্দুধর্মে ব্যক্তির পতিত হওয়া যত সহজ, বাইরে থেকে এতে ব্যক্তি বিশেষের প্রবেশ ততই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। এক একটি গোষ্ঠী বা জনজাতিকে এই ধর্ম ক্রমে ক্রমে আত্মীকরণ করেছে। উভয়পক্ষের গরজেই কেমন করে তা ঘটেছে, ইতিপূর্বে তা বলেছি। এই প্রক্রিয়ায় রাজশক্তি অবশ্যই সহায়ক হয়েছিল, কিন্তু ইসলামের আগমনের

পব থেকে এই সহাযক শক্তি ক্রমে দুর্বল থেকে দুর্বলতব হ্যেছে এবং এক সময প্রায সমগ্র ভাবতবর্ষেব বাজধর্ম হযে দাঁড়িযেছে ইসলাম। এ অবস্থায হিন্দু ধর্মেব ব্যাপ্তি যে ক্ষীযমান হবে, সেটা সহজেই অনুমান কবা যায।

তাই বলে ভাবতবর্ষে ইসলাম তববাবিব সাহায্যে জযলাভ কবেনি। আর্যবা যে কাবণে অনার্যদেব ধর্মাচবণে হস্তক্ষেপ কবেনি, সে কাবণেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী নূতন শাসকেবাও এই বিশাল দেশেব সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে আঘাত কবতে চাযনি। এদেশেব শাসনব্যবস্থা তাবা এদেশীযদেব দ্বাবাই গড়ে তুলেছিল, এবং শুধু তাই নয, অচিবেই তাবা নিজেবাই হিন্দুস্থানি বনে গিযেছিল। কিন্তু আর্য ব্রাহ্মণেবা যে এক সুসমন্বিত 'ধম গডে তুলেছিল, এই নূতন শাসকদেব পক্ষে সেবকম কিছু কবা সম্ভব ছিল না (আকবব একবাব ব্যর্থ চেষ্টা কবেছিলেন মাত্র), কাবণ তাবা নিজেবাই ছিল এক শক্তিশালী শৃঙ্খলাবদ্ধ নব্য ধর্মমতে বলীযান। অপব দিকে হিন্দু ধর্মেব মত ইসলামে পতিত হওযাব ভয নেই, এবং তাব প্রবেশেব দ্বাবটি হিন্দুধর্মেব মত কুলুপ আঁটা নয। এই নবাগত ধর্মে বর্ণভেদ নেই, বযেছে সকলেব মধ্যে সাম্য। তাবই ফলে ভাবতবর্ষেব বিপুল সংখ্যক নির্যাতিত অবহেলিত ঘৃণিত ছোটজাতেব মানুষ ইহলোকে কিঞ্চিৎ মর্যাদা ও বাজাব ধর্মেব সম্মান এবং পবলোকে বেহেস্তেব আশায হিন্দুধম ত্যাগ কবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেছিল। তববাবিব আস্ফালনে যে ইসলাম এদেশে জযী হযনি বা হওযা সম্ভব ছিল না, তাব প্রমাণ হল এই যে তাহলে যে ধর্ম এ দেশে প্রায ছশ বছব ধবে বাজাব ধর্ম ছিল সেই ধমাবলম্বীবা এমন সংখ্যালঘু হতনা, এবং শাসন শিক্ষা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে উচ্চবর্ণেব হিন্দুদেব এত দাপটও থাকত না। প্রকৃতপক্ষে মহানুভব আকবব থেকে শুরু কবে ধর্মীয সঙ্কীর্ণতাবাদী ঔবঙ্গজেব পযন্ত সকলেই ব্রাহ্মণ, হিন্দু জমিদাব ও মন্দিব নিমাণেব ক্ষেত্রেব জন্য ভূমি, বিত্ত ও আনুকূল্য বিতবণে ছিলেন মুক্ত হস্ত— ইতিহাসেই তাব ভূবি ভূবি সাক্ষ্য বযেছে। অপব পক্ষে সাধাবণ মুসলমানেবা বযে গেছে যেই তিমিবে সেই তিমিবে। আজকেব কোটা কোটী ভাবতীয মুসলমানেব পূর্ব পুরুষেবা এদেশেবই দবিদ্র শূদ্র চণ্ডাল বা পতিতেব ঘবে জন্মেছিল, তাবা বহিবাগত শাসক শ্রেণীভূক্ত ছিল না। যদি তাই হত তা হলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ভাবতবর্ষব্যাপী এত অবহেলা তাদেব কপালে জুটত না, বহিবাগত আর্যদেব উত্তবসূবী আজকেব উচ্চবর্ণীয হিন্দুদেব মতই তাবা সমাজেব উচ্চাসনে থাকত।

শতশত বছব ধবে ভাবতবর্ষেব মাটিব এই সন্তানদেব আমবা অপমান কবে চলেছি। শূদ্র চণ্ডাল আব মুসলমানদেব আমবা উচ্চ বর্ণেব হিন্দুবা ঘবে প্রবেশ কবতে দিই নি, তাদেব ছোঁযা জল খাইনি, পথেব কুকুবেব মত তাদেব আঙিনা থেকে দব দূব কবে তাড়িযে দিযেছি। তোমায একটি উদাহবণ দিই। ভাবতবর্ষেব মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে জাতপাতেব বাঁধন কিছু আলগা বলে খ্যাতি বা কুখ্যাতি আছে। তদুপবি এই বাজ্য বাম বাজনীতিব পীঠস্থান। সেই পশ্চিমবঙ্গেব মধ্যে আমাদেব গ্রামীণ এলাকাটি, তুমি জান, যাকে বলে 'বেড ফোর্ট'। বামপন্থী ছাড়া কেউ কোনওদিন এখানে ভোটে জেতে না। সেই গ্রামেব একটি লজ্জাকব কাহিনী শোন। এখানে এই প্রায শতকবা একশ ভাগ হিন্দু এলাকায দৈবক্রমে একটি মুসলমান পবিবাব ভাড়াটে হযে এসেছিলেন। পবিবাবেব কর্তা সজ্জন হলেও দুর্ভাগ্যবশত কিঞ্চিৎ বিত্তবান, নিজেব গাড়িটাড়ি আছে। সুতবাং শীঘ্রই পাড়াব ছেলেদেব নানা আবদাব শুরু হযে গেল। নানা 'সামাজিক' কাবণে 'সমাজসেবী'বা ভদ্রলোকেব কাছ থেকে টাকা পযসা গাড়ি ব্যবহাবেব দাবি কবতে লাগল। যখন এই

অত্যাচার কিছু অতিরিক্ত হল তখন পাড়ার সহানুভূতিশীল মানুষেরা হস্তক্ষেপ করলেন এবং এই উৎপাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তাঁকে বলে দেওয়া হল এখানকার 'প্রগতিশীল' মানুষরা থাকতে তাঁর কোনও ভয় নেই। তিনি সত্যিই কৃতার্থ হলেন। ইতিমধ্যে একদিন এই পড়শিরা ঠিক করলেন যে সবাই মিলে একটা পিকনিক হবে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে সকলেই সহর্ষে রাজি হয়ে গেলেন, সেই মুসলমান ভদ্রলোকটি সমেত। কিন্তু গোল বাধল পরদিন থেকে। উদ্যোক্তাদের কাছে এসে জনে জনে প্রশ্ন করতে থাকলেন, 'আচ্ছা, 'উনি'ও আমাদের সংগে পিকনিকে আছেন?' যখন উল্টে প্রশ্ন করা হল, 'হ্যাঁ, আছেন, কিন্তু কেন?' তখন আমতা আমতা জবাব এল, 'না, মানে, কেউ কেউ আবার এসব নিয়ে আপত্তি করেন কিনা। মানে, বুঝলেন না, সবাই তো আর আপনার আমার মত প্রগতিশীল নয়। হেঃ হেঃ হেঃ।' 'আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?' প্রশ্নের জবাবে সকলেই দীর্ঘ জিহ্বা দংশন করে বলে গেলেন, 'ছিঃ, ছিঃ, উনিও মানুষ, আমরাও মানুষ। আপত্তি থাকবে কেন?' ....কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল পিকনিকের চাঁদা দিতে আর কেউ এলেন না। সকলেরই কোনও না কোনও অসুবিধে ঘটে যাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের ভাষায় কাহারও বাড়িতে বড় অসুখ, আবার কাহারো বাড়িতে বড় সুখ, একটি নাতি হইয়াছে। উদ্যোক্তারা যখন ঠিক করলেন যে তাঁরা দু তিন জনে মিলেই পিকনিকটি করবেন, তখন সম্ভবত ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে মুসলমান ভদ্রলোকটিও একটা অজুহাতে সরে দাড়ালেন। সেই ভদ্রলোককে অনেকদিন দেখিনা, সম্ভবত কোনও 'মুসলমান পাড়া'য় চলে গেছেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী একই দেশে জন্মে ও একই মাটিতে বাস করেও এই যে পারস্পরিক বিচ্ছেদ ও অনাত্মীয়তা, মানবত্বের এই যে অপমান, ভারতবর্ষের হিন্দু ঐতিহ্যের এ এক দুরপনেয় কলঙ্ক। অনেকে মনে করেন 'সাম্প্রদায়িকতা' জিনিসটা ইংরেজদের তৈরি, নয়তো এদেশে চিরকাল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল। কথাটাকে আমি নির্ভেজাল সত্য বলে মনে করিনা। এদেশে কখনওই মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করা হয়নি, রক্তকরবীর পাতালপুরীর মত সকলেই এখানে তকমা আঁটা,— কেউ ৭৯ এর খ, কেউ ৭৮ এর ঙ, – কেউ শূদ্র, কেউ চণ্ডাল, কেউ মুসলমান। বিবাহ হবে? দেখে নাও সে ব্রাহ্মণ, না মাহিষ্য? মুসলমান হলে নৈব নৈব চ। একাসনে আহার? মুসলমান না হিন্দু? হিন্দু হলেও রক্ষা নেই যদি না হয় জলচল। অফিস আদালত কাছারি শাসন ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থা সর্বত্রই দেশের মুষ্টিমেয় ব্যানার্জী চ্যাটার্জী বোস ঘোষ দাশগুপ্ত সেনগুপ্তদের রমরমা। এই নাকি ভারতবর্ষ? দেশের অধিকাংশই রয়েছে আলাদা হয়ে। একেই বলে অ্যাপার্ট-হীড, যার উচ্চারণ অ্যাপারথীড। অর্থাৎ কিনা বর্ণবৈষম্য। দক্ষিণ আফ্রিকা আর ভারতবর্ষে একই ব্যবস্থার কিছু বাহ্যিক হের ফের।

এই হৃদয়হীন অমানবিক পরিবেশেই বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা এত সহজ হয়েছে। এর জন্য কে দায়ি নয়, বলতো? এক নম্বর আসামী অবশ্যই উত্তরপ্রদেশের কল্যাণ সিং সরকার, যারা প্রকাশ্যে মসজিদ ভেঙে মন্দির গড়ার জন্য সর্বপ্রকার মদত জুগিয়েছে। তারা জমি অধিগ্রহণ করেছে, আশপাশের মন্দিরগুলিকেও বুলডজার দিয়ে ভেঙেছে, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অমান্য করে কর সেবকদের জমায়েত হতে, মন্দিরের বাইরের কাঠামো গড়তে ও মসজিদটিকে ভেঙে ফেলতে সবরকমের সাহায্য করেছে। মসজিদ ভাঙার পর এদের নেতারা বাইরে দুঃখপ্রকাশ করলেও এই চিঠি ছাপতে যাওয়ার সময় দেখা যাচ্ছে, ওরা সাময়িক দুঃখপ্রকাশ শুধরে নিয়ে বলতে শুরু করেছে ঃ 'ভেঙেছি, বেশ করেছি।

বামেব কৃপা না হলে অতবড় মসজিদ ভাঙা যায়? এবাবে আমবা ঠিক ওখানেই মন্দিব গড়ব।' দুই নম্বব আসামী হলেন কেন্দ্রে নবসিংহ বাও সবকাব। যে নিপুণ কৃৎকৌশল ও সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রযোগ কবে ঐ বিশাল সৌধটি তড়িৎ গতিতে ধূলিসাৎ কবা হযেছে এবং তাব সমস্ত ধ্বংসাবশেষ সবিযে ফেলে সেখানে বামেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কবা হযেছে, তা বিবাট সংখ্যক মানুষেব দীর্ঘদিনব্যাপী আলোচনা, প্রশিক্ষণ ও মহড়া ভিন্ন সম্ভব নয, এ কথা প্রত্যক্ষদর্শীবা ঘুবে এসে বলেছেন। মিলিটাবি পুলিশ ইনজিনিযাবিং প্রভৃতি পেশায বর্তমানে অথবা পূর্বে নিযুক্ত কিছু মানুষ এই চক্রান্তেব সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত ছিল। এতগুলি মানুষকে নিযে একটা কাণ্ড কখনও সম্পূর্ণ গোপনে হযনি, অনেকেই তা আগে থেকে জানত। কেন্দ্রীয সবকাবেব কাছেও তা কিছুতেই অগোচব থাকাব কথা নয। কিন্তু তাঁবা কখনও সাধুদেব সঙ্গে কথা বলে কখনও উত্তবপ্রদেশ সবকাবকে শুধু হুঁশিযাবি দিযে কালক্ষেপ কবে গেছেন। লাঠিটি না ভাঙে, সাপও না মবে, এই ছিল প্রধানমন্ত্রীব নীতি। বাববি মসজিদ ভাঙ্গল, সুপ্রিম কোর্টেব বায অমান্য কবা হল, হাজাব মানুষ চক্রান্ত কবে দেশেব কতকগুলি মূলনীতিকে প্রকাশ্যে হত্যা কবল, আব কেন্দ্রীয সবকাব তাব যাবতীয ক্ষমতা ও মজুত সৈন্যদল নিযে অদূবে দাঁড়িযে বইল। এমন কি বাববি মসজিদ ধূলিসাৎ হওযাব পবও দিল্লী ছ–ঘন্টা অপেক্ষা কবল, কেবিনেট মিটিং বসল না, এবং এই সমযেব মধ্যে মসজিদ চত্বরে বীতিমত এক অস্থাযী মন্দিব, সামিযানা, মাইক ব্যবস্থা ইত্যাদি সমেত বামলালা প্রতিষ্টিত হল। এত সব কাণ্ডেব পব, চোব বামাল সবে পড়বাব পবেই কেবল পুলিশ এল, উত্তবপ্রদেশে বাষ্ট্রপতিব শাসন বলবৎ হল। অথচ মনে বেখো প্রধানমন্ত্রীব দোদুল্যমানতাব কোনও অজুহাত ছিল না। দেশেব সমস্ত ধর্মনিবপেক্ষ বাজনৈতিক পার্টি জাতীয সংহতি পবিষদেব সভায প্রধানমন্ত্রীকে ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিযেছিল। বলেছিল ঃ দেশেব ধর্ম নিবপেক্ষতাকে, বাববি মসজিদেব কাঠামোকে বক্ষা কবাব জন্য প্রধানমন্ত্রী যা কিছু কববেন তাকেই আমবা সমর্থন কবব। এবকম দ্ব্যর্থহীন জাতীয সমর্থন ক্বচিৎ মেলে। আসামীব কাঠগড়ায দাঁড়াতে হবে গণমাধ্যমগুলিকেও। পত্রিকাগুলি অনেক কাব্য কবেছে, তাবা অনেক প্রত্যক্ষদর্শীব বিপোর্ট ছেপেছে, অনেক কাগজেব প্রতিনিধি আবাব কবসেবকদেব সঙ্গে মিশে গিযে তাদেব 'ভিতবেব খবব'ও ছেপেছে। কিন্তু বাববি মসজিদ ধ্বংসেব যে ব্লু প্রিন্ট তৈবি হযেছে এবং তা কার্যকব কবাব জন্য বিবাট প্রকাশ্য চক্রান্ত চালু আছে, এ খবটি তাবা ঘুণাক্ষবেও দেযনি। অথচ পত্রিকাগুলি আজকাল খববেব চেযে খববেব পিছনেব খবব ছাপতেই বেশি ভালবাসে। দূবদর্শনে বাববি মসজিদ ভাঙাব পৈশাচিক তাণ্ডবটিকে দেখানো হযনি। এমন কি সাপ্তাহিক 'ওযার্ল্ড দিস উইক', যা সোৎসাহে পূর্ব ইউবোপীয দেশগুলিতে কিংবা বাশিযায লাল পতাকা কিংবা লেনিনেব মূর্তি নামিযে আনাব গণউল্লাস দিনেব পব দিন দর্শকদেব কাছে উপস্থিত কবেছে, বাববি মসজিদ ধ্বংসেব ব্যাপাবে তাও ছিল বড়ই নিরুৎসুক। অথচ শুধু মাত্র ঐ ঘটনাটিব ছবি, ঐ ধর্মান্ধদেব কুৎসিৎ আস্ফালন, তাদেব অশ্লীল চিৎকাব, তাদেব মুখেব পাশবিক হিংস্রতা কী সহজেই না তাদেব বীভৎস স্বরূপটিকে জনসমক্ষে তুলে ধবতে পাবত। মানুষ জানত যে বামেব এই বিংশ শতাব্দীব তথাকথিত ভক্তবা বানবও নয, বাক্ষস।

কিন্তু আমি তোমাকে গোড়ায যে কথা বলতে চাইছিলাম, তা হল এই ঘটনা কেবল সাম্প্রদাযিকতাবাদীদেব চক্রান্ত আব প্রশাসনিক ব্যর্থতাব ফল নয। যাবা অপবকে দাযী কবছে,তাবা নিজেবাও দাযী। গণমাধ্যমেব উল্লেখটি আমি সে কাবণেই কবলাম। কিন্তু

শুধু গণমাধ্যম কেন, আরও আছে। সরকার বিরোধী বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলি কেবল প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা দিয়ে কেন বসে রইল, তিনি ব্যর্থ হলে পরে তাঁকে সমালোচনা করবে বলে? তাঁর পক্ষে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ তো একরকম আশাতীত ব্যাপারই ছিল। তবে? অযোধ্যা এমন একটি কেন্দ্র যেখান থেকে আগের বারেও নির্বাচিত হয়েছিলেন একজন কমিউনিস্ট প্রার্থী। একসময় বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলি ঘোষণা করেছিলেন–কংগ্রেসের কোনও কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বও তাতে সামিল হয়েছিলেন বলে মনে আছে–যে তাঁরা বাবরি মসজিদকে ঘিরে রেখে তাকে রক্ষা করবেন। কোথায় গেল সেই ইপ্সিত গণ উদ্যোগ? পুলিশ মিলিটারি করে দেশের অমূল্য সম্পদ তার আদ[illegible]ক রক্ষা করেছে, তারা তো শাসক শ্রেণীর দাসমাত্র। দেশের গণতান্ত্রিক মানুষেরা আগাম জেনে শুনেও কেন বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে রুখতে এগিয়ে এল না? শত শহীদের দেশ এই ভারতবর্ষে একজনও কি ছিল না ত্রিশূলধারীদের সামনে বুক পেতে দেবার মত? এ কি তোমার আমার সবার লজ্জা নয়? সেই লজ্জার তাড়নায়ই এই চিঠি, এই স্বীকারোক্তি। আসলে সত্যজিতের 'দেবী'র স্বামীর মত আমরা দেবি করে ফেলেছি। বুদ্ধি দিয়ে ধর্মান্ধতাকে বুঝেছি, কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করিনি, তাকে প্রশ্রয় দিয়েছি, জায়গা ছেড়ে দিয়েছি, গোড়াতেই বিষবৃক্ষকে উৎপাটিত করিনি। অতএব এই ট্র্যাজেডী ছিল অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক সমঝওতা আর ক্ষমতার পাটিগণিত কষতে গিয়ে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ভারতবর্ষে আর একবার হেরে গেল। সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি, আপোষ আর সুবিধাবাদের ওপর দাঁড়িয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

সারা দেশ জুড়ে আজ চিন্তার দৈন্য। পথে ঘাটে শুধু সন্দেহ আর অবিশ্বাস। আমি বেশ কয়েকজনকে বলতে শুনেছি, যারা এই সব মারদাঙ্গা বা মসজিদ ভাঙার সমর্থক নয়, কিন্তু তারা মুসলমানদের 'বাড়াবাড়ি ও পছন্দ করে না। 'আমাদের দেশে থেকে আমাদেরই চোখ রাঙাচ্ছে'? 'ওদের দেশে ওরা আমাদের এরকম বলতে দেবে?' ইত্যাদি প্রশ্ন তারা তাক করে ছুঁড়ে মারছে। এই মনোভাবের সরল অর্থ হল এই যে দেশটা হল হিন্দুদের, 'ওরা' এদেশের কেউ নয়। এর চেয়ে অর্থহীন, এর চেয়ে মিথ্যা আর কী হতে পারে? শুধু তাই নয়, এর চেয়ে কপট উক্তিও কিছু নেই, কারণ 'হিন্দু' বলতে এখানে মনে করা হয়ে থাকে শুধু 'বর্ণহিন্দু', শূদ্র বা হরিজন নয়। ব্রাহ্মণে শূদ্রে চণ্ডালে আত্মীয়তা কোথায়? মুসলমানের মতই তো এরাও অনাত্মীয়। সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন বর্ণে ও ধর্মে বিভক্ত মানুষগুলি যতদিন দ্বীপের মত বাস করছে, ততদিন প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জাগবে কী করে? ইংরেজ বা কোনও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সকলে মিলে রুখে দাঁড়ানো— সে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কিন্তু যখন কোনও বহিঃশত্রু নেই, বা তা আড়ালে বা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তখনও যদি সকলের ঐক্য থাকে, তবেই তো তা প্রকৃত জাতীয় সংহতি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশীয়ানার জোয়ারে সেই যে মনে হয়েছিল, 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান। বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান,' আজ তা দূরাগত প্রতিধ্বনিত ধ্বনিতে পর্যবসিত। এর একটা কারণ যে ধর্মান্ধতা, তা দেখতেই পাচ্ছ। আমার মতে এদেশে এই ধর্মান্ধতার একটা মৌলিক উপাদান হল বর্ণভেদ। কেননা, তোমায় দেখিয়েছি হিন্দুধর্মে মৌলবাদের প্রাবল্যের অবকাশ নেই। যেটা আছে, তা হল কূপমণ্ডুকতা, যার যার একান্ত নিজস্ব বিশ্ব নিয়ে দেমাক ও বিচ্ছিন্নতা। এটা কোনও আপতিক ঘটনা নয় যে ভারতবর্ষের যে 'হিন্দি বলয়ে' জাতপাতের প্রাবল্য বেশি, সেখানেই সাম্প্রদায়িকতাও বেশি জোরদার। আবার গ্রামগুলিতে যেখানে নিম্নবর্ণের হিন্দু আর মুসলমানেরা একত্রে মাঠে ঘাটে কাজ

করবেন, সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সহজে ঢোকে না। হিন্দু যদি তাই নিজের উন্নতি চায়, যদি চায় দেশের কল্যাণ, তবে তাকে বর্ণ-পরিচয় থেকে মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল মানুষ হতে হবে। উচ্চ বর্ণের আধিপত্য ও নিম্নবর্ণের প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা হিন্দুকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, তাকে ভাঙতেই হবে। মন্দির গড়ে কার উপকার? ভারতবর্ষের প্রতিটি হিন্দু-মন্দিরে কি প্রতিটি হিন্দুর প্রবেশাধিকার আজ আছে? আগে নিজের চরকায় তেল দাও, পরে মুসলমানদের নিয়ে মাথা ঘামিও।

এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসে অনন্তকাল ধরে ঘ্যানর ঘ্যানর করছিলেন : 'হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ আমিও অপছন্দ করি। কিন্তু, জানেন তো, ওরা কী হারে বাড়ছে? ওরা একেক জনে দশটা পাঁচটা করে বিয়ে করে।' আমি তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না যে অঙ্কের হিসেবে এটা হয় না। প্রতিটি পুরুষকে পাঁচটা বিয়ে করতে হলে বিবাহযোগ্য নারীর সংখ্যা বিবাহযোগ্য পুরুষের পাঁচ গুণ হতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক সমাজেই নারী পুরুষ প্রায় সমান সমান, প্রাচ্য দেশে নারীর সংখ্যা বরং সব সময়ই পুরুষের চেয়ে কম, সেটা নারীর প্রতি অবহেলার কারণে। ভদ্রলোক যখন কিছুই বুঝবেন না, তখন আমি তাঁকে বললাম, 'আপনারা হিন্দুরা কেন বিধবার বিয়ে দেন না? তাহলেই তো কত জনসংখ্যা বাড়ে। আগে নিজেদের ত্রুটিগুলি সংশোধন করুন। আমাদের কত বিধবা যে ভিক্ষা বৃত্তি পতিতাবৃত্তি আর মৃত্যুবরণ করছে, তার কি কোনও খবর রাখেন?' হিন্দু প্রেমীটি তখন কেটে পড়লেন। অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন এই বলে যে ষাট কোটি হিন্দু পনের কোটি মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির ভয়ে ভীত কেন? আসলে আমরা নিজেদের ষাট কোটি বলে ভাবি নাকি? পঞ্চাশ কোটি নিম্নবর্ণের হিন্দু তো ফালতু মাল, ওরা কি ধর্তব্যের মধ্যে আসে?

মুসলিম সমাজও অন্ধকারাচ্ছন্ন। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্যে তারা ম্রিয়মান। মৌলবীরা তাদের আল্লা আজান আর বেহেস্তের আশা ছাড়া আর কিছু দিতে পারেনি। কিন্তু ওদের ছুৎমার্গ নেই। ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক হিন্দু যদি বর্ণের খোলস থেকে মুক্ত হয়ে পরস্পরকে ভাই বলে ভালবাসতে পারে, তাহলে সংখ্যালঘু মুসলমানের সঙ্গে তার বিভেদও সহজেই মিটে যাবে। চৈতন্য বর্ণভেদ মানতেন না বলে অনায়াসেই মুসলমানকে কোল দিয়েছিলেন।

চিঠি ক্রমশই বড় হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে শেষ করি। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি আমরা কতই না আউড়েছি : 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, । জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, । আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী, । বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, ।....যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি, । বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি, । পৌরুষেরে করেনি শতধা' -রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে 'নির্দয় আঘাতে' সেই স্বর্গে জাগরিত করার জন্য পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। কবির সেই প্রার্থনা পরম পিতা শুনেছিলেন কিনা, তা তিনিই বলতে পারবেন, কিন্তু আমরা তো শুনেছিলাম। আর নির্দয় আঘাতও তো আমরা কম পাইনি। সুতরাং জাগরিত হবার দিন তো কবেই এসে গেছে।